পঞ্চম বর্ষের বর্ণানুক্রমিক বিষয় সূচী।

(আশ্বিন হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত ১৩২৩, ১৩২৪ সাল)

প্রবন্ধাবলী।

বিষয়		লেখক	পত্রাঙ্ক
আগমনী	..	শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ	৮
আহ্নিক-তত্ত্বে—গুরুশিষ্যসংবাদ	...	শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র কাব্যস্মৃতিতীর্থ	২০৮, ২৮৯
আয়ু	...	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ	২৫৯
কবিত্ব ও দার্শনিকতা	...	শ্রীযুক্ত	৩১৮
কুলপরিচয় রক্ষার আবশ্যকতা	...	শ্রীযুক্ত শশিভূষণ শিরোমণি	৩১৮
কৈফিয়ৎ	...	শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৮
গোপালন	...	শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কাব্যতীর্থ	৪৫৪
গোসেবা	...	শ্রীযুক্ত রামচরণ বিদ্যাবিনোদ	২০২
গার্হস্থ্যাশ্রম	.	শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৮১
জাতি বা বর্ণ	...	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার তর্কনিধি	২৮, ২৭১, ৩৮৬
জাতীয় উত্থান	..	শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র সান্যাল	৫১৬, ৫৭৫
দেবযানীয় বিবাহ	...	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ	৩২৪
ধর্ম্ম ও সদাচার	...	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ	২৬
নাম-মাহাত্ম্য	...	শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী	২৩২
পঞ্জিকা-সংস্কার	...	শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র এম-এ,	৫০০, ৫৩৮
পঞ্চতত্ত্ব সাধনায় সমাধান	...	শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৬৬
পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধীয় আলোচনা		শ্রীযুক্ত সাতকড়ি সিদ্ধান্তজ্যোতির্ভূষণ	৩৬২
পুরাণ-কাহিনী	...	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩৭, ২৯৩
পুরোহিতের কর্ত্তব্যপরায়ণতা	- ..	শ্রীযুক্ত	৩৫১, ৪২৮
পূজার খেলা	...	শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য	৩৪
পৌরাণিক ভারতবর্ষ	...	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ	৫৩০
প্রতিবাদ (স্মৃতি)	...	শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ স্মৃতিমীমাংসাতীর্থ	৪৩৬
প্রাচীন ভারতে জড়বিজ্ঞান	...	শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার শাস্ত্রী	৪৬৪
প্রতিবাদের প্রতিবাদ (জ্যোতিষ)		শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণ	৬০১
সন্ধ্যা সম্বন্ধীয় প্রাপ্তপত্র)	...	শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ রায়	৩৪১

বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক
মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ ...	শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ	১৫১
মুক্তি ও তাহার সাধন ...	শ্রীযুক্ত শশিকুমার শিরোমণি	২৯৯
রাখালদাস স্মরণার্চ্চনা..	শ্রীযুক্ত রামসহায়বেদান্তশাস্ত্রীকাব্যতীর্থ	৫২৫
রাজভক্তি...	শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কাব্যস্মৃতিতীর্থ	২১১
বৃষোৎসর্গের বৃষ	শ্রীযুক্ত রামতারণ মুখোপাধ্যায়	১৯৬
বেদ ও বৈদিক উপাসনা .	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	১১৬
বোপদেব .	শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কাব্যস্মৃতিতীর্থ	১৩৯
বোধক .	শ্রীযুক্ত	৩
বৈদিকক্রিয়ার ফল .	শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৫২৩
ব্রাহ্মণ-সমাজ শীর্ষক প্রবন্ধে প্রতিবাদ	শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ঘটক	৭৪
ব্রাহ্মণসভা প্রতিষ্ঠা ..	শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরঞ্জন	৫৫৯
ব্রাহ্মণ্য সাধনা .	শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়বাহাদুর	৫৮৩
ব্রহ্মচর্য্য ..	শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৩৭৬
শব্দের আক্ষেপ ..	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ	৭৯
শিক্ষা ..	শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য এম্ এ,	১১৯, ১৭৭
শিক্ষা ..	শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য এম্ এ,	৫১০
শ্রাদ্ধে বিরাটপাঠের উদ্দেশ্য	শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৩৪৩
শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব	শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন	৪৯, ৫৫, ১২৮
সদাচার	শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্কতীর্থ	৪৩৮
সত্যবতী বিবাহ	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ	৪৭১
সভাপতির অভিভাষণ	শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন	৪০২
সন্ধ্যায় সন্দেহ ..	শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র শর্ম্মা	৮০
সন্ধ্যাব্যবস্থা...	শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার শাস্ত্রী	২৬৬
সন্ধ্যাসম্বন্ধীয় আলোচনা ও সন্ধ্যা (প্রাপ্তপত্র) ..	শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ রায়	।৪৭৮, ৫৫৪
সাহিত্য ও জাতীয় জীবন	শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রীকাব্যতীর্থ	৪৪৫
সুখের মূল...	শ্রীযুক্ত পঞ্চানন স্মৃতিতীর্থ	৪৮৪
স্ত্রীশিক্ষা...	শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র সান্যাল	৩২৯
হিন্দু বিধবা...	শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র সান্যাল	২৪
হিন্দুস্থানি পর্ব্ব...	শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য	২৪৮
হিন্দুজীবনের লক্ষ্য .	শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৫৪৬

আখ্যায়িকাবলী।

বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক
কীর্ত্তিমালিনী ··	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	৯৪
পুরহিতের কর্ত্তব্যপরায়ণতা ··	শ্রীযুক্ত	৩৫১
পূজার খেলা ··	শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য	৩৪, ৪২৮
প্রতিফল···	শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য	৩৩
মানবী না দেবী ··	শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার শাস্ত্রী	১৪৫, ১৮৮
মেৎনীর দেউল ··	শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ	৪৯০
শাণ্ডিলী ও সুমনা ··	শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রীকাব্যতীর্থ	৫৯৪
হিন্দুসমাজে পণপ্রথা (বিবাহব্যবসায়)	শ্রীযুক্ত	৫৭০
পঞ্জিকা-সংস্কার সমালোচনার বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা।	শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র এম্‌এ,	৬৫৫

সামাজিক-প্রসঙ্গ।

বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক
সংস্কার না সংহার		৯৯
মহারাজ পরলোকে		১০২
তর্করত্নমহাশয়ের পীড়া		
মেটিয়ারীর প্রায়শ্চিত্ত		১০৩
অন্যায় প্রশ্ন		
পঞ্জিকা-সংস্কার		
দলাদলির কথা		১০৪
শৈববিবাহে বাবুর বিদ্যা		
সাহিত্যে অবনতি		১০৭
উপায় কি ?		
অপর উপায়		
মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা		
ব্রাহ্মণ-সভার শত্রু নহে মিত্র		১০৯
সৃষ্টিরহস্যের ইঙ্গিত		১৬২
জাতিরহস্য		
পতিতহিন্দু হিন্দুনামের যোগ্য কি না		১৬৩
নিন্দকের নিন্দায় মহাভারতের উপদেশ		১৬৬
সংহারের একবাদিতা		১৬৭
শ্রীপঞ্চমী		২৭৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
সমাজের অধঃপতনের মূল	২৭৭
প্রকৃত শিক্ষার উপায়	২৭৯
বাসন্তী	৩৯০
অন্নপূর্ণা	৩৯১
ব্রহ্মপুত্রস্নানযোগ	৩৯২
শ্রীরামনবমী	৩৯৩

কবিতাবলী।

বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক
অকিঞ্চনে ...	শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৩৭৫
আগমনী (গীত) ...	শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার শর্ম্মা	১
আগমনী (পদ্য) ...	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য	১৩
আবেদন ..	শ্রীযুক্ত ইন্দুপতি মুখোপাধ্যায়	৫৪
কলঙ্ক-ভঞ্জন ...	শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২০৬
গান দুটী ..	শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়	১৬১
তপোবন-স্মৃতি ...	শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায়	২১
দুর্গাস্তব ...	শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায়	২
দোলযাত্রা ...	শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ব্যাকরণতীর্থ	৩১২
প্রাচীন নিরক্ষর কার্য্যের লেখাপড়া	শ্রীযুক্ত শারদাচরণ মজুমদার	১২৭
ধরণীবিলাপ	শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র তর্কবাগীশ	১৫৬
নদীর প্রতি ...	শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৫৪৩
নবান্ন ...	শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ	১৬৯
ভারতের ভাগ্য ...	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য	২৮৭
ভ্রান্তি ..	শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৪৫৩
মা ..	শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়	৫৫৯
রথযাত্রা ...	শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৮৯
বাণীবন্দনা ...	শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ	
ব্রাহ্মণ ...	শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	১১৩
ব্রাহ্মণ	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য	১৭৫
ব্রাহ্মণ ..	শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ ভট্টাচার্য্য	৮৫
শঙ্কর পূজা .	শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রীকাব্যতীর্থ	৫০
শ্যামাসঙ্গীত ...	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার তর্কনিধি	৫৩, ৩৩৯
হোলীর বাঁশী ...	শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৩৪১

বিজ্ঞাপন।

সদুপদেশপূর্ণ নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী এম, বি, ৩।২, বৃন্দাবন মল্লিকের লেন, কলিকাতা। এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে পাওয়া যায়।

১। Bisweswar's Bhagbatgita—In English Rhyme Highly Praised by—Renowned Authors and journalists.

"Excellent translation": "Admirable Edition": J. S. Meston Esq., I. C. S. "Very well done": Sir Alfred Croft M. A., L. L. D., K. C. I. E. etc., etc.

২। ক[illegible]রাণী—পঞ্চাঙ্ক নাটক। রাজসাহী প্রধান দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী এম, বি, কাব্যানন্দ প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা।

৩। মধ্যলীলা— শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যলীলা অবলম্বনে লিখিত। ইহাতে অদ্বৈতবাদের খণ্ডন প্রভৃতি বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি বৈষ্ণব ভক্তগণের অতি আদরের জিনিষ।

৪। লোকালোক—নানা বিষয়ের উপাদেয় কবিতাপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ। বালকের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের বিশেষ উপযোগী।

৫। আ[illegible]ক—সংস্কৃত শ্লোকপূর্ণ বাঙ্গালা অনুবাদসহ গ্রন্থ মূল্য ।।০ আট আনা।

৬। উচ্ছ্বাস—ইহাও একখানি সংস্কৃত সুন্দর গ্রন্থ, মূল্য ৸০ বার আনা।

বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ২য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের হার মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ৩য় পৃষ্ঠা ও পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ পৃষ্ঠা ৪৲ চারি টাকা হিসাবে লওয়া হয়। অন্য পেজ ৩৲ তিন টাকা—বার্ষিক স্বতন্ত্র।

২। তিন মাসের কম সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। তিন মাসের মধ্যে বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তিত হয় না।

৩। বিজ্ঞাপনের মূল্যের অর্দ্ধেক টাকা অগ্রিম জমা না দিলে ছাপা হয় না।

৪। দীর্ঘকালের নিমিত্ত বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইলে কার্য্যালয়ে জানিতে পারা যায়।

REGISTERED No. C—675.

পঞ্চম বর্ষ। { ১৮৩৮ শক, ১৩২৩ সাল, পৌষ। } ৪র্থ সংখ্যা।

ব্রাহ্মণ।

(১)

আঁধার আগারে, নিদ্রিতের প্রায়, কেন গো মুগ্ধ জড়ের মতন।
জ্ঞানের আলোক, নেভ নেভ হায়, স্বপন তোমার শোভে কি এখন?
না জাগিলে তুমি, পূরবগরবে জ্ঞানের বিমল জোছনারাশি,
নিস্বার্থে কেই বা বিলাইবে জীবে অজ্ঞান-আঁধার-বিষাদ বিনাশি॥

(২)

নির্লিপ্ত ধীমান, ভূলোক-দেবতা, তুমি যে নিত্য তেজের আধার।
লভি আত্মজ্ঞান কর নিত্য দান ধরমতত্ত্ব ভারত মাঝার॥
জাগিবে হৃদয়ে অতীতের স্মৃতি, পুলকে পূরিবে শত শত প্রাণ।
ধরিয়া হৃদয়ে তোমারই রীতি গাইবে সকলে তোমারি গান॥

(৩)

দূরে হের ওই করম-আধারে সত্ত্ব-পলিতা হ'তেছে ক্ষীণ।
সংযমি-প্রধান, উঠ ত্বরা করি জ্ঞান স্নেহ ধারা না হ'তে লীন॥
উপেক্ষায় তব, পাপের অনলে, দগ্ধ হয় হায়, মুগ্ধ হিন্দু।
হিত যদি চাও, শীতলিয়া দেও বিতরি ভারতে বিবেক-বিন্দু॥

(৪)

স্মরহ বারেক আগেকার কথা, তপোবনে বাস শালিই জীবিকা।
ছিল না আসক্তি, বিলাইতে ভক্তি, বিমুক্তির পথ যাহাতে আঁকা॥
মহত্ব দেখাতে স্বধর্ম্ম রক্ষিতে দিতে অনাবিল পূতধর্ম্ম শিক্ষা।
ফণীন্দ্রসমান কুটিল বয়ান নরেন্দ্রও নিত আসিয়া দীক্ষা॥

(৫)

পূর্ব্বপুরুষ আছিল তোমার, মহর্ষি বাল্মীকি বশিষ্ঠ প্রবীণ।
মরিয়াও তারা অমর জগতে, যুগ যুগান্তর থাকিবে স্বাধীন:॥
জান কি গো কিছু যাঁদের প্রভায় গঙ্গা জাহ্নবী, সমুদ্র হত।
সেই স্বত্ববান তোমরা ব্রাহ্মণ, জপজজ্ঞ রত সতত পূত॥

(৬)

সমাজ-সাগরে বিবেক-প্রবাহে বয়েছিল যবে প্রবল উজান।
জন্মিয়া জগতে সে রঘুনন্দন:রাখিল হিন্দুর হতপ্রায় মান॥
সেই তেজবীর্য্যে গঠিত তোমরা, সেই আত্মবোধ সেই তত্বজ্ঞান।
ভুলিয়া সে সব কেন হে ব্রাহ্মণ, আজ হতমান অসার সমান॥

(৭)

জলদমন্ত্রে ধরম বারতা আবার উচ্চে গাও হে মহান্।
বাজিয়া উঠিবে হৃদয় তন্ত্রী, আনন্দে ভরিবে সবার প্রাণ॥
তব প্রজ্জলিত বিমল আলোকে আলোকিত হবে সমাজ হিন্দু।
পৎ পৎ করি ধরম-পতাকা উড়িবে আবার অবধি সিন্ধু॥

শ্রীঅমৃতলাল ভট্টাচার্য্য।

শিক্ষা।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

এখন দেখা যাউক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই বা কি প্রণালীতে সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এবং তাহার ফলেই বা সমাজ কি ভাবে কি হেতুতে কিরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছিল এবং সেই শিক্ষাতে কি কি বিশিষ্টতা ছিল। একথা বলা চলিবে না যে বর্ণাশ্রম সমাজের উন্নতি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিধানের ফলে হয় নাই। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বর্ত্তমান সময়ের বিভিন্ন সমাজের ধর্ম্মের ন্যায় নামেমাত্র, ইহাতে কোন ধর্ম্মব্যবস্থা ছিল না ; পরন্তু এই ধর্ম্মের ব্যবস্থাতে প্রত্যেককে দৈনিক অতিক্ষুদ্র বিষয়েও ধর্ম্মবিধিমতেই চলিতে হইত, ধর্ম্মবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতাই কাহারও ছিলনা।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মশাসনে বর্ণাশ্রমিসমাজ কিরূপে বাহ্য জগতের সাহায্য ব্যতীতও স্বাধীনভাবে সর্ব্ববিষয়ে অসীম উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়াছিল, এখন সমস্ত সভ্যজগৎই তৎসম্বন্ধে বিশেষ অবগত হইয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতেছেন। কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়েই ঋষিগণ অতুলনীয় উন্নতিপন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহাই নহে, ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিধিতে বিভিন্ন-বর্ণ ঐহিক ও বৈষয়িক সর্ব্বজাতীয় বিদ্যাতেই অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। এখন কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর সভ্যতার ও তাহাদের নানারূপ বিদ্যার সহায়তা পাইয়াও আমরা বর্ণাশ্রম-সমাজে প্রচলিত নানারূপ বিদ্যার কোনটীতেই একটুও প্রবেশলাভ করিতে পারিতেছি না। বেদবেদাঙ্গ-উপনিষদাদি এবং দর্শনশাস্ত্রসমূহও জ্ঞানের চরম উন্নতির সম্পূর্ণ পরিচায়ক ; বাহ্য জগৎ এখনও ঐ সকলের তত্ত্ব উদ্ঘাটনে অসমর্থ, যাহা কিছু জানিয়াছেন তাহাতেই তাহারা বিস্মিত ও স্তম্ভিত। তাঁহাদের প্রচারিত সংহিতাদি ধর্ম্মশাস্ত্র এবং পুরাণসাহিত্য-ইতিহাসাদি সুগঠিত সমুন্নত ও অতি সুসভ্য প্রাচীনসমাজের সাক্ষীস্বরূপে বর্ত্তমান, যাহার তুলনা অনেক বিষয়েই এখনও পৃথিবীতে নাই। ভারতের জ্যোতিষ, চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিতবিদ্যা রসায়ন বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, ভূতবিদ্যা প্রভৃতি অনেক লুপ্ত হইয়া থাকিলেও যতটুকু জানা যায় তাহাই পৃথিবীর সম্মান ও প্রশংসা আকর্ষণ করে। ভারতের দেবতত্ত্ব এখনও লোকের অবোধ্য ; ভারতের যোগশাস্ত্র জগতে অতুলনীয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনেক বিভাগের সমালোচনাতেও প্রাচীন বর্ণাশ্রমসমাজ পশ্চাৎপদ ছিলেন না। এবিষয়ে ডাক্তার শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের Positive Science of Ancient Hindus সকলেরই পাঠ্য। ভারতের বাণিজ্য, ভারতের শিল্প, ভারতের চিত্রবিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা, সঙ্গীতশাস্ত্র, সমস্তই, সেকালেও সমস্ত জগতে প্রসিদ্ধ ছিল, এখনও তাহার অনেকই পৃথিবীর অন্যান্য জাতির অনুকরণীয়। এখন যে আমাদের এত গর্ব্ব, তাহাতে কোন একটী বিষয়েও কি আমরা তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণেও সমর্থ হইতেছি ? কেনই বা আমরা এখন বিদ্যার এত গর্ব্ব করিয়াও কেরাণী ব্যতীত কিছুই

হইতেছি না, আর তখনই বা কেন ব্রাহ্মণের প্রতি আরোপিত নানা অত্যাচার সত্ত্বেও এবং শূদ্রাদি জাতির এত মূর্খতা ও দাসত্ব সত্ত্বেও ভারত শূদ্রজাতির উচিত নানারূপ শিক্ষা ব্যবসায়েও এত উন্নতি করিতে পারিয়াছিল, যাহার অনুকরণে নব্য সভ্যতা গর্ব্বিত আমরা কেন, পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্যজাতিও, এখন পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে সমর্থ হইতেছে না, এই সমস্ত বিষয় কি আমাদের বিশেষ চিন্তার বিষয় নয়? বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এ বিষয়ে কি কি প্রণালীতে কিরূপ সহায়তা সামাজিকদিগকে দিয়াছিল, সেই তত্ত্ব উদঘাটন ও কি আমাদের কর্ত্তব্য নয়? এসকলের বিশেষ সমালোচনা এস্থলে সম্ভবপর নয়; তথাপি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কয়েকটী বিশিষ্টতার উল্লেখ এবং তাহার যে সমস্ত ফল বর্ণাশ্রম সমাজে ফলিয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক নয়।

১। প্রথমতঃ, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সমস্ত সমাজকে ত্যাগের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বর্ত্তমান সভ্যতাতে ভোগই মাত্র জীবনের প্রধান লক্ষ্য, পরকাল নাই বা আছে কিনা সন্দেহ। সুতরাং, ইহজীবনে যত ভোগ করিয়া লওয়া যায়, ততই জীবনের সার্থকতা। বর্ণাশ্রম সমাজে এই জীবনকে জীবাত্মার অসীম উন্নতিপথে একটী সামান্য স্তরমাত্র জ্ঞান করা হইত এবং জীবাত্মার নানারূপ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভই সকলে নিজ নিজ সকল চেষ্টার চরম উদ্দেশ্য মনে করিত; সুতরাং ভোগের প্রতি কাহারও বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। ধর্ম্মে ও শিক্ষা দিয়াছিল ভোগে তোমার প্রতিষ্ঠা নয়, ভোগে তোমার প্রকৃত উন্নতি, প্রকৃত সমৃদ্ধি, প্রকৃত সুখশান্তি কিছুই হইবে না, কেবল ভোগপ্রবণতায় তোমার প্রকৃত ভোগশক্তির হ্রাসই করিবে, তোমাকে মৃত্যুর দিকে বিনাশের দিকেই টানিয়া লইয়া যাইবে, আরও শিক্ষা দিয়াছিল--একমাত্র ত্যাগেই তোমার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা, প্রকৃত স্থিতি, প্রকৃত সমৃদ্ধি, উন্নতি, যশকীর্ত্তিলাভ; সংযমাভ্যাসেই তোমার ভোগশক্তিরও বৃদ্ধি, তাহাতেই তোমার প্রকৃত সুখশান্তি প্রাপ্তি, ত্যাগেই তোমার অমরত্ব, ত্যাগেই তোমার মুক্তি এবং তোমার আত্মার চরম উদ্দেশ্য প্রাপ্তি।

২। ঐরূপ শিক্ষা দিয়াই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ক্ষান্ত ছিলেন না। সমাজটীকেও ঠিক ঐ ভাবেই গঠিত করিয়াছিলেন। এবং তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা, তাহার প্রত্যেক বর্ণের বৃত্তি বিভাগ ব্যবস্থা ও ঐ ত্যাগের ভিত্তিতেই স্থাপন করিয়াছিলেন। ভোগের উদ্দেশ্যে কোন বর্ণই কোন কার্য্য করিতেন না, কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন না—ত্যাগের জন্য, অন্যের ভোগবিধান জন্যই সমাজের সমস্ত কার্য্য ব্যবস্থিত হইত; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় অন্যের ভোগবিধান অন্যের মঙ্গলসাধনে সমাজ ব্যাপৃত থাকিয়াই নিজের ভোগ ষোলআনা সাধন করিত; প্রত্যক্ষ দেখিতে তাহাতেই আত্মার ভোগশক্তি বৃদ্ধি, ভোগের অতিমাত্রার উপলব্ধি এবং উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে সকল আত্মার একত্বোপলব্ধি এবং তাহাতে অসীম আনন্দোপভোগ। ব্রাহ্মণই ঐ ত্যাগ-ধর্ম্মের আদর্শ ছিলেন—তাঁহার সমস্ত শিক্ষা এবং সমস্ত বৃত্তি আত্মভোগ ত্যাগে সমস্ত সমাজের, সমস্ত পিতৃপুরুষের এবং আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত জীবজন্তুর মঙ্গল ও প্রীতিবিধান জন্যই ব্যবস্থিত হইয়াছিল। প্রথম বয়সে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যপালনে এবং বেদবেদাঙ্গাদির অধ্যয়নরূপ তপশ্চরণে, গার্হস্থ্যে সৃষ্টির সমস্তরূপ

জড়তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তত্ত্বের আলোচনায় এবং তৎসম্বন্ধে আশ্চর্য্য গূঢ়রহস্যসমূহের আবিষ্কারে, শিষ্যগণের স্বব্যয়ে পুত্রবৎ প্রতিপালনপূর্ব্বক অধ্যাপনে সমাজমঙ্গলকামনায় যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে এবং গৃহীর কর্ত্তব্য যাজন ও প্রতিগ্রহলব্ধ সামান্য অর্থে শিষ্যবর্গসহ পরিবার প্রতিপালনে, কুটুম্বভরণে, অতিথি-সৎকারে এবং দৈনিক কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধতর্পণ-যজ্ঞাদিতেই অতিবাহিত হইত। বানপ্রস্থাদি আশ্রমদ্বয়ে আত্মোন্নতি-জনক এবং সৃষ্টির মঙ্গলবিধায়ক আরও কঠোরতর কৃচ্ছ্রতপস্যাদি সাধনেই ব্রাহ্মণ-জীবন অতিবাহিত হইত। ব্রাহ্মণের এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া অন্যান্য বর্ণাশ্রমিগণও নিজ নিজ বর্ণোচিত শিক্ষায় এবং বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন, এবং নিজ নিজ বর্ণোচিত কর্ত্তব্যপালনই জীবনের ব্রত করিয়া লইতেন। বিলাসভোগে জীবনের সার্থকতা হয় একথা কেহই তৎকালে জানিতেন না, বর্ণাশ্রম-সমাজে ঐরূপ কথা সম্পূর্ণ অপ্রসিদ্ধ ছিল।

৩। বর্ণাশ্রমি-সমাজে বর্ণোচিত বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক বর্ণোচিত ধর্ম্মপালন না করিয়া কেহই সমাজে প্রতিষ্ঠার সহিত অবস্থান করিতেও পারিতেন না। অবশ্যই প্রত্যেক ব্যক্তিই যাহাতে বর্ণোচিত ধর্ম্মপালনে অভ্যস্ত এবং উৎসাহিত হয়, তজ্জন্য সমাজশিক্ষার নানারূপ ব্যবস্থা ছিল এবং নানারূপ ক্রিয়া সমাজে নিত্য অনুষ্ঠিত হইত, তদ্ধেতু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই সমাজের প্রত্যেক অঙ্গে মূর্ত্তিমান থাকিয়া সমাজ পরিচালন করিতেন। তখন সমাজের মঙ্গল উপেক্ষা করিয়া বর্ত্তমান কালের ন্যায় নিজ ভোগসাধন লইয়াই ব্যস্ত থাকিয়া কেহই সমাজে সুখে থাকিতে পারিতেন না। যিনি ধর্ম্মব্যবস্থামতে নানা সমাজহিতকর ব্রতের অনুষ্ঠান দৈনিক-জীবনে করিতেন, তিনিই সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেন। বর্ত্তমান কালের অর্থমাত্র সম্বল করিয়া স্ব স্ব প্রধান হইয়া সমাজকে উপেক্ষা করিয়া আত্মভোগে রত ব্যক্তি সমাজে হেয় ও ঘৃণিত হইতেন। কেবল তাহাই নহে, সদাচার ও সৎক্রিয়ারহিত হইলে অনেককে সমাজচ্যুত হইতে হইত এবং দুক্রিয়াপরায়ণ হইলে তেমন প্রতাপশালী ব্যক্তিকেও পাপের গুরুত্বানুসারে চণ্ডালত্ব পর্য্যন্ত দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া গ্রামের বহির্ভাগে যাইয়া বাস করিতে হইত। সমাজকে বর্ত্তমান কালের ন্যায় অব্যাহতভাবে নিজের দুশ্চরিত্রতা ও দুক্রিয়ার দৃষ্টান্তে কলুষিত করিবার অধিকার সেকালে কাহারও ছিল না। বর্ত্তমান কালে কতকগুলি গুরুতর অপরাধ মাত্রের দণ্ডবিধানের ব্যবস্থাই মাত্র রাজ্যে আছে। সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অপরাধের ও পাপের কোন শাস্তি ব্যবস্থাই দেশে নাই। যে সমস্ত ব্যক্তিগত ও সামাজিক পাপের ও দোষের ফলে ব্যক্তি ও সমাজ অধঃপাতে যায়—যে মূল ধর্ম্মসমূহের উল্লঙ্ঘনে এবং অপালনে অন্যান্য গুরুতর অপরাধসমূহ প্রশ্রয়লাভ করে—সেই সমস্ত নিবারণের তাহার শাসনের কোন ব্যবস্থাই বর্ত্তমান কালে নাই। কিন্তু অর্থ সংগ্রহ করিয়া বসিতে পারিলেই এখন আর কেহ সমাজের ধার ধারে না, স্ব স্ব প্রধান হইয়া সমাজে অবস্থানে সাহসী হয়। পূর্ব্বকালে বর্ণাশ্রম-সমাজের জীবিতকালে সামাজিক-জীব মনুষ্যসমাজে পশুবৎ আত্মভোগ মাত্র-পরায়ণ হইয়া বর্ত্তমান কালের মত স্থায়ী হইতে পারিত না। তাহাদের শাসনজন্য নানারূপ

প্রায়শ্চিত্ত-বিধান, সামাজিক-শাসন এবং রাজদণ্ডের বিধান ও ছিল। তাহার ফলে সমাজ এত পবিত্রতা লাভ করিয়াছিল যে কোন ব্যক্তি তাহাতে কোনরূপ পাপ সংস্পর্শ হইয়াছে জানিলে সেই পাপের সংক্রামণ হইতে আত্মোদ্ধার জন্য ও সমাজকে রক্ষার জন্ত গোপনে ও প্রকাশ্যে স্বেচ্ছায়ই প্রায়শ্চিত্তাদির অনুষ্ঠান করিত। স্বেচ্ছামতে এইরূপ শাস্তিভোগের এবং তদ্বারা আত্মশুদ্ধির ও সমাজশুদ্ধির ব্যবস্থাও আকাঙ্ক্ষা পৃথিবীর কুত্রাপি শ্রবণগোচর হয় না। এই সমস্ত ব্যবস্থার ফলেই বর্ণাশ্রম-সমাজ আধ্যাত্মিকজগতে অতুলনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছিল, নবগুণবিশিষ্ট কুলীনের আবির্ভাব হইয়াছিল, দ্রষ্টা ঋষিকুলের অবতার এ ধরামণ্ডলে সম্ভাবিত হইয়াছিল, পৃথিবীর রাজত্বলাভ করিয়াও স্বেচ্ছায় তাহা ত্যাগের বহু দৃষ্টান্ত বর্ণাশ্রম-সমাজে দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

৪। বর্ণাশ্রম-সমাজে শিক্ষার ব্যবস্থা এবং ব্যবসায়ের ব্যবস্থা বংশানুক্রমেই বিভিন্নরূপে হইত। বর্ণোচিত ধর্ম্মের ও বৃত্তির উল্লঙ্ঘন কেহই সহজে করিতে পারিতেন না এবং করিতে যাইতেন না। বিভিন্ন বর্ণের জন্য বিভিন্নরূপ ও বিভিন্ন ব্যবসায়ের শিক্ষার ব্যবস্থা বংশ-পরম্পরায় থাকাতে বিভিন্নবর্ণ বর্ণোচিত সংস্কার সমূহ লইয়া বিভিন্ন বর্ণে জন্মধারণ করিতেন এবং প্রত্যেকে বংশানুক্রমে আশৈশব একই বিষয়ের শিক্ষাতে শিক্ষিত হইয়া নিজ বর্ণোচিত ব্যবসায়ে সহজেই অশেষ পারদর্শিতা এবং কার্য্যকুশলতা লাভ করিতে সমর্থ হইতেন। এইরূপে সমাজে বংশানুক্রমে নিজ নিজ বর্ণোচিত শিক্ষাতে এবং ব্যবসায়ে প্রত্যেক বর্ণের প্রতিষ্ঠাই প্রাচীন ভারতের সমস্তরূপ উন্নতির ও উচ্চ সভ্যতার মূলে অবস্থিত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পাশ্চাত্য সমাজে বর্ণভেদ না থাকাতে এবং বংশানুক্রমে কোন বিষয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকাতে কোন্ বালকের পক্ষে কোন্রূপ শিক্ষা স্বাভাবিক শক্তির অনুকূল শিক্ষা হইবে, তাহার স্থিরীকরণ সহজসাধ্য হয় না, এবং তজ্জন্য তাহাদের পক্ষে সমস্ত সমাজের কোনরূপ সমুচিত শিক্ষার ব্যবস্থাও কার্য্যতঃ সম্ভবপর হয় না। বর্ণাশ্রম-সমাজে সেই অসুবিধা কিছুই ছিল না; জন্মদ্বারাই প্রত্যেকের স্বাভাবিক শক্তি বা সংস্কারের পরিচয় হইত এবং আশৈশব প্রত্যেক বর্ণের বালকের নিজ বর্ণের সমাজে ও পরিবারে অবস্থিতি ও সেই স্বাভাবিক-শক্তির ও প্রবৃত্তির পরিপুষ্টি বিধানই করিত—তৎপর সেই বালক যৌবনের প্রারম্ভে বিশেষজ্ঞের নিকট নিজ ব্যবসায় সম্বন্ধে যে শিক্ষা পাইত, তাহাতেই অতি সহজে সে তাহার বর্ণোচিত ব্যবসায়ে পারদর্শিতা লাভ করিত। সমাজের জনসাধারণের শিক্ষার জন্য ইহাহইতে স্বাভাবিক নিরাপদ এবং অধিকতর ফলদায়ী শিক্ষাপ্রণালী আর কোথায় সম্ভবপর হইতে পারে? অবশ্যই বর্ত্তমানকালে চাকুরিই বিশেষ সম্মান-জনক ব্যবসায় বলিয়া গণ্য হওয়াতে কেহ কেহ আপত্তি করেন যে এই শিক্ষাতে ধোপার ছেলে, মুচির ছেলে তো হাকিম বা উকীল হইতে পারিত না। এ কথা অসত্য নহে। কিন্তু সমাজের শিক্ষার ব্যবস্থাতে দুই চারিটী বালকের বিশেষ সুবিধার কথা না ভাবিয়া সমাজসাধারণের অধিক সুবিধার কথাই ভাবিতে হয়। কোন শিক্ষাতে

অধিক সংখ্যক ধোপার ছেলে, মুচির ছেলে, অধিক উন্নতি লাভ করিবে, তাহাই সমাজের চিন্তা করা উচিত। বর্ণাশ্রমধর্ম্মপ্রণালীতে প্রত্যেক বর্ণেরই অধিকাংশ বালক নিজ বর্ণোচিত ব্যবসায়ে নিপুণতালাভ করিত। তৎপর বিবেচ্য এই, সে ছুতারের ব্যবসায় বা ধোপার ব্যবসায়ও নব্য শিক্ষিতগণ হাকিমি ওকালতী হইতে মন্দ মনে করিতে পারেন না। ধোপার শিক্ষার উন্নতিতে বস্ত্রপরিষ্কারের নূতনকল আবিষ্কৃত হয় - ছুতারের ব্যবসায়ের উন্নতিতে জাহাজ প্রস্তুত হয়। যে নূতন কল আবিষ্কার করে বা জাহাজ নির্ম্মাণ করে, তাহার স্থান কুত্রাপি হাকিম উকীলের নীচে হয় না। বর্ণাশ্রম-সমাজ বর্ণোচিত উচ্চশিক্ষা প্রদানে প্রত্যেক বর্ণকেই বিশেষ সহায়তা করিতেন। তাহা না হইলে প্রাচীন ভারতে জাহাজও নির্ম্মিত হইত না—ঢাকার মাস্‌লিনও হইত না—কাশ্মিরী শাল ও হইত না—এবং বৈশ্যশূদ্রগণ যে নানারূপ শিল্পবিদ্যাতে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়াছিল, তাহাও হইত না এবং এই কাশীমবাজারে যে এককালে রেশমব্যবসায়িগণ পরিপূর্ণ অতুল ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার এক মহাসমৃদ্ধ-নগর ছিল, তাহারও সম্ভাবনা হইত না। অনেকে মনে করেন যে তখন বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় সাধারণ জ্ঞান-শিক্ষার General culture) এক সুন্দর ব্যবস্থা ছিল না। এ সম্বন্ধে পরে বলিব। কিন্তু যাহারা নিজ নিজ ব্যবসায়ে সেই প্রাচীন সময়েও অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়া গিয়াছেন - তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে অশিক্ষিত ছিলেন, সে কল্পনা অত্যন্ত পক্ষপাতযুক্ত কল্পনা নয় কি? অবশ্যই তখন ছিল না—শূদ্রাদির জন্য বেদপাঠ ব্যবস্থা, ছিল না তখন উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয়,—হয়ত বা তখন ছিলনা এত স্কুল কলেজের বাহুল্য। কিন্তু তাহা বলিয়া প্রকৃত উচ্চশিক্ষার বা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের ব্যবস্থা তখন ছিলনা ইহার কল্পনা অত্যন্ত অন্যায়। কিন্তু এখন আমরা তো বলিতে আরম্ভ করিয়াছি যে একমুখী এই সাধারণ শিক্ষায় স্কুলকলেজের শিক্ষা —বাহুল্য না কমাইয়া দিলে ব্যবসায় শিক্ষায় নৈপুণ্যলাভ হইবে না। বস্তুতঃ যাহারা বর্ত্তমান সময়েও নানারূপ যন্ত্রাদির আবিষ্কারে বা শিল্পনৈপুণ্যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইতেছেন, তাঁহাদের অনেকেই কিন্তু ততবড় পণ্ডিত নহেন। যাহারা আমাদের সমাজের বর্ত্তমান লক্ষ্য অর্থলাভ বলিয়া কল্পনা করেন, তাহারাও দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে যাহারা বিপুল অর্থোপার্জ্জন করে, তাহারা কেহই প্রায় সাধারণ শিক্ষা ও স্কুলকলেজে লাভ করেনা, এবং যাহারা খুব বেশী শিক্ষিত তাহারা কিন্তু দরিদ্রতার সীমাই অনেকে অতিক্রম করিতে পারেনা। সুতরাং বর্ত্তমান শিক্ষা লইয়া আমাদের অহঙ্কারের কি কারণ আছে? বস্তুতঃ যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মমতে শিক্ষিত হইয়া বর্ণচতুষ্টয় নিজ নিজ ব্যবসায়ে অসামান্য নৈপুণ্যলাভ করিয়া প্রাচীন ভারতে যে অতুলনীয় সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং ভারতে এক অতি সমুন্নত জাতির আবির্ভাব বহু সহস্রবৎসর পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছিল, তাহার দিকে বারেক দৃষ্টিপাত করিলেও প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তিকেই স্বীকার করিতে হইবে যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিহিত শিক্ষাপ্রণালী বর্ত্তমান সময়ের কেরাণী, মাষ্টার, উকীল, মোক্তার প্রভৃতি কিঞ্চিদর্থোপার্জ্জনক্ষম যন্ত্রমাত্রের প্রস্তুতকারী শিক্ষা-প্রণালী হইতে সহস্রগুণেই শ্রেষ্ঠ ছিল।

৫। উক্তরূপ শিক্ষা ও ব্যবসায়ে নৈপুণ্য লাভ করিলেও এবং তদ্দ্বারা বিশেষ অর্থোপার্জ্জন ক্ষমতা লাভ করিলেও এবং তাহার ফলেই প্রাচীন ভারত সমস্ত পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী দেশ বলিয়া ভূভারতে প্রখ্যাত থাকিলেও বর্ণাশ্রমসমাজে অর্থলাভজন্য হাহাকার ছিলনা। কারণ ধর্ম্মানুষ্ঠানের ধর্ম্মোন্নতির অবিরোধেই মাত্র তৎকালে অর্থ কামোপভোগ সম্ভবপর হইত। এই পরম কল্যাণকর বিধিতে বাল্যকাল হইতে অভ্যস্ত হইয়া কেহই কখনও ধর্ম্মের উল্লঙ্ঘনে বা বর্ণোচিত বৃত্তির উল্লঙ্ঘনে যাইতনা; স্ব স্ব বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাতেই যথাশক্তি অর্থলাভে যতটুকু কামোপভোগ সম্ভবপর হইত তাহাতেই সকলে সন্তুষ্ট থাকিত। বিভিন্ন বর্ণের জন্য বিভিন্ন কার্য্যক্ষেত্র ও অর্থোপার্জ্জনক্ষেত্র নির্দ্ধারিত থাকাতে এবং বৃত্তির উল্লঙ্ঘন অধর্ম্ম বলিয়া সমাজে গণ্য থাকাতে, তৎকালে সমাজে বৃত্তি-সাঙ্কর্য্য-জনিত অস্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিলনা। সুতরাং হিংসা, বিরোধ, ঈর্ষ্যা, প্রতিহিংসা প্রভৃতির প্রশ্রয় বর্ণাশ্রম-সমাজে কখনও হইতে পারিত না; সুতরাং সন্তোষ ও শান্তি সর্ব্বদা বিরাজমান ছিল। তৎপর ধর্ম্মই সকলের জীবনের লক্ষ্য হওয়াতে সকলেই অধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য যথেষ্ট অবসর রাখিত। সমাজে স্কুলকলেজের বাহুল্য না থাকিলেও গুরু পুরোহিত ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের হস্তেই সমাজশিক্ষার ভার থাকাতে প্রকৃত জ্ঞান লাভের এবং ধর্ম্মকর্ম্মাচরণের নানারূপ নিত্যব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত থাকাতে, তখন আচণ্ডাল সমস্তজাতিই উচ্চশিক্ষারও প্রকৃত জ্ঞানলাভের সুবিধা পাইত এবং প্রকৃততত্ত্বজ্ঞ ও প্রকৃত ধর্ম্মশীল হইত এবং তজ্জন্যই চণ্ডালাদি জাতি মধ্যেও মনুষ্যত্বের উচ্চতম আদর্শ অহরহ দৃষ্টিগোচর হইত, আর এই বর্ণাশ্রম সমাজেই "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ" হইয়া দাঁড়াইতে পারিত। উক্তরূপ পরম কল্যাণজনক সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থা হেতু বস্তুতঃ বর্ণাশ্রমসমাজে সেরূপ উচ্চ আদর্শের পুরুষ সামান্য ব্যবসায়িগণ মধ্যেও সম্ভবপর হইয়াছে, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী এবং পাশ্চাত্য আদর্শ তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারে না।

৬। তৎপর বর্ণাশ্রমধর্ম্মে ও তাহার ব্যবস্থাপ্রণালীতে সাম্য, মৈত্র্য ও স্বাধীনতার কথা। অবশ্যই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বলেন সৃষ্টিতে প্রকৃত সাম্য সম্ভবে না—মুক্তিতেই মাত্র তাহা সম্ভবে। তবে পৃথিবীতে মুক্তি যদি কোথাও সাধ্যায়ত্ত হইয়া থাকে তবে তাহা ভারতেই সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও অন্য সমাজ হইতে অনেক অধিক বিষয়ে বর্ণাশ্রম সমাজে সাম্যের ব্যবস্থা দেখা যায়, সাম্য মুক্তিবাদে, কর্ম্মের ফলাফলে, শক্তির স্ফুরণবিষয়ে সকলকেই সমান সুবিধা প্রদানে সকলেই সমাজে সমান সুখী হইতে পারে—তদ্রূপ ব্যবস্থা বিধানে সকলের জন্যই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের বিধান অধিকারী ভেদে সমানভাবেই ব্যবস্থাপনে বিভিন্ন বর্ণকেই সমান ভাবে সমাজেরকল্যাণার্থ নিজ নিজ শক্তিপ্রয়োগে নিয়োজনে নিজ নিজ কর্ত্তব্যপালনে তৎপরে বর্ণাশ্রমসমাজেই প্রকৃত মৈত্র্য সম্ভবপর ছিল, তথায় ধর্ম্ম ব্যবস্থা দ্বারাই বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন বৃত্তি নির্দ্ধারিত হওয়াতে কাহারও প্রতি বা কাহারও বৃত্তিতে কোনরূপ ঘৃণার বা বিদ্বেষের ভাব পোষণে কাহারও অধিকার ছিল না, এই সমাজ বিধানে সকলেই সমবেতভাবে পরস্পর পরস্পরের

যাহারা, পরস্পরের কল্যাণ বিধানে নিযুক্ত, সকলেই একক্রিয় সুতরাং সকলেই পরস্পরের মিত্র, স্বার্থ সাধনমন্ত্র লইয়া কাহারও সমাজে বাস সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং বিরোধের সম্ভাবনা খুব কমই ছিল। তখন একটী সম্পূর্ণগ্রাম—একটী পরিবারের মত হইয়াই বাস করিত। বিভিন্ন বর্ণভুকদিগের মধ্যেও গ্রাম্য সম্পর্ক ছিল তাহাই মৈত্রের অকাট্য প্রমাণ ছিল। এখন নিজ স্ত্রীপুত্র লইয়া মাত্র পরিবার, সুতরাং পরিবারের বাহিরে মিত্রতাভাব খুবই কম। আত্মীয় কুটুম্বও প্রায় পর হইয়াই দাঁড়াইয়াছে—পুত্রও বড় হইলে প্রায়শঃ পর হইবার উপক্রম হইয়াছে। বর্ণাশ্রম সমাজে—সমাজের মস্তিষ্ক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি জাতিও ব্রহ্মার বা সমাজ শরীরের এক একটী অঙ্গ বলিয়াই প্রসিদ্ধ, সকলেই এই সমাজ শরীরের রক্ষা বিষয়ে নিযুক্ত সুতরাং পরস্পরের মধ্যে মৈত্র সম্ভাবনা পাশ্চাত্য আদর্শে স্ত্রী পর্য্যন্ত চুক্তির, স্ত্রী—পুত্র কন্যার সঙ্গে পশু-পক্ষীবৎ পালনকাল পর্য্যন্ত মাত্র সম্বন্ধ—বড় হইলেই সকলে স্ব স্ব প্রধান—সুতরাং এই আদর্শে মৈত্র কোথায় সম্ভবে। তৎপর স্বাধীনতার কথা—মনুষ্য সমাজের স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারে নয়, মনুষ্যের স্বাধীনতা নিয়মের অধীনতায় এবং সংযমে-মনুষ্যের স্বাধীনতা-নিজ নিজ অধিকারমতে শিক্ষা লাভে এবং নিজ ব্যবসায়ে অব্যাহতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে এবং তদ্দারা অর্থোন্নতি ও জ্ঞানোন্নতি লাভে স্ব বা আত্মার অধীনতায় বা আত্মোপলব্ধির উপযোগী নিয়মসমূহের অধীনতায়; তাহাতেই প্রকৃত আত্মার স্বাধীনতা ভোগ হয়, আত্মার অসীম পরিস্ফুরণ হয়,—তাহাতেই ব্রহ্মাণ্ডে আত্মোপলব্ধি বা আত্মাতে ব্রহ্মোপলব্ধি সম্ভব পর হয়। এই স্বাধীনতা বর্ণাশ্রম সমাজেই মাত্র সম্ভব পর ছিল—এবং তজ্জন্য বর্ণাশ্রম সমাজের এত উন্নতি, বর্ণাশ্রম সমাজে এরূপ সুখশান্তি বিরাজ করিত। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য স্বাধীনতায় ভোগের অধীনতার ভীষণ পরিণতি কোথায়—বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

উপরোক্ত সমালোচনাতে ইহাই দেখান হইল যে বর্ত্তমান শিক্ষার ভিত্তি যে সাম্য মৈত্র ও স্বাধীনতাবাদ তাহা কথার কথা মাত্র। পাশ্চাত্য আদর্শে, ভোগের আদর্শে, বর্ত্তমান শিক্ষার আদর্শে তাহার কিছুই সম্ভবপর নয়। বরং তাহার অনেক সম্ভাবনা বর্ণাশ্রম বিধিতে সম্ভব ছিল, এবং এখনও সম্ভবপর হইতে পারে। তৎপর বর্ত্তমান শিক্ষাতে অর্থোপার্জ্জন সম্ভাবনাও তত হইতে পারিতেছে না—কয়েকজনমধ্যে কিছু অর্থোপার্জ্জন হইলেও অন্য একদল দরিদ্রতা পীড়নে পীড়িত। এবং যাহারা বর্ত্তমান শিক্ষা বেশী পাইতেছে না—তাহারাই এদেশে ধনী—যাহারা বংশ পরম্পরাক্রমে এক ব্যবসায় অবলম্বনে রহিয়াছে—তাহারাই এদেশে ধনী। সুতরাং ত্যাগের আদর্শ ছাড়িয়া ভোগের আদর্শে পড়িয়া আমরা ক্রমশঃ দুর্ব্বল ক্ষীণ ও বৈক্লব্যপীড়িতই হইতেছি। পক্ষান্তরে বর্ণাশ্রম সমাজে অর্থ সমৃদ্ধি প্রচুর ছিল—ব্যবসায়োন্নতি অসাধারণরূপ হইয়াছিল—প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের উপায় অনেক বেশী ছিল—সংযম প্রতিষ্ঠাও ধর্ম্মের আধিপত্যে বর্ণাশ্রম সমাজে প্রকৃত সন্তোষ শান্তি ও সুখ ছিল—যাহাকে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বলা যায়—আদর্শ সমাজ আদর্শ সভ্যতা বলা যায়—তখনই তাহা ছিল—এখন বর্ত্তমান শিক্ষাতে তাহা সম্ভবপর হইতেছে না। এরূপ হইলে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মোটের উপর শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই

থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ বর্ণাশ্রম প্রথাই এদেশে এজাতির পক্ষে চিরন্তন প্রথা—ধর্ম্মই এ জাতির প্রাণ। সুতরাং এই জাতির রক্ষা বাঞ্ছনীয় হইলে ঐ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষা ঐ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিহিত শিক্ষার বিস্তার সর্ব্বপ্রকারে বাঞ্ছনীয় ও আবশ্যক।

অনেকে বলিবেন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বাঞ্ছনীয় হইলেও বর্ত্তমান সময়ে উহার রক্ষা কি সম্ভবপর—বর্ত্তমান সময়ের স্রোত ফিরান কি সম্ভবপর? ইহার অতি সহজ উত্তর এই যে পুরুষকার দ্বারা সকলই সম্ভবপর হয়। পুরুষকার দ্বারা দূরদর্শী ইউরোপীয়গণ এদেশের বহুকাল প্রবাহিত স্রোত ফিরাইয়া দিয়া অতি অল্পসময়েই বিরুদ্ধ স্রোতের অব্যাহত খরতর প্রবাহ সম্ভবপর করিয়াছেন। সুতরাং পুরুষকার প্রয়োগে সেই স্রোতের পরিবর্ত্তন—উল্টাগতির সমাজে প্রবর্ত্তন ও সহজ-সাধ্যই হইতে পারে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা এখনও সমাজের অন্তঃস্তরে পরতে পরতে অনুস্যূত রহিয়াছে—উপরে কেবল বিরুদ্ধশক্তির বিরুদ্ধসভ্যতার ছায়া পড়িয়াছে। সংযম নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমে ভোগের আদর্শের পরিবর্ত্তনে পূর্ব্বতন ত্যাগের আদর্শ-সমাজ সমক্ষে একবার ভাল করিয়া ধরিতে পারিলেই-সমস্ত মোহ কাটিয়া যাইবে—বর্ণাশ্রমী পুনরায় স্বপদে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এখন অনেকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে এখন সমস্ত পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিবর্ত্তে টোলের শিক্ষারই সমস্ত সমাজে প্রচালন কি মহাসম্মিলনের উদ্দেশ্য। উত্তরে বলা যায়—ঐ প্রশ্ন এখন উঠিতেই পাবেনা—বর্ত্তমান অবস্থায় উহা অসম্ভব। তবে ঐ আদর্শেই যখন উন্নতি হইয়াছিল এবং সমাজে সন্তোষ শান্তি ও সুখ বৃদ্ধি পাইয়াছিল—তখন ক্রমশঃ পুনরায় যথাসম্ভব সেই প্রাচীন আদর্শের অনুসরণই সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে। একথা যেন কেহই মনেও স্থান না দেন যে সেই আদর্শের অনুসরণ হইলেই দেশ হইতে উন্নতি, সভ্যতা, সুখ, শান্তি ও সর্ব্বপ্রকার ভোগ উঠিয়া যাইবে। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি—যে বর্ণাশ্রমাদর্শের অনুকরণে ভোগক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে—প্রকৃত উন্নতি ও সভ্যতা—প্রকৃত শান্তি প্রকৃত সুখই সম্যক্ পরিমাণে লব্ধ হইবে। স্ত্রীলোকগণ এখনও প্রায়শঃ বর্ণাশ্রমের বিধিতে বিশ্বাসী; পুরুষগণও যৌবনে অবিশ্বাসী হইলেও অভিজ্ঞতার বৃদ্ধিতে ক্রমে বিশ্বাসী হইতেছেন—মনুষ্যের আবিষ্কৃত উপায়ে যখন সংসারতাপ আর নাশ না পায় তখন অগত্যা মধুসূদনই অনেকেরই সম্বল হন। এ অবস্থায় সমাজের বর্ত্তমান ভাব পরিবর্ত্তন অতি অনায়াসসাধ্যই বটে।

তৎপর প্রশ্ন হয় যে পূর্ব্ব প্রণালীমতে শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা হইলে সেই প্রণালীতে শিক্ষিত ব্রাহ্মণগণ সমাজে কি কার্য্যে লিপ্ত হইবেন। আমার সহজ উত্তর এই যে আমাদের সমাজে—ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এবং সামাজিক কোন কার্য্য করিবার জন্যই কোন উপযুক্ত ব্যক্তি সমাজে পাওয়া যায় না। যদি আমরা চতুষ্পাঠী-সমূহে প্রকৃত পক্ষে নানা শাস্ত্রের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি—এবং ছাত্রদিগকে ক্রমে সংযমে অভ্যস্ত করিতে পারি—তবে সেই ত্যাগাভ্যস্ত ভোগে অনাসক্ত নানাশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণই এই বিপুল সমাজের প্রত্যেক বিষয়েরই নায়কত্ব গ্রহণ করিয়া সমাজকে পুনরায় সুখশান্তির দিকে লইয়া যাইতে পারিবেন।

বর্ত্তমানে আমাদের সমাজে সকলেই অর্থোপার্জ্জন লইয়া ব্যস্ত— এবং তাহা লইয়া এত ব্যস্ত যে তাহাদের অন্য কার্য্য করিবার অন্য বিষয়ের চিন্তা করিবার অবসর অতি অল্প। এমন কি তাঁহারা যে অর্থ উপার্জ্জনের জন্য অন্যান্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতেছেন— সেই অর্থের উপার্জ্জনের পর তাহার সদ্ব্যবহার কিরূপে করিতে হইবে তাহাও কেহই জানেন না। অথচ একথা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ যে অর্থের উপার্জ্জন হইতে অর্থের সদ্ব্যবহারই অধিক কঠিন ব্যাপার। এই অবস্থায় এই অর্থের ব্যবহার শিক্ষা দেয় এমন একটী লোকও সমাজে না থাকা কি কম দুর্ভাগ্যের বিষয়। আমাদের সমাজে বর্ত্তমানে অর্থশূন্য পূর্ব্বাচারসমূহের খাতিরে বৃথামোদের খাতিরে, স্ত্রীদেবীর আব্দারে, পণ-প্রথার অত্যাচারে,—বিলাসিতার মোহে— নানা বিষয়ক মূর্খতার দায়ে, কতরূপে যে সমাজের কষ্টোপার্জ্জিত কত অর্থ দৈনিক বৃথা নষ্ট হইতেছে তাহার গণনা কে করে। আমরা কত চিন্তা করিয়া, কত দুঃখ সহ্য করিয়া সমস্ত সুখে বিসর্জ্জন দিয়া —দিন রাত্রি খাটিয়া কতকষ্টে অর্থোপার্জ্জন করি – কিন্তু তাহার অধিকাংশই কি উপরোক্ত নানা নর্দ্দমাতে পড়িয়া পচিয়া, দুর্গন্ধ—সমাজে বিস্তার করিয়া সমাজ শরীরে নানা দুশ্চিকিৎস্য রোগের প্রাদুর্ভাব করিতেছে না? তাহা সর্ব্বদা দেখিয়াও আমরা নিতান্ত নিরাশ্রয়ের ন্যায়, নিতান্ত দুঃখীর ন্যায়, নিতান্ত বৈক্লব্যদূষিত ব্যক্তির ন্যায়, নিতান্ত ক্লীবের ন্যায়ই কি তাহা সহ্য করিয়া যাইতেছি না? আমরা যদি এমন এক শ্রেণীর পরিচালক পাইতাম—যাঁহারা ত্যাগী ও স্বার্থ শূন্য হইয়া একমাত্র ধর্ম্মবুদ্ধিতে সমাজের অর্থব্যয়ের প্রকৃত মঙ্গলময় পন্থা-সমূহ আমাদিগকে প্রদর্শন করিতে পারিতেন তাহা হইলে কি আমাদের উপকার হইত না। এইরূপে আমাদের অর্থোৎপত্তি, অর্থবৃদ্ধি, স্বাস্থ্যবৃদ্ধি, সমাজের সুখশান্তি, কিসে হইবে তাহার শিক্ষক কোথায়? আমাদের শাস্ত্র-রক্ষার ও ধর্ম্মশিক্ষার যোগ্য বিশুদ্ধমতি, শাস্ত্রজ্ঞপণ্ডিত নাই—ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপযুক্ত রক্ষক পুরোহিত নাই—আমাদের জাতিগত পবিত্রতারক্ষক এবং কুলপরিচয়-রক্ষক নানা শাস্ত্র বিশারদ কুলাচার্য্য আর সমাজে নাই—আমাদের লক্ষ লক্ষ স্কুলকলেজের বালকদিগকে ধর্ম্মপথে, মিতাচারে, সত্যবাদিতায়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞায়, স্থাপন করে এমন শিক্ষক নাই, আমাদের অর্থের সদ্ব্যবহার শিক্ষা দেয়—এমন শিক্ষক নাই, আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা কিসে হয়—সামাজিককে বুঝাইবার লোক নাই। আমাদের সংবাদপত্রসমূহ সুপ্রণালীতে এবং সমাজের মঙ্গলকামনায় পরিচালন করে এমন নিরপেক্ষ বুদ্ধি নানাশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত সমাজে নাই, সংক্ষেপতঃ যে যে বিষয়ের সুপরিচালনার উপর একটী জাতীর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ নির্ভর করে—সেই সমস্ত বিষয়ের কোনটীর ও পরিচালন করিতে পারে এমন একটী সুযোগ্য ব্যক্তিও আমাদের সমাজে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। বর্ণাশ্রম-সমাজে বৈশ্য মাত্রই যে অর্থোপার্জ্জন অর্থবৃদ্ধি কার্য্য সম্পাদন করিত, তাহারও একাংশ মাত্রই বর্ত্তমানে সমগ্র শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজ সুচারুরূপে করিয়া উঠিতে পারিতেছে না— ক্ষত্রিয় কার্য্য রাজা করিলেও ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্রাদির কোন কার্য্যই আমরা উচিতরূপে

করিতে পারিতেছি না। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাতে আমরা ইহা হইতে বেশী কিছু করা সম্ভবপরও দেখিতেছি না। অথচ অনেকেই এখন আমাদের প্রকৃত দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হইতেছি—এই অবস্থায়ও: কি বলিতে হইবে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম-প্রণালীমতে শিক্ষার বিধান করিয়া সেই প্রণালীতে শিক্ষিত ব্যক্তিদ্বারা আমাদের কিছুই করাইবার নাই—তাহাদিগকে উপযুক্ত কার্য্যে নিয়োজিত করিবার যোগ্য কোন কর্ম্মই সমাজে খালি নাই। তবে কেহ কেহ বলিবেন কেন—আমরা নব্য শিক্ষিতগণই তো ঐ সকল অধিকাংশ আমাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতে পারি, এজন্য আবার প্রাচীন শ্রেণীর শিখাধারী ব্রাহ্মণের সৃষ্টি না হইলে কি চলে না? ইহার প্রথম উত্তর এই যে আত্মভোগসাধন, আত্মভোগের নিত্য নূতন প্রণালী উদ্ভাবন, এবং তৎপর তাহার পরিতৃপ্তির জন্য নিত্য নূতন অর্থোপার্জ্জন-প্রণালী অবলম্বনই যে, নব্য শিক্ষার মন্ত্র—সে মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিদিগের উপর সমাজের কোন বিষয়ক নায়কত্বেরই ভার থাকিতে পারে না—ঐরূপে স্বার্থমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিগণ কখনও সমাজ-নায়কত্বের বিশেষতঃ ধর্ম্মোপরি সংস্থাপিত বর্ণাশ্রম-সমাজের কোন বিষয়েরই নায়কত্বের যোগ্যতা লাভ কখনই করিতে পারে না। যাহারা ছাত্রাবস্থা হইতেই ব্রহ্মচর্য্যে শিক্ষিত, ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত, যাহারা নিস্পৃহ, নিরপেক্ষ, সমাজের মঙ্গল কামনাই দেশের কল্যাণ চিন্তাই যাহাদের জীবনের ব্রত, দরিদ্রতাই যাহাদের অলঙ্কার, ভিক্ষা বিনিময়েই যাহারা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান বিতরণে প্রস্তুত—যাহারা ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রকৃত জ্ঞানবান, যাহারা নানাশাস্ত্রবিশারদ, যাহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বর্ণাশ্রম-সমাজের মূলতত্ত্বসমূহে প্রগাঢ়রূপে লব্ধবিদ্য হইয়াছেন—ঐরূপ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতই প্রকৃতপক্ষে সমাজের নায়কত্বের বর্ণাশ্রম-সমাজের পরিচালনের ভার গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাতেই মাত্র মঙ্গল হইতে পারে—তাহাতেই বর্ণাশ্রম-সমাজ পুনরায় ইহার পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইতে পারে। নতুবা আমাদের নায়কত্বে, অর্থান্বেষী নব্যশিক্ষিতের নায়কত্বে, যাহা হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত এখনও দেখা যায়। প্রকৃত নায়কের অভাবে এখন আমরাই তো নায়কতা করিতেছি—তাহার ফল সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন—ক্রমে সমাজে অভাবসৃষ্টি, ক্রমে দ্রারিদ্র্য বৃদ্ধি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি এবং তজ্জনিত হিংসা দ্বেষাদি ও অশান্তি বৃদ্ধি। তবে এক কথা—আমরা ভোগাকাঙ্ক্ষী হইয়া মনে করি, আমরা সব কাজই করিতে পারি—পূর্ব্বেই বলিয়াছি উল্লঙ্ঘনই ভোগের আত্মোপলব্ধির একটী মার্গ। তাই আমরা এখন সকল কার্য্যেই পণ্ডিত হইয়াছি মনে করি। কেহ বেজার হইবেন না—এই দেখুন উকীলবাবুগণই এখন সব কর্ম্মে নায়েক ও সমাজ-নায়ক হইয়া দাঁড়াইতেছেন। রাজনীতির আন্দোলন চাই—তাহাতেও উকীলবাবুগণ ব্যারিষ্টরগণই চাঁই হইয়া কার্য্য করিবেন, শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা চাই—তাহাতেও উকীলবাবুগণেরই ডাক, ষ্টীমারকোম্পানি করিব, বীমাকোম্পানি করিব, বেঙ্ক করিব—আমরা যাহা কিছু করিব তাহারই কর্ত্তা উকীল ব্যারিষ্টরগণ—আবার ব্রাহ্মণসভা করিব, মহাসম্মিলন করিব—সামাজিক আন্দোলন করিব, সে সব কর্ম্মেও উকীলবাবুগণই কর্ত্তা। আমি

তাহাদের নিন্দা করিতেছি না—বস্তুতঃ অন্য কাহাকেও অন্ন কিছু করিবার জন্যই পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদিগকে যে বাধ্য হইয়াই এরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়—এরূপ অবসর শূন্য যোগ্য শিক্ষা দীক্ষাশূন্য এক শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে সব কর্ম্মেই উৎপাত করিতে হয়, তদ্দ্বারাই বুঝিতে পারেন যে আমাদের সমাজ কিরূপ দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন আমাদের সুযোগ্য ও ধার্ম্মিক সরলপ্রকৃতি বিনীত স্বভাব সভাপতিমহাশয় স্বয়ংই বলিয়াছেন যে, তাহার ন্যায় অবসরপ্রাপ্ত একজন রাজসেবাকারী ব্যক্তিকে যখন ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের নায়কত্বে বরণ করিতে হইল বলিয়া তিনি জানিলেন—তখনই মনে করিলেন যে বর্ণাশ্রম-সমাজ চরম দুর্গতির অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। বস্তুতঃ তিনি একথা দ্বারা সমস্তকে ইহাই বুঝাইলেন যে, এখন সমাজের নায়কত্ব গ্রহণ করিতে পারে এই শ্রেণীরব্রাহ্মণ সমাজে অত্যন্ত বিরল হইয়া পড়িয়াছে। যোগ্যব্যক্তির অভাবেই যোগ্য নায়কের অভাবেই সমাজে যে এত দুর্গতি হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এজন্যই এখন প্রস্তাবনা হইতেছে—মহাসম্মিলনে প্রস্তাবনা করিতেছেন যে সমাজের ভার গ্রহণ করিতে পারে -বিভিন্ন দিকে সমাজের উন্নতি করিতে পারে -এরূপ এক শ্রেণীর সদাচারপূত বিশুদ্ধমতি—নানা শাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সৃষ্টি সমাজে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

তৎপরে অনেকেই হয়ত মনে করিবেন—আমরা এত নব্যশিক্ষাদৃপ্ত হইয়াছি ; আমরা প্রায় সকলেই মনে করি যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের উপর সমাজ ছাড়িয়া দিলেত আর কিছু থাকিল না। তাঁহাদের বিচারের কচকচিদ্বারা সমাজ চলিলেই সব হইবে,—যাহা কিছু এই পঞ্চাশ বৎসরে আমরা সাধন করিয়াছি তাহার সবই জলে যাইবে বস্তুতঃ পণ্ডিত শ্রেণী হইতে আমরা এত দূরে সরিয়া পড়িয়াছি—এবং পণ্ডিতগণও অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা এত সঙ্কীর্ণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ে পড়িয়া এত ব্রাহ্মণ্য হীন হইয়াছেন যে ঐরূপ নব্যশিক্ষাগর্ব্বিত যুবকদিগের মনে—এমন কি আমার ন্যায় প্রৌঢ় বা বৃদ্ধদিগের মনেও এই চিন্তার আবির্ভাব হইয়া থাকে ; কিন্তু আমাদের এই চিন্তার অতি সহজ উত্তর পূর্ব্বেও দিয়াছি—এখনও দিতেছি যে এই ব্রাহ্মণই যখন ইংরাজি না শিখিয়া এবং ইংরাজি দর্শন বিজ্ঞানে—ইংরাজি অঙ্ক রসায়নে—ইংরাজি নানা শিল্প বিদ্যাতে শিক্ষিত না হইয়াও একটী প্রকাণ্ড সমাজকে স্বাধীন ভাবে পৃথিবীর সহায়তা গ্রহণ না করিয়াই বহু সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত চালিত করিয়াছে। তারপর, তাহারা কি খাইবেন সেই কথা সমাজের উপরে আসিলে সমাজ বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন। সকলেই সেইভাবে রক্ষিত হইতেছে।

তবে তাহারা বড়লোক হইতে পারিবেন না। এই জন্যই পণ্ডিতের হস্তে এই ভার। এজন্যই ঐ মন্তব্য।

শ্রীমনোমোহন ভট্টাচার্য্য।

মানবী না দেবী ?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সূর্য্যদেব সারাদিনের ক্লান্তশরীর সে সময়ে সন্ধ্যার কোলে ঢালিয়া দিয়াছেন। শুক্লপক্ষের অষ্টমীর শশধর কুমুদিনীকে প্রফুল্লিত কবিতে হাসিমুখে বিশ্বগৃহের আকাশ প্রাঙ্গণে কেবল মাত্র দেখা দিয়াছেন, আমিও ঠিক সেই সময় অবসন্ন শরীরে গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম, পরে আস্তে আস্তে গৃহে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু দরজায় পা দিতেই মনে নানাবিধ ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। এতক্ষণ মায়ের কথা ভাবিতে পারি নাই। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম রোগশয্যাগতা মাতার পার্শ্বে আমার দাদামহাশয় উৎকণ্ঠিতচিত্তে বসিয়া আছেন। আমার মুখ দেখিয়াই দাদামহাশয়ের বোধহয় জিজ্ঞাসা করিবার বিশেষ কিছুই থাকিল না। তাঁহার যেন কিছুই বুঝিতে বাকি নাই, প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় তিনি চুপ করিয়াই রহিলেন।

কেবল মা দুর্ব্বল কণ্ঠে বলিলেন "কে'ও? ধীরেন! বাবা! আসিয়াছ? বৌমা আসিয়াছেন? আমার কাছে একবার আসিতে বল। আমি একবার শেষদেখা দেখিয়া যাই"। মায়ের কথা শুনিয়া আমার চক্ষের জল যেন গিরিনদীর তীরস্রোতের ন্যায় দরদর-বেগে আসিয়া পড়িতে লাগিল। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, বাহিরে আসিয়া নিঃশব্দ নয়ন-জলে বক্ষস্থল প্লাবিত করিলাম। সেই প্রবল বন্যায় যেন আমার হৃদয়ের প্রদীপ্ত অনলরাশি কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। আমার উত্তর না পাইয়া এবং অন্য কাহাকেও না আসিতে দেখিয়া মা যেন কিছু চঞ্চল হইলেন, বলিলেন—"বাবা ধীরেন! কথা কহিতেছ না যে? কোথায় গেলে? বলি বৌমা আমার ভাল আছেন ত? তাহাদের বাড়ীর সকলের মঙ্গল ত?"

আমি বলিলাম তাঁহাদের বাড়ীর সকলেই একরূপ ভাল আছেন! "বৌদিদির শরীর একটু অসুস্থ আছে, তাই তিনি আসিতে পারিলেন না।"

সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় আমার এই অপরাধটা মার্জ্জনা করিবেন। মায়ের সহিত প্রতারণা করা যে অন্যায় তাহা আমি জানিয়াও অগত্যাই উহা করিতে বাধ্য হইয়া ছিলাম, ইহার জন্য শাস্ত্রকার বা শাস্ত্রের নিকট আমি দায়ী কিনা তাহা অবশ্য বলিতে পারি না, তবে আমার বিবেকের নিকট যে সম্পূর্ণ নিরপরাধ তাহাতে সন্দেহ নাই। এই রূপ ক্ষেত্রে পতিত হইলে তাঁহারা কি করিতেন তাহার বিচার তাঁহারাই করিতে পারেন; আমার সে বিচার করিবার অবসর বা ক্ষমতা তখন আদৌ ছিল না। কিছুক্ষণ পরে আমার মা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এখন তবে উপায়? আমার জন্য আমি তত ভাবি না, কিন্তু তোমরা যে না খাইয়া মারা পড়িবে—তাহা আমি কেমন করিয়া দেখিব?

আচ্ছা, বড়বৌমাকে আনিলে হয় না ?” এই কথা বলিয়া সতৃষ্ণ-নয়নে আমাদের উভয় ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমার কথা বলিবার পূর্ব্বেই দাদা বলিলেন, “মন্দ কি! তবে তাহারা কি পাঠাইয়া দিবে ? সে মুখ আর রাখিয়াছি কৈ ? আবার কেমন করিয়াই বা তথায় যাওয়া যায় ?”

যাহা হউক অনেক তর্কবিতর্কেরপর বড়বৌকে আনিতে যাওয়াই স্থির হইল। বলা বাহুল্য—সে ভারও আমার উপরেই পড়িল। আমি মনে মনে বলিলাম হায়! হায়!, কেনই ছোট হইয়াছিলাম, ছোট হওয়াই কি ঝকমারী। এইভাবেই সে রাত্রি কাটিয়া গেল, পরদিন প্রত্যুষে শয্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই আবার নানাবিধ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। কেমন করিয়া যাইব, কোন্ পুরস্কার তথায় পাইতে হইবে। না যাইয়াও উপায় নাই ইত্যাদি বিষয়ে মনে মনে যখন নানাবিধ কল্পনা করিতেছি এমন সময়ে দেখি একখানা পাল্কী অকস্মাৎ আমাদের দরজায় আসিয়া উপস্থিত, বড়ই বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম এ কি! বাবার মৃত্যুর পর আর ত কখনও আমাদের দরজায় পাল্কী বেহারার শুভসম্মিলন দেখি নাই! বাবা থাকিতে প্রায়ই অফিস হইতে পাল্কী করিয়া আসিতেন বটে। মনে হইল বুঝিবা বৌদিদির দয়া হইয়াছে। মাঐমা বুঝি আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। মেয়েমানুষের কোমল হৃদয়, তাই আমাদের দুঃখে তাঁহার হৃদয় গলিয়াছে। যাহা হউক দেখি ব্যাপার কি! এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি যেমন বাহির হইতেছি অমনি দেখি তাহার মধ্য হইতে একজন অবগুণ্ঠনাবৃতা যুবতী বাহির হইয়া মৃদুমন্দ হাঁসিতে হাঁসিতে ঘোমটা টানিতে টানিতে আমার ঘরের দিকেই আসিতেছেন। এ কি! এত সে বৌদিদি নহে। ইঁহার পরিচ্ছদে কোনরূপ যাঁকযমক নাই, সঙ্গে দাস দাসীও নাই। এ আবার কে ? অনেকদিন না দেখিলেও কেমন যেন চেনা চেনা মুখ বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। আমার কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি আসিয়া আমাকে বলিলেন—“কেও ঠাকুরপো! চিনিতে পার কি ?”

আমি।—ওঃ! কেও! চিনিয়াছি। বড় বৌদিদি! তুমি!

বড়বৌ। হাঁ, আমিই, কেন অবাক হইলে নাকি ?

আমি। হাঁ! একটু হইলাম বৈকি ? কৈ আমরা ত তোমাকে আনিতে যাই নাই, তুমি কেমন করিয়া আসিলে।

বড়বৌ। কেন ? এখানে আসিতে আমার লজ্জা সম্ভ্রম কি ? তোমরা যদি সাতজন্মে আমাকে মনে না কর, তবে কি আমার বাড়ী আমি আসিব না ? তোমাদের যখন সুখের সময় ছিল, তখন আসি নাই বটে; কিন্তু এখন আসিবনা কেন ? সুখের অংশ সকলে লইতে পারেনা সত্য, কিন্তু দুঃখের অংশ লইবার অধিকার সকলেরই আছে। যাক সে কথা পরে হইবে, এখন মা কেমন আছেন বল দেখি ?

আমি। সে সংবাদও রাখ নাকি ?

বড়বৌ:। রাধি বৈ কি? তাহা না হইলেই কি আর গায় পড়িয়া আসিয়াছি। আমরা জীবিত থাকিতে মা কষ্ট পাইবেন; তোমরা দুটী রাঁধা ভাতের অভাবে কষ্ট পাইবে ইহাও কি হয়। চল আগে মায়ের ঘরে যাই।

এই সমস্ত কথা যখন হইতেছিল তখন সেই সামান্য বেশভূষার মধ্য হইতে কি যেন এক অসামান্য জ্যোতিঃ আসিয়া আমার হৃদয় উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। তাঁহার সেই আধ ঘোমটা ঢাকা মুখের মৃদুমন্দহাস্য যেন এক অননুভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয়ভাবে আমাকে একেবারেই মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। আমি মনে মনে ভাবিলাম একি কোন দেবী? আমাদিগকে এই দুঃসময়ে সাহায্য করিবার জন্য মানব ছলে আসিয়া আবির্ভূতা হইলেন।

তখনই যেন আমার মস্তক আমার অজ্ঞাতসারে আপনা আপনিই তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইল। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মায়ের ঘরে প্রবেশ করিলাম।

একজন অপরিচিতা অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোককে লজ্জা কম্পিতপদে সেই গৃহদ্বারে দণ্ডায়মানা দেখিয়া দাদামহাশয় আস্তে আস্তে উঠিয়া গৃহের বাহিরে আসিলেন। ঐ সময় বৌদিদির অবস্থাও যেন কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইল। আমি যেন দেখিলাম বৌদিদি কোন দেবতা বা গুরুজনের উদ্দেশ্যে অন্যের অগোচরে সেই গৃহদ্বারের দেওয়ালে একটা প্রণাম করিয়াই তড়িত পদে গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং একেবারে মায়ের চরণতল অধিকার করিয়া বসিলেন। মা ঐরূপ একজন স্ত্রীলোককে হঠাৎ গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া :অতি কাতরকণ্ঠে কহিলেন—"কেও! নূতন বৌমা! তুমি আসিয়াছ কি? এস, আমি যে যাই।" এইরূপ বলিতে বলিতে আবার যেন, নূতন বৌ নয় ইহা বুঝিতে পারিয়াই আবার বলিলেন; আমি কি বলিতেছি; একে?" তখন আমি আহ্লাদে গদ গদ কণ্ঠে বলিলাম। মা! বড় বৌদিদি আসিয়াছেন। আমায় আর যাইতে হয় নাই। তোমার ব্যায়রামের সংবাদ পাইয়া আপনিই পাল্কী করিয়া আসিয়াছেন।" মা যেন বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে আমার ও বৌদিদির দিকে পুনঃ পুনঃ তাকাইতে লাগিলেন। তাঁহার সেই বিস্ময়মাখা আনন্দপূর্ণ সলজ্জ চাহনি দেখিয়া মনের ভাব বুঝিতে বাকি থাকিল না। বেহারাদিগকে বিদায় করা হইয়াছে কিনা একথাও মাতৃদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কথা বলিবার পূর্ব্বেই বৌদিদি বলিলেন—"তাহারা চলিয়া গিয়াছে' বাবাই তাহাদিগকে যাহা কিছু দিতে হয় দিবেন বলিয়া দিয়াছেন। মা! আপনি কেমন আছেন? এতদিন আমাকে সংবাদ—বলিয়াই যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া একটু ঢোক গিলিয়া তখনই আবার বলিলেন এতদিন জানিতে পারি নাই, তাই আমার আসিতে বিলম্ব হইয়াছে; সে জন্য মা ও বাবা বড়ই আক্ষেপ করিয়াছেন।"

এই কথা বলিবার সময় তাঁহার মোটা মোটা চক্ষু দুইটী বর্ষাকালের মেঘের মত জলপূর্ণ হইয়া আসিল। সেদিকে আর যেন চাহিতেই পারিলাম না। এদিকে পশ্চাতে চাহিয়া দেখি কপাটের আড়াল হইতে দাদামহাশয় বিস্ফারিত নয়নে বৌদিদির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার চক্ষুপথে আমার দৃষ্টিও যেন হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত গমন করিয়া তাৎকালিক

তাঁহার সেই যুগপৎ লজ্জা, ক্রোধ, আনন্দ, উৎসাহ প্রভৃতি ভাবসমূহের সমাবেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইল। এই শুভ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে আমাদের বহুদুঃখপূর্ণ নিরাশায় নিবিড় অন্ধকার মানসপটে যেন একটা স্বর্গীয় ভাবের বিকাশ হইল। এমন সময় বৌদিদি তাঁহার বীণা বিনিন্দিত স্বাভাবিক সলজ্জ কণ্ঠে কহিলেন—"মা ভয় কি? আপনি এখনই সুস্থ হইবেন।" এই কথা বলিয়াই তাঁহার হস্তদ্বয় মায়ের শরীর মার্জ্জনায় নিয়োজিত করিলেন। এবং আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন— "ঠাকুরপো খাওয়া দাওয়ার কি হইতেছে? আমি বলিাম কি আর হইবে?

বৌদিদি। কিছুই না?

আমি। রান্ধে কে? আমরা ত তাহা কখনও জানিনা। তবে মধ্যে মধ্যে দোকানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি এইমাত্র।

বৌদিদি। তোমাদের কতদিন এভাবে চলিতেছে?

আমি। যতদিন মা শয্যাগ্রহণ করিয়াছেন।।

বৌদিদি। আচ্ছা চল আমাকে সমস্ত দেখাইয়া দেও, আমি আগে তোমাদের খাওয়ার যোগাড় করি, এবং মাকেও একটু পথ্য দেওয়া দরকার, ডাক্তারেরা বলেন পথ্য ও শুশ্রূষাই রোগীর প্রধান ঔষধ!

আমি বলিলাম ভাল কিন্তু—

বৌদিদি। কিন্তু কি?

আমি। আর বড় কিছুই না, তবে রান্ধিবে কি? তাই ভাবিতেছি।

তখন বৌদিদি তাঁহার বস্ত্রের মধ্য হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া আমার হাতে—এবং বলিলেন "ইহার দ্বারা সমস্ত কিনিয়া আন, আর একজন ভাল ডাক্তারের অদ্যই বৈকালে আসিবার কথা আছে, তিনি বাবার বন্ধু; বাবার অনুরোধে আসিতে স্বীকৃত হইয়াছেন কিন্তু কেবলমাত্র তাঁহার উপর নির্ভর করা চলিবেনা, কেননা তাঁহার বাড়ী দূরে সর্ব্বদা দেখিতে পারিবেননা মধ্যে মধ্যে আসিয়া দেখিয়া যাইবেন সুতরাং একজন স্থানীয় ভাল ডাক্তারকেও আনিতে হইবে।" আমি ত শুনিয়াই অবাক! মনে মনে ভাবিলাম দরিদ্রের পর্ণ কুটীরে যদি এত দয়া, এত সহৃদয়তা, এমন পূর্ণ আনন্দ, এমন নির্ম্মল সৌহার্দ্দ থাকে, তবে সেই দারিদ্রই যেন আমার নিত্য সহচর হয়। যে লক্ষ্মীর কৃপায় মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলে সে লক্ষ্মীকে আমার কোটি কোটি নমস্কার। আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া বৌদিদি আবার তাঁহার প্রীতিপূর্ণ স্বাভাবিক হাস্যময় মুখখানি তুলিয়া সেই মধুর ঠাকুরপো সম্ভাষণে সাদরে কহিলেন—কি ভাবিতেছ টাকার কথা কি? আপাততঃ আমার গায়ে গহনা আছে—তাহা হইতেই মায়ের চিকিৎসা চালাইতে পারিব, সে জন্য কোন ভয় নাই। তোমরা বাঁচিয়া থাকিলে পয়সার ভাবনা কি?

কথাটা যদিও একদিন মায়ের মুখে শুনিয়াছিলাম বটে কিন্তু সেদিন ইহার মূল্য বুঝিতে

পারিনাই, আজ আর তাহা বুঝিতে বাকি থাকিলনা, আজ বেশ বুঝিলাম—আমরা বাঁচিয়া থাকিলে পয়সার ভাবনা কি? বুঝিলাম অর্থাভাবে মানুষের কথঞ্চিৎ কষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু মনুষ্যত্বের কাছে অর্থ কোন্ ছার? ইত্যাদি নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে যথাকালে চাউল ডাইল প্রভৃতি আনিয়া দিলাম। বড় বৌদিদি সযত্নে রান্না বাড়া করিয়া দিলেন। অনেক দিন পরে পেটে অন্ন প্রদান করিয়া আমরা আবার যেন নব জীবন লাভ করিলাম।

যথাসময়ে ডাক্তারবাবু আসিলেন, বৌদিদির বাবাও একজন ডাক্তার সঙ্গে করিয়া আমাদের বাড়ীতে আসিলেন; যথারীতি চিকিৎসা চলিতে থাকিল। বলা বাহুল্য সেই দুইজন ডাক্তারের সুচিকিৎসার গুণে এবং বৌদিদির শুশ্রূষার ফলে সে যাত্রা মাতৃদেবী রক্ষা পাইলেন। এই কার্য্যে বৌদিদিও নিরাভরণা হইলেন। এখন তাঁহার অঙ্গে একমাত্র শাঁখা ও শাড়ীই অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতে থাকিল। দেখিলাম ইহাতেও তাঁহার কোনরূপ ভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেই অকপট ভাব, সেই হাসিহাসি মুখ, সেই সস্নেহ সম্ভাষণ সমস্তই বিরাজিত। এখন আমাদের সংসারে বৌদিদিই সর্ব্বেসর্ব্বা। তিনিই যেন গৃহের লক্ষ্মীরূপিনী আমরা যেন তাঁহার আজ্ঞাবহ দাস, এইভাবেই সংসার চলিতে থাকিল। দাদারও একটা উপযুক্ত চাকরী হইয়াছে—বেশ দুই পয়সা পাইতেছেন, সেও বৌদিদির বাবার অনুগ্রহে, তিনি একজন আফিসের বড়বাবুকে অনুরোধ করায়। সুতরাং আর্থিক ক্লেশ আর আমাদের তেমন নাই। একজন চাকর ও দুইজন ঝি রাখা হইয়াছে, সেও বৌদিদির জেদে পড়িয়া, বৌদির ইচ্ছা নয় যে ঝি রাখা হয়। আমি একদিন কথায় কথায় বলিলাম "বৌদিদি! একজন বামন রাখিলে হয়না?"

বৌদিদি। কেন আমার রান্নায় অরুচি হইয়াছে বুঝি? বামনেরা আমা অপেক্ষা ভাল রান্ধিতে পারিবে কি?

আমি। না, তা বলিতেছি না, তবে তোমার বড় কষ্ট হয় তাই। বৌদিদি আবার স্বর্গীয় সুষমালয় হাস্যমুখে আমার প্রতি একটু কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "ভাল শুনিয়া সুখী হইলাম যে আমার কষ্ট তোমাদের প্রাণে আঘাত করিয়াছে।" আবার সেই হাসি।

আমি মনে মনে বলিলাম "তুমি কি না হাঁসিয়া থাকিতে পারনা নাকি? তোমার কথায় কথায় হাঁসিরাশি আমার হৃদয় মধ্যে কি যে এক অননুভূত পূর্ব্ব ভাব তরঙ্গ আনয়ন করিয়াদেয়। একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম "আচ্ছা তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি বড় বৌদিদিই এখন আমাদের একমাত্র অবলম্বন, তিনিই সংসারে সর্ব্বে সর্ব্বা। মাকে কোন কাজই করিতে দেন না। তিনি এখন প্রায় সর্ব্বদাই পূজা আহ্নিক ধ্যান, জপ, তপ লইয়াই থাকেন। সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্যেই এখন বড় বৌদিদি। এইভাবে কিছু দিন বেশ কাটিয়া গেল। একদিন বৈকালে যখন আমি কলেজ হইতে আসিয়া বৌ দিদির স্নেহপ্রদত্ত আহার্য্য গ্রহণপূর্ব্বকদন্তপংক্তির বল পরীক্ষায় একাগ্র হইয়াছি, সেই

সময় বড় বৌদিদি একটু অধিকতর আগ্রহের সহিত আমার নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন৷ "ঠাকুরপো ! একটা কথা বলিব রাখিবে কি ?"

আমি। এ আবার তোমার কোন মূর্ত্তি বৌদিদ ?

বৌ দিদি। কেন আমি কি বহুরূপী নাকি ?

আমি। আমার যেন তাই বোধ হয়। তোমার কোন কথাটা নারাখিয়া থাকি ?

বৌদিদি। না, তা বলিতেছি না, তবে বল আজ যে কথাটা বলিব তাহা রাখিবে ত ?

আমি কিছু ইতস্তত করিয়া বলিলাম "বল কি বলিবে ; তোমার কথা রাখিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব।"

বৌদিদি ! সাধ্যমত নয়, রাখিতেই হইবে। মানুষের সাধ্য নয় এমন কাজ করিতে তোমারই কেন বলিব ?

বৌদিদির এতাদৃশ ভূমিকা শুনিয়া মনে হইল বুঝি ঝিদিগকে বিদায় দিয়া তাহাদের কার্য্যের সম্পূর্ণ ভার নিজ হস্তে লইতে চাহিতেছেন। অথবা কোন সুদূর সম্পর্কীয় আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে কাহারও কোনরূপ আশ্রয় প্রদান বা সাহায্য করিবার আবশ্যক হইয়াছে। কেননা সেই প্রকার কোনও প্রয়োজন হইলেই বৌদিদি এবম্বিধ ভূমিকার অবতারণা করিতেন সুতরাং বলিলাম –"আচ্ছা বল তোমার কষ্ট হইবেনা বুঝিলেই তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।" বৌদিদি হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন—নিজের কষ্টের কারণ কি কেহ ইচ্ছা করিয়া টানিয়া আনে ঠাকুরপো ? আমি অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকমাত্র, আমি আর তোমাকে কি বলিব, তবে তোমরাইত বলিয়া থাক "নিজের ইষ্টসাধনতা জ্ঞানব্যতীত কাহারই কোনও কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারেনা" ইহা দর্শনশাস্ত্রকারদিগের মত। তুমি কি ইহা বিশ্বাস করনা ? আমার বড় বৌদিদি যেন সকলশাস্ত্রেই সুপণ্ডিত। এই প্রকার অনেক সময়েই তাঁহার বহুবিধ জ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছি কিন্তু একদিনও তাঁহাকে একখানা বই পড়িতে অথবা একটি কথাও লিখিতে দেখি নাই। মনে মনে বলিলাম "তুমি যদি অশিক্ষিতা তবে আর শিক্ষিতা কে ? তোমার শিক্ষাই সার্থক। আমরা পুস্তক কীট হইয়াও যাহা শিখিতে পারি নাই। আবাল্য-স্কুলে পড়িয়া মানুষ যাহা শিখিতে পারেনা ; তুমি ঘরে বসিয়া অনায়াসে তাহা শিখিয়াছ।" প্রকাশ্যে বলিলাম "বল কি করিতে হইবে করিতেছি।"

বড়বৌ ! তোমার দাদার শ্বশুর সারদাবাবুর অবস্থা নাকি খুব খারাপ হইয়াছে।

আমি। হাঁ, তাহা ত জানি। তুমি সেকথা কোথায় শুনিলে ?

বৌদিদি কিছু বিস্মিতভাবে বলিলেন। "সে সংবাদ কি তোমরা জান ?"

আমি। হাঁ ! জানি বৈকি ? দাদাও জানেন—মাও জানেন।

বড়বৌ। তাঁহারা ঐ সংবাদ পাইয়া কেহ কিছু বলেন নাই ?

আমি। না কি আর বলিবেন, দাদা একটু হাঁসিলেন। মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন সমস্তই বরাত —এইমাত্র।

তখন বৌদিদি অনন্যমনে আমার কথা শুনিয়া যেন আরও অধিকতর আগ্রহের সহিত, অধিকতর বিস্ময় বিহ্বলচিত্তে বলিলেন, "একথা আমি এতদিন শুনিতেও পাই নাই; আজ স্নেহলতাদের বাড়ীতে একজন ঝি চাকরী খুঁজিতে আসিয়াছিল, তাহারমুখে ঐ সংবাদ পাইয়াছি মাত্র।"

আমি। যাক সে কথায় কাজ কি? তুমি কি বলিবে তাই বল। এখন ওসব বাজেকথা ছাড়িয়া দেও।

আমার এই কথা শুনিয়া বৌদিদি একটা তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন, ঠাকুরপো! ঐটিই আমার কাজের কথা। আমি বলিতেছিলাম তোমায় এখনই তাঁহাদের অনুসন্ধানে যাইতে হইবে। যেরূপেই পার তাঁহাদিগকে তোমাদের বাড়ীতে আনিতেই হইবে। এইটিই আমার কাজের কথা"। বৌদিদির কথা শুনিয়া আমি যেন শিহরিয়া উঠিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল বুঝিবা ঘরের ছাদ ভাঙ্গিয়া আমার মাথায় পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

বৌদিদি। ঠাকুরপো! একদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া কি দেখিতেছ? আমাকে কি আর কখনও দেখ নাই?

আমি একটু লজ্জিত হইয়া বলিলাম—"হাঁ! দেখিয়াছি বৈকি? কিন্তু তোমাকে যেন প্রত্যেক মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন ভাবেই দেখিতে পাই? তুমি মানবী না দেবী?"

বৌদিদির আর একটা বিশেষ গুণের পরিচয় আমরা অনেক সময়ে পাইতাম। তিনি আপনার প্রশংসা শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন না। আত্মপ্রশংসা পাইবার জন্যই অনেকে অনেক কাজ করিয়া থাকে কিন্তু এরূপ নিঃস্বার্থপরতা আজকালকার দিনে বড়ই বিরল। বৌদিদির কেহ প্রশংসা করিলেই হয় তথা হইতে স্থানান্তরিত হইতেন, নাহয় অন্য কথায় সে কথাটা চাপা দিতেন। বৌদিদি বলিলেন, "তোমার অন্য কোনও কথা আমি শুনিতে চাই না, তুমি আমার অনুরোধ রাখিবে কিনা বল"। বৌদিদিকে এমন জেদ করিয়া কোন কথা বলিতে আর কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার জেদ এই নূতন। প্রত্যুত্তরে অন্য কথা বলিতে সাহস হইল না বলিলাম "যাইব, কিন্তু মার ও দাদার মত লইলে ভাল হইত না?

বৌদিদি। সে ভার আমার, আমি যেমন করিয়া পারি তাঁহাদের মত করাইব। এখন এই কয়েকটি টাকা লও প্রত্যুষে উঠিয়াই চলিয়া যাইবে। সে রাত্রে আর কোন ঘটনা হইল না—মার বা দাদার মত হইল কিনা খোঁজ আর করিলাম না, করিবার কোন প্রয়োজনও বোধ করিলাম না। সকালে উঠিয়াই প্রসাদবাবুর বাসার অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। অনেক অনুসন্ধানের পর—একটা অতি কদর্য্য গলির মধ্যে একখানা সামান্য খোলার বাড়ীতে তাঁহাদের খোজ পাইলাম। দরজায় আঘাত করিতেই প্রসাদবাবু স্বয়ং আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন এবং আমাকে অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে দেখিয়া যেন একটু

স্তম্ভিত হইলেন। আমি যথারীতি নমস্কার করিয়া তাঁহার সহিত বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বড় অধিক দূর যাইতে হইল না কেননা দরজা পার হইলেই অন্দর। তথায় প্রবেশ করিতেই দেখি আমার সেই আদরিণী ছোট বৌদিদি বাহিরে বসিয়া বাসন মাজিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই একটু লজ্জিতভাবে উঠিয়া আড়ালে গেলেন এবং ঐ সময়ে একটি আড়াই কি তিন বৎসরের ছোট টুকটুকে মেয়ে মা—মা বলিয়া তাঁহার অঞ্চলাগ্রভাগ ধরিয়া টানিতে টানিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেল। তখন আমিও প্রসাদবাবু দাওয়ায় একখানা ছিন্ন সতরঞ্চিতে বসিয়া কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রসাদবাবুর সহিত অনেক কথাই হইল, মোটের উপর তিনি একজন শত্রুর চক্রান্তে পড়িয়া কোন ধনবানের সহিত বিরোধ করিতে বাধ্য হন, তাহারই পরিচালনে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে। মাঠৈমাতা আর ইহধামে নাই, ইহাদের দুরবস্থার সূত্রপাতেই তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য আমার আগমনের কারণ অতি বিনয় নম্র বচনে তাঁহাকে জানাইলাম। উত্তরে প্রসাদবাবু বলিলেন, "আমার আর তাহাতে আপত্তি কি? আমি যে অবস্থায় পড়িয়াছি, তাহাতে দুটি অন্ন পাইলেই আমার যথেষ্ট, এখন আর আমার স্থানাস্থান বিচার করিবার অবসর কোথায়? প্রসাদবাবুর সহিত আমার এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে ঘরের মধ্য হইতে আমার ছোট বৌদিদি তাঁহার কন্যাটিকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিলেন "অমি! যা তোর কাকাবাবুর কাছে যা, ঐ দেখ তোর কাকাবাবু আসিয়াছে। বুঝিলাম দাদার মেয়েটার নাম রাখা হইয়াছে অমিয়বালা। মেয়েটি হাঁসিতে হাঁসিতে আমার নিকট আসিল। আমিও তাহাকে সাদরে কোলে লইয়া মুখচুম্বনাদি করিলাম। প্রসাদবাবুর সহিত শেষকথা এই পর্য্যন্ত স্থির হইল যে আগামী কল্যই তাঁহার বাসা তুলিয়া আমাদের বাড়ীতে যাইবেন, বাসাভাড়া প্রভৃতি যাহা কিছু দেনাপত্র আছে, সে সমস্তই আমরা পরিশোধ করিয়া দিব। আসিবার সময় ৫৲ টি টাকা দাদার মেয়ের হাতে দিয়া আসিলাম। যথাকালে বাড়ী আসিয়া সমস্ত সংবাদ বড়বৌ-দিদিকে দিলাম। বড়বৌ-দিদির আর আনন্দের সীমা নাই, কেননা আজ তাঁহার হাতে অনেক কাজ। যেখানে যাই সেই খানেই দেখি আমারবৌ-দিদি সশরীরে বিদ্যমান। রান্নাঘরে গেলাম দেখি বড়বৌদিদি অন্নপূর্ণারূপে হাঁসিমুখে সকলকে অন্নদানে পরিতৃপ্ত করিতেছেন, মায়ের ঘরে দেখি বড়বৌদিদি মায়ের পূজার আয়োজনে ব্যস্ত। কোন্ ঘরে প্রসাদবাবু থাকিবেন, কোন্ ঘরে ছোট বৌদিদি বসিবেন এবং স্বহস্তে তাঁহাদের শয্যারচনা প্রভৃতি কার্য্য লইয়া তিনি আজ ভারি ব্যস্ত। ফলতঃ বাড়ীরমধ্যে যখন যে অংশে গমন করি তখনই সেই স্থানেই কোননা কোন একটি কার্য্যে আমার বড়বৌদিদিকে নিবিষ্ট চিত্তে দেখিতে পাইলাম; তাঁহার মুখে সেই হাঁসি, প্রাণে সেই উদারতা, মনে সেই একাগ্রতা সমস্তই এক ভাব। যখনই তাঁহার এই মূর্ত্তি দেখিতাম তখনই মনে হইত সত্যই কি ইনি "মানবী না দেবী"!

শ্রীযুক্ত অমরকুমার শাস্ত্রী।

বৃষোৎসর্গের বৃষ।

পরম পিতা পরমেশ্বর জীবশ্রেষ্ঠ মানবের উপকারের নিমিত্ত যে সমস্ত দ্রব্যাদি সৃজন করিয়াছেন তন্মধ্যে গোজাতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। প্রথম এবং ঐতরেয় উপনিষদে লিখিত আছে যে, লোকপালগণ ক্ষুধাতুর ও পিপাসাতুর হইয়া ভগবানকে বলিলেন যে

"আয়তনং নঃ প্রজানীহি, যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদামেতি," অর্থাৎ যাহাতে প্রতিষ্ঠা হইয়া আমরা অন্ন আহার করিতে পারি আমাদিগকে সেইরূপ আশ্রয় দিন্। তখন ভগবান তাঁহা-দের নিকট "গামানয়ৎ" অর্থাৎ একটি গরু আনয়ন করিলেন; দেবতা বা লোকপালগণের পর গাভীই প্রথম সৃষ্ট জীব। গাভীর পর অশ্ব এবং অশ্বের পর মনুষ্য সৃষ্ট হয়। মর্ত্তভূমির সৃষ্ট জীব বলিয়া সকল মানবেরই গাভী পূজা করা কর্ত্তব্য। ঐ ২য় খণ্ড।

গো-পূজায়, মানবের মন অনুকূল রাখিবার জন্য শাস্ত্রে নানারূপ বিধি ও উপদেশ আছে। গোয়াল পূজা, গোগ্রাস দান, বৈতরণী কৃত্য, বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি এই গোপূজারই সমর্থন করি-তেছে। বিবাহ সময়েও গোস্থাপন গোমোক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে কিন্তু এক্ষণে তাহা "নাপিতেন গৌগৌ" এই মন্ত্রোচ্চারণেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপালন করিতেন এবং তাঁহার একতর নাম গোপাল। কন্যাগণ গোদোহন করিতেন, এজন্য তাহাদের নাম দুহিতা, যাহার "গো"ধন আছে তিনিই ধনী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। গো-দান গো-প্রতিপালন অতি পুণ্য কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত। নিজের সমতুল্য ব্যক্তির প্রতি, গো-প্রতিপালনের ভার না দিয়া অন্যের উপর যাহাতে সেইরূপ ভার ন্যস্ত করা না হয় তন্মূলেও শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে।

"পিতুরন্তঃ পুরে দদ্যাৎ, মাতুঃ দদ্যাৎ মহানসে।
গোষু চাত্মসমে দদ্যাৎ, স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ॥

অর্থাৎ পিতার উপর অন্তঃপুর পর্য্যবেক্ষণের ভার দিবে, রন্ধনশালার ভার মাতার উপর ন্যস্ত করিবে, যিনি নিজের সমতুল্য তাঁহার প্রতি গোরক্ষার ভার দিবে এবং নিজে কৃষিকার্য্য করিবে।

মহারাজ দিলীপ স্বর্গীয় গাভী সুরভীকে প্রদক্ষিণ না করিয়া মর্য্যাদালঙ্ঘন বশতঃ মহারাজ অপুত্রক হইয়াছিলেন। কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের উপদেশে, সুরভির কন্যা নন্দিনীর সেবাদ্বারা দিলীপ, প্রথমতঃ নন্দিনীকে এবং পরে সুরভিকে প্রসন্ন করিয়া পুত্ররত্ন "অজ"কে প্রাপ্ত হন। মহারাজ দিলীপ ও তাঁহার পত্নী সুদক্ষিণা নন্দিনীকে যেরূপ ভাবে সেবা করিয়াছিলেন তাহা অমর কবি কালিদাস "রঘুবংশে" লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

"আস্বাদবদ্ভিঃ কবলৈস্তৃণানাং কণ্ডূয়নৈর্দংশ নিবারণৈশ্চ।
অব্যাহতৈঃ স্বৈরগতৈঃ স তস্যাঃ সম্রাট্ সমারাধন তৎপরোঽভূৎ॥

স্থিতঃ স্থিতামুচ্চলিতঃ প্রয়াতাং নিষেদুষী মাসনবন্ধ ধীরঃ।
জলাভিলাষী জলমাদদানাং ছায়েব তাং ভূপতি রন্বগচ্ছৎ॥"

রঘুবংশ।

অর্থাৎ সম্রাট্ দিলীপ সুস্বাদু তৃণগ্রাস প্রদানে, শরীর কণ্ডূয়ন, শরীরোপবিষ্ট মশকাদি নিবারণ,করতঃ নন্দিনীর স্বেচ্ছাগমনে কোনও প্রকার বাধা প্রদান না করিয়া তাহার সেবা করিয়াছিলেন। সেই গাভী দণ্ডায়মান থাকিলে, সম্রাট দণ্ডায়মান থাকিতেন, তিনি উপবেশন করিলে, সম্রাট উপবেশন করিতেন, তিনি জলপান করিলে, সম্রাট জলপান করিতেন, এইরূপে ছায়ার ন্যায় সম্রাট নন্দিনীর অনুসরণ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব শাস্ত্রে স্পষ্টই উপদেশ আছে যে—

"অশ্বত্থতুলসী ধাত্রী গোভূমি সুরবৈষ্ণবাঃ।
অর্চ্চিতাঃ পূজিতা ধ্যাতাঃ ক্ষপয়ন্তি নৃণাং মলং॥

অর্থাৎ অশ্বত্থ, তুলসী, ধাত্রী, গোরু, ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবদিগকে, অর্চ্চনা, পূজা ও ধ্যান করিলে, মানবের সকল পাপ দূরীভূত হইয়া যায়।

সপ্তমাতার মধ্যে "গাভীকে" একটি মাতা বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে॥ যথা

"আদৌ মাতা গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণী রাজপত্নী চ।
গাভী, ধাত্রী তথা পৃথ্বী সপ্তৈতা মাতরস্মৃতাঃ॥

অর্থাৎ প্রথম মাতা' জননী, ২য় গুরুপত্নী ৩য় মাতা ব্রাহ্মণপত্নী' ৪র্থ মাতা রাজ্যেশ্বর পত্নী, ৫ম মাতা গাভী, ৬ষ্ঠ মাতা প্রতিপালিতা ধাত্রী এবং ৭ম মাতা পৃথিবী। এজন্য হিন্দুগণ গাভীকে মাতৃ দেবতাজ্ঞানে ভক্তি ও যথারীতি পালন ও সংরক্ষণ করিয়া থাকেন।

ফলতঃ গাভীর তুল্য উপকারী জীব মানবের পক্ষে আর দ্বিতীয় নাই। গোজাতি দ্বারা মানব বিবিধ প্রকারে উপকৃত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা কৃষিকার্য্য হয়, গোযানে নানাস্থানে গমনা গমন করা যায়, এবং দূরবর্ত্তী প্রদেশে দ্রব্যাদি প্রেরিত এবং তথা হইতে দ্রব্যাদি আনিত হইয়া বাণিজ্যের উন্নতি ও সুবিধা হয়। দুগ্ধপ্রদানে ইহা মানবসমাজকে পরিপোষণ করে। গোময়দ্বারা পঞ্চগব্যাদির কার্য্য, জ্বালানীকার্য্য ও জমি উর্ব্বরা করিবার উত্তম সার প্রস্তুত হয়, এবং দুর্গন্ধ ও বীজাণুনাশক বলিয়া ইহা দরিদ্র ভারতবাসীর গৃহে ফেনাইলের কার্য্য করে। গোমূত্রদ্বারা বিবিধ ঔষধ প্রস্তুত ও বস্ত্রপরিষ্কার করা হয়। আজ কালকার এই পাশ্চাত্য অনুকরণের দিনেও এমন হিন্দুর বাড়ী নাই বলিলেই হয়, যে বাড়ীতে "গোবরছড়া" দেওয়া না হয়, বা যে বাটীতে গৃহমার্জ্জনাদি কার্য্যে গোময় ব্যবহৃত না হয়।

এই মানবদেহ, জীবনান্তে শ্মশানে নীত হইয়া, চিতার ভস্মে, বা গোর স্থানে নীত হইয়া কৃমিকীটের খাদ্যে বা "Iower of Sieu●ena" এ নীত হইয়া, গগণবিহারী পক্ষিগণের খাদ্যে পরিণত হয় জীবিতাবস্থায় যে মানব সকল প্রাণিগণের উপর অশেষবিধ কর্তৃত্ব

করিয়া, জ্ঞান বিবেক ও বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সেই জীবশ্রেষ্ঠমানবদেহের শেষ পরিণতি এই বা এবম্বিধ। কিন্তু জীবনান্তেও গোজাতি, মানবের বিবিধপ্রকার উপকার করিতে ক্ষান্ত হয় না। ইহার চর্ম্মদ্বারা জুতা, গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ, বেল্ট, প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়, অস্থিদ্বারা সার প্রস্তুত হয়, লবণ চিনি প্রভৃতি নির্ম্মল করা হয় এবং অন্ত্রদ্বারা সেতার, ইস্রাজের (এসরাজ) তন্ত্রী প্রস্তুত হইয়া মানবকুলের চিত্ত বিনোদন করিয়া থাকে, এবং প্রকারান্তরে মানবকে শিক্ষা দেয় যে মানব, তুমি "আমি আমি, অহং অহং করিয়া, ধরাকে সরাজ্ঞান করিতেছ, অহংজ্ঞান দূর না হইলে "ত্বম্" পদার্থের জ্ঞান হইবে না, আমিও অহংজ্ঞানে, মত্ত হইয়া কেবল "হাম্" (হাম্‌রা) হাম্ (আমি করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছি, কিন্তু দেখ আমার তন্ত্রী, অঙ্গুলির কম্পনে কেমন্ "তুঁহু তুহু" (ত্বম্ ত্বম্) করিতেছে। "আমি" লইয়া মত্ত থাকিলে চলিবে না, সংসারে থাকিয়া "ত্বম্" পদার্থের অন্বেষণ কর, "ত্বম্"কে সার কর ইত্যাদি। যে গোজাতীর দ্বারা আমরা এরূপ মহোপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও সংরক্ষণের জন্য মানবমাত্রেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য কিনা তাহা পাঠকগন বিবেচনা করিবেন।

পৃথিবীর সমস্ত সুসভ্য জনসমাজ গোজাতির নিকট কৃতজ্ঞ। যদিও ইউরোপ আদি দেশে অশ্ব, অশ্বতর প্রভৃতি দ্বারা যান বহন ও কৃষিকার্য্যাদি নির্ব্বাহিত হয়, তথাপি সংসারে এমন লোক বিরল, যিনি কোনও না কোনও প্রকারে গোজাতির নিকট ঋণী নহেন। কৃষি-প্রধান এই ভারতবর্ষে গোজাতির আবশ্যকতা ও উপকারিতা যে অত্যন্ত অধিক, তাহা বলাই বাহুল্য। কৃষি বহুল ভারতবর্ষে গোজাতিই মানবের সংসারযাত্রানির্ব্বাহের প্রধান অবলম্বন। এজন্য গোজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি, বংশ-বিস্তার এবং সংরক্ষণ বিষয়ে যত্নবান থাকিতে আর্য্য-শাস্ত্রকারগণ বারম্বার আদেশ করিয়াছেন।

সুস্থ, সবল, গোবংসাদি প্রজনন করিতে হইলে, বীর্য্যবান উৎকৃষ্ট বৃষের আবশ্যক। অন্যান্য দেশে, সচরাচর বৃষ পাওয়া যায় না বলিয়া, গাভি আদি গৃহপালিত পশুদিগকে গর্ভিণী করাইবার জন্য স্থানে স্থানে পুংগবাদি রক্ষিত থাকে, তথায় উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়া গাভী গর্ভিণী করাইয়া লইতে হয়; কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বৃষোৎসর্গব্যাপারে, সুস্থ, সবল ও বীর্য্যবান বৃষ, সহজেই পাওয়া যায় বলিয়া ভারতবর্ষে সচরাচর, মজুরি দিয়া গো গর্ভিণী করিয়া লইতে হয় না। আর এই সকল বৃষ; স্বচ্ছন্দভাবে আহার বিহার করে বলিয়া যেরূপ সুস্থ, সবল ও বীর্য্যবান হয়, বহু যত্নে গৃহপালিত বৃষ সেইরূপ হইতে পারে না। এই কৃষিপ্রধান দেশে, কৃষিকার্য্যের প্রধান অবলম্বন, উৎকৃষ্ট গবাদির যাহাতে অভাব হইতে না পারে, তজ্জন্য আর্য্যমনীষীগণ, বৃষোৎসর্গের বিধান করিয়া, পরোক্ষে মৃতের পারলৌকিক উন্নতি এবং প্রত্যক্ষে সুস্থ ও সবল গোবৎস প্রজনন দ্বারা গোবংশরক্ষার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

উৎসর্গান্তে ছাড়িয়া দিবার সময়, বৃষকে বলা হয় যে,—

" ন খাদেঃ পরশস্যানি নাক্রামেঃ গর্ভিণীঞ্চ গাং"

অর্থাৎ পরের শস্য খাইওনা এবং গর্ভিণী গাভীকে আক্রমণ করিও না।

শস্য ভক্ষণে নিষেধ থাকিলেও উৎসৃষ্ট বৃষ যথেচ্ছ আহার বিহারপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকে। এই সকল বৃষ কর্ত্তৃক জনসাধারণের শস্যের ক্ষতি বা অন্য প্রকারে অনিষ্ট হইলেও প্রকারান্তরে উপকার পায় বলিয়া কেহ তাহাতে অসন্তুষ্ট হইত না বা কেহ ঐ সকল বৃষকে পীড়ন বা বধ করিত না। হিন্দুদিগের উৎসৃষ্ট-বৃষ বলিয়া হিন্দুগণই যে ঐ সকল বৃষের অত্যাচার সহ্য করিত এমত নহে; ঐসকল বৃষদ্বারা হিন্দুমুসলমান জনসাধারণ যেরূপ উপকার প্রাপ্ত হন, তাহার তুলনায় শস্য ক্ষতি নগণ্য। এজন্য ভারতবাসী হিন্দুমুসলমান সকলেই সেই ক্ষতি নীরবে সহ্য করিত। কৃষিকার্য্যের তথা গবাদি পশুর উন্নতিকল্পে গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ নানারূপ চেষ্টা করিতেছেন। উৎসৃষ্ট বৃষ "অস্বামিক" বস্তু (Res nullius, nullius proprietas, fera naturae, fera bestae) ৮, এ, ৫১, ১৭, ক ৮৫২, ১১, অ, ১৪৫, ৩০, এ, ১৮১, ১৪, এ, ১৪৫, ১৮, ব, ২১২, ২২ ক, ৪৫৭) বলিয়া গণ্য হওয়ায় প্রজননকার্য্যের (Breeding) সুবিধার নিমিত্ত এই বৃষগুলিকে এক্ষণে রক্ষা করা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া পড়িতেছে।

হাইকোর্ট স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে উৎসৃষ্ট গবাদিতে উৎসর্গকর্ত্তার কোনও স্বত্বস্বামিত্ব থাকে না, উৎসর্গের পর তাহা জনসাধারণের সম্পত্তি মধ্যে পরিগণিত হয়। এজন্য উৎসৃষ্ট বৃষ কেহ হত্যা করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিলে এবং তাহার চামড়া বিক্রয় করিলে কেহই তজ্জন্য আদালতে দণ্ডনীয় হইবে না। হিন্দুশাস্ত্রে ইহাকে অস্বামিক পদার্থ বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই অস্বামিক শব্দের অর্থ ইহা নয় যে যে কেহ যথেচ্ছরূপে বধ করিয়া ইহার মাংস আহার ও চর্ম্ম বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতে পারিবে; ইহার অর্থ এই যে, উৎসৃষ্ট বৃষকে রক্ষা করিয়া তদ্দ্বারা অন্য কেহ তাহাদের গাভীগুলি প্রজননকার্য্য সম্পাদন করিলে, উৎসর্গকর্ত্তা তাঁহার নিকট তজ্জন্য কোনও দাম বিনিময় লইতে পারিবেন না, উৎসৃষ্ট বৃষ কেহ পূজা করিতে ইচ্ছা করিলে উৎসর্গকর্ত্তা তাহাতে বাধা দিতে পারিবেন না, বা কেহ তাহা দান বিক্রয় করিতে বা তদ্দ্বারা কেহ যান বা লাঙ্গল বহাইতে পারিবে না ইত্যাদি। পাঠাকে ভালবাসার অর্থ ইহা নয় যে পাঠাকে কাটিয়া খাইয়া ফেলিতে হইবে। সাধারণ সম্পত্তি বলিলেই যে, উৎসৃষ্ট "বৃষ" "Res nullius"এ পরিণত হইবে, ইহা কদাচ সঙ্গত নয়। বিশেষতঃ বনের পক্ষী, জঙ্গলের ব্যাঘ্র যে ভাবে অস্বামিক, ইহা সেই ভাবের অস্বামিক নহে। বনের পক্ষীর উপর কাহারও কোনও স্বত্ব থাকে না। উৎসৃষ্ট বৃষের উপর উৎসর্গের পূর্ব্বে উৎসর্গকর্ত্তার স্বত্ব থাকে, উৎসর্গের পর তাহা জনসাধারণের সম্পত্তি হয়। জনসাধারণের কোনও সম্পত্তি কোনও ব্যক্তি বিশেষ ক্ষতি করিলে, অপর জনসাধারণের তাহাতে ক্ষতি হয়, সুতরাং অপর জনসাধারণ তজ্জন্য কেন ক্ষতিকারককে দণ্ডিত করিতে পারিবেন না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক, এই সকল বৃষকে

বধ করা দূরে থাকুক, ইহারা কাহারও শস্যের ক্ষতি করিলেও শাস্ত্রানুসারে ইহারা দণ্ডনীয় হয় না—

"অনির্দ্দশাহাং গাং সূতাং বৃষান্দেব পশূংস্তথা।
সপালান্ বা বিপালান্ বা ন দণ্ড্যান্ মনুরব্রবীৎ"॥

(মনু ৮।২৪২)

অর্থাৎ সদ্যঃপ্রসূত গাভী ও দেবোদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট গবাদি পালকসহিত বা পালকরহিত অবস্থায় শস্যাদির ক্ষতি করিলে, তজ্জন্য কেহই দণ্ডনীয় হইবে না। দুঃখের বিষয় হাইকোর্টের নজির বিরুদ্ধ থাকায় উৎসৃষ্ট বৃষ বধ করিয়া লোকে বেকসুর খালাস পাইতেছে। অনেকে ঐ বৃষদ্বারা লাঙ্গল বহাইতেছে, এবং মিউনিসিপ্যালিটীর ময়লার গাড়ী বহন করিবার জন্যও তাহাদিগকে নিযুক্ত করা হইতেছে। উৎসৃষ্ট বৃষকে চলিত কথায় ধর্ম্মের ষাঁড় বলে। হিন্দু মুসলমান সকলেই জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইহাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে উক্ত নজিরগুলির কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন না করিলে ষাঁড়গুলি রক্ষা করিবার আর উপায় থাকিবে না। এই ষাঁড়গুলি যদি যে সে বিনাদণ্ডে বধ করিতে অধিকারী হয় বা তদ্দ্বারা লাঙ্গল বা যান বহাইতে সমর্থ হয়, তবে ষাঁড়গুলির এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া অনেকেই বৃষোৎসর্গ ক্রমশঃ বন্ধ করিয়া দিবেন এবং ক্রমে উৎকৃষ্ট বৃষের অভাব হইয়া গোবংশ ধ্বংস হইবে। এজন্য উৎসৃষ্ট বৃষ যাহাতে অস্বামিক (Res nullius) গণ্য না হয়, এবং যাহাতে উহাকে কেহ বধ করিলে, বিনাদণ্ডে বেকসুর খালাস না পায়, যাহাতে উহাকে কেহ ইচ্ছামত লাঙ্গল বা যানে ব্যবহার করিতে না পারে, যাহাতে ইহা প্রজননকার্য্য জন্য রক্ষিত হয়, এবং যাহাতে উক্ত নজির রদরহিত হয়, তজ্জন্য জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। হাইকোর্ট বৃষোৎসর্গের প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়া বলিয়াছেন যে—

"A bull thus dedicatd and set at liberty is regarded as sacred by all Hindus, and it is a religious and meritorious act on the part of strangers even to feed it; bnt it is peculiarly sacred in the eyes of the person, who performed the Sradh and set the animal at liberty and he regards it as a moral duty to feed it, after it has been set at liberty.

Even if it be true that the villagers do not use the bull for breeding purposes without asking permission of the Rajbari people, I think this is only a matter of courtesy on their part and ought not to be construed as evidence of any property in the animal remaining in those who set him at large 14. cal. 852.

অর্থাৎ উৎসৃষ্ট বৃষকে হিন্দুগণ পবিত্র জ্ঞান করেন এবং অন্য কেহ ইহাকে খাওয়াইলে,

তাহা পুণ্য ও ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। উৎসর্গকর্ত্তা ইহাকে খাওয়ান যে পুণ্যকার্য্য মনে করিবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? উৎসর্গকর্ত্তার অনুমতি ব্যতীত প্রজনন-কার্য্যের জন্য বৃষ ব্যবহার করিতে না পারিলে, ইহা ধরিয়া লইতে হইবে না যে উৎসর্গকর্ত্তার তাহাতে কোনও স্বত্ব আছে; শিষ্টাচার প্রণোদিত হইয়াই লোক উৎসর্গকর্ত্তার অনুমতি গ্রহণ করে মাত্র।

"If such animals in their wanderings at times, tresspass on and do damage to private property with impunity, it is because superstition induces villagers to regard them with veneration and to endure the mischief which they commit without seeking redress as of right. U. M. 145.

অর্থাৎ এই সমস্ত প্রাণী অব্যাহতভাবে অন্য লোকের ফশল যে ক্ষতি করে, তাহার কারণ এই যে কুসংস্কারবশতঃ পল্লীবাসিগণ ইহাদিগকে সম্ভ্রমের চক্ষুতে দেখে এবং এজন্য বৃষকৃত ক্ষতির প্রতীকার চেষ্টা না করিয়া নীরবে তাহা সহ্য করে।

যাহা হউক, প্রজননকার্য্যের সুবিধার জন্য এই বৃষগুলি যে পল্লীবাসীর একান্ত আবশ্যক, তাহা কোনও হাইকোর্ট স্বীকার করেন নাই।

ইহাই প্রচলিত আইন। এই নজির প্রচলিত থাকিলে উৎসৃষ্ট গবাদি রক্ষা করা যাইবে না। এজন্য সহৃদয় হিন্দুমুসলমান ভ্রাতৃগণের নিকট হিন্দুসভা, ব্রাহ্মণ-সভা এবং মসলেমদিগের নিকট সানুনয় নিবেদন যে তাঁহারা বৃষ রক্ষা করিবার জন্য সদাশয় গবর্ণমেণ্টের নিকট উপযুক্তমতে আবেদন নিবেদন করুন। এবার উভয় লাট-কাউন্সিলে অনেক সুযোগ্য হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ সদস্য মনোনীত হইয়াছেন, এ দেশে অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজপরিচালিত বাঙ্গালা ও ইংরেজী সংবাদ-পত্র প্রচলিত আছে, অনেক মহারাজ, রাজা, জমিদার, মহাজন ও শিক্ষিতমহোদয় কৃষিজীবিগণের দুঃখে কাতর হইয়া থাকেন, এই সকল মহাত্মারা গবর্ণমেণ্টকে উৎসৃষ্ট বৃষের উপকারিতা বুঝাইতে পারিলে সহজেই বৃষ রক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে। এই সুযোগ পরিত্যাগ না করিয়া, যাহাতে সত্বর ও সহজে উৎসৃষ্ট বৃষগুলি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হয়, তৎসম্বন্ধে হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ ভ্রাতৃগণ তুল্যরূপে চেষ্টা করেন, ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীরামতারণ মুখোপাধ্যায়।

গো-সেবা।

বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ সভার আলোচ্য ও কর্ত্তব্যগুলির মধ্যে অন্যতম গো-সেবা। সভার নেতৃগণ আর্য্য-সমাজের মধ্যে সংযম, ধ্যান ও ধারণাদির পুনরুন্মেষ ও প্রসারণের জন্য যতই যত্নবান্ হউন্ না কেন, কিন্তু তাহার ফল বিজ্ঞবিজ্ঞেয় ও বিদূরবর্ত্তী; কিন্তু গোসেবা তাহা নহে। গো-রক্ষণে সর্ব্বজাতির স্বার্থ অধিগম্য এবং হিন্দুর ধর্ম্ম অবিকল্প হয়; সুতরাং তাহা অবশ্য রুচিকর; তাহাতে হস্তক্ষেপ সিদ্ধির সোপান। সভার সিদ্ধান্ত অপেক্ষা সিদ্ধিই প্রার্থনীয়।

কলিকাতায় গোজাতির অবস্থা-অবলোকন দূরে থাকুক, শুনিলেও কর্ণজ্বর জন্মে। তাহার প্রতিকার প্রতিষ্ঠান 'পিঞ্জরাপোল' হইলেও সম্পূর্ণ সংবিধান নহে, কাজেই এইরূপ দ্বিতীয় গো-কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। রাজতরঙ্গিণীপাঠে জানা যায়, পুরাতন আর্য্যরাজ ও আঢ্যগণ বিহার-মঠাদির ন্যায় গো-কুল প্রতিষ্ঠান করিতেন; তাহা তাঁহাদিগের অন্যতম কীর্ত্তিকেতন। কালে তাহা কবলিত হওয়ায় বঙ্গের ভূম্যধিকারিগণ জমিদারীর মধ্যে গোচরভূমি নিষ্করে রাখিয়া দিতেন, পল্লীর নিঃস্বজনের গোধন তাহাতে বাঁচিত; সম্পন্নের গৃহে গৃহে গো-পূজা হইত। এখন তাহাও 'গয়াগচ্ছ' হইয়াছে। শাস্ত্রে পরের গরুকে প্রত্যহ ভক্ষ্যদানের বিধি ('গবাহ্নিকং দেবপূজা') আছে, তাহা ত লুপ্ত। আপন গরু আহারাভাবে শীর্ণশরীর হইতেছে। এদিকে গো পালনের অভাব, আবার তাহাতে গো-ঘাতকের উৎসাহদানে গো-বংশ ধ্বংস হইতে চলিল।

এক্ষেত্রে প্রধানতঃ রাজদৃষ্টি আকৃষ্ট না হইলে গোজাতির জীবন ও স্বাস্থ্য থাকে না। ভারতসম্রাট্ ধর্ম্মান্তরের সেবক হইলেও, ভারতীয় প্রজার ধর্ম্মকর্ম্মাদির প্রতিভূ। বিশেষতঃ হিন্দু ধর্ম্মপ্রাণ। তৎসমস্ত তিনি অপক্ষপাতে রক্ষা করিতেছেন। এবিষয়ে স্খলন হইবে কেন? আফ্-গানাধিপতি সে বার গোহত্যা হিন্দুর প্রাণস্পর্শিনী বুঝিয়া বকরিদে মেষবলি ব্যবস্থার উদঘোষণা করিলেন। আর আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সভ্য ব্রিটীশভূপ কেন বিরূপ হইবেন? বারংবার প্রার্থনা কর্ত্তব্য। যখন মৎস্য রক্ষার জন্য fishery এবং পক্ষিজীবনের জন্য forest বিধি এবং কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে, তখন সর্ব্বোপকারী গোজীবন রক্ষার ব্যবস্থা কেন না হইবে? বর্ত্তমান্ জার্ম্মানযুদ্ধে ব্রিটীশসিংহ বিজয়ভেরী ধ্বনি করিয়া এই প্রকার অভাব ও অভিযোগের প্রতী-কার করিবেনই, এই প্রজাপুঞ্জের আশা; সেই সুযোগে ও সুদিনে ব্রাহ্মণ-সভা অগ্রসর হইবেন।

ইতাবসরে সমাজদ্বারা যাহা সাধনীয়, তৎপক্ষে জনসাধারণ বদ্ধপরিকর হউন। গো-রক্ষণ ও ব্রাহ্মণসভার পক্ষপাতী জমিদারগণ স্ব স্ব জমিদারীর মধ্যে বিলুপ্তপ্রায় গোচরভূমির পুনরুন্মেষণ করিতে হস্তার্পণ করুন। পূর্ব্বকথিত গোচরভূমিগুলি জমীদারগণ নিষ্করে গ্রামে গ্রামে রাখিয়া দিতেন; নিঃসহায় ও নিঃস্ব লোকে সেখানে গরু রাখিয়া ঘাস খাওয়াইত, সম্পন্ন লোকও সময়ে সময়ে সেই স্থানে গোপালন করিত। কালক্রমে জমিদারগণের গ্রাম্য কর্ম্মচারীর চক্ষে

তাহা সহ্য হইল না; তাহারা অবস্থাপন্ন লোকের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণে গোচর-ক্ষেত্রের জমা বন্দোবস্ত করিয়া কর আদায় করিয়া কতকটা আত্মসাৎ করিত, কতকটা উর্দ্ধতন কর্ত্তার নজরস্বরূপ লইত এবং অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিদংশ ভূস্বামীর খাজনার খাতায় জমা করিয়া দিত। এইরূপে গোচরক্ষেত্র সকরাকারে পরিণত হইয়া শস্যক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সদরে বসিয়া ভূমিপতি আয়ের অঙ্ক বৃদ্ধি দেখিয়া আনন্দ বোধ করেন। অলক্ষিতভাবে এবম্বিধ দুর্ব্যাপারে গোচরক্ষেত্রের তিরোধান হইয়াছে ও হইতেছে। পল্লীতে এজন্য হাহাকার; সম্ভবতঃ তাহা ভূস্বামীর অবধানে পৌঁছে না। এক্ষণে ধার্ম্মিক প্রজাপ্রিয় জমিদারগণ ইহার প্রতীকার করুন। ৺কালীঘাট ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীতে আমি এই বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার কোন ক্রিয়া এযাবৎ হয় নাই।

সহরের পাষণ্ড গোপজাতির গো-জাতির প্রতি অত্যাচার সর্ব্বজনবিদিত। তাহার প্রতি-বিধাতাও রাজবিধান, অন্য দ্বারা নিবারণ অসাধ্য বা কৃচ্ছ্রসাধ্য। সুতরাং পল্লী-গ্রামে গো-সেবা অক্ষত রাখিতে ও উন্নত করিতে হইলে স্থানীয় শাখা—ব্রাহ্মণসভা ও ভদ্রবৃন্দের সহানুভূতি কর্ত্তব্য।

গো-জাতির সংক্রামকরোগ শান্তির জন্য গ্রাম্য ঔষধগুলি (পত্রমূলাদি) পূর্ব্বে বহুজনের বিজ্ঞাত ছিল; সেই সকল সামান্য উপকরণে ও উপায়ে তাহার নিবারণ ও প্রতীকার হইত; সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেইগুলি লীন হইয়াছে। পল্লীতে বেলগাছিয়ার পশুচিকিৎসালয় বা মিউনিসিপ্যালিটীর নিযুক্ত ডাক্তার নাই, কাজেই নিরুপায়; তাহারও ব্যবস্থা বিধেয়।

যাহা হউক, অগ্রে গো-পালন, পরে তদীয় রোগ দূরীকরণ কর্ত্তব্য। অনেক স্থলে পালনের অপচারেই গো-রোগ হয়; তাহাতে গো বংশ বিনষ্ট হইয়া থাকে। হিন্দুর নিকটে ও হিন্দুর শাস্ত্রে গোজাতি দেবতা এবং মাতৃ রূপায় (গাভী) হিতকারিণী। গর্ভধারিণী মাতার স্তন্য দুগ্ধ কখন কখন আমরা পাইনা, কিন্তু গোমাতার গব্য সর্ব্বদাই পাইয়া থাকি; তাহাই আমাদিগের জীবন এবং হৃষ্টি, পুষ্টি ও তুষ্টির প্রধান উপাদান। হিন্দুভিন্ন জাতি গোজাতিকে দেবতাবোধ করিতে না পারেন, কিন্তু সকল গৃহপালিত পশুর মধ্যে সর্ব্বপ্রকারে গোজাতি যে হিতকারিণী, তাহা তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন। স্থূল চক্ষে আপাততঃ মহিষজাতি গোজাতির ন্যায় উপযোগিনী বোধ হয়; মহিষ ও গরুর ন্যায় দুগ্ধাদি দেয় এবং যানবহন ও কর্ষণাদিতে লাগে; তবে হিন্দুর শাস্ত্র তাহা ত্যাগ করিয়া গোধনের গুণগান কেন করেন? শাস্ত্র ও তদুক্ত ফলোপধায়কতার দিকে দৃষ্টি দান করিলে গো গৌরব অতুলনীয়। গোধনের অর্থ—গো-রূপিণীলক্ষ্মী বা সম্পত্তিদেবতা। গোজাতির উপযোগাধিক্যবিষয়ে শাস্ত্রের বক্তব্য শুনুনঃ—হরিবংশে "কর্ষকান্ পুঙ্গবৈর্ব্বাহৈ র্মেধ্যেন হবিষা সুরান্। শ্রিয়ং শকৃৎ প্রবৃত্তেন তর্পয়িষ্যামহে বয়ম্॥" হলাদিবাহক পুঙ্গব দ্বারা—কৃষককুলকে, পবিত্র হব্য (ঘৃতাদি) দ্বারা দেবতাগণকে—

এবং গোময়দ্বারা লক্ষ্মীকে আমরা (গোজাতির মা সুরভি প্রভৃতি) সন্তুষ্ট করিয়া থাকি। কৃষিজীবী কেবল হলযোজনে বলীবর্দ্দের সাহায্য প্রাপ্ত হয় না, যানাদিযোজনেও শস্যাদির চালনা করে। যাগের মুখ্য সাধন—ঘৃত, নবনীত, দুগ্ধ, আমিক্ষা (ছানা) এবং দধি; এসমস্তই গোজাত। তাহা দ্বারা যজ্ঞে দেবতাকুল পরিতৃপ্ত হয়েন। এইত অদৃষ্টফল। কিন্তু অদৃষ্টের নামে জড়বাদী যাতনায় জ্বলিয়া উঠেন, তাঁহাকে চাটুনি দিয়া ঠাণ্ডা করা চাই। যাহা দিব তাহা কষ্টকল্পনা নহে, ঘৃতাদি হব্য যজ্ঞবহ্নিতে বিক্ষিপ্ত ও ধূমে পরিণত হইয়া পর্য্যন্যদেবের পুষ্টি সাধন করে; সেই পর্য্যন্য (বর্ষণশীল মেঘ) হইতে বৃষ্টি; তাহাই সৃষ্টিরক্ষার মূল ('বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ) এখন যজ্ঞ নাই; বৃষ্টির জন্য প্রজা ও রাজা উভয়ই ব্যাকুল। তবে বাষ্পযানযজ্ঞে কয়লার আহুতির উদ্গারে যে মেঘের উৎপত্তি—তাহার বৃষ্টি কেরোসিন বা তজ্জাতীয় বিষম বস্তু ব্যতীত আর কি? তাহার ফল—ম্যালেরিয়া, প্লেগ্ প্রভৃতি উৎকট বা নবজাত ব্যাধি। তাহা প্রত্যক্ষ উপাদানের গুণে উৎপন্ন থাকেই (কারণগুণাঃ কার্য্যগুণমারভন্তে)। গোময়ে লক্ষ্মীর বাস। সদ্যোগোময়ের গন্ধ ও লেপন যেমন পুতি-গন্ধহর, তদ্রূপ ম্যালেরিয়াদি সংক্রামকরোগনাশক। যাবতীয় মলদুষ্ট স্থান গোময়-লেপনে রূপান্তর ও স্থলান্তরের আধান হয়। সুতরাং, গোময়ে আরোগ্য ও শোভা-সম্পত্তি বিদ্যমান। গোমূত্র রক্ত পরিষ্কারক ও কীটাণুনাশক, প্লীহার ত অকৃত্রিম ঔষধ। এজন্যশাস্ত্রে গর্ভাধানসংস্কারে পঞ্চগব্য (গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত) পানের বিধান। পঞ্চ গব্যে যেমন অন্তঃশুদ্ধি, তদ্রূপ বহিঃশুদ্ধি জন্মে। মহিষমূত্র ও পুরীষে এসকল গুণ নাই। গাভীরা সুরভি নামক স্বর্গীয় গাভীর সন্তান, এজন্য তাহাদিগকে সৌরভেয়ী বলে। সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ' ইহা শাস্ত্রীয় শাসন। সুরভির অর্থ—ঘ্রাণতৃপ্তিদায়ক মৃদুগন্ধ। দিব্য গবী তদ্রূপ গন্ধময়ী,—তাঁহার সন্তানগণ তাদৃশ। সাধারণ গন্ধদ্রব্য উৎকটগন্ধসম্পন্ন; পদ্মপুষ্প তদ্রূপ নহে; কিন্তু তাহার মৃদুগন্ধ মনোহারী। গোগাত্রের গন্ধ সেইরূপ সুখ ও আরোগ্যকর। যে গৃহে গোগাত্রের অনুপম গন্ধ প্রত্যহ প্রবিষ্ট হয়, তাহার বায়ুদোষ সংশোধন হইয়া থাকে। গোশরীর শবাকারে পরিণত হইলেও, না পচিলে সেই গন্ধ থাকে, তাহা সেব্য—বর্জ্জনীয় নহে। 'গবামস্থি ন লঙ্ঘ্যেত মৃতে গন্ধং ন বর্জ্জয়েৎ। যাবদ্ ঘ্রাতি তং গন্ধং তাবদ্ গন্ধেন যুজ্যতে।' বহুস্থলে শাস্ত্র তাহাই কীর্ত্তন করিয়াছেন—

'গাবঃ সুরভয়ো নিত্যং গাবো গুগ্‌গুলুগন্ধিকাঃ।

গোশরীর সর্ব্বদা সুগন্ধি ও গুগ্‌গুলুর ন্যায় গন্ধযুক্ত। সাক্ষাৎ ও পরম্পরাভাবে গোধন সর্ব্বপ্রাণীর স্থিতিরক্ষক ও হিতকারক।

'গাবঃ প্রতিষ্ঠা ভূতানাং গাবঃ স্বস্ত্যয়নং মহৎ।'

গোজাত দুগ্ধ, দধি, নবনীত, তক্র, আমিক্ষা, (ছানা) ও বাজিন (ছানার জল) প্রভৃতির প্রত্যেকটী বহুগুণ সম্পন্ন। তাহা শিক্ষিত মাত্রের অল্পাধিকাকারে বিদিত; বিশেষবর্ণনা এই প্রবন্ধের ক্ষুদ্রকলেবরে স্থানপায়না। 'গব্যং ঘৃতং ঘৃত শ্রেষ্ঠম্' ইহা আয়ুর্ব্বেদের উক্তি।

বল, স্মৃতি, বুদ্ধি ও আয়ুঃ প্রভৃতি সমস্ত মঙ্গল ঘৃতপায়ী পাইতে পারেন। স্থূলকথায় প্রাক্তন শাসন 'আয়ু র্ঘৃতম্" অর্থাৎ গব্যঘৃতই আয়ুঃ বা আয়ুর্ব্বৃদ্ধির অসাধারণ উপকরণ। পুরাতন বস্তু প্রায়ই পরিত্যক্ত হয়; কিন্তু ঘৃত পুরাতন হইলে বহু-রোগনাশক।

হিন্দুরা পশুতত্ত্ব সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া গোজাতির নিরতিশয়োপযোগিত্ব বুঝিয়াছিলেন এবং সর্ব্বপ্রকারে সেবার বিধান করিয়াছেন। গোবংশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য বৃষোৎসর্গ, নীলষণ্ড বিমোক্ষণ ও চন্দন-ধেনু-দানাদির বিধান হইয়াছে। 'গবি গুরুতল্পসমঃ এই গৌতমবচনে গাভীকে পিতৃ-পত্নী স্থানে বসাইয়াছেন। ভারতভূমি ঋতুষট্‌কের ভোগ্য। হিমানীক্ষেত্র প্রতীচ্যাদি দেশের ন্যায় মাংসাশন প্রকৃতিদেবীর অনুমোদিত নহে; বিশেষতঃ হিন্দুর জীবন জিবাংসার জন্য নহে; যমনিয়মাদিই তাহার লক্ষ্য ও শিক্ষণীয়। যাহাতে শরীর রক্ষা সংযমাদির শিক্ষা হয়;—এইরূপ আহার্য্য অনায়াসলভ্য গব্য দুগ্ধ ঘৃতাদি ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাহাই দেখিয়া বিজ্ঞ আচার্য্যগণ গোসেবার বিধান, গোগৌরব-কীর্ত্তন এবং গোপীড়নে অশেষ পাতক ও প্রায়শ্চিত্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ত্রিকালজ্ঞ তত্ত্ববিদ্‌গণ কলিতে কুল কুমারীর পরিণয়কৃচ্ছ্র আশঙ্কা করিয়া যেমন বিধবোদ্বাহ বারণ করিয়াছেন, তদ্রূপ নরাপচারে গোবংশ ধ্বংস বুঝিয়া স্বর্গাদি সাধন হইলেও গবালম্ভন নিষেধ করিয়াছেন। গণ্ডের উপর বিস্ফোটক হইলে আর চলিবেনা, এই মহাত্মা মুনিদিগের ভয়। নরাপচারই গোকুলনির্ম্মূলতার মূল। গোজাতির প্রতি দেবতাবোধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভক্তি থাকিলে, আপামরসাধারণে তাহাই গ্রহণ করিত; হিন্দু গোপগণ কখনও গোঘাতকের নিকটে গোবিক্রয় করিতনা ও মফঃস্বলে হিন্দুরা—কসাইএর ব্যবসায়বৃদ্ধির প্রকারান্তরে উৎসাহ দিত না। মফস্বলবাসীর সাহায্যে গরুর আমদানি সহরে হয়। মফস্বলের গোহাটায় কসাইএর দালাল দেখা যায়। তাহারা এই সর্ব্বনাশের হেতু। ধর্ম্মবুদ্ধি ভঙ্গ হওয়ায় এই মহাপাপের উৎপত্তি। ইংরাজীশিক্ষিত কতিপয় হিন্দু-সন্তান enlightenedএর খাতায় নাম লেখাইয়া প্রকাশ্য প্রাচ্যভোজনাবাসে (হোটেলে) এবং বাটীর বাবুর্চ্চিখানায় বসিয়া রসনা দ্বারা গোসেবা করেন। তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া ইতরলোকের হরিভক্তি উড়িয়া যায়। ফলে, পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমির প্রকৃতির তাহা অসহ্য; এজন্য মহাব্যাধি, মহামারী ও দুর্ভিক্ষাদির আবির্ভাব এবং লোকক্ষয় হইতেছে। গোভক্তিকে অক্ষত রাখিবার জন্য ঋষিগণ কেবল জ্ঞানাজ্ঞানকৃত গোবধের গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন তাহা নহে—গো-পালনের বিন্দুমাত্র ভ্রংশে নানারূপ প্রায়শ্চিত্ত ও ভয় প্রদর্শন করিতে ক্রটী করেন নাই। গোপীড়ায় অযথা বা অনবহিত চিকিৎসায় দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে।

"চিকিৎসকানাং সর্ব্বেষাং মিথ্যাপ্রচরতাং দমঃ"।

(মনু)

"ঔষধং লবণঞ্চৈব স্নেহং পিণ্যাকমেব চ।
অতিরিক্তং ন দাতব্যং কালে স্বল্পঞ্চ দাপয়েৎ॥
অতিরিক্তে বিপন্নানাং কৃচ্ছ্রপাদো বিধীয়তে॥"

ঔষধ, লবণ, স্নিগ্ধবস্তু ও খইল গরুকে অধিক দিবে না, প্রয়োজন সময়ে অল্পই অর্পণ করিবে, ইহার অন্যথাচরণে বিপত্তি ঘটিলে প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। পরিবারস্থ পুত্রাদির ন্যায় গরুর পালন সাবধানে সতত কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রীয় গোপালন-প্রকরণ পাঠ করিলে মানব-জীবন অপেক্ষা গো-জীবন মহামূল্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

"গোপালকো গবাং গোষ্ঠে যস্তু ধূমং ন কারয়েৎ।
মক্ষিকালীননরকে মক্ষিকাভিঃ স ভক্ষ্যতে॥"

গোশালায় ধূমদান দ্বারা মশকাদি ও ('শীতানিলচ্ছতাচৈব') এবং শীত বাতাদি নিবারণ না করিলে মহাপাপ। বলীবর্দ্দবয় বা স্ত্রীগবী দ্বারা হলাদি চালন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।

হিন্দুর শাস্ত্র উন্মত্ত প্রলপিত নহে। সমস্ত পশু পরিত্যাগ করিয়া গোজাতির প্রতি কেন অসাধারণ ভক্তি ও সেবার বিধান করিয়াছেন, তাহার কারণ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সামান্যাকারে নির্দ্দিষ্ট হইলেও যখন শত শত হিত আমরা স্বর্গীয় সুরভি-সন্তানগণ হইতে দিন দিন লাভ করিতেছি, তখন কোন শাসনবাণী না থাকিলেও স্বার্থই গোসেবাব্রতধারণের প্রবর্ত্তক, তাহাতে কাহারও দ্বিরুক্তি নাই। বোধ হয় বর্ত্তমানে ভারতের কোন শিক্ষিত মুসলমান গোজাতির প্রতি উপেক্ষাবান নহে। যেদিন 'ঘাসমুষ্টিং পরগবে' এবং 'গবাহ্নিকং দেবপূজা' ইত্যাদি মহাবাক্য জাগিয়া উঠিবে, সেদিন "ন দুর্ভিক্ষং ন চ ব্যাধি নাকালমরণং নৃণাম্" হইবে।

শ্রীরামচরণ বিদ্যাবিনোদ।

কলঙ্ক-ভঞ্জন।

কলসী ডুবাতে হবে সলিল-মাঝে!—
মৃদুল অনিল লভি' উচ্ছল অবিরল
নীলিম ললিত কল যমুনা-মাঝে!

মনে পড়ে কতবার শ্যামসনে আসিয়া
সে আমার —আমি তার, চোখে চাহি হাসিয়া,
নীলনীরে বিম্বিত উভয়েরে দেখিয়া
বলিতাম -'তুমি ভালো'

সে বলিত—তুমি ভালো'—
কত যে বচসা হত সোনালি-সাঁঝে !
মিছে বাদ মিটিত না—থাক্ আর কহিব না—
কলসী ডুবাতে হবে সলিলমাঝে !
যত গোপ-বালাগণ গুমরিয়া কাঁদিছে,
বিস্মিত আঁখি তুলি আমা-পানে চাহিছে—
ননদিনী মোরে কুলপাংশুলা কহিছে ;—
শতছিদ্ গাগরীতে
হবে নাকি জল নিতে ;—
সমান পারা-না-পারা এ হেন কাজে !
বলেছ,—এসেছি তাই,—'কেন' ?　তাতে কাজ নাই—
কলসী ডুবাতে হবে সলিলমাঝে !
ওগো ও জীবিত-সুখনিধি প্রিয়বঁধু হে !
সঞ্চিত চিরগত পূতপ্রেম মধু হে !
রাধা ত কলঙ্কিনী তোমা লাগি শুধু হে !
আমার যা কিছু আছে
কালা-প্রাণ লভিয়াছে—
তবে কেন মরি মিছে ক্ষুব্ধ লাজে ?
হে হৃদি-অবস্থিত মঙ্গল মনোরথ—
কলসী ডুবাতে হবে সলিলমাঝে !
কলসী ডুবাতে জলে যত ঢেউ জাগিছে,
আমার শরীরে আসি সবে ঘন লাগিছে—
কৃষ্ণ-পরশ স্মরি মন শুধু মাগিছে—
সে রাঙ্গা চরণ ধরি
রমণে পূজন করি
দাঁড়ান গোপিনী-সখা মোহন সাজে !
ওই যে তমালশাখী ঘিরিয়া উড়িছে পাখী—
কলসী ডুবাতে হবে সলিল-মাঝে !
একি এ ললিতা, দেখ কালা জলে ভাসেরে
রাধার পরাণ-সখা দেখ রাধা পাশেরে
কলসী পরশি সখি মৃদু মৃদু হাসেরে !

ভাষাময় অনিবার
প্রেমালস আঁখি তার
স্থির এ নয়ন'পরে ধীর বিরাজে !
নাহি রে চিন্তাকরা কলসী হয়েছে ভরা—
কি রাগিণী মনোহরা মর্ম্মে বাজে !
কালো জলে কালারূপ কলসীমাঝে !

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

আহ্নিক-তত্ত্বে—গুরুশিষ্য-সংবাদ।

শিষ্য। গুরুদেব! সদ্‌গুরু সংসর্গজাত যে এক অভূতপূর্ব্ব অমৃতোপম আনন্দরস, বিষ-মিশ্রিত সংসারদৈন্যক্লিষ্ট মনুষ্যকে অল্পকাল মধ্যে সেই পরমার্থপদ চন্তার উপযুক্ত অধিকারী করিয়া তুলিতে পারে, এ বিশ্বাস আমার বিশিষ্টরূপে জন্মিয়াছে। আমি আপনার শ্রীচরণপ্রান্তে আশ্রয়লাভের পর হইতে যে কি এক অনির্ব্বচনীয় শান্তি উপলব্ধি করিতেছি, তাহা বাক্যদ্বারা বা লেখনীসাহায্যে প্রকাশ করা নিতান্ত সুদূরপরাহত। যাহা হউক আজ যে জ্ঞানলাভের আশায় শ্রীচরণান্তিকে উপস্থিত হইয়াছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক এবিষয়ে আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করিয়া আমার অজ্ঞানান্ধকার দূর করুন।

আপনার কৃপায় বুঝিলাম যে সর্ব্বসুখকর পরমানন্দদায়ক আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, বেদবিহিত কার্য্যানুষ্ঠানই তাহার প্রথম সোপান। বেদবিরুদ্ধ কার্য্যদ্বারা কখনই আত্মজ্ঞান লাভ হয়না। অতএব সেই বেদাধিকারী হইতে হইলে প্রথমতঃ আমার কি কি কার্য্য করা উচিত।

গুরু। বৎস! তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি অতীব প্রীত হইয়াছি। তুমি পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বভাবতঃই বেদাধিকার লাভ করিয়াছ; কিন্তু বর্ত্তমান দেশের অবস্থা, বিশেষতঃ অধিকাংশেরই অবৈধ কার্য্যের অনুষ্ঠান দর্শন করিয়া আমি নিতান্ত ভীত ও বিষণ্ণ হইয়াছি। এবংবিধ অবস্থায় তোমার এইরূপ প্রশ্নে আমি উৎসাহিত হইয়া যথাসাধ্য কিছু উপদেশ প্রদান করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। দেখ, বৎস! পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শী মনস্বিগণ লোকহিতার্থে যাহা যাহা বিধান করিয়া গিয়াছেন, তৎসমস্তই আমাদের স্বাস্থ্য ও আত্মোন্নতির কারণ বলিয়া জানিবে, যাহা হউক, আমি তোমাকে সেই বেদের প্রধান সোপান আহ্নিকতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ

প্রদান করিতেছি। এই কার্য্যানুষ্ঠানদ্বারা ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে প্রকৃতমনুসরামঃ।

প্রাতঃকৃত্যঃ—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ অরুণোদয়ে গাত্রোত্থান করতঃ শয্যাতে উপবিষ্ট হইয়া দেবগণকে এবং ঋষিসকলকে স্মরণ করিবে। যথা "ব্রহ্মামুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী, ভানুঃশশী ভূমিসুতো বুধশ্চ। গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি রাহু কেতু কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতং॥"

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যে দুই মুহূর্ত্ত (দণ্ডদ্বয়), তাহার প্রথম মুহূর্ত্তের নাম ব্রাহ্ম এবং দ্বিতীয় মুহূর্ত্তের নাম রৌদ্র॥

দেবতাদিস্মরণান্তর "প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং। প্রসন্নং বদনং শান্তং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকং"॥ "নমোঽস্তু গুরবে তস্মা ইষ্টদেবস্বরূপিণে। যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসারসংজ্ঞকং॥" এই শ্লোকটী পাঠ করিয়া তদনন্তর "অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্।" লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥ জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথানিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥ এইগুলি পাঠ করিবে। পরে—

শিষ্য (বাধা দিয়া) দেব! অপরাধ লইবেন না। আমি উল্লিখিত মন্ত্রগুলির অর্থ যথাসম্ভব আপনার অনুগ্রহে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, কিন্তু মন্ত্রগুলির বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি জানিতে পারিলে বিশেষ সন্তুষ্ট হই।

গুরু। বৎস! উতলা হইও না। তোমার মনের ভাব আমি সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি। এইগুলি তোমাকে যথাসম্ভব বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিদ্বারা ক্রমান্বয়ে বুঝাইতেছি।—

দেখ, আমরা রাত্রিতে আহারান্তে যখন নিদ্রিত হই, তখন আমাদের শরীরস্থ ইন্দ্রিয়গণ সকলেই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করে। জীবাত্মাও সেই সময় বিশ্রাম লাভ করেন। তৎপর রজনীশেষে নিদ্রাবসানে ইন্দ্রিয়গণ জাগরিত হইয়া জগৎ পুনর্দর্শন করে। তৎকালে সত্ত্বগুণবর্দ্ধক ঐসকল মন্ত্র উচ্চারণদ্বারা হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হয় এবং বিমলানন্দ উপভোগ করে। সেই পুনর্জ্জীবিতবৎ ইন্দ্রিয়সমূহকে সত্ত্বগুণে বর্দ্ধিত করিলে তদ্দিনের সমস্ত কার্য্যই সুখকর হয়।

শিষ্য। এখন বুঝিলাম যে ঐ সমস্ত মন্ত্রোচ্চারণ মাত্র পারত্রিক সুখের কারণ নহে, ঐহিক সুখেরও সম্পূর্ণ মূলীভূত কারণ। এখন আপনার বক্তব্য বিষয়ের আলোচনা করুন।

গুরু। তৎপরে "প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পৃথিবীকে প্রণাম করিয়া প্রথমে "স্বস্তি" বলিয়া দক্ষিণ পদ ভূমিতে প্রদান করিবে। কর্কোটক নামক নাগ, দময়ন্তী, নলরাজা ও ঋতুপর্ণ রাজর্ষির নাম কীর্ত্তন করিলে কলহ বিনষ্ট হয়। প্রাতঃকালে উঠিয়া

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নামক রাজার নাম স্মরণ করিলে বিত্ত নষ্ট হয় না, বরং নষ্টবিত্ত লাভ হয়। প্রত্যূষে উঠিয়া শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণ, ভাগ্যবতী স্ত্রী, অগ্নি, গাভী ও সাগ্নিক ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হইলে সমস্ত আপদ নষ্ট হয়; পাপিষ্ঠ, দুর্ভাগ্যবতী স্ত্রী, মদ্য, উলঙ্গ ও ছিন্ননাসিক দৃষ্টি গোচর হইলে কলহ উপস্থিত হয়।

শিষ্য। গুরুদেব! এই বাক্যগুলির যথার্থ কারণ অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে বলুন।

গুরু। দেখ বৎস! কোন কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে যদি নিজের মন অশান্তিতে পরিপূর্ণ থাকে, তাহা হইলে সেই কার্য্য কখনই সুখপ্রদ হয় না। কর্ম্মপ্রারম্ভে জীবের মানসিক বৃত্তি যে ভাবে সন্নিবেশিত থাকে, কর্ম্মসমুদায় সেই ভাবেই নিষ্পন্ন হয়, ইহা সাধারণ নিয়ম। রজনীতে সুগভীর নিদ্রাবসানের পর প্রাতঃকালীন বালসূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন আমরা পুনরায় সংসাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই. সেই সময় যদি আমাদের হৃদয় শুদ্ধ, শান্ত ও নির্ম্মল থাকে, তাহা হইলে তদ্দিনের যাবতীয় কার্য্যও আমাদের সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভবপর। যে দয়াময় ভগবানের কৃপায় আমরা নির্ব্বিঘ্নে পুনর্ব্বার জগৎ দর্শন করিলাম, প্রথমেই তাঁহার উদ্দেশে অসংখ্য প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া পরে, "হে ভগবন! তোমারই আদেশানুসারে এবং তোমারই প্রীত্যর্থে আমি সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিব" এই সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া যিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহার কার্য্য কদাচ ধর্ম্মবিগর্হিত বা কুফলপ্রদ হইতে পারে না। পরন্তু, এই সংস্কার ক্রমশঃ হৃদয়ে দৃঢ়ীভূত হইলে উত্তরোত্তর সাত্ত্বিকভাব পরিবর্দ্ধিত হয় এবং তদ্দ্বারা অন্তকালে জীব পরমানন্দপদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরং।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥"

ভগবান আরও বলিয়াছেন—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ" ॥ ইতি

(গীতা ৮ম অঃ)

এই শ্লোকে "সদা তদ্ভাবভাবিতঃ" এই পদটী দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যে ব্যক্তি জীবনের অধিকাংশ সময় যে ভাব হৃদয়ে পোষণ করে, অন্তকালে তাহার সেই ভাবই প্রবল থাকিয়া যায়। বহু চেষ্টা করিলেও তাহার ব্যতিক্রম করা যায় না।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার অমৃতোপম বাক্যশ্রবণে ক্রমশঃ আমার হৃদয় আনন্দ-সাগরে পরিপ্লুত হইতেছে। এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি যে সূক্ষ্ম-দর্শী মনস্বি-প্রণীত শাস্ত্রসমূহ অতি সূক্ষ্ম কারণের উপর সংস্থাপিত। আমরা স্থূল দৃষ্টিতে তাহার কিছুই বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, ক্রমশঃ আপনি বলিতে আরম্ভ করুন।

গুরু। বৎস! সন্ধ্যা সমাগতা, ভগবান অংশুমালিসূর্য্যদেব রক্তিমবর্ণে রঞ্জিত হইয়া অস্তাচলে গমন করিতেছেন। অতএব সায়ংসন্ধ্যার সময় উপস্থিত। সন্ধ্যার মুখ্যকাল পরিত্যাগ করা কখনই বিধেয় নহে। সায়ং-কার্য্য সমাপনান্তে ইহার পরের কার্য্য সম্বন্ধে তোমাকে যথোচিত উপদেশ দিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅরুণকান্ত স্মৃতিতীর্থ।

রাজভক্তি।

(১২ই ডিসেম্বর দরবার দিন—উপলক্ষে রাণীগঞ্জ উচ্চ ইংরাজি-
বিদ্যালয়ের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।)

কোন অতীতের অনন্ত সমুদ্রের মধ্য হইতে ক্ষুদ্র বুদ্বুদের মত কোথায় মিলিয়া মিশিয়া কোথাও বা স্ফুট বিকশিত স্বর্ণকিরণমণ্ডিত হইয়া ভাসিয়া আসিয়া এখনও আমরা 'মহতী দেবতার' অর্চ্চনার কথাটা ভুলি নাই। আমাদের 'মহতী দেবতা' রাজা। "মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি" বলিয়া কোন অতীতের এক পুণ্যোজ্জ্বল মুহূর্ত্তে এক ঋষিকণ্ঠোচ্চারিত এই শব্দ-ঝঙ্কার হিন্দুর প্রাণের মধ্য দিয়া যে ভাবলহরীর খেলা খেলিয়াছিল, তাহা এখনও কালের কষ্টিপাথরে স্বর্ণরেখায় অঙ্কিত আছে, মুছিয়া যায় নাই; যায় নাই বলিয়া আমরা এখনও জগতের কাছে আমাদের শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারটা বজায় রাখিতে পারিয়াছি।

কথাটা হইতেছে ত রাজভক্তি! রাজভক্তি কথাটায় অনেকেই কহিয়া থাকে, অর্থও সোজা। রাজার প্রতি ভক্তি করা উচিত কি অনুচিত তাহা কাহাকেও শিখাইতে হয় না, মানুষের স্বাভাবিক কোমল হৃদয়তন্ত্রীর প্রত্যেক স্বরলহরীর সঙ্গে এই কথাটা বেশ স্পষ্টাক্ষরেই ঝঙ্কার দিয়া উঠে যে ভক্তির পাত্রকে ভক্তি করিতেই হয়। রাজা দেবতা, বালক হইলেও দেবতা "বালোঽপি নাবমন্তব্যঃ" বলিয়া আমাদের শাস্ত্রেও সেকথা স্পষ্টাক্ষরে বলা আছে; কাজেই তিনি ত ভক্তির পাত্র। দোষগুণ তাহার থাকুক বা না থাকুক, তিনি সমালোচনার অতীত শুদ্ধসত্ব দেবতা, কাজেই ভক্তি করিতেই হয়। এইভাবে রাজভক্তির কথাটা বলিলেও মন্দ বলা হয় না; কিন্তু কথাটা হিন্দুর দিক্ দিয়া আরও গভীর—সেই কথাটা খুলিয়া বলিতেছি।

রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র বলিয়া দুইটী কথা উঠিয়াছে, এবং এই কথামত রাষ্ট্রও অনেক স্থলে গঠিত আছে। প্রজাতন্ত্র কথাটা বলিলে এখন যে ভাবটা মনে প্রভাব বিস্তার করে,—

প্রাচীনকালে অবশ্য সেইভাবে আমাদের হিন্দুর জীবনে কোন দিন স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠে নাই। কারণ হিন্দুর চক্ষে 'রাজশক্তি' একটা মস্ত বড় বিষয় ছিল। এখনকার মত রাজশক্তি তখন সাধারণ-জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিল না, রাজশক্তি ধর্ম্মের আবরণে ধর্ম্মের উজ্জ্বল প্রতিভায় দেদীপ্যমান ছিল। কাজেই এই ধর্ম্মরক্ষার জন্য একজন নেতার—ধর্ম্মদণ্ডধারীর প্রয়োজন ছিল—সেই দণ্ডধারীরই প্রতি প্রজাদিগের সমস্ত শক্তির অনুপ্রেরণাটা এমনভাবে নিহিত ছিল যে,—রাজা যেন প্রজাদের ধর্ম্মশক্তির সমবায়ে গঠিত একটী অনাবিল ধর্ম্মমূর্ত্তি বা ধর্ম্মরাজরূপে প্রতিভাত হইতেন। প্রজারা নিজেদের সমস্ত হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি লইয়া সেই দেবতার পদে আপনাদের সর্ব্বস্ব বলি দিত। সেই ভক্তির অর্ঘ্যে স্নাত হইয়া রাজা দেবতা হইতেন, তাই রাজা হিন্দুর চক্ষে "নরদেবতা"।

মনুসংহিতায় রাজার স্বরূপ এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

ইন্দ্রানিলযমার্কানামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রানির্হৃত্য শাশ্বতীঃ॥
অষ্টাভিশ্চ সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নির্ম্মিতো নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষঃ সর্ব্বভূতানি তেজসা।
সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ॥
বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥
স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।
চতুর্ণামাশ্রমানাঞ্চ ধর্ম্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, ও কুবের এই অষ্ট দিক্‌পালের সারভূত অংশ গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইন্দ্রাদিদেবগণের শ্রেষ্ঠ অংশ হইতে রাজা নির্ম্মিত হইয়াছেন বলিয়া তেজের আতিশয্যদ্বারা তিনি সকল প্রাণীকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। রাজা প্রভাবে—অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ এবং মহেন্দ্রের তুল্য। রাজা বালক হইলেও সামান্য মনুষ্য বোধে তাঁহাকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে, পরন্তু তিনি মহান্ দেবতা, মনুষ্যরূপে অবস্থান করিতেছেন। প্রকৃত পক্ষে দণ্ডই রাজা, দণ্ডই পুরুষ, দণ্ডই রাজ্যের নেতা ও শাসনকর্ত্তা। ঋষিরা দণ্ডকেই চারি আশ্রমের ধর্ম্মের প্রতিভূ-স্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন। রাজার স্বরূপ হিন্দুর চক্ষে কেমন মনোহর প্রভায় উজ্জ্বলীকৃত—তাহা একবার আপনারা দেখুন।

হিন্দুর চক্ষে রাজা কেমন এখন সেই কথাটা বলা দরকার। আমরা যে জাতীয়জীবন লইয়া, যে Nationalism-এর মধ্য দিয়া ক্রমে পুষ্ট বর্দ্ধিত হইয়া পৃথিবীর এই খৃষ্টজীবনের বিংশশতাব্দীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি,—তাহার স্বরূপটা এখন ম্লান হইয়া গিয়াছে। আমাদের Nation টা

ঠিক কতক গুলা কামানবন্দুকের অভিনব সৃষ্টির মধ্য দিয়া পরকে কেবল ভয় দেখায় নাই, এবং নিজের জীবনী শক্তিটা কোন দিন ইয়ুরোপের মত বড় একটা জায়গায় খাড় হইয়া এইরূপ মহাসংগ্রামের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিবার জন্যও আকাঙ্ক্ষিত হয় নাই। আমাদের জাতীয় জীবনের পরিণামটা ঠিক এভাবের. হিংসা, দ্বেষ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে একমাত্র মুখ্য পথ বলিয়া বরণ করিয়া লয় নাই। আমাদের পরিণামটা ছিল অন্যরূপ। তাই কুরুক্ষেত্রের মত বড় যুদ্ধের মধ্যেও গীতার উদ্ভব হইয়াছিল।

দৈনন্দিন জীবনের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখ—হিন্দুর ছেলের কাছে—পিতা দেবতা, মাতা সাক্ষাৎ দেবী, গুরু সাক্ষাৎ দেব, তাই তিনি 'গুরুদেব'। অধ্যাপক—আচার্য্য পিতৃবৎ; বয়োজ্যেষ্ঠ :পিতৃবৎ; আবার অন্যদিকে ব্রাহ্মণ হ'লেন ভূদেব; স্ত্রীর কাছে স্বামী দেবতা, কন্যার কাছে শ্বশুর শাশুড়ী দেবতা, প্রজার কাছে রাজা দেবতা। নরদেব, পিতৃদেব, মাতৃদেবী ভূদেব, গুরুদেব প্রভৃতি কথাগুলি আমাদের দেশে মানুষকে দেবতা করিয়া তুলিয়াছিল। হিন্দু যেন দেবতার মধ্যে আপনার শয্যা পাতিয়া অনন্তের কোলে আপনার জীবনের বিশ্রান্তিকে একদম ঢালিয়া দিয়া রাখিয়াছে।

আবার জড়পদার্থের দিকে চাহিয়া দেখ—অশ্বত্থবৃক্ষ দেবতা, "অশ্বত্থঃসর্ব্ববৃক্ষানাং" (গীতা) পাথর দেবতা, "অশ্মাপি যাতি দেবত্বং" পাথরও দেবত্বপ্রাপ্ত, খড়কুটা দিয়া ঠাকুর তৈয়ারী করিয়া হিন্দু দেবতা সৃষ্টি করে। এটা যে দেবতার রাজ্য, তাই ত হিন্দু পূর্ব্বকালে বৃক্ষলতার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন দেখিতে পাইয়াছিল। বৃক্ষলতাকে উদ্দেশ করিয়া মনু বলিয়াছেন—

"অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ"

এদেরও প্রাণ আছে, এদেরও সুখদুঃখে অনুভূতি আছে। তাই ত ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।" তাই ত হিন্দু পাথরের মধ্যেও প্রাণ খুঁজিয়া পায়। এই সমস্ত কথা ভাবিলে কি মনে হয়? মনে হয় না কি যে হিন্দুর দূরদৃষ্টি এই ক্ষুদ্র সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া বাহিরের বিরাট অনন্ত জগতের দিকে ধাবিত হইয়াছে?

হিন্দু ক্ষুদ্রত্ব চায় না, চায় বৃহৎ হইতেও বৃহত্তর হইতে। ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে তাহার হৃদয়বৃত্তিকে ঢালিয়া দিয়া হিন্দু কোন দিন পরিতৃপ্তি পায় নাই—কোন স্বস্তি পায় নাই—শান্তি পায় নাই। তাই আকুলি ব্যাকুলি করিয়া এই চৈতন্যময়ের রাজ্যে হিন্দু সকলকে সেই চৈতন্যের অংশরূপে মনে করিতে চায়, তাই অন্যান্য দেবতার মধ্যে রাজাও একটী "মহতী দেবতা"। কত ভক্তিস্রোত পুঞ্জীভূত করিয়া, কত একাগ্র মনের আবেগরাশি জড়ীভূত করিয়া হিন্দু রাজাকে দেবতা করিয়াছিল। অন্যে পারে নাই, তাই প্রজাতন্ত্র চায়! তাই হিন্দুশাস্ত্রে "প্রজাতন্ত্রের" স্থান নাই। শূন্য নিরাকার কল্পনা করিয়া হিন্দু আবেগ উৎফুল্ল হৃদয়স্রোত কোথায় ঢালিয়া দিবে? প্রজাতন্ত্রের মত নিরাকার একটী দেবতা রাজার আসন পায় না—তাই হিন্দু প্রজাতন্ত্রের দিকে শূন্য দৃষ্টি স্থাপন করে। ভালবাসা, ভক্তি বা অনুরাগ রূপ চাহে। সৌন্দর্য্যবিহীন শূন্যের দিকে চাহিয়া চাহিয়া

ভালবাসা যায় না। এইজন্য বৌদ্ধদিগের কামনাহীন শূন্যবাদ ভারতবর্ষে স্থান পায় নাই। এইজন্য শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈততত্ত্বও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়া অনেকে উপেক্ষা করেন। কামনার সঙ্গে রূপ, রূপবানের সঙ্গে প্রেম —আধারের সঙ্গে আধেয় চিরকাল জড়িত।

"জনম অবধি হাম রূপ নিহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

এ যে হিন্দুর কথা! রূপ চাই! সৌন্দর্য্য সুধা চাই! দাও, আমি পিপাসী, আমার এই হৃদয়স্রোত নিংড়াইয়া লইয়া খালি করিয়া ঐ রাঙাপদ ধৌত করিয়া দাও। আমি তোমাকে সর্ব্বস্ব দিতে চাই। তাই রাজাকে সর্ব্বস্ব দিয়া হিন্দু পূজা করে। রাজভক্তির মধ্যে এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে বলিয়া রাজা আমার প্রেমের, অনুরাগের সেই আরাধ্য দেবতা—রাজা আমার যে সর্ব্বস্ব।

মুসলমান সম্রাট্ আকবরকে লক্ষ্য করিয়া হিন্দু জলদগম্ভীরস্বরে বলিয়াছে—"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"। কি মহামন্ত্র! শুন শুন পাশ্চাত্যভাবানুপ্রাণিত হিন্দু! হিন্দুর সেই বিরাট প্রাণের কথাটী শুন "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"। মুসলমান সম্রাট্ হিন্দুর কাছে জ দীশ্বর!

হউন না তিনি মুসলমান, হউন না তিনি শাস্ত্র হিসাবে ম্লেচ্ছ, তথাপি তিনি জগদীশ্বর। ওযে হিন্দুর কথা,—হিন্দুর প্রাণে ঘৃণা দ্বেষ থাকিতে পারে না—"শুনি চৈব শ্বপাকে চ" তিনি তখন সমদর্শী, অর্থাৎ কুক্কুর চণ্ডাল তাহার কাছে সমান। ভাষার মারপ্যাঁচ লইয়া যাহারা হিন্দুকে "ছোঁয়াছুঁয়ির" বায়ুগ্রস্ত বলিয়া অনুদার বলিয়া নিন্দা করেন, তাঁহারা ত এ কথাটা কোন দিন তলাইয়া বুঝেন না যে প্রকৃত হিন্দু হইতে হইলে প্রাণটা বড় করা চাই, পরের মনুষ্যত্বের কাছে আপনার হৃদয়বৃত্তি বিসর্জ্জন দেওয়া চাই। বাহিরের খোলসটাকে বাদ দিয়া হিন্দু প্রাণের মনুষ্যত্বের পূজা চিরকাল করিয়াছে; কেবল করে নাই তাহার বাহিরের আবরণটাকে। সেই জন্য শূদ্রত্বের খোলসটা যতই কেন নিন্দার হউক না, তাহার মনুষ্যত্বটা—তাহার প্রাণটা যে পূজার। হিন্দু এই প্রাণের পূজা চিরকাল করিয়াছে। তাই সেই দিনকার চৈতন্যদেবও যবনহরিদাসকে কোল দিয়া ছিলেন। তিনি যে হিন্দু, তিনি যে তাই হিন্দুর দেবতা।

আজ যদি আমরা ভারতেশ্বরকে—আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট্ মহামান্য পঞ্চম জর্জ্জকে "ভারতেশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া পূজা করি, তাহাতে সেই প্রাচীন হিন্দুজীবনের অনুসরণ করা হইবে এবং এ কথাটা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইবে যে হিন্দুর জাতীয় জীবনে রাজার আসন এখনও অনেক উচ্চে।

আজকাল নীতির কথাটা হিন্দুর সমাজে বড়ই স্থান পাইয়াছে। নীতির দোহাই দিয়া রাজভক্তি প্রকাশ অবশ্য মন্দ নহে; 'মিথ্যা বলিও না, সদা সত্য কথা বলিবে,' এইরূপ নীতিবাক্যের সার্থকতা অবশ্যই ধর্ম্মবিবর্জ্জিত দেশে শোভা পায়। কিন্তু আমাদের কাছে নীতি অপেক্ষা ধর্ম্ম

অনেক বড়, নীতির আদেশ মাথা পাতিয়া গ্রহণ না করিলে বড়জোর immorality প্রকাশ পাইবে, কিন্তু ধর্ম্মের শাসন আরও বেশী। ধর্ম্ম moral কে ত বড় করেই, কিন্তু আজকাল যাহাকে moral বলে তাহা অপেক্ষা আরও একটা জিনিস আছে, সেটা হইতেছে আত্মা। ধর্ম্মের শাসনে চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে আত্মা পর্য্যন্ত পরিমার্জ্জিত হয়, ইহকাল ও পরকাল সুরক্ষিত হয়, moral এর সঙ্গে ইহকালের সম্বন্ধটা বড় বেশী, কিন্তু ধর্ম্মের সঙ্গে ইহকাল ও পরকালের সম্বন্ধ বড় বেশী। Moral ইহকাল,—ধর্ম্ম ইহ ও পরকাল। তাই আমাদের ধর্ম্ম সার্ব্বভৌম। ধর্ম্মটাকে গির্জ্জার মধ্যে বা মন্দিরের মধ্যে বদ্ধ করিয়া হিন্দু কোন দিন নীতিটাকে সার্ব্বভৌম করে নাই, এইজন্ত আমাদের লেখাপড়া ধর্ম্ম, খাওয়া দাওয়া ধর্ম্ম, সত্যকথা বলাও ধর্ম্ম, মিথ্যাকথা না বলাও ধর্ম্ম, এসব ছাড়া ক্ষমা, দয়া, দান প্রভৃতি ত বড় ধর্ম্ম আছেই ; কাজেই "রাজভক্তি" জিনিষটাও আমাদের বড় ধর্ম্ম। হিন্দুর সাধারণ গৃহস্থ-জীবনের উদার গভীর মধ্য হইতে নীতি নির্ব্বাসিত হইয়া Politicsএ গিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই চাণক্য-শ্লোক, বাৎসায়ন-সূত্র বা শুক্রনীতি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে স্থান পায় নাই। এইজন্ত আমাদের দেশে কখন ইয়ুরোপের মত Nationalistএর স্থান হয় নাই। রাজবিদ্রোহ জিনিষটা মহাপাপ, হিন্দুর ছেলে কখন আধুনিক জগতের স্তাশানালিষ্টের স্তায় ষড়যন্ত্রকারী হয় না, হইতে পারে না। আজকাল রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী যে সমস্ত হিন্দু-সন্তানদের নাম শুনা যায়, তাহারা বিকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া হিন্দুর মজ্জাগত সংস্কার ভুলিয়াছে—প্রকৃত হিন্দুর শিক্ষা কখন এই বিকৃতভাবের পোষক নহে।

এটা হইতেছে এখন আমাদের বিচারের যুগ। এই যুগে সকল মানবই প্রত্যেক পদার্থই বিচার করিয়া দেখিতে চায়। এই বিচার করিবার ফলে রাজার প্রতি ভক্তি করা উচিত কি অনুচিত—তাহা লইয়া একটা মস্ত বিবাদও করা যায়। রাজা যদি ভাল হন, তবে তিনি ভক্তির পাত্র, তিনি যদি মন্দ হ'ন, তবে ভক্তির পাত্র নহেন—এইরূপ ভালমন্দের উপর নির্ভর করিয়া আজকালকার লোকে প্রেম-ভক্তি করিতে চায়। এইরূপ বিচারের ফলেই মেয়েদিগের বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দিয়া তাহাদের উপর পতি-নির্ব্বাচনের ভার দেওয়ার ব্যবস্থা অনেক সমাজ ভাল বিবেচনা করেন। যদি কন্তার স্বামী পছন্দ হয়, যদি কন্তা বিবেচনা করে যে তাহার বিবাহার্থী ভক্তির যোগ্য, তবেই তিনি তাঁহার স্বামী হইতে পারিবেন। এইরূপ "যদির" উপর নির্ভর করিয়া সংসার হইতে বাপ্ মাকে, গুরু পুরোহিতকে, বড় ভাই ভগিনীদিগকেও বিদায় করা চলে। এইজন্ত হিন্দুর সংসারে এই বিচারমূলে ভক্তি বা ভালবাসার স্থান নাই, নাই বলিয়াই হিন্দুর সামাজিক সংস্থানটাও এই বিচার-বুদ্ধির উপর গঠিত নহে। অহৈতুকী ভক্তিই হিন্দুর আদর্শ। তাই কন্তার স্বামি-নির্ব্বাচনের ভার পিতার উপর, াই পিতামাতা ভাইভগিনী, গুরু পুরোহিত যতই কেন মন্দ হউননা, তথাপি তাঁহারা দেবতা। এদিকে এই ভক্তিই রাজার প্রতি—নরদেবতার প্রতি সঞ্চারিত করিয়া হিন্দু রাজভক্তি প্রকাশ করে। আজ আমরাও সেই ভক্তির আদর্শকে

হৃদয়ে ধারণ করিয়া এই অভিষেক দিনে সেই মহাত্মার উদ্দেশে ভক্তিধারা ঢালিতে আসিয়াছি।

ভক্তির দিক্ দিয়া এই কথাগুলি আমরা আলোচনা করিলাম। কিন্তু রাজার কর্ত্তব্য কি পিতা মাতার কর্ত্তব্য কি? সে সমস্তও শাস্ত্রে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। প্রত্যেকের হৃদয়-বৃত্তিকে বড় করিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রে কোন ব্যবস্থারই ত্রুটি নাই।

শ্রীপঞ্চানন কাব্য-স্মৃতিতীর্থ।

প্রতিবাদ।

বিগত চৈত্র মাসের ব্রাহ্মণ-সমাজ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার পঞ্জিকা-সমিতি-কর্ত্তৃক প্রচারিত প্রশ্নাবলীর উত্তর স্বরূপে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহা পাঠে সহজেই উপলব্ধি হয়, বিশুদ্ধসিদ্ধান্তপঞ্জিকায় অবলম্বিত সংস্কার সমর্থন করাই প্রবন্ধলেখকের লক্ষ্য এবং বোম্বাই পঞ্চাঙ্গ-শোধন-সমিতির আংশিক নির্দ্ধারণই তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। বোম্বাই পঞ্জিকা-শোধন-সভা তাঁহাদের শেষ কার্য্য-বিবরণী এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নাই। উক্ত সভায় যে সকল ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের সম্বন্ধেও সভাস্থলে বিষয়গুলি রীতি মতে ও নিরপেক্ষভাবে সমালোচিত হইবার সুবিধা ঘটিয়াছিল কিনা তদ্বিষয়ে জনসাধারণ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সংস্কারবাদী কতিপয় ব্যক্তি এই সমিতিকে ভারতবর্ষীয় সমস্ত প্রধান প্রধান জ্যোতির্ব্বিদের সম্মিলনী উল্লেখে তাহার সম্যক বিষয়ের বিচার—মীমাংসা হইয়া গিয়াছে বলিলেও, হিন্দু-সমাজ উহা পরীক্ষা করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। এমন কি ইহার ৬ বৎসর পরেই শৃঙ্গেরীমঠাধিপতি শ্রীমদ্ জগদ্গুরু, আদি শঙ্করাচার্য্যের জন্মভূমি কালটীগ্রামে পঞ্জিকা-সংস্কারসম্বন্ধীয় প্রশ্নের বিচারের জন্য একটী সভা আহ্বান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অতএব ঐ সভার অভিমত কতকটা সন্দেহের চক্ষে দেখিলে কি দোষাবহ হইবে? কোন ব্যক্তিবিশেষের মতের সহিত ঐক্য হওয়ায় তিনি উহা মানিতে পারেন; সমস্ত হিন্দু-সমাজ উহাতে স্বীকৃত হইবে কেন?

তর্কভূষণ মহাশয় পঞ্জিকা-সমিতির প্রশ্নসমূহের উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করা যায় না। তিনি তাঁহার উক্তি সমর্থন কালে স্বীয় অনুশীলনোচিত প্রমাণপ্রয়োগ ও যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করিতে সক্ষম হন নাই বলিয়াই অনেকের ধারণা। অনেকেই তাঁহাদের নিকট হইতে এতৎসম্বন্ধে আরও আশা করেন বলিয়াই এস্থলে কয়েকটী

বিষয়ের উল্লেখ করা হইল। অধিকন্তু উত্তরচ্ছলে ঐটী প্রবন্ধাকারে পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়ায় আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে।

প্রথম প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে তিনি বলিয়াছেন দৃগ্‌গণিতমতে পঞ্জিকা গণনা করিলে ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত বিন্দুমাত্র বিরোধ ঘটিতে পারে না, বরং না করিলে ধর্ম্মকার্য্য পণ্ড হওয়ার আশঙ্কা আছে। ইহার প্রমাণ-স্বরূপ তিনি তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রথমটী সূর্য্য-সিদ্ধান্ত হইতে; উহাতে লিখিত আছে, "যে সকল গতিবশে গ্রহগণ যেরূপ নিত্য দৃক্‌তুল্যতা প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ স্ফুটীকরণ আদরের সহিত বলিতেছি।" ইহার পূর্ব্বেই গ্রন্থকার নানাপ্রকারের গতির উল্লেখ করিয়াছেন এবং পরে কি প্রণালী অবলম্বনে স্ফুটসাধন করিতে হয়, তাহার নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে বর্ত্তমান সময়ে দৃক্‌গণিতৈক্যকে সমর্থন করিয়াছেন বুঝায় না, বরং যাহাকে তাঁহারা দৃক্‌তুল্য বলিবেন, উহারই সংজ্ঞা করিয়াছেন মাত্র। ইহা হইতে অনুক্ত অভিনব সংস্কারসমূহ সংযোগ করা অনুমোদিত হইয়াছে বলিতে যাওয়া নিতান্ত কষ্টকল্পনা। তাঁহার দ্বিতীয় প্রমাণ বশিষ্ঠের উক্তি "যে পক্ষে যে কালে দৃগ্‌গণিতৈক্য দৃষ্ট হয়, তিথ্যাদি নির্ণয় ঐ পক্ষে করিবে।" ইহা কতকটা বর্ত্তমান দৃগ্‌গণিতৈক্যের পরিপোষক বটে, কিন্তু ধর্ম্মকর্ম্মে উহা কোন সময়েই ব্যবহৃত হয় নাই। অধিকন্তু বশিষ্ঠ সায়ন-প্রণালীর প্রবর্ত্তনের জন্য "পুণ্যদারাশিসংক্রান্তিঃ কেচিদাহুর্মনীষিণঃ, নৈতন্মমমতং" বলায়, প্রবন্ধ লেখকের ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ প্রাণটী (নিরয়ণ) পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হওয়ায়, আদর করিতে পারেন না। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ অধিকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন এমন কি পরস্পর সম্পূর্ণ বিবদমান ব্যবস্থা করিয়াছেন। বশিষ্ঠ আমাদের জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকিলে, মহাজনগণ উহা অনুসরণ করেন নাই কেন? এই প্রশ্নের মীমাংসার পূর্ব্বে, উহা গৃহীত হইতে পারে না। লেখকের তৃতীয় প্রমাণ সৌর-পুরাণে লিখিত আছে "চন্দ্রসূর্য্য হইতে স্ফুটতর তিথি জানিয়া, ব্রতী একাদশী, তৃতীয়া ও ষষ্ঠীতে উপবাস করিবেন।" ইহাতে দৃগ্‌গণিতৈক্য স্ফুট যে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা অনুমান করিবার কারণ কি? পুরাণকার শাস্ত্রোক্তবিধানে স্ফুটতর করিতে বলেন নাই কে বলিল? এতদ্ব্যতীত স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের উদ্ধৃত যে তিথির সংজ্ঞা অবলম্বনে দৃক্‌সিদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বলা হইয়াছে, তাহাও অনুকূল নহে, বরং বিরুদ্ধ। মধ্য সূর্য্য ও চন্দ্রের পার্থক্য হইতে মধ্যতিথি এবং সূর্য্য ও চন্দ্রের স্ফুটের পার্থক্য অনুযায়ী স্ফুটতিথি হয়। ইহার সহিত দৃগ্‌গণিতৈক্যের সম্বন্ধ কিছু দূরবর্ত্তী। সূর্য্যগ্রহণের পর ব্যতীত চন্দ্র সূর্য্য হইতে প্রতি অমান্তে বিনিঃসৃত হয় না। সূর্য্য হইতে চন্দ্রের প্রকৃত কৌণিক দূরত্বের উপর তিথি গণিত হয় না। রবিবর্ত্মে চন্দ্রের সংস্থানের পার্থক্য হইতেই তিথি গণিত হইয়া থাকে। ফলে, উপরোক্ত প্রমাণসমূহ দ্বারা তর্কভূষণ মহাশয়ের উত্তর সমর্থিত হয় নাই, ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন "বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়" এই মতটী কোন ঋষিগ্রন্থে লিখিত আকারে এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। বাক্য কএকটী না থাকিলেও, এই মতটী

সূর্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি যাবতীয় হিন্দুজ্যোতির্গ্রন্থে লিখিত আকারেই রহিয়াছে, তাহা সামান্য অঙ্কপাতদ্বারাই উপলব্ধি হয়। সকল গ্রন্থেই তিথি ও তিথিমান গণনাপ্রণালী ও মূলাঙ্ক লিখিত ভাবেই আছে; উহা হইতে এই মতটী সহজেই গণিতদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে এই মতটী লিখিত আকারে নাই বলিলে কি সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা হয়?

তৃতীয় প্রশ্নের প্রত্যুত্তর কালে "সপ্তবৃদ্ধি দশক্ষয়" অপেক্ষা অধিক হ্রাস বৃদ্ধি হইবে বলিতে গিয়া তর্কভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন, গ্রহলাঘব, সিদ্ধান্তরহস্য ও ভাস্বতী প্রণয়নকালে ঐসকল গ্রন্থের গণনা দৃষ্টির সহিত ঐক্য হইত, এরূপ প্রমাণ ঐ সকল গ্রন্থেই পাওয়া যায় এবং গ্রন্থসমূহের বহুল প্রচার ও জনশ্রুতিদ্বারাও কতকটা অবগত হওয়া যায়। তিনি গ্রন্থসমূহে কি প্রমাণ পাইয়াছেন উল্লেখ না করায় মিলাইবার সুবিধা হয় নাই এবং জনশ্রুতি কিরূপ তাহাও বুঝাইয়া দেন নাই। গ্রন্থের বহুল প্রচার দ্বারা উহার গণনা মিলিত, ইহা বলিলে প্রকৃত যুক্তির অনুসরণ করা হয় না। অপর দিকে পাশ্চাত্য গণনাভিজ্ঞ অনুসন্ধিৎসু ইহা কখনই স্বীকার করিবেন না, যেহেতু তাঁহারা জানেন যে, এই সকল গণনা প্রণালীতে যখন মান্দ্য সংস্কার ব্যতীত অন্য সংস্কার করা হইত না, তখন কখনই দৃক্‌গণিতৈক্য হইতে পারিত না। সপ্তবৃদ্ধিদশক্ষয়ের পরিবর্ত্তন সমর্থন করিতে গিয়া সূর্য্যসিদ্ধান্তের যুগপরিবর্ত্তনের সহিত কালভেদের কথায় উল্লেখ করিয়াছেন। টীকাকার রঙ্গনাথ যাহাই বলুন, মূলশ্লোকে এইরূপ পরিবর্ত্তনের কথা নাই। বশিষ্ঠের উক্তি সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উহা ভিন্নাধিকারীর জন্য হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য চান্দ্র সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ না হইলেও, যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে দশবৃদ্ধি সপ্তক্ষয়ের পার্থক্য কতদিনে কিপ্রকারে হইতে পারে, তাহা দেখাইতে পারিতেন।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইয়াছে যে যদি বীজ ব্যবহার করিয়া আর্ষসিদ্ধান্ত সংস্কার করা যায়, তাহা হইলে পাশ্চাত্য প্রণালী ব্যতীত আর্ষউপায়ে দৃক্‌সিদ্ধ গণনা হইতে পারে। তিনি বলেন যে, দৃক্‌প্রত্যয়ার্থে যে সকল বেধোপলব্ধ সংস্কারে যে যে স্থলে আবশ্যক হইবে, উহা বীজরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। বীজ নাম দিয়া পাশ্চাত্য প্রণালী অবলম্বন করতঃ উহাকে আর্ষ উপায় বলিলে, কি জগতের নিকট ঘৃণিত হইতে হইবে না? কৃতজ্ঞতা ও সরলতা পরিত্যাগ করিয়া কখন আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায় না। অতএব আর্ষ উপায়ে দৃক্‌সিদ্ধ গণনা করা সম্ভবপর নহে, কারণ পাশ্চাত্য প্রণালীর নাম কিম্বা আকার কতকটা পরিবর্ত্তন করা হইলেও উহাই থাকিয়া যাইবে—"পাশ্চাত্য প্রণালীর ব্যতিরেক" হইবেনা।

পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে তর্কভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন অসংস্কৃত সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে গণিত বর্ষারম্ভকালে, পাশ্চাত্য সায়ন রবিবিন্দুটিকে অয়নাংশ ধরিয়া নিরয়ণ আদি বিন্দু স্থির করাই উচিত, অর্থাৎ বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় যে রীতি অবলম্বিত হইয়াছে উহাই সঙ্গত। তিনি বলেন যে, যুগাদির পরিমাণ মূল ভিত্তি নিরয়ণ গণনার উপর স্থাপিত বলিয়া সকল দিকে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য, যে উপায়েই হউক, রাশিচক্রের প্রারম্ভ বিন্দুটী স্থির রাখা চাই, অথচ সংস্কারও করা

চাই। ইহাতে যে, রাশিচক্রের প্রারম্ভ বিন্দু স্থির থাকিবে না, তাহা উল্লেখ করাই বাহুল্য; যেহেতু তিনিই বলিয়াছেন, পাশ্চাত্য নিরয়ণ সৌরবর্ষমাণ সূর্য্যসিদ্ধান্তের বর্ষমান- অপেক্ষা সাড়ে আটপল কম হইয়া থাকে। হিন্দুজ্যোতিষের অপর যাবতীয় অঙ্কও গণনাপ্রণালী পরিবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়া বর্ষমানটী প্রকৃত দৃক্‌বিরুদ্ধ জানিয়াও, উহাকে প্রাণতুল্য বিবেচনায় রক্ষা করিতে যাওয়া কি আশ্চর্য্য নহে? ইহার একমাত্র কারণ এই যে ইহাতে প্রচলিত তারিখের সহিত মিল হইবে না এবং উহা না হইলে লোকে আদৌ স্বীকার করিবেনা। বিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্রের নিকট এই সামান্য লোকাপেক্ষা কি নিতান্ত অযৌক্তিক নহে? সূর্য্যগতির সাড়ে আট বিকলা অয়নাংশের ভিতরে গিয়া সায়নসংক্রান্তি অবৈধরূপে পিছাইয়া পড়িলে প্রথম ফল এই হইবে যে, নিরয়ণ মেষ বলিতে যে নক্ষত্রপুঞ্জকে বুঝাইতেছে, কিছুকাল পরে আর ইহা বুঝাইবে না। হিন্দুসমাজ এইরূপ একটী বিসদৃশ প্রস্তাব দৃক্‌গণিতৈক্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন কেন?

প্রথম অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন যে, দেশে মানমন্দির স্থাপন করিয়া সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি গ্রন্থে বীজসংস্কার দিয়া গণনা করিলে, গ্রহণাদির সময় নিরূপিত না হওয়ায় কোন কারণ নাই। উহাতে না হইলে পাশ্চাত্য মূলাঙ্ক গ্রহণ করিয়া করণগ্রন্থ প্রস্তুত করতঃ তদ্বারা গ্রহণাদি গণনা করা যাইবে। যখন পাশ্চাত্য পঞ্জিকাদি হইতেই গ্রহণাদি গণনা বিশুদ্ধরূপে হইতে পারে, তখন এত অধিক আয়াসের প্রয়োজন কি? এরূপ শক্তির অপচয় দ্বারা প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন ফলোদয় হইবেনা। ইহা কি অপব্যয় নহে?

দ্বিতীয় অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তর তর্কভূষণ মহাশয় পূর্ব্বের উত্তরে বরাত দিয়া বলিয়াছেন যে দৃক্‌সিদ্ধ না হইলে তিথি প্রভৃতি হইতে পারেনা বলিয়া ধর্ম্মকর্ম্মের উপযুক্তকাল নি পণ সমস্তই দৃক্‌গণিতৈক্যের বিষয়ীভূত। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে এই উত্তরের উপযুক্ত ভিত্তি নাই। পরিশেষে তিনি বলিয়াছেন যে প্রথমে মানমন্দির করিয়া আর্ষগ্রন্থ সংস্কার করা হউক, তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে পাশ্চাত্য মূলাঙ্ক দ্বারা করণগ্রন্থ প্রস্তুত করা যাউক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই অযথা শক্তিক্ষয়ের আবশ্যকতা নাই। দেশে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের উন্নতি করিতে হইলে ফলিত জ্যোতিষ কি ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত উহা সংযোগ করার প্রয়োজনীয়তা কি? বিজ্ঞানের আদর বিজ্ঞানের জন্য থাকিলেই কি ভাল হয় না? যখন আমাদের প্রজাবৎসল বৃটীশ রাজশক্তি এই বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে সচেষ্ট, তখন অপরের মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।

তৃতীয় অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন যে সময়ে একমাত্র মন্দফল সংস্কার দ্বারা চন্দ্রের স্ফুট হইত, ঐ সময়ের জন্য "বাণবৃদ্ধি রসক্ষয়" নিয়ম হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে অতিরিক্ত অনেক নূতন সংস্কার যোগ করিতে হইতেছে বলিয়া সপ্তবৃদ্ধি দশক্ষয় হইতেছে। ইহা প্রকৃত উত্তর হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, যেহেতু কোন সময়েই একমাত্র মান্দফল সংস্কারদ্বারা চন্দ্র পাশ্চাত্যমতের দৃগ্‌গণিতৈক্যরূপে স্পষ্টীকৃত হইতে পারে নাই।

প্রাগুক্ত আলোচনা হইতে দৃষ্ট হইবে যে তর্কভূষণ মহাশয়ের উত্তরগুলি গ্রহণ করার গুরুতর অন্তরায় রহিয়াছে। তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা আধুনিক দৃগ্‌গণিতৈক্য গণনা প্রণালীমতে হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মকর্ম্ম অনুশাসিত হইতে পারে দেখাইতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি রাশিচক্রের আদিবিন্দু নির্ণয় সম্বন্ধে যে পথ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছেন, উহা দৃক্‌গণিতৈক্য পাশ্চাত্য গণনাপ্রণালী কখনই সমর্থন করিবে না, অপর দিকে প্রকৃতপক্ষে ভ্রমপূর্ণ বিবেচনা করিয়া বর্জ্জন করিবে। জ্যোতিষশাস্ত্রের উন্নতির জন্য হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম নিয়োগ করার প্রস্তাব কখনই অনুমোদিত হইবেনা।

শ্রীসাতকড়ি সিদ্ধান্ত জ্যোতির্ভূষণ।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা পরিগৃহীত ১৮৩৮ শকাব্দীয় উপাধি ও পূর্ব্ব পরীক্ষায়

অধ্যাপক বৃত্তি।

উপাধি পরীক্ষায়।

শ্রীশ্রীনাথ তর্কালঙ্কার	তোটানালা	১২৲
শ্রীরঘুবীর ত্রিবেদী	বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়	৮৲

পূর্ব্বপরীক্ষায়।

শ্রীযোগী ঝাঁ	বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়	১২৲
শ্রীরঘুবীর ত্রিবেদী	ঐ	১০৲
শ্রীশ্রীনাথ স্মৃতিরত্ন	কিশোরপুর	১০৲
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ	৪০।১এ মহেন্দ্রগোস্বামী লেন, সিমলা	৮৲
শ্রীচন্দ্রিকা দত্ত মিশ্র কাব্যতীর্থ	সাঙ্গবেদ বিদ্যালয়	৮৲
শ্রীহরিপদ সামাধ্যায়ী	রুক্মিণীটোল, মেদিনীপুর	৮৲
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র কাব্যতীর্থ	সাউরীটোল, মেদিনীপুর	৮৲
শ্রীনবীনচন্দ্র তর্করত্ন	মূলগ্রাম, ফরিদপুর	৮৲
শ্রীফণিভূষণ স্মৃতিতীর্থ জ্যোতির্ব্বিনোদ	ধান্দাচতুষ্পাঠী, মেদিনীপুর	৮৲

পরীক্ষক		বৃত্তি।
শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ	ভাটপাড়া	৪৲
শ্রীপঞ্চানন স্মৃতিতীর্থ	ঐ	২
শ্রীপঞ্চানন তর্কতীর্থ	ঐ	২
শ্রীযামিনীনাথ তর্কবাগীশ	সংস্কৃতকলেজ	২৲
শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ	ভাটপাড়া	২৲
শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি	ব্রাহ্মণ সভা	৩৲
শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন	সিমলা	২৲
শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ	পাবনা, দর্শনটোল	২৲
শ্রীশশিভূষণ শিরোমণি	গঙ্গাটিকুরী	৩৲
মহামহোপাধ্যায় শ্রীলক্ষ্মণ শাস্ত্রী	সংস্কৃত কলেজ	৩৲
শ্রীরাজকুমার বেদতীর্থ	কৈকালা, হুগলী	৩৲
শ্রীদুর্গাসুন্দর স্মৃতিরত্ন	ব্রাহ্মণ সভা	৫৲
শ্রীকালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী	আঠারবাড়ী, মৈমনসিংহ	৪৲
শ্রীজগদ্দুর্লভ স্মৃতিতীর্থ	ভাটপাড়া	৩৲
শ্রীসতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ	রাজসাহী	২৲
শ্রীরাধাবল্লভ জ্যোতিষতীর্থ	সংস্কৃত কলেজ	২৲
শ্রীমনুজমোহন স্মৃতিতীর্থ	গঙ্গাটিকুরী	৩৲
শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন	ভাটপাড়া	৪৲
শ্রীআশুতোষ শিরোরত্ন	সিমলা, কাঁসারীপাড়া	২৲
শ্রীরামরক্ষ তর্কতীর্থ	মাণিক্যরাম চতুষ্পাঠী মেদিনীপুর	৩৲
শ্রীচন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার	কোটালীপাড়া	২৲
শ্রীচন্দ্রিকাদত্তমিশ্র কাব্যতীর্থ	সাঙ্গবেদবিদ্যালয়	৩৲

নবদ্বীপ সমাজ-সম্মিলিত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা পরীগৃহিত ১৮৩৮ শকাব্দীয় উপাধি ও পূর্ব্বপরীক্ষার ফল, বৃত্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নাম ও বৃত্তির পরিমাণ।

ছাত্র	বৃত্তি	অধ্যাপক	চতুষ্পাঠী	বিষয়	বিভাগ
শ্রীজানকীনাথ বিদ্যালঙ্কার	১০৲	শ্রীরজনীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য	চট্টগ্রাম সংস্কৃত কলেজ	কাব্য উপাধি	২য়
শ্রীহেরম্বনাথ ব্যাকরণতীর্থ	১৫৲	শ্রীশ্রীনাথ তর্কালঙ্কার	ভোটানালা	সংক্ষিপ্তসার উপাধি	১ম
শ্রীহৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য	•	ঐ	ঐ	ঐ	২য়
শ্রীকৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্য	•	ঐ	ঐ	ঐ	২য়
শ্রীউগ্রনাথ মিশ্র	১২৲	শ্রীরঘুবীর ত্রিবেদী	বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়	সারস্বত উপাধি	২য়
শ্রীরামরূপ মিশ্র	•	ঐ	ঐ	ঐ	২য়
শ্রীবালচন্দ্র যতি	•	শ্রীযোগী ঝাঁ	ঐ	ঐ	২য়
শ্রীউমাপ্রসন্ন চৌধুরী	৬৲	শ্রীনবীনচন্দ্র তর্করত্ন	মূলগ্রাম ন্যায়চতুষ্পাঠী	নব্যন্যায় পূর্ব্ব	২য়
শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য	৫৲	শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ জ্যোতির্ব্বিনোদ	ধান্দাচতুষ্পাঠী	ঐ	২য়
শ্রীশ্রীপতিচরণ দাস	•	ঐ	ঐ	পুরাণ পূর্ব্ব	১ম
শ্রীভূতনাথ ভট্টাচার্য্য		ঐ	ঐ	ঐ	২য়
শ্রীগিরিশচন্দ্র উখাশনী	•	শ্রীগোপালচন্দ্র বেদকাব্যতীর্থ	অশ্বত্থতলাচতুষ্পাঠী	ঐ	২য়
শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	৫৲	শ্রীহরিপদ সামাধ্যায়ী	রুক্মিণীটোল	কর্ম্মকাণ্ড পূর্ব্ব	২য়
শ্রীহরেকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য		ঐ	ঐ	ঐ	২য়
শ্রীনারায়ণচন্দ্রমিশ্র		ঐ	ঐ	কাব্য পূর্ব্ব	২য়

ছাত্র	বৃত্তি	অধ্যাপক	চতুষ্পাঠী	বিষয়	বিভাগ
শ্রীকিশোরীমোহন দাস	•	শ্রীরজনীকান্ত কাব্যতীর্থ	চট্টগ্রাম সংস্কৃত কলেজ	কাব্যপূর্ব্ব	১ম
শ্রীসতীশচন্দ্র পালিত	•	শ্রীরজনীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য	ঐ	ঐ	২য়
শ্রীজয়নারায়ণ পাণ্ডে	•	শ্রীরঘুবীর ত্রিবেদী	বিশুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়	ঐ	২য়
শ্রীশীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬৲	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ	সিমলাচতুষ্পাঠী	সংক্ষিপ্তসার পূর্ব্ব	১ম
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲	ঐ	ঐ	ঐ	১ম
শ্রী তারাপদ ঘোষাল	•	ঐ	ঐ	ঐ	১ম
শ্রীনগেন্দ্রনাথ পালধি	•	ঐ	ঐ	ঐ	২য়
শ্রী অবনীপতি সেনগুপ্ত	৭৲	শ্রীশ্রীনাথ তর্কালঙ্কার	তোটানালা	ঐ	১ম
শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	•	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ কাব্যস্মৃতিতীর্থ	কিশোরপুর	ঐ	২য়
শ্রীঅনাদিনাথ ভট্টাচার্য্য	•	শ্রীভগবতীচরণ কাব্যভূষণ	ধান্দাচতুষ্পাঠী	ঐ	২য়
শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায়	•	শ্রীঈশ্বরচন্দ্র কাব্যতীর্থ	সাউরীটোল	ঐ	২য়
শ্রীজাহ্নবীচরণ চক্রবর্ত্তী	•	ঐ	ঐ	ঐ	২য়
শ্রীশরৎচন্দ্র পাহাড়ী	•	ঐ	ঐ	সারস্বতপূর্ব্ব	২য়
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ অধিকারী	•	শ্রীগোপালচন্দ্র কাব্যতীর্থ	অশ্বত্থতলা	ঐ	২য়
শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য	•	শ্রীভূতনাথ ব্যাকরণতীর্থ	কাশুরিয়াবাড়ী	ঐ	২য়
শ্রীরঘুবংশ মিশ্র	•	শ্রীরঘুবীর ত্রিবেদী	বিশুদ্ধানন্দবিদ্যালয়	পাণিনি পূর্ব্ব	
শ্রীজগদীশপ্রসাদ পাণ্ডে	৫৲	ঐ	ঐ	ঐ	১ম
শ্রী শ্যামসুন্দর ঠাকুর	•	শ্রীযোগী ঝাঁ	ঐ	ঐ	২য়

ছাত্র	বৃত্তি	অধ্যাপক	চতুষ্পাঠী	বিষয়	শ্রেণী
শ্রীসীতারাম ঝাঁ	•	শ্রীযোগী ঝাঁ	শুদ্ধানন্দ বিদ্যালয়	পাণিনিপূর্ব্ব	২য়
শ্রীনরসিংহ শর্ম্মা	•	ঐ	ঐ	ঐ	২য়
শ্রীহনুমানদত্ত শর্ম্মা	•	ঐ	ঐ	ঐ	২য়
শ্রীকপিলদেব মিশ্র	•	শ্রীচন্দ্রিকাদত্ত মিশ্র কাব্যতীর্থ	সাঙ্গবেদবিদ্যালয়	ঐ	২য়
শ্রীরামদেব পাণ্ডে	•	ঐ	ঐ	সারস্বত পূর্ব্ব	২য়
শ্রীসিদ্ধি ওঝা	•	ঐ	ঐ	ঐ	২য়
শ্রীশ্রীনিবাস ভট্ট	•	•	•	ঐ	২য়
শ্রীভক্তরাম শর্ম্মা	•	শ্রীদেবীচরণ ত্রিবেদী	৬ মল্লিকষ্ট্রীট্	ঐ	২য়
শ্রীশিবদেব শর্ম্মা	•	ঐ	ঐ	ঐ	২য়
শ্রীচতুর্ভুজ আচার্য্য	•	শ্রীযোগী ঝাঁ	বিশুদ্ধানন্দবিদ্যালয়	ঐ	২য়
শ্রীপ্রেমচন্দ্র শর্ম্মা		ঐ	ঐ	ঐ	২য়
শ্রীওঙ্কারদত্ত শর্ম্মা	•	শ্রীরঘুবীর ত্রিবেদী	ঐ	ঐ	২য়
শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় ভট্টাচার্য্য	•	শ্রীরামচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ	রামচন্দ্রচতুষ্পাঠী, চট্টগ্রাম	কলাপ পূর্ব্ব	১ম
শ্রীকৃষ্ণদাস ঠাকুর	৫৲	শ্রীনবীনচন্দ্র তর্করত্ন	মল্লগ্রাম	ঐ	১ম
শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য	•	শ্রীভবনাথ ব্যাকরণতীর্থ	মহিষার	ঐ	২য়
শ্রীজানকীনাথ পত্তি	•	শ্রীভগবতীচরণ কাব্যভূষণ	ধান্দাচতুষ্পাঠী	মুগ্ধবোধ পূর্ব্ব	২য়
শ্রীগদাধর ভট্টাচার্য্য	•	শ্রীহরিপদ সামাধ্যায়ী	রঙ্কিণীটোল	ঐ	২য়
শ্রীরজনীকান্ত দাস,	•	শ্রীনীলকণ্ঠ বাচস্পতি	বাণীচতুষ্পাঠী, কাখুরিয়াবাড়ী	ঐ	২য়
শ্রীদক্ষিণাচরণ ভট্টাচার্য্য	৫৲	শ্রীশ্রীনাথ স্মৃতিরত্ন	কিশোরপুর	জ্যোতিষ পূর্ব্ব	২য়
শ্রীভূষণচন্দ্র মিশ্র	৭৲	ঐ	ঐ	ঐ	২য়
শ্রীকেদারনাথ ভট্টাচার্য্য	৮৲	ঐ	ঐ	ঐ	২য়
শ্রীজীবনকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	•	শ্রীহরিপদ সামাধ্যায়ী	রঙ্কিণীটোল	ঐ	২য়

দ্বৈতোক্তিরত্নমালার প্রশ্নোত্তর।

দ্বৈতোক্তি রত্নমালা—দার্শনিক চিন্তার নূতন সমাবেশ গ্রন্থ। নৈয়ায়িক মতে উপনিষদ ব্যাখ্যা ও শ্রুতিসমন্বয় এবং শারীরক ভাষ্যে দোষ প্রদর্শনের নূতন প্রণালী এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। যে উপক্রম উপসংহার প্রভৃতি লইয়া বেদান্তাচার্য্যগণ আত্মপক্ষ প্রবল রাখিয়াছিলেন, দ্বৈতোক্তি রত্নমালার সেই উপক্রম উপসংহার প্রভৃতিই দ্বৈতপক্ষের সমর্থন করে নিয়োজিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীবৃক্তপঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় এই গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থ সংস্কৃত, এখনও অনুবাদ হয় নাই। এই কারণে সাধারণে এই গ্রন্থের মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ। আমি তর্করত্ন মহাশয়ের ছাত্র এই জন্য আমার নিকটে দ্বৈতোক্তি রত্নমালা ঘটিত যে কয়েকটী প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে আমি সেই সকল প্রশ্ন উদ্ধৃত করিয়া তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি –

প্রশ্ন। দ্বৈত্যোক্তির-ত্নমালা—বর্দ্ধমানাধিপতির নামে উৎসৃষ্ট হইয়াছে, ইহার উদ্দেশ্য অর্থ সাহায্য লাভ নহে কি ?

উত্তর। না, তর্করত্ন মহাশয় যে অর্থ সাহায্যপ্রার্থী নহেন, তাহা বর্দ্ধমানাধিপতি বিশেষরূপ জানেন বলিয়াই, তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার নামে এই পুস্তক উৎসর্গ করিয়াছেন। কেন যে উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহাও বোধ হয় বর্দ্ধমানাধিপতির অবিদিত নহে।

প্রশ্ন। তবে কি জন্য তাঁহার নামে উৎসর্গ ?

উত্তর। তিনি ভূপেন বাবুর বিবাহ বিলের প্রতিবাদ ও খণ্ডন করিয়া হিন্দু সমাজের যে উপকার করিয়াছেন, তাহার জন্য হিন্দুমাত্রেরই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তর্করত্ন মহাশয় সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তাঁহার নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছেন। সেই বিলের খণ্ডন দ্বারা তিনি জয় অর্জ্জন করিয়াছেন; এই জন্য ইহা তাঁহার 'জয়মাল্য' সাহিত্য পরিষদের সংবর্দ্ধনা দিনে ইহা তাঁহাকে অর্পিত হইয়াছিল। 'জয়মাল্য' বলিয়াই শ্লোকে 'জয়রত্নমালা' বলা আছে।

প্রঃ। এতদিনের পর সেই জয়মাল্য ?

উঃ। একটা কার্য্য ঘুণাক্ষরের ন্যায়ও হইতে পারে, যাঁহাকে 'জয়রত্ন মাল্য' অর্পণ করা হইবে, তাঁহার যোগ্যতা বিচার সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, তর্করত্ন মহাশয় বর্দ্ধমানাধিপতির সহিত দুইবার কথোপকথন করিবার পর তাঁহার আন্তরিক ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহাকে এই উপহার দিয়াছেন, সেই জন্যই বিলম্ব হইয়াছে। তাহার পর এই দ্বৈতবাদ সমর্থক গ্রন্থ উপহারের অন্য কারণও আছে। বর্দ্ধমানাধিপতি দর্শনশাস্ত্রে অনুরাগী, তিনি কোন সভাতে নিজের অদ্বৈতবাদ পক্ষপাতের কথা প্রকাশ করিয়া ন্যায়মতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন—তাঁহাকে এই দ্বৈতবাদ সমর্থকগ্রন্থ আলোচনা করাইয়া ন্যায়মতের অনুকূল করা তর্করত্ন মহাশয়ের উদ্দেশ্য। দেশ হইতে ন্যায় শাস্ত্রের চর্চ্চা মন্দীভূত হইতেছে, সমাজের ধনিগণ এসময়ে অধিকতর উৎসাহ প্রদান না করিলে বাঙ্গালার পাণ্ডিত্য গৌরবের প্রধান অঙ্গ ন্যায়শাস্ত্র অচিরেই লুপ্ত

হইবে, এই আশঙ্কা দূরদর্শিগণ করিয়া থাকেন। আর একটী উদ্দেশ্যও তর্করত্ন মহাশয়ের আছে, বর্দ্ধমানাধিপতি রাজাধিরাজের সহিত অনেক পণ্ডিতই সাক্ষাৎকার করেন, অনেকে তাঁহাকে গ্রন্থ উপহারও দিয়াছেন, কিন্তু ইহাঁদিগের মধ্যে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা বা তাঁহার প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ না করিয়াছেন এমন লোক অল্প। এ সময়ে যে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মধ্যে অর্থলালসাশূন্য কেবল গুণগ্রাহী পুরুষ আছেন, তাহা বর্দ্ধমানাধিপতির বিদিত হওয়া আবশ্যক। কেন না এখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজকে হেয় করিবার জন্য অনেকেই সচেষ্ট। এ সময়ে দেশ-প্রধানের সহিত প্রকৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অন্তঃ-পরিচয় একান্ত আবশ্যক। সেই পরিচয় প্রদানে সমাজের কল্যাণ হইতে পারে। এই সকল চিন্তা করিয়া তর্করত্ন মহাশয় বর্দ্ধমানাধিপতির নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছেন।

প্রঃ। এই উৎসর্গপত্রে ইংরাজি অক্ষর কেন?

উঃ। ভাষার অনুরূপ বর্ণমালা হইয়া থাকে। উপাধির ভাষা ইংরাজি তাই বর্ণমালার সঙ্কেত স্বরূপ অক্ষরও ইংরাজি।

প্রঃ। 'অদ্বৈতপক্ষহৃদয়ায়' 'অদ্বৈতপক্ষহৃৎ'—এ কিরূপ, যে অদ্বৈতপক্ষ হরণ করে—সেই বস্তু অদ্বৈত পক্ষপাতীকে প্রদান এ কিরূপ?

উঃ। শ্লোকটী শুন—

অদ্বৈত-পক্ষ-হৃদয়ায় গুণৈক ধাম্নে
শ্রীবর্দ্ধমানপতয়ে বিজয়াভিধায়।
অদ্বৈত-পক্ষ-হৃদিয়ং পরিবর্দ্ধমান—
শ্রীরর্প্যতে গুণবতী জয়রত্নমালা।

এই শ্লোকের অনুবাদ—

'এই জয়-রত্নমালা—অদ্বৈতপক্ষহৃৎ, পরিবর্দ্ধমানশ্রী এবং গুণবতী, ইহা অদ্বৈতপক্ষহৃদয় গুণৈকনিকেতন 'বিজয়' নামা শ্রীবর্দ্ধমানপতিকে অর্পণ করা যাইতেছে।

ব্যাখ্যা—"অদ্বৈতপক্ষহৃৎ" শ্লিষ্টপদ,—এক অর্থে অদ্বৈতপক্ষে যাহার হৃদয়, অন্য অর্থে অদ্বৈত পক্ষ যে হরণ করে। মালাপক্ষে অদ্বিতীয়ভাবে ও অবিকল্পে মনোহরণ করিবার শক্তি যাহার আছে; তাহা "অদ্বৈতপক্ষহৃৎ" ভেদে অভেদ—অতিশয়োক্তি অলঙ্কার, শ্লেষ-মূলক অতিশয়োক্তি অলঙ্কার দ্বারা 'অদ্বৈতপক্ষহৃৎ'—এই অংশ হইতে 'অদ্বৈতপক্ষ হৃদয়ায়' ইহার অনুরূপভাব প্রকাশ করা হইল। 'গুণৈক নিকেতন' বা 'গুণৈকধাম্নে' এই অংশের অনুরূপভাব প্রকাশের জন্য 'গুণবতী' আছে। গুণ—ধীরতা প্রভৃতি, অপ্রধান অংশ বা অঙ্গ এবং সূত্র। গ্রন্থপক্ষে অপ্রধান অংশ বা অঙ্গ, মালাপক্ষে সূত্র। ধীরতা প্রভৃতি গুণের সহিত শ্লেষমূলক অতিশয়োক্তি অলঙ্কার দ্বারা শেষোক্ত গুণের অভেদ সমর্থিত হইল, অতএব যে, 'গুণবতী' তাহা 'গুণৈকনিকেতনের' অনুরূপ। 'শ্রীবর্দ্ধমানপতির' অনুরূপ 'পরিবর্দ্ধমানশ্রী'। এখানে বর্দ্ধমান শব্দের শ্লেষমূলক অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। বর্দ্ধমান নগর ও বৃদ্ধিমান্—বর্দ্ধমান

শব্দের অর্থ। শ্রীদ্বারা বুদ্ধিমান্ বস্তু এবং 'পরিবর্দ্ধমানশ্রী' তুল্য। যিনি শ্রীবর্দ্ধমানের পতি তাঁহার পক্ষে 'পরিবর্দ্ধমানশ্রী' অনুরূপ। শ্রীশব্দে লক্ষ্মী, গ্রন্থপক্ষে সরস্বতী, মালাপক্ষে শোভা। বর্দ্ধমান-পতির পূর্ব্বে শ্রীশব্দ প্রয়োগে—তাঁহাকে শ্রীযুক্ত বলা হইয়াছে। মহারাজের নাম বিজয়—জয় তাঁহার অনুরূপ। গ্রন্থপক্ষে জয়শব্দে বাদিজয়ের সাধন, অথবা শ্রুতিপ্রধান বলিয়া মহাভারতাদি জয়গ্রন্থের সদৃশ। মাল্যপক্ষে জয়সূচক। পতির অনুরূপ পত্নী হইলে যোগামিলন হয়। এই মালিকা যোগ্য বলিয়া অর্পিত হইতেছে। যিনি কবি, সংস্কৃত ভাষায় যাঁহার অধিকার আছে, এই কবিতার রস গ্রহণে তিনিই সমর্থ।

প্রঃ। জয়শব্দ কি ব্যর্থ নহে ?

উঃ। এতখানি বলিবার পর এই প্রশ্ন! জয় শব্দের অর্থ ত বলিয়াছিই, তাহার পর জয় আর বিজয় যে পরস্পর অনুরূপ তাহা কি জাননা ?

প্রঃ। তর্কাতিদুর্গমগিরিপ্রকটপ্রভাবঃ
পঞ্চাননো বিবিধতন্ত্রবনাঃ চারী।
অদ্বৈতদ্বিগ্‌দ্বিপবলাবগমায় তেষাং
মৌলৌ করোতি কতিচিৎ করজাঙ্কপাতান্।

এই শ্লোকের অর্থ কি ?

উঃ। তর্কস্বরূপ অতি দুর্গম পর্ব্বতে যাঁহাব প্রভাব প্রকট—বিবিধ শাস্ত্ররূপ বনভূমিতে যিনি বিচরণ করেন, সেই পঞ্চানন, অদ্বৈতদিক্—অদ্বৈতবাদীস্বরূপ হস্তিগণের বলপরীক্ষার জন্য তাহাদিগের মৌলিদেশে করজ-অঙ্কপাত করিতেছেন। পঞ্চানন শব্দে গ্রন্থকর্ত্তা ও সিংহ, মৌলি-শব্দে মস্তক এবং মূলগ্রন্থের ব্যাখ্যা বা শীর্ষস্থানীয় ভাষ্য। করজ-অঙ্কপাত শব্দে নখরচিহ্ন ও হস্তাঙ্কপাত অর্থাৎ লেখনী প্রয়োগে কলঙ্কস্থাপন। অন্য অর্থ,—তর্কশাস্ত্রের অতি দুর্গম বিচার অংশে (গিরি—গির্ সপ্তমী একবচন) যাঁহার প্রভাব বিখ্যাত, বিবিধ শাস্ত্র সমূহে (বন—সমূহ) যাঁহার জ্ঞান আছে, সেই পঞ্চানন অদ্বৈতবাদীশ্রেষ্ঠ (দ্বিপ শ্রেষ্ঠার্থ) গণের বলপরীক্ষার্থ তাঁহাদিগের শীর্ষস্থানীয় গ্রন্থে কয়েকটা কলঙ্কপাত করিতেছেন, এই কলঙ্কপাত তাঁহার হস্তসম্ভূত। (মনের কথা কি তাহা এখন তিনি বলিতেছেন না)।

প্রঃ। প্রথম অর্থে সিংহ পক্ষে 'তর্ক' লাগে না, 'করজ' লাগে না, সিংহের যে পদজ, 'তেষাং' তৎপক্ষে 'বলাবগম' বুঝাইতে পারে, অন্য কিছু বুঝায় না, বহুবচন প্রয়োগই বা কেন ?

উঃ। বাপু তুমি সংস্কৃত একেবারেই জান না। রূপকস্থলে কি রূপ্য রূপক দুই অংশের অন্বয় হয়। মনে কর—কালিদাস তাড়কাবধ বর্ণনাস্থলে লিখিয়াছেন, 'রামমন্মথশরেণ তাড়িতা' 'তাড়কা রামরূপী কামের শরে আহতা হইয়া, এখানে তাড়কা কামশরে আহতা না হইলেও রামশরে আহতা বলিয়া রূপকের অসঙ্গতি নাই। একটা স্থলমাত্র উদাহরণ দিলাম—প্রায় সকল রূপকেই এই নিয়ম। করজ নখের নাম, পদজ নখের নাম নহে। দ্বিতীয় কথা সিংহের সম্মুখের পদদ্বয় সাধারণতঃ হস্তি-আক্রমণে ব্যবহৃত। এই পদদ্বয় কর নামেই খ্যাত কথা—

ততো বেগাৎ খমুৎপত্য নিপত্য চ মৃগারিণা।
কর-প্রহারেণ শিরশ্চামরস্য পৃথক্ কৃতম্। (চণ্ডী)

সিংহ করপ্রহারে চামরের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিল।

তৎশব্দ সমস্ত বাক্যের অন্তর্নিবিষ্ট পদবিশেষের বোধক হইতে পারে—তাহাতে কোনই বাধা নাই। 'দদৃশতে রাজমাতঙ্গাস্তস্যৈবারী তুরঙ্গমাঃ।' শব্দশক্তি প্রকাশিকা)

'রাজমাতঙ্গাঃ' সমস্ত বাক্য—'রাজার হস্তী' ইহা তাহার অর্থ,—'তস্যৈব' এস্থলে তৎশব্দে ঐ রাজাকে বুঝাইতেছে, মাতঙ্গ অর্থাৎ হস্তীকে নহে। সেইরূপ উক্ত শ্লোকেও 'তেষাং' ইহা দ্বারা অদ্বৈত দিগ্‌বিজয়িগণকে বুঝাইতেছে সেই জন্যই বহু বচন। এখন বুঝিলে কি ?

প্রঃ। বুঝিলাম বটে, তবে কি শঙ্করাচার্য্য ঐ দিগ্‌হস্তী নহেন ?

উঃ। নিশ্চয়ই না। তর্করত্ন মহাশয় যাঁহাকে শিবের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন, যাঁহাকে প্রণাম করিয়া অপরাধ ক্ষমা চাহিয়াছেন (অন্তযোজনা দেখ) তাঁহার প্রতি এইরূপ ভাব প্রকাশ যে একান্ত অসম্ভব উহা কি বুঝিতেছ না ?

প্রঃ। আচ্ছা—ইহা কি গর্ব্বোক্তি নহে ?

উঃ। এক্ষণে দেশের পণ্ডিতেরা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করেন না, তাই তাঁহাদের উত্তেজনার জন্য এইরূপ কথা লিখিত হইয়াছে। এবং পূর্ব্বতন গ্রন্থকারেরা অনেকেই এই রীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহা গর্ব্বোক্তি হইলেও রীতিবিরুদ্ধ নহে।

প্রঃ। বদতাং যথাধিকারং শিষ্যান্ প্রতি শ্রুতিমতাং মম।
মার্গোপদেশভেদা বেদাদেবেতি সিদ্ধান্তঃ।
এই শ্লোকে 'বদতাং' ইহার কর্ম্মপদ কৈ ?

উঃ। যেখানে কর্ম্মপদ সহজেই বোধগম্য সে স্থলে কর্ম্মপদ প্রদানের আবশ্যকতা নাই, ইহাই সংস্কৃত ভাষার সাধারণ নিয়ম। যথা

এষ কশ্যপসুতা মতিগন্তা পশ্য কশ্যপসুতঃ শতমন্যুঃ।' নৈষধ।

এখানে 'পশ্য' ক্রিয়ার কর্ম্মপদ উল্লিখিত নাই। বচ ধাতু দ্বিকর্ম্মক ভগবানুবাচ ইত্যাদিবাক্যে একটী কর্ম্মপদেরও উল্লেখ নাই।

'অন্তোর ঘটঃ পশ্য' ইত্যাদি স্থলে—যে নিয়মে, ঘটঃ প্রথমা বিভক্তি, এবং "অহিরহিরহিঃ পশ্য পশ্য পশ্য পশ্য" ইত্যাদি স্থলে—অহিঃ প্রথমা বিভক্তি সেই নিয়মেই 'মার্গোপদেশভেদাঃ প্রথমা—পরন্তু উহা হইতেই কর্ম্ম বুঝাইবে।

অনেক প্রশ্ন করিতেছ, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় তোমার একেবারেই দখল নাই দেখিতেছি। আর কি প্রশ্ন ?

প্রঃ। নিয়মেত পদ অশুদ্ধ নহে কি ?

উঃ। না। কেবল 'অস্তি' অসধাতু পরস্মৈপদী, কিন্তু নিয় পূর্ব্বে আছে বলিয়া—নিয়মে আত্মনেপদ হইয়াছে। যথা—

উপসর্গাদস্ত্যূহ্যোর্বেতিবাচ্যম্ ।অথর্ষং নিরস্যতি নিরস্যতে ॥　　(সিদ্ধান্তকৌমুদী)

ছিঃ এমন প্রশ্ন করি তন্থ ! ইহাতে যে একেবারেই বিদ্যাপ্রকাশ ।

প্রঃ । শঙ্করাচার্য্য নিজে যাহা বুঝিয়াছিলেন লোককে তাহা না বুঝাইয়া ভুল বুঝাইলেন ইহা কি দোষের নহে ?

উঃ । না । গুরু অধিকার বিবেচনা করিয়া শিষ্যকে উপদেশ দেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র প্রকটিত হয় না । এইজন্য পুরাণে মতভেদের আভাস আসিয়াছে । অধিক কি স্বয়ং প্রজাপতি—ইন্দ্র ও বিরোচনকে প্রথমে অক্ষিপ্রতিবিম্বিতপুরুষকে আত্মা বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন । ছান্দোগ্য উপনিষদে এই বিবরণ আছে । দ্বৈতোক্তিরত্নমালায় ইহার সুমীমাংসাও আছে ।

প্রঃ । বিজ্ঞানবাদীরা কি দ্বৈতবাদী নহে ?

উঃ । না । দ্বৈতবাদিগণ বিজাতীয় দ্বৈত স্বীকার করেন । "বৈচিত্র্যাচ্চ সমস্তন ।" এই কুসুমাঞ্জলি কারিকাতে এইভাব বিশদরূপে বর্ণিত আছে । বিজ্ঞানবাদিগণ বিজাতীয় দ্বৈত স্বীকার করেন না । শঙ্করাচার্য্য বিজ্ঞানবাদ মুগ্ধ মানবগণকে অধিকতর নূতন কথা শুনাইলেন, বিজাতীয় দ্বিতীয় ত নাইই, সজাতীয় দ্বিতীয়ও নাই । এই কথা বলিয়া তাহাদিগের বৌদ্ধ মোহ দূর করিলেন । সুতরাং বিজ্ঞানবাদিগণ শ্রুতি ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ দ্বৈতবাদের প্রতিকূল । বহু বিজ্ঞান মাত্র স্বীকার, দ্বৈতবাদের অনুকূল নহে, তাহা অদ্বৈত মতেরই একটী স্তর ।

প্রঃ । শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ দ্বারা ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা করিলেন কেমন করিয়া ?

উঃ । ইহা এককথায় বলিবার নহে, তবে তিনি যে সাকার উপাসনা, শালগ্রামসেবা দেবতার প্রভাব ইত্যাদি সমর্থন করিয়াছেন, তাহা হইতেই সনাতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় । এসম্বন্ধে বিশদ বিচার একদিন শুনাইব ।

প্রঃ । মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের শেষের শ্লোকের সহিত তর্করত্ন মহাশয়ের যোজনাশ্লোক মিলিয়া গিয়াছে সুতরাং ইহা কি তর্করত্ন মহাশয়ের চৌর্য্য নহে ?

উঃ । পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের শ্লোকটী কি বল দেখি ।

প্রঃ । অদ্বৈতাবগতৌ যথাস্তি বচনং দ্বৈতপ্রতীতৌ তথা ।
　　ভ্রান্তাঃ কিন্তু বয়ং ততো ভব ভবত্তত্ত্বস্য নির্দ্ধারণম্ ।
　　অস্মত্তো নহি সম্ভবেত্ত তথাপ্যেতদ্ বিচারচ্ছলাৎ ।
　　যন্নামোক্তিশতং কৃতং ননু কথং নশ্যেন্ন তস্মাদঘম্ ॥

উঃ । এ শ্লোক অদ্বৈতবাদখণ্ডনপণ্ডিত-ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কৃত বলিয়া মনে হয় না ।

প্রঃ । কেন ?

উঃ । এই শ্লোকের অনুবাদ এই যে 'অদ্বৈত মতের বচন আছে । দ্বৈতমতের ও বচন আছে অতএব আমরা ভ্রান্ত হইয়াছি । হে ভব ! আমাদের দ্বারায় তোমার তত্ত্ব নির্দ্ধারণ অসম্ভব, তবে বিচার ছলে যে তোমার নাম শতবার উচ্চারণ করিয়াছি তাহাতে কি আমার পাপ নাশ হইবে না ।' তিনি যে অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন তাহার প্রমাণ-বচন আছে একথা

তিনি এই শ্লোকে স্বীকার করিয়াছেন, অথচ সেই সকল বচনের দ্বৈতপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যদি ব্যাখ্যা ও অর্থ সত্য হয় তাহা হইলে বচন অদ্বৈতপক্ষে প্রমাণ নহে, যদি সত্য না হয় তবেই প্রমাণ হইতে পারে। এখানে "অদ্বৈতা বগতৌ যথাস্তি বচনং" ইহার দ্বারা স্বীয় ব্যাখ্যা যে মিথ্যা তাহাই বলা হইয়াছে। তাহার পর বিচারচ্ছলে যে ঈশ্বর আত্মা ইত্যাদি নাম গ্রহণ তাহা হইতে পাপ নাশ হয় এ বিষয়ে কি কিছু প্রমাণ আছে? নাম বিশেষের উচ্চারণে পাপ নাশের কথা শাস্ত্রে আছে বটে, সে সকল নাম গ্রন্থমধ্যে শতবার উচ্চারণ হইয়াছে কি? সেরূপ নামোচ্চারণে পাপনাশের প্রসঙ্গও কোন দর্শনে আছে কি? সুতরাং ন্যায়শাস্ত্রে প্রগাঢ় বিশ্বাসী অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় যে এমন শ্লোক করিবেন তাহা মনে হয় না। তর্করত্ন মহাশয়ের যোজনা শ্লোক,—

> ন জানেতত্ত্বং নিরবধি বিভূতের্ভগবতো
> যদদ্বৈতং দ্বৈতং জগতি যদিবাস্যাদবিতথম্।
> তথাপ্যন্তঃ-ক্ষোভক্ষম-বিষয় চিন্তাচয়হবে
> বিচারে চাতুর্য্যং প্রকয়িতুমেষা মম কৃতিঃ॥

ভগবানের বিভূতি অসীম। তাঁহার সত্যস্বরূপ কি তাহা জানিতে পারি নাই। কিন্তু তাঁহার প্রসঙ্গযুক্ত বিচার দ্বারা বিষয় চিন্তা অপহৃত হয়, যে বিষয় চিন্তা হইতে মনের ক্ষোভ উপস্থিত হয় সেই বিষয় চিন্তা দূর হয়—এইজন্য তাঁহার বিচারে নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য আমার এই যত্ন। ইহাতে তর্করত্ন মহাশয় শ্রুতবাক্য ও দর্শন মতের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন, "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" এই শ্রুতি ও "ধ্যায়তো বিষয়ান্‌পুংসঃ" গীতা বাক্যের অনুগমন করিয়াছেন। এই শ্লোকের ভাবের সহিত তথাকথিত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের শ্লোকের কোন মিল নাই। তবে শেষে এইরূপ পরিহার—এইটুকুতে মিল আছে—সে মিল নূতন নহে,—উহা পুরাতন রীতি। অতিপূর্ব্ববর্ত্তী ভগবান উদয়নাচার্য্যও লিখিয়াছেন,—

> ইত্যেষনীতি কুসুমাঞ্জলিরুজ্জ্বল শ্রীর্যদ্বাসয়েদপিচ দক্ষিণবামকৌ দ্বৌ।
> নো বা ততঃ কিমমরেশগুরো গুরুস্তু প্রীতোঽস্বনেনপদপীঠসমর্পণেন।

বলা বাহুল্য মঙ্গলাচরণ ও সমাপ্তি শিষ্টাচার অনুসারে গৃহীত হইলেও শ্লোকের ভাব সম্পূর্ণ পৃথক। ইহাতে চৌর্য্যের আশঙ্কা নিতান্ত অনভিজ্ঞ বিদ্বেষ্টা ব্যতীত আর কেহ করিতে পারেনা। আচার্য্য ও পরবাচার্য্যের প্রশ্ন আছে তাহার উত্তর বারান্তরে বলিব।

শ্রীজগদ্দুর্ল্লভ স্মৃতিতীর্থ।

গত অগ্রহায়ণ মাসের 'ব্রাহ্মণ সমাজে' প্রকাশিত 'বোপদেব' শীর্ষক প্রতিবাদ প্রবন্ধের ভাষা আশানুরূপ সংযত না হওয়ায় আমরা দুঃখিত। ব্রাঃ সঃ সং।

বিজ্ঞাপন।

সদুপদেশপূর্ণ নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যশরণ চক্রবর্ত্তী এম, বি, ৩।২, বৃন্দাবন মল্লিকের লেন, কলিকাতা। এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে পাওয়া যায়।

১। Bireswar's Bhagbatgita—In Fnglish Rhyme Highly Praised by—Renowned Authors and journalists.

"Excellent translation" : "Admirable Edition" : J. S. Meston Esq., I. C. S. "Very well done": Sir Alfred Croft M. A., L L. D., K. C. I. E. etc., etc.

২। লক্ষ্মীরাণী—পঞ্চাঙ্ক নাটক। স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রধান দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী এম,এ, কাব্যানন্দ-প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা।

৩। মধ্যলীলা—শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যলীলা অবলম্বনে লিখিত। ইহাতে অদ্বৈতবাদের খণ্ডন প্রভৃতি বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি বৈষ্ণব ভক্তগণের অতি আদরের জিনিষ।

৪। লোকালোক—নানা বিষয়ের উপাদেয় কবিতাপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ। কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের বিশেষ উপযোগী।

৫। আহ্নিক—সংস্কৃত শ্লোকপূর্ণ বাঙ্গালা অনুবাদসহ গ্রন্থ মূল্য ॥০ আট আনা।

৬। উচ্ছ্বাস—ইহাও একখানি সংস্কৃত সুন্দর গ্রন্থ, মূল্য ৷৶০ বার আনা।

বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ২য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ৩য় পৃষ্ঠা ও পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ পৃষ্ঠা ৪৲ চারি টাকা হিসাবে লওয়া হয়। অন্য পেজ ৩৲ তিন টাকা—বার্ষিক স্বতন্ত্র।

২। তিন মাসের কম সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। তিন মাসের মধ্যে বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তিত হয় না।

৩। বিজ্ঞাপনের মূল্যের অর্দ্ধেক টাকা অগ্রিম জমা না দিলে ছাপা হয় না।

৪। দীর্ঘকালের নিমিত্ত বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইলে কার্য্যালয়ে জানিতে পারা যায়।

মহাকালী পাঠশালা।

বর্ত্তমান বর্ষে মাতাজী প্রতিষ্ঠিত মহাকালী পাঠশালায় মাতাজীর প্রতিষ্ঠিত বিনায়ক ও ভদ্রকালী মাতার পূজোৎসব পাঠশালার তত্ত্বাবধায়ক ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও বিশেষ উদ্যোগে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই বাহাদুর, মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, মহারাজা শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, মহারাজা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, মিবার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার, ডাঃ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী, কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ শ্রীমাণি প্রমুখ বহু গণ্যমান্য হিন্দু-সন্তানের সমাবেশ হইয়াছিল। পাঠশালার সম্পাদক হাইকোর্ট উকিল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল মহাশয় সমাগত নিমন্ত্রিত মহোদয়গণকে সাদর সম্ভাষণাদির দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। বিনায়ক পূজার দিন দিনাজপুরের মহারাজবাহাদুর এবং নদীয়ার মহারাজবাহাদুর কুমারীগণকে মিষ্টান্নাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। ভদ্রকালীপূজায় হোম, বেদপাঠ, কুমারীগণের স্তবপাঠ এবং মধ্যাহ্নে প্রায় ছয়শত কুমারী ভোজন দৃশ্য, অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বেঙ্গল আর্টষ্টুডিয়োর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর মহাশয়ের উদ্যোগে ও চেষ্টায় অরোরা বায়স্কোপ কোম্পানি বহুবিধ সুন্দর নূতন চিত্রাবলী সেদিন কুমারীগণকে দেখাইয়া পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছেন।

REGISTERED No. C—675.

পঞ্চম বর্ষ। { ১৮৩৮ শক, ১৩২৩ সাল, মাঘ। } ৫ম সংখ্যা।

বাণী-বন্দনা।

(গীত , সুর 'রূপসী পল্লীবাসিনী', প্রমথ রায়চৌধুরী)

নমামি বঙ্গ-জননি!
অয়ি! বাণি! বিদ্যাদায়িনি! বীণাপাণি!
ভক্ত পুত্র-তপ-অর্জ্জিত-স্নিগ্ধ আননখানি।
ধবল বসন আবরি অঙ্গে
স্বাগতা জননী ভারতি! বঙ্গে
দেখিয়া তোমায় নাচিয়া রঙ্গে
উঠিবে হৃদয় আপনি।

স্থাপিয়া আসন শুভ্র-সরোজে
আয়াহি শোভনে! হৃদি-পঙ্কজে;
বীণা-পুস্তকে দু'কর রঞ্জে—
উর মা কমল-বরণি!

বামে দেহ বর দীন সন্তানে
ইতরে অভয়া অভয়-প্রদানে ;
রাখিও চরণে হীনঅশরণে
বিজ্ঞান-বীথি-সরণী।
তব সঙ্গীত সঙ্গতে সবে
চরণোপান্তে মিলনোৎসাব
'দেহি' যাচিছে ছন্দে আরবে
চরণ-কমল দু'খানি।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য পুরাণতীর্থ।

নাম-মাহাত্ম্য।

অনাম অরূপ অনন্ত অপার চৈতন্য সান্ত মনোবৃত্তিগম্য নহে বলিয়া সনাম সরূপ ও সান্ত পরমেশ্বরই উপাস্য। এই নামরূপই তাঁহার বিভূতি। নাম ও রূপের মধ্য দিয়াই তাঁহার প্রকাশ। এই নামরূপ তাঁহা হইতে পরমার্থতঃ অভিন্ন, ব্যবহারতই ভিন্ন। বস্তু ও তাহার প্রতিবিম্বের মতই এই পরমেশ্বর ও নামের সম্বন্ধ। প্রতিবিম্বের মত নাম কখনই বস্তুভূত পরমেশ্বর হইতে স্বরূপতঃ শ্রেষ্ঠ নহে। তবে উপাসকের নিকট মধুর হৃদয়গ্রাহী ও অন্তরঙ্গ বলিয়া নাম শ্রেষ্ঠ। নাম না থাকিলে চেনা যায় না, আপনার বলিয়া ভাবা যায় না, নিকটতম উপলব্ধি করা যায় না ; যেন মনে হয় পাইবার নহে, আমাদের ধারণাগম্য হইবার নহে। কর্ম্মের কাম্য নিত্য সকাম নিষ্কাম এগুলি যেমন কর্ত্তার মনোবৃত্তিভেদে বিভাগ মাত্র, নামের শ্রেষ্ঠতা ও তেমনই শুধু উপাসকের মনোবৃত্তিভেদে ; আমরা উপাসক, কাজেই আমাদের কাছে নামই শ্রেষ্ঠ, নামের মাহাত্ম্যই অধিক। "নামৈব ব্রহ্ম উপাস্যং" নামকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা সম্পদুপাসনার অন্তর্গত। নাম ধরিয়া ডাকা, অনাম ব্রহ্ম উপাসনা না করিয়া সনাম পরমেশ্বর-উপাসনা সম্পদুপাসনা নহে। আসলের কিঞ্চিৎ মাত্র গুণ দেখিয়া সামান্য সাদৃশ্য উপলব্ধি করিয়া সারূপ্যমূলক উপাসনাই সম্পদুপাসনা "মনোব্রহ্মেব উপাস্যং" যথা। সম্পদুপাসনার ফল সাম্রাজ্যলাভ, স্বর্গপ্রাপ্তি বা অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যাধিগম।

নামের মধ্যদিয়া উপাসনা এক প্রকার স্বরূপোপাসনা, সাকারোপাসনা ত বটেই। বৈদিক ওঁকারোপাসনাই পূর্ব্বে শ্রেষ্ঠ উপাসনা ছিল, এক্ষণে কঠিন বলিয়া যে তাহার শ্রেষ্ঠতা নাই, তাহা নহে। এই অ উ ম্ ধ্বনি ব্রহ্ম হইতে লীলা-নিশ্বাসবৎ বহির্গত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্বাভাবিক অথচ

চিরন্তন শব্দ। এই ধ্বনি জায়মান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বজ্ঞাপক বলিয়া ব্রহ্মের বড় প্রিয়। এই ওঁকারেই ব্রহ্মের সর্ব্বপ্রধান আলম্বন, ওঁকারই ব্রহ্মের অন্তরতর নাম। শ্রুতি এই বলিয়া স্তব করিয়াছেন।

সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যৎ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিতি।

এই ওঙ্কাররূপেই ব্রহ্ম উপাস্য। এই ওঙ্কার ব্রহ্মে নিত্যসংযুক্ত, কাজেই সত্য।

নাম যদিও তাঁহারই নাম, তথাপি আমাদের কাছে উহা মাধুর্য্যে যত বড় ঠেকে, যত আদরণীয় হয়, পরমেশ্বর বুঝি মাধুর্য্যে তত, বড় তত আদরণীয় হন না। নামে যত আত্মীয়তা, যত ভাব, অন্তরঙ্গতা, যত হৃদয়োন্মুখতা জন্মে, ভগবানে তেমনটি জন্মে না। প্রিয়জনের যত দিন নামকরণ না হয়, তত দিন তাহাকে আদর করার সুবিধা হয় না, মানুষ আপনাআপনি সুবিধার জন্য—মানবপ্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মের জন্য নাম করিয়াই লইবে। নামকরণ না হইলে আপনার বোধ জন্মে না, তাই সে অবস্থায় শোকও তত বেশী হয় না। দশম কি দ্বাদশ দিনে শিশুব নামকরণবিধি কোন কোন ঋষি ভাল মনে করেন নাই।

যে কোন প্রত্যক্ষ বস্তু অপেক্ষাই তাহার নাম বড়, মাধুর্য্যে শ্রেষ্ঠ, আর অতীন্দ্রিয় পরোক্ষ বস্তু অপেক্ষা যে তাঁহার নাম বড় এবং মাধুর্য্যে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। লক্ষ্যবস্তু যেখানে অতি দূরে, সেখানে প্রতিবিম্বদৃষ্টে লক্ষ্যভেদ করার ব্যবস্থা। দৃষ্টান্ত,: অর্জ্জুনের সলিলে প্রতিবিম্বিত মৎস্যমুণ্ড দর্শনে লক্ষ্যভেদ।

বাস্তব পদার্থ যখন মানসী কল্পনা, কবি প্রতিভা বা চিত্রকরের তুলিকার সম্পর্কে আইসে, তখন তাহা যত মধুর, যত বৈচিত্র্যময়, যত নবীন ঠেকে, বাস্তব কি সেরূপ ঠেকে? আকাশ, সাগর, গিরি, নদী, বন, উপবন কাব্যে বর্ণিত চিত্রে অঙ্কিত হইলে যেমনটি বোধ হয়, চক্ষুর উপর দেখিলে কি তেমনটি হয়?

যে কোন মধুর বস্তুর নামে কেবলই তাহার মাধুর্য্যটুকু ও সৌন্দর্য্যটুকুই থাকে, অমাধুর্য্য অসৌন্দর্য্যও যে তাহাতে আছে, তাহা বোধ হয় না। আর আনুষঙ্গিক মন্দটির অস্তিত্ব মনেই পড়ে না। গোলাপ ফুলটির নাম মনে পড়িলেই তাহার সেই সুন্দর বর্ণ, নধর গঠন, সুমিষ্ট গন্ধ, কোমল স্পর্শ চিত্তে ভাসিয়া উঠে, একটি অব্যক্তভাব হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। সে গোলাপে যে কীট আছে, বৃন্তে যে কাঁটা আছে, শাখা হইতে ছিঁড়িয়া লইলে যে শোভা নষ্ট হয়, আবার গন্ধ নাও থাকিতে পারে—এ সকল একেবারেই মনে উদিত হয় না। আম্রফলের নামে তাহার মিষ্ট আস্বাদও মধুর গন্ধই মনে পড়ে; কিন্তু তাহা টক, বিস্বাদ, পান্‌শে ও পিরেপড়া হইতে পারে, ছাল পুরু, আঁটি বড় হইতে পারে, এসব মনেই পড়ে না। আম্র নামে যত সুখ, প্রকৃত আম্র পাইলে সে সুখ কোথায়? মা দুর্গা

চণ্ডীমণ্ডপ আলো করিয়া আছেন, আমরা তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি মনে পড়িলে যে অনির্ব্বচনীয় সুখ, দুর্গোৎসবকালে সেই সুখই বাহ্য ব্যাপার সমাকীর্ণ থাকায় পূর্ব্বের মত অনির্ব্বচনীয়রূপে উপলব্ধ হয় কি? সুখের চেয়ে তাহার আশা মিষ্ট, তার স্মৃতি মধুর। প্রবাসে প্রিয়জনের সমাগমাশায় যে ভাবের উদ্রেক, মিলনস্মরণে যে আনন্দকম্পন, সাক্ষাতে তাহা জন্মে কি? নবযুবকের মানসী-প্রতিমার সহিত ফুলশয্যারাত্রে কল্পনাময়ী কথাবার্ত্তা কি অধিক মধুর নহে?

পরমেশ্বর অপেক্ষা নামের মহিমা বড়, ইহা শাস্ত্রের কথা, মহাজনের উপদেশ। ভগবান সৃষ্টি, রক্ষা ও ধ্বংসের মালিক। শান্তরূপ আবার বিশ্বরূপ, শিষ্টের বন্ধু, দুষ্টের শত্রু। সাধুর রক্ষক, পাষণ্ডের দণ্ডদাতা। ধার্ম্মিকের নিকট তিনি অমৃতসরোবর, পাপীর কাছে ভীষণ শ্মশান। প্রসন্নমধুর উৎকটভীষণ উভয়বিধ গুণই তাঁহাতে বর্ত্তমান। অভয় ও দণ্ড সমভাবে দুই হস্তে বিরাজমান। দ্বিপাদ দ্বিহস্ত যেমন তিনি, সহস্রপাদ্ সহস্র বাহুও তিনি। মানবের কাছে ভগবান কেবলই মধুর, শান্ত, সুন্দর, দয়াময়, অভয়দ ও অন্তরঙ্গ-রূপে প্রতীত হইতে পারেন না, অন্ততঃ সাধারণ লোকে সেই সহস্র বাহূদর বক্ত্রনেত্র বিশ্বাতীত সংহারমূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডাধিপের কথা বিস্মৃত হইতে পারে না। দৈব চক্ষু পাইয়াও অর্জ্জুন বিশ্বরূপ অধিক ক্ষণ দেখিতে পারেন নাই, অন্যে পরে কা কথা। নামে কেবলই মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য, কোমলতা বিদ্যমান, শান্ত প্রসন্ন মঙ্গলভাবই বর্ত্তমান। অমাধুর্য্য, অসৌন্দর্য্য, ঔৎকট্য ও ভয়ানকত্ব নামে নাই। অভক্ত ও পাষণ্ড পাপী দণ্ডদাতা, ন্যায়বান্, বিচারক, সর্ব্বদর্শী ভগবানকে ভয় করিতে পারে, কিন্তু নামে সে ভয় নাই। নামগ্রহণে ত তিনি দণ্ড দিবেন না, বরং উদ্ধারই করিবেন। এই আশা, এই সান্ত্বনা পাপীর জীবনবন্ধনী।

শ্রীভগবানের নামই পাপীর উদ্ধারের উপায়। নামতরণী বাহিয়া কত কত মহাজন যে ভবসিন্ধু পার হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা কে করে? পাপী আপনিই ভগবানকে দূর করিয়া দিয়াছে, দূরে রাখিতেই যে ভালবাসে, তাই দয়াময় ভগবান তাহার নিকট হইতে বহুদূরে অন্তের স্থানে থাকেন। পাপী দণ্ডদাতা, ন্যায়বান, বিচারক ভগবানকে ভয় করে, স্থির মনে নির্ভয়ে অসঙ্কোচে ডাকিতে পারে না, দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত তাই ভগবানে নির্ভরতা তাহার জন্মে না। জোর করিয়া পাপীর চর্ম্মচক্ষুর সম্মুখে মলিন মোহাচ্ছন্ন হৃদয়ের উপর ভগবানকে দাঁড় করাও, বা বসাইয়া রাখ, দেখিবে সে পাপীর চক্ষু বুজিয়া আসিবে, ঝলসিয়া যাইবে, হৃদয় সঙ্কুচিত ও কোমাম হইতে থাকিবে।

ভগবানের কাছে ভক্ত অভক্তের প্রভেদ আছে, পাপপুণ্যের বিচার আছে; নামের কাছে কিন্তু সে প্রভেদ সে বিচার নাই। ভক্ত ও অভক্ত পাপী, তাপী, ব্রাহ্মণ ও চাণ্ডাল, ম্লেচ্ছ ও যবন, বালক ও বৃদ্ধ সকলেরই দয়াল ভগবানের নাম গ্রহণের অধিকার আছে; অধিকার অনধিকার কালাকাল এ সকল ইহাতে কিছুই নাই। আপামরসাধারণে সকল সময়ে

সকল অবস্থায় নামামৃত পানে বিভোর থাকিতে পারে। নামের কাছে জাতিবিচার নাই, সম্প্রদায় ভেদ নাই।

ভগবানের নাম বড় রকমের বীজ। উহা হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ কর, প্রেমফুল ফুটিবে, ভক্তিফল মোক্ষশস্য ফলিবেই। এই বীজ রোপিত হওয়ার পরও দগ্ধ ভর্জ্জিত হইবার ভয় আছে, হেজে যাইবার শঙ্কা আছে, নানা কারণে ইহার নাশও ঘটে। সাবধান, এই নামবীজ রক্ষা কর, তাহাতে জল সেক কর, লোকের অবজ্ঞা ও উপহাস গ্রাহ্য করিও না, অভাব আকাঙ্ক্ষার সহিত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইও না। নামবীজ থাকিলেই শ্রীভগবান রহিলেন। নামের মধ্যেই তিনি থাকেন, নামের ভিতরে প্রেমবন্যা বহে। এই নামের জপে, কথনে ও কীর্ত্তনে যে প্রেমের আস্বাদ, যে আনন্দরসের অনুভূতি, যে শান্তির উপলব্ধি, তাহার তুলনা নাই।

নাম ছাড়া ব্যক্তির ধারণা আমরা করিতে পারি না। বস্তু মাত্রেরই নাম আছে। আবার গোলাপের নাম অঘোরঝিন্টিকা হইলেও মানাইত না। যে কোন নামেই ডাকিলে চলিতে পারে, কিন্তু তাহা ঠিক খাপ খায় না। কাজেই বস্তুর সহিত নামের একটি প্রাকৃতিক সম্বন্ধ আছে। উভয়ের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বন্ধন আছে, যাহা অনেক স্থলে আমরা বুঝিতে পারি, আবার অনেক সময়ে বুঝিতে পারিও না। যে কোন নাম যখন খাপ খায় না, তখন নাম একটা মাত্র বহিরাবরণ নহে, শুধুই যে আমরা সুবিধামত করিয়া লইয়াছি, তাহা নহে। আর যদি নামমাত্র আমাদের সুবিধার্থই নামের সৃষ্টি, তাহাতেও নামমাহাত্ম্যের কিছু যায় আসে না।

নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে যাঁহার নাম তিনি উত্তর দেন, কাছে আসেন। ভগবানের নাম ধরিয়া ডাকার মত ডাকিতে পারিলে তিনি শোনেন, নিকটে আসেন। নাম না ধরিয়া ডাকিব কিরূপে? নাম থাকিলে তবেই ত এই নাম ধরিয়া ডাকিলে তিনি শুনিবেন? এই বিশ্বাস বড়ই আবশ্যক। কখন কখন ভগবানের অন্তরঙ্গ জ্ঞান মহাজন আসিয়া তাঁহার বিবরণ জানাইয়া দেন, পথের সন্ধান বলেন। নামে বিশ্বাস রাখ, নির্ভর কর, নাম ভজন, গান ও কীর্ত্তন কর, তাহাতেই উদ্ধার হইবে; অন্ততঃ উদ্ধারের উপায় আবিষ্কৃত হইবে। আকাশ হইতে গুরু আসিয়া বা দেবতা আসিয়া তোমার হাত ধরিয়া ভগবানের কাছে পৌঁছিয়া দিবেন, এ আশা বাতুলের। শান্তি তৃপ্তি ফল সঙ্গে সঙ্গেই জন্মে।

যোগে তপস্যায় নানা বিপদের সম্ভাবনা আছে; কঠিন বোধে পরিহারের আশঙ্কা আছে, আবার অণিমাদ্যৈশ্বর্য্য, স্বর্গসারাজ্য প্রভৃতি লাভ বা অন্য মায়ারূপ লোভও আছে। নামে বিপদের কোন ভয় নাই, কোন লোভের ব্যাপার নাই। নামের ফল প্রেম, ভক্তি ও ভগবৎ-করুণা জীবের জীবত্ব লোপে, অহংভাবের বিনাশে, ভগবানের আত্যন্তিক বিচ্ছেদে সুখ কোথায়? রসাস্বাদ, আনন্দোপভোগ ও ভগবৎ-দাস্য জন্য সুখলাভই বা করিবে কে? সংসারে আসিয়া নামমাহাত্ম্য বিলাইবার জন্য, নামরসে ডুবিয়া থাকার সুখলাভের জন্য, অমৃত অভয়ের সন্ধান দিয়া জীবের উদ্ধারের জন্য, প্রেমরসাস্বাদ পাইবার জন্য জন্মও ভক্ত চায়। লীলারসামৃত পানে যে বড় সুখ।

মন্ত্র ও দেবতা * স্বরূপতঃ অভিন্ন, ব্যবহারতঃ ভিন্ন। মন্ত্র ও দেবতার অভেদে ভেদে দুই প্রকারে ধ্যানই বিহিত। তবে অভেদে ঝটিতি ফললাভ, ইহা কঠিনও বটে। দেবতা অপেক্ষা মন্ত্র বড়, ইহা কোন কোন ঋষির মত। আর নাম ভগবান্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা শুধু ঋষির বচনে বা শাস্ত্রের উপদেশে যে বলিতেছি তাহা নহে; দ্বাপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আপনার চেয়ে নামের শ্রেষ্ঠত্ব উদ্‌ঘোষিত করিয়াছেন। আপনার অপেক্ষা নাম বড়, ইহা তিনি বুঝাইয়া না দিলে আমাদের সাধ্য কি যে এত বড় কথা বলি। পুরাণপাঠক অবগত আছেন যে তুলাদণ্ডের এক দিকে শ্রীকৃষ্ণ, অপর দিকে রাজ্যের সমস্ত ধনরত্ন চাপান হইল; তথাপি কৃষ্ণের দিকই ভারী হইয়াছিল। পার্থিব ধনরত্নের সহিত ভগবানের তুলনা? কৃষ্ণপ্রেমিকা কৃষ্ণবল্লভা রুক্মিণী-দেবী যখন তুলসীপত্রে কৃষ্ণের নাম লিখিয়া তাহাই ধনরত্নের বদলে চাপাইলেন, তখনই নামের দিক্ ভারী হইল। ভগবান্ নিজ মুখে প্রচার করিলেন যে তাঁহার অপেক্ষা নামের মাহাত্ম্যই অধিক।

ভক্তি ও একাগ্রতা সহকারে নামগানে, নাম জপে নাম কীর্ত্তনে, নাম ধ্যানে কল্যাণ, ইহা সত্য বটে। কিন্তু ইহাও ভাবিবার বিষয় যে এই ভক্তি একাগ্রতা জন্মিবে কোথা হইতে, ভগবানের নাম গান করিবার পূর্ব্বেই কি উপায়ে তাঁহাকে পাইবার আকুলতা হইবে? অগ্রে নাম গানাদি করিলে তবেই একাগ্রতা ও ভক্তির আবির্ভাব জন্মিবে। হরিনাম করিতে করিতে সমস্বরে মিলিতকণ্ঠে মৃদঙ্গধ্বনির সহিত ভগবানের নাম গাহিতে গাহিতে চিত্তে একটি ভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ভাবই ভক্তির প্রথম স্তর। আবার এক জনের প্রকৃত ভক্তিভাব দেখিলে সকলকার ভক্তিভাব জন্মিতে পারে, এক জনের শান্ততড়িৎ সকলের দেহে সঞ্চারিত হইয়া সকলকে তদ্ভাবে ভাবুক তন্মাহাত্ম্যে আকুল করিয়া তুলিতে পারে। অগ্রে নাম গান কর, নাম জপ কর, ঐ আকুলতা ঐ ভাব ঐ একাগ্রতা অবশ্যই আসিবে।

মন্ত্রের অর্থ জানিয়া জপে ফল সম্পূর্ণ, অর্থ না জানিয়া কেবল জপে ফল অর্দ্ধেক। যাহার ভক্তিভাব আছে, তাহার হরিনামে, নাম জপে ষোলআনা ফল; যাহার নাই তাহার ফল অল্প, কিন্তু নিষ্ফল নহে। যাহার ভক্তি ভাব নাই, সে কি হরিনাম করিবেনা, সে কি নাম জপ করিবেনা, তাহার কি উপায় নাই? অবশ্যই করিবে, উপায় আছেই। অন্তরের ভক্তি বড় সোজা জিনিষ নহে, উহাই অনেক সাধনায় জন্মে। নাম জপে নাম গানে অনেক দিনে তাহা অল্পে অল্পে হৃদয়ক্ষেত্রে দেখা দেয়। মন্ত্রের এমনই শক্তি, নামের এমনই মহিমা, যে নাম জপ করিতে করিতে, নাম গান করিতে করিতে একাগ্রতা ও আকুলতা দেখা দেয়। প্রথমে ত বাহ্য, পরে আন্তর। মন্ত্রজপ ও নাম গান কিছু দিন করিতে আরম্ভ করিলে কেহ তখন আর ছাড়িতে ইচ্ছা করিবে না; সুখ শান্তি বোধ হইবে, আনন্দরসের উপভোগে

---

* দেবতা উপাস্য পরমব্রহ্ম, দয়াময় ঈশ্বর কৃষ্ণাদি অবতার ও ইষ্টদেবতা।

তৃপ্তি পাইবে। তবে যিনি মাত্র লোক দেখাইবার জন্য, লোক চক্ষুতে ...ভ্ত নাম জপ ও নাম গানের ভাণ করেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। আবার ভাণ ভাল। কেন না ভাণ করিতে করিতে নাম মাহাত্ম্যে, মন্ত্রশক্তি-...হার পরিবর্ত্তন হইতে পারে, ভাণ সত্য হইতে পারে। একটি নীচ অন্ত্যজ ...এই সুমহৎ পরিবর্ত্তনের গল্প অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। ধর্ম্মপ্রবন্ধপাঠে ধর্ম্মশাস্ত্র-অধ্যয়নে ও সাধুসঙ্গে, সাধু চরিত্রকথাসমালোচনে ভগবন্নাম মাহাত্ম্যে, ধর্ম্মবক্তৃতা শ্রবণে নাম সঙ্গীতে অনেকের মতি পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে।

তবে ইহা সত্য যে কার্পণ্য সর্ব্বথাই বর্জ্জনীয়, লোক থাকিলে জপ করিব, নচেৎ করিবনা; লোক দেখিলেই শ্রীহরি শ্রীহরি বলিব, নচেৎ বলিবনা, ইহা অন্যায়। কি মন্ত্রজপে কি নাম গানে প্রথমে একটু শ্রদ্ধা একটু বিশ্বাস থাকা আবশ্যক, নচেৎ প্রবৃত্তই যে জন্মিবেনা। কপট জপাদির কথা বলিতেছিনা; কারণ কপট জপাদির মূলে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নাই। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ নাম ব্যতীত কলিতে উদ্ধারের উপায় নাই। নামই কলির জীবের উদ্ধারের উপায়।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ।

পুরাণ-কাহিনী।

দ্রৌপদী-চরিত।

বহুদিনের পুরাতন কথা। তথাপি পুনরালোচনায় লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই।

হস্তিনানগরে আজ মহাসমারোহে দ্যূতক্রীড়ার আয়োজন হইতেছে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ-সভার সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া অবধি ঈর্ষাপরায়ণ দুর্য্যোধন হৃদয়মধ্যে সহস্র বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা অনুভব করিতেছেন, তাহারই প্রশমনার্থে অদ্য বিষয়লোলুপ ধৃতরাষ্ট্রের এই বিপুল অনুষ্ঠান। মূঢ় দুর্য্যোধন রাজ্যকামী, কিন্তু তিনি অধম ক্ষত্রিয়, যেহেতু পাণ্ডবের ভুজবীর্য্য হইতে তিনি শঙ্কিত, সৎপুরুষের ন্যায় অকপটযুদ্ধে তাঁহার অভিলাষ নাই,—তাই অন্ধরাজ শতদ্বারবিশিষ্ট, সহস্রস্তম্ভ-শোভিত, হেমবৈদূর্য্যখচিত, ক্রোশায়ত, তোরণস্ফাটিকা-নাম্নী এক দ্বিতীয় রাজসূয়সভাতুলনীতুল্য মহতীসভা নির্ম্মিত করাইয়া তথায় যুধিষ্ঠিরকে সুহৃদ্দ্যূতক্রীড়ার্থ আহ্বান করিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরও ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে ভ্রাতৃগণ ও পাঞ্চালী সমভি-ব্যাহারে কৌরবগৃহে আগমন করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়চূড়ামণি যুধিষ্ঠিরের ভয় নাই; অসার ঐহিকসম্পদনাশের আশঙ্কায় তিনি কৃপণ কাপুরুষের ন্যায় ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত

বহেন। তিনি জানিতেন যে এই কপটদ্যূত নিতান্ত পাপজনক, তথাপি তিনি ইহাতে লিপ্ত হইলেন। বলিলেন—

"আহূতো ন নিবর্ত্তেয়মিতি মে ব্রতমাহিতম্।
বিধিশ্চ বলবান্ রাজন্ দিষ্টস্যাস্মি বশে স্থিতঃ॥

আহূত হইলে নিবৃত্ত হইবনা, ইহাই আমার নিত্যব্রত ; অদৃষ্টই বলবান্,আমি সেই অদৃষ্টেরই বশীভূত।"

প্রাতঃকালে কৃতাহ্নিক পাণ্ডবগণ দ্যূতসভায় প্রবেশ করিলেন ; রাজগণও ধৃতরাষ্ট্রকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন। মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর অপ্রসন্নমনে তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। সিংহগ্রীব, মহাতেজা, বেদবেত্তা, শূর ও ভাস্বরমূর্ত্তি ভূপতিগণ চতুর্দ্দিকে সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন,—সভাস্থল অমরাধিষ্ঠিত অমরাবতীর শোভা ধারণ করিয়াছে।

সুহৃদ্যূত আরম্ভ হইল। যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'হে রাজন্,আমি মহামূল্য কাঞ্চনখচিত মণিময়হার পণ করিলাম, তোমার প্রতিপণের বস্তু কই ?" দুর্য্যোধন কহিলেন "অগ্রে ত জয়লাভ করুন,—ধনরত্ন আমার প্রচুর আছে।" তদনন্তর অক্ষতত্ত্ববিৎ শকুনি,—(দ্যূতক্রীড়ায় ইনি দুর্য্যোধনের প্রতিনিধি হইয়াছেন)—অক্ষগ্রহণ করিয়া "এই জিতিলাম" বলিয়া অক্ষ নিক্ষেপ করিবা মাত্র তাহারই জয় হইল। এইরূপে একে একে যুধিষ্ঠিরের অক্ষয়কোষ, হিরণ্যরাশি, কিঙ্কিনীজালজড়িত সহস্ররাজরথ, সুবর্ণালঙ্কার-ভূষিতা শতসহস্রদাসী, সহস্রদাস, সহস্র মত্তমাতঙ্গ, রথিসমূহ ও অশ্বগণ, এবং ষষ্টিসহস্র বীরপুরুষ,—সমস্তই দ্যূতমুখে বিসর্জ্জিত হইল। বিদুর ভীত হইয়া কহিলেন, "দুর্য্যোধন, নিবৃত্ত হও ; পরস্পরের প্রণয়চ্ছেদ করিও না।" দুর্য্যোধন তখন ব্যাঘ্রের ন্যায় পাণ্ডবশোণিতপানে উন্মত্ত হইয়াছেন, সুতরাং বিদুরকে অত্যন্ত পরুষবাক্যে অবমাননা করিলেন। ক্রীড়া চলিতে লাগিল,—যুধিষ্ঠির ব্রহ্মস্বব্যতীত সকল ধন পণ রাখিলেন, ব্রাহ্মণ ব্যতীত সমস্ত পুরুষগণকে পণ রাখিলেন, অবশেষে একে একে প্রাণোপম ভ্রাতৃগণকে দ্যূতরাক্ষস মুখে অর্পণ করিলেন,—সর্ব্বস্ব গেল। শকুনি বলিল "আর কিছু ধন আছে কি ?" তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমি ভ্রাতৃগণের শ্রেষ্ঠ ও দয়িত, আমি আপনাকেই পণ রাখিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিব।" শকুনি তৎক্ষণাৎ জিতিয়া লইল এবং কহিল,—

"অস্তি তে বৈ প্রিয়া রাজন্ গ্লহ একোঽপরাজিতঃ।
পণস্ব কৃষ্ণাং পাঞ্চালীং তয়াত্মানং পুনর্জ্জয়॥

হে রাজন্, আপনার প্রণয়িনী দ্রৌপদী এখনও পরাজিত হন নাই, অতএব আপনি তাঁহাকে পণ রাখিয়া আপনাকে মুক্ত করুন।"

ঠিক এইরূপ সর্ব্বস্বাপহারিণী দ্যূতক্রীড়া আর একবার নিষধদেশে ঘটিয়াছিল। সেখানেও পুষ্কর স্বীয় ভ্রাতা পুণ্যশ্লোক নলরাজাকে কহিয়াছিলেন "মহারাজ, আমি অন্য সমস্ত সম্পত্তিই

জয় করিয়াছি, একমাত্র দময়ন্তী অবশিষ্ট আছে,—যদি অভিমত হয় তবে এবার দময়ন্তীকে পণ করুন"। নলরাজা ক্রোধে ও দুঃখে তৎক্ষণাৎ পুর হইতে পত্নী সমভিব্যাহারে বাহির হইলেন, পতিব্রতাকে দ্যূতমুখে বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু আজ হস্তিনায় অভূতপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হইল; যুধিষ্ঠির নলরাজাকেও অতিক্রম করিলেন, কহিলেন—

নৈব হ্রস্বা ন মহতী ন কৃশা নাপি রোহিণী।
নীলকুঞ্চিতকেশী চ তয়া দীব্যাম্যহং ত্বয়া॥
শারদোৎপলপত্রাক্ষ্যা শারদোৎপলগন্ধয়া।
শারদোৎপলসেবিন্যা রূপেণ শ্রীসমানয়া॥
তথৈব স্যাদানৃশংস্যাৎ তথা স্যাদ্রূপসম্পদা।
তথা স্যাচ্ছীলসম্পত্ত্যা যামিচ্ছেৎ পুরুষঃ স্ত্রিয়ম্॥
সর্ব্বৈর্গুণৈর্হি সম্পন্নামনুকূলাং প্রিয়ম্বদাম্।
যাদৃশীং ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধিমিচ্ছেন্নরঃ স্ত্রিয়ম্॥
চরমং সংবিশতি যা প্রথমং প্রতিবুধ্যতে।
আগোপালাবিপালেভ্যঃ সর্ব্বং বেদ কৃতাকৃতম্॥
আভাতি পদ্মবদ্বক্ত্রং সস্বেদং মল্লিকেব চ।
বেদীমধ্যা দীর্ঘকেশী তাম্রাস্যা নাতি লোমশা॥
তয়ৈবংবিধয়া রাজন্ পাঞ্চাল্যাহং সুমধ্যয়া।
গ্লহং দীব্যামি চার্ব্বঙ্গ্যা দ্রৌপদ্যা হন্ত সৌবল॥

হে সুবলনন্দন, যিনি নাতিহ্রস্বা, নাতিদীর্ঘা, নাতিকৃশা, নাতি স্থূলা, রূপে যিনি শ্রীর ন্যায়, যিনি নীলকুঞ্চিতকেশী, শারদপদ্মলোচনা, শারদপদ্মগন্ধা, শারদপদ্মধারিণী;—যিনি অনৃশংসতা সুরূপতা, সুশীলতা, অনুকূলতা, প্রিয়বাদিতা ও ধর্ম্মার্থকামসিদ্ধির হেতুভূতা, ভর্ত্তার অভিলষিত গুণসমুদায়ে বিভূষিতা; যিনি গোপাল ও মেষপালগণের নিয়মানুসারে শেষে নিদ্রিত ও অগ্রে জাগরিত হয়েন, যাঁহার সস্বেদ মুখপদ্ম মল্লিকার ন্যায়, মধ্যদেশ বেদীর ন্যায়, সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দ্রৌপদীকে পণ রাখিলাম"।

ছি! ছি। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মুখে এই বাক্য! সভাসদ্ বৃদ্ধগণ তাঁহাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন, সভাতল একেবারে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, ভূপতিগণ শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন, ভীষ্মদ্রোণকৃপাদির কলেবর হইতে ঘর্ম্মবারি নির্গত হইতে লাগিল, বিদুর মস্তক ধারণ করিয়া ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র মনোভাব গোপন করিতে অসমর্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন "জয় হইল কি? জয় হইল কি?"—তিনি বুঝিলেন না যে স্বহস্তে যে বিষবৃক্ষ তিনি রোপণ করিয়াছেন, কালে তাহার বিষময় ফল তাঁহাকেই ভোগ করিতে হইবে। কর্ণ ও দুঃশাসনের হর্ষের সীমা নাই। অন্যান্য সভ্যগণ অশ্রুমোচন করিতে

লাগিলেন। শকুনি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া "এই জিতিলাম" বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষনিক্ষেপ করিবা মাত্র তাহারই জয় হইল; বোধ হয় কৌরব কুললক্ষ্মী বিচলিত হইলেন।

মূর্খ দুর্য্যোধন হর্ষে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন,—তিনি ধর্ম্মজ্ঞ বিদুরকে আজ্ঞা করিলেন—

"এহি ক্ষত্ত দ্রৌপদীমানয়স্ব
প্রিয়াং ভার্য্যাং সম্মতাং পাণ্ডবানাম্
সম্মার্জ্জতাং বেশ্ম পরৈতু শীঘ্রং
তত্রাস্তু দাসীভিরপুণ্যশীলা ॥

"হে ক্ষত্ত, তুমি শীঘ্র দ্রৌপদীকে আনয়ন কর, অপুণ্যশীলা কৃষ্ণা এখানে আসিয়া দাসীগণের সহিত আমাদের গৃহ মার্জ্জন করুক"। ক্রূরবুদ্ধি দুর্য্যোধন বোধ হয় পাণ্ডবহৃদয়ের মর্ম্মস্থল লক্ষ্য করিয়াই এই "অপুণ্যশীলা" বাক্যবাণটি প্রহার করিলেন, পুণ্যবতী পতিব্রতার পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর কি কঠোরতর বাক্য হইতে পারে? মূঢ় জানিত না যে উত্তরকালে ভারতের প্রাতঃস্মরণীয়া পতিব্রতাগণের মধ্যে এই 'অপুণ্যশীলা' পাঞ্চালীই অন্যতমা হইবেন। অথবা জানিলেই বা কি হইত? মদমত্ত কাপুরুষের নিকট চিরকালই ধর্ম্ম ধর্ষিত হইয়া আসিতেছে। সর্ব্বত্রও সর্ব্বকালেই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ আছে।

যাহা হউক, ধর্ম্মজ্ঞ বিদুরের পক্ষে দুর্য্যোধনের এই পাপবাক্য অসহনীয় হইল,—তিনি ক্রোধভরে তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। তখন দর্পিত দুর্য্যোধন বিদুরকে ধিক্কার দান করিয়া প্রাতিকামী নামক এক সূতপুত্রকে পূর্ব্ববৎ আদেশ করিলেন। কুক্কুর যেমন সিংহমুখে প্রবেশ করে, তদ্রূপ প্রাতিকামী পাণ্ডবভবনে প্রবেশ করিয়া দ্রৌপদীকে কহিল "হে দ্রুপদনন্দিনি, যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া তোমাকে পণ রাখিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন তোমাকে জয় করিয়া লইয়াছেন; অতএব তোমাকে ধৃতরাষ্ট্রভবনে গমন করিয়া কিঙ্করীর ন্যায় কর্ম্ম করিতে হইবে। আমি তোমাকে লইতে আসিয়াছি।" দ্রৌপদী বিস্মিত হইলেন, বলিলেন "তুমি কি প্রলাপবাক্য কহিতেছ? কোন্ রাজপুত্র পত্নীপণ করিয়া ক্রীড়া করে?" প্রাতিকামী পাঞ্চালীর সন্দেহ তৎক্ষণাৎ অপনোদন করিলেন; তখন দ্রৌপদী কহিলেন, "তুমি যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস তিনি অগ্রে আমাকে কি আপনাকে দ্যূতমুখে বিসর্জ্জন করিয়াছেন?" সভামধ্যে অবমাননার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্যই বুদ্ধিমতী পাঞ্চালী এই কৌশলময় প্রশ্ন করিলেন; কিন্তু বিধাতা যখন প্রতিকূল হন, তখন সমস্ত কৌশলই ভাসিয়া যায়। দুর্য্যোধন প্রাতিকামীকে বলিলেন "তুমি দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন কর; তাহার যাহা জিজ্ঞাস্য আছে সে এই স্থানে আসিয়া করুক।" এবার প্রাতিকামীও সঙ্কুচিত হইল; পতিব্রতাকে বলপূর্ব্বক সভামধ্যে আনায়ন! বোধ হয় এইবার কুরুকুল উন্মূলিত হইল"! যাহা হউক, সে প্রভুর আজ্ঞা দ্রৌপদী সমীপে জ্ঞাপন করিল। দ্রৌপদী বলিলেন—

এবং নূনং ব্যদধাৎ স বিধাতা
স্পর্শাবুভৌ স্পৃশতো বৃদ্ধবালৌ।
ধর্ম্মন্ত্বেকং পরমং প্রাহ লোকে
স নঃ শমং ধাস্যতি গোপ্যমানঃ॥
সোঽয়ং ধর্ম্মো মাত্যগাৎ কৌরবান্ বৈ
সভ্যান্ গত্বা পৃচ্ছ ধর্ম্ম্যং বচো মে।
তে মাং ব্রূয়ুর্নিশ্চিতং তৎ করিষ্যে
ধর্ম্মাত্মানো নীতিমন্তো বরিষ্ঠাঃ॥

হে সূতনন্দন বিধাতাই এইরূপ বিধান করিয়াছেন।

পৃথ্বীতলে ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই ধর্ম্মই আমাদিগকে শান্তিবিধান করিবেন। আমি প্রার্থনা করি—ধর্ম্ম যেন কৌরবগণের প্রতি বিমুখ না হন। তুমি সভ্যগণ সমীপে যাইয়া ধর্ম্মতঃ আমার কি করা কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা কর, সেই নীতিজ্ঞ বরিষ্ঠ ধর্ম্মাত্মগণ যাহা কহিবেন, আমি নিশ্চয়ই তাহা করিব।" প্রাতিকামী সভায় যাইয়া তাঁহার বাক্য কহিলে সভ্যগণ অধোমুখে রহিলেন,—দুর্য্যোধনের আগ্রহ দেখিয়া কেহই বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। অভিমানী যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মাভিমান বোধ হয় জাগরিত হইয়া উঠিল,—তিনি দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় বুঝিয়া দ্রৌপদীকে বলিয়া পাঠাইলেন—

একবস্ত্রাপ্যধোনিবী রোদমানা রজস্বলা।
সভামাগম্য পাঞ্চালী শ্বশুরস্যাগ্রতো ভব॥

একবস্ত্রা অধোনিবী রজস্বলা পাঞ্চালী রোদন করিতে করিতে সভামধ্যে শ্বশুরসমীপে উপস্থিত হউন"। দুর্য্যোধন প্রাতিকামীকে কহিলেন "এখন তুমি দ্রৌপদীকে এই স্থানে লইয়া আইস"। কিন্তু প্রাতিকামী সেই অগ্নিতুল্যা তেজস্বিনী রমণীর নিকট যাইতে আর সম্মত নহে। দুর্য্যোধন তাহাকে ভীত দেখিয়া স্বীয় অনুজ দুঃশাসনকে এই কুকর্ম্মের ভার অর্পণ করিলেন। দুরাত্মা দুঃশাসন আরক্তনয়নে দ্রৌপদী সকাশে গমন করিয়া কহিল, "পাঞ্চালি, লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া সভামধ্যে আগমনপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে অবলোকন কর। কমলনয়নে, তুমি কুরু-দিগকে ভজনা কর;—আমরা তোমাকে ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছি।" ভীতা দ্রৌপদী বৃদ্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রীগণের সমীপে দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন। জালবদ্ধা হরিণীর পশ্চাতে ব্যাধের ন্যায় ক্ষত্রিয়কুলপাংশুল দুঃশাসন তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া ধাবমান হইল এবং বলপূর্ব্বক পাঞ্চালীর কেশ ধারণ করিল। মূঢ় জানিত না যে ইহা অপেক্ষা জলন্ত হুতাশনে হস্তক্ষেপন করা ভাল ছিল। যজ্ঞাগ্নিসম্ভূতা, যজ্ঞাগ্নিতুল্যপ্রদীপ্তা ও পবিত্রা পতিব্রতার কেশাকর্ষণ করিয়া পাপাত্মা যে তখনই দগ্ধ হইল না ইহাই আশ্চর্য্য। দেবতারা কি নিদ্রিত হইয়াছেন?—নতুবা এই পাপ-কারীর মস্তক এখনই কেন শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না? মহাভারতের মহান কবি এই অভাব-নীয় উৎকট ব্যাপার বর্ণন করিতে করিতে ক্ষুব্ধ হইলেন, তিনি বলিলেন—

যে রাজসূয়াবভৃথে জলেন
মহাক্রতৌ মন্ত্রপূতেন সিক্তাঃ।
তে পাণ্ডবানাং পরিভূয় বীর্য্যং
বলাৎ প্রমৃষ্টা ধৃতরাষ্ট্রজেন ॥

আহা! যে কেশকলাপ ইতিপূর্ব্বে রাজসূয়যজ্ঞের অবভৃথ স্নান সময়ে মন্ত্রপূত জল দ্বারা সিক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্র সেই চিকুরচয় বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল এবং সনাথা কৃষ্ণাকে অনাথার ন্যায় কেশাকর্ষণ করিয়া সভামধ্যে আনয়ন করিল? দীর্ঘকেশী দ্রৌপদী কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে হইতে বিনীত বচনে কহিতেছেন, হে দুঃশাসন আমি রজস্বলা হইয়াছি ও একমাত্র বসন পরিধান করিয়াছি। এ অবস্থায় আমাকে সভামধ্যে লইয়া যাওয়া উচিত নহে।" দুঃশাসন তাঁহার বাক্য গ্রাহ্য করিল না, বরং দৃঢ়রূপে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক কহিল, "তুমি রজস্বলাই হও, একবস্ত্রাই হও, আর বিবস্ত্রাই হও,—তুমি এখন দাসী,—এক্ষণে উপস্ত্রীর ন্যায় তোমাকে দাসীগণ মধ্যে বাস করিতেই হইবে।" গত্যন্তরবিহীনা পাঞ্চালী তখন "হা কৃষ্ণ, হা অর্জ্জুন, হা হরে, হা নর" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। দারুণ আকর্ষণে কেশ আলুলায়িত হইল, অর্দ্ধ বসন অঙ্গ হইতে বিস্রস্ত হইল। ক্রোধে দুঃখে অভিভূতা হইয়া দ্রৌপদী দুঃশাসনকে তিরস্কার করিতেছেন, আর কুরুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের নিন্দা করিতেছেন—

ইমে সভায়ামুপদিষ্টশাস্ত্রাঃ ক্রিয়াবন্তঃ সর্ব্বএবেন্দ্রকল্পাঃ।
গুরুস্থানা গুরবশ্চৈব সর্ব্বে তেষামগ্রে নোৎসহে স্থাতুমেবং ॥
নৃশংসকর্ম্মংস্ত্বমনার্য্যবৃত্ত মা মাং বিবস্ত্রাং কুরু মা বিকার্ষীঃ।
ন মর্ষয়েয়ুস্তব রাজপুত্রাঃ সেন্দ্রাদিদেবা যদি তে সহায়াঃ ॥
ধর্ম্মে স্থিতো ধর্ম্মসুতো মহাত্মা ধর্ম্মশ্চ সূক্ষ্মো নিপুণোপলক্ষ্যঃ।
বাচাপি ভর্ত্তুঃ পরমাণুমাত্রমিচ্ছামি দোষং ন গুণান্ বিসৃজ্য ॥
* * ধিগস্তু নষ্টঃ খলু ভারতানাম্ ধর্ম্মস্তথা ক্ষত্রবিদাঞ্চ বৃত্তম্।
যত্রাত্যতীতাং কুরুধর্ম্মবেলাং প্রেক্ষন্তি সর্ব্বে কুরবঃ সভায়াম্ ॥
দ্রোণস্য ভীষ্মস্য চ নাস্তি সত্বং ক্ষত্তুস্তথৈবাস্য মহাত্মনোঽপি।
রাজ্ঞস্তথাহীমমধর্ম্মমুগ্রং ন লক্ষয়ন্তে কুরুবৃদ্ধমুখ্যাঃ ॥

"হায়, ভরতবংশীয়গণের ধর্ম্মে ধিক্! ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞগণের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যে হেতু সভাস্থ কুরুগণ স্বচক্ষে কুরুধর্ম্মের ব্যতিক্রম নিরীক্ষণ করিয়াও স্থির হইয়া আছেন। বুঝিলাম্ দ্রোণ ভীষ্ম বিদুরাদির কিছুমাত্র সত্ব নাই"। কিন্তু স্বামিগণের নিন্দা করিতেছেন না,—বলিলেন"মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন সাধুসেবিত ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া আছেন। আমি স্বামীর বাক্যে গুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কদাচ পরমাণুমাত্র দোষারোপ করিতে বাঞ্ছা করিনা"। করুণ স্বরে রোদন করিতে করিতে দ্রৌপদী একবার ভর্ত্তৃগণের প্রতি কটাক্ষপাত

করিলেন, —হায়, সে কটাক্ষ তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল;— সমুদায় রাজ্যধন বিনষ্ট হওয়াতে তাঁহাদের তাদৃশ ক্ষোভ হয় নাই। দুঃশাসন তাহা দেখিয়া বেগে আকর্ষণ করিয়া দ্রৌপদীকে প্রায় সংজ্ঞাহীনা করিল এবং 'দাসী দাসী' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল। তাহার এই পৈশাচিক অভিনয়ে কর্ণ ও শকুনি ব্যতীত সমস্ত সভ্যগণ দুঃখে ম্রিয়মাণ হইলেন।

ভীষ্ম সত্য সত্যই সত্ত্ববিহীন হইয়াছেন, নতুবা তিনি স্বীয় কুলবধূর অবমাননা দেখিয়াও প্রতিকারপরায়ণ না হইয়া যুধিষ্ঠিরের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া আছেন কেন? অথবা তাঁহারই বা দোষ কি? মূর্ত্তিমান ধর্ম্মস্বরূপ স্বয়ং যুধিষ্ঠির কি এই অধর্ম্মাচরণ দেখিতে পাইতেছেন না? তবে তিনি কি নিমিত্ত অদ্য তূষ্ণীভূত অচেতনপ্রায় অবস্থান করিতেছেন? যুধিষ্ঠির কি অদ্য স্বীয় তিতিক্ষার পরিচয় দিতেছেন, বা ধর্ম্মের পরীক্ষা করিতেছেন? অথবা পূর্ব্বজন্মার্জিত যাবতীয় কর্ম্মফল একদিনেই বক্ষঃ পাতিয়া লইতেছেন? একবার কটাক্ষে ইঙ্গিত পাইলে বীরচূড়ামণি ভীমার্জ্জুন এখনই কৌরবকুল ধ্বংস করিতে পারেন,—কিন্তু যুধিষ্ঠির তাহা করিতেছেন না।

তিনি স্থির, তিনি ধর্ম্মপাশে আবদ্ধ, বলপ্রয়োগ করিয়া তিনি ধর্ম্মের অবমাননা করিবেন না। রজস্বলা, পতিতোত্তরীয়া আকৃষ্যমানা দ্রুপদতনয়ার সেই অনুচিত অপমান দর্শন করিয়া বৃকোদর ধৈর্য্য হারাইলেন, বলিলেন "সহদেব,- অগ্নি আনয়ন কর;. অদ্য যুধিষ্ঠিরের হস্তদ্বয় ভস্মসাৎ করিব। দ্রৌপদীকে পণরাখিয়া দ্যূতক্রীড়া করা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে।" অর্জ্জুন কহিলেন, "হে ভীমসেন, এদুর্ব্বাক্য তোমায় সাজে না; শত্রুগণ তোমার ধর্ম্মগৌরব নষ্ট করিয়া হাস্য করিতেছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির শত্রুগণ কর্ত্তৃক দ্যূতে আহূত হইয়া ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে তাহাদের অভিলাষানুরূপ ক্রীড়া করিয়াছেন; ইহা আমাদের মহান্ যশস্কর। ধর্ম্মপাশাবদ্ধ জ্যেষ্ঠভ্রাতার অবমাননা করিওনা।" ভীম নিরস্ত হইলেন।

দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর কেহই দিলেন না। একমাত্র কৌরব বীর বিকর্ণ ক্রোধভরে ভূপতিগণ সম্মুখে কহিলেন "আমি যাহা ন্যায্য বলিয়া বিবেচনা করি, তাহাই বলিব। যুধিষ্ঠির ব্যসনাসক্ত হইয়া দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছেন, ব্যসনাসক্তের আচরণ প্রামাণিক নহে। দ্রৌপদী, পাণ্ডবগণের সাধারণী ভার্য্যা,—যুধিষ্ঠিরের তাঁহাতে সম্পূর্ণ অধিকার নাই। আর তিনি স্বয়ং পূর্ব্বেই পরাজিত হইয়া পরে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছেন,— সুতরাং দ্রৌপদীতে তিনি স্বত্ববর্জ্জিত ছিলেন, তাহার পণ রাখিবার অধিকার ছিল না। বিশেষতঃ শকুনি পণার্থী হইয়া কৃষ্ণার নামোল্লেখ করিয়াছিলেন। এই সকল বিচার করিয়া দেখিলে দ্রৌপদীকে জয়লব্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিনা।" বিকর্ণের বীরোচিত বাক্য শ্রবণে সভ্যগণ সঙ্কুলরবে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই তুমুল নিনাদ নিস্তব্ধ হইবামাত্র, রাধেয় কর্ণ বিকর্ণকে বালক বলিয়া তিরস্কার করিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে যুধিষ্ঠির সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছেন, দ্রৌপদী সেই সর্ব্বস্বের

অন্তর্গত। আর পঞ্চভর্ত্তৃকা স্ত্রী বারস্ত্রী মাত্র, তাহাকে সভামধ্যে আনয়ন বা বিবস্ত্রা করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ইতিপূর্ব্বে স্বয়ম্বরসভায় কুলাভিমানিনী দ্রৌপদী সর্ব্বসমক্ষে 'আমি সূতপুত্রকে বরণ করিবনা' বলিয়া কর্ণের যে মর্ম্মান্তিক অবমাননা করিয়াছিলেন, ক্রূরমতি কর্ণ অদ্য তাহার প্রতিশোধ লইতেছেন। তিনি দুঃশাসনকে কহিলেন তুমি পাণ্ডবগণের ও দ্রৌপদীর সমুদায় গ্রহণ কর। পাণ্ডবগণ তৎক্ষণাৎ স্ব স্ব উত্তরীয় বস্ত্রগুলি প্রদান করিয়া সভামধ্যে উপবিষ্ট হইলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

প্রতিবাদে—গুরুশিষ্য-সংবাদ।

শিষ্য—গুরুদেব! "ব্রাহ্মণ-সমাজ" পত্রের পঞ্চমবর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় "শুদ্ধিতত্ত্বে গুরুশিষ্য-সংবাদ" নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদে দুটী ভুল প্রদর্শিত হইয়াছে। এ যাবৎ তাহার প্রতিবাদ না করার কারণ কি? না করিলে আপনার অযশঃ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি উদাসীনেরা প্রতিবাদীর মতে চলিবে। অতএব সত্যের অনুরোধে সাধারণের নিকট ঠিক কথা বলা উচিত।

গুরু—বৎস! নির্ব্বাক্ থাকার কারণ—অসুখ। বয়সের ৬০ বৎসর অতীত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩৩ বৎসর সমান উৎসাহের সহিত টোল চালাইতেছি, তথাপি সমাজে নগণ্য থাকিলাম যশের শীতল ছায়ায় প্রাণ জুড়াইতে পারিলাম না। অপযশের ভয় কি? মাথা নাই, তা'র মাথার ব্যথা। প্রত্যুত এই বাদপ্রতিবাদে নাম জাহির হইলে গণ্য মান্য হইতে পারি। ফল কথা, "মৌনং সম্মতি লক্ষণং" এই হিসাবে সত্যের খাতিরে এবং তোমাদের অনুরোধে বক্তব্য প্রকাশ করিতেছি।

প্রতিবাদকর্ত্তা দুটী ভুল দেখাইতে গিয়া মহাভুল করিয়াছেন। আপনার ঘর না সামলাইয়া পরের ঘরে মাত করিতে যাইলে এইরূপ বিড়ম্বনা হয়। প্রতিবাদকর্ত্তা মীমাংসাতীর্থমহাশয় মীমাংসা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

"অস্থিসঞ্চয়নাঙ্গস্পর্শয়োঃ কালমাহ সম্বর্ত্তঃ—
চতুর্থেঽহনি কর্ত্তব্যমস্থিসঞ্চয়নং দ্বিজৈঃ।
ততঃ সঞ্চয়নাদূর্দ্ধমঙ্গস্পর্শো বিধীয়তে॥
চতুর্থেঽহনি বিপ্রস্য ষষ্ঠে বৈ ক্ষত্রিয়স্য চ।
অষ্টমে দশমে চৈব স্পর্শঃ স্যাদ্বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥

এই সম্বর্ত্তবচনে পরিষ্কারভাবেই শূদ্রের দশদিন অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব বিহিত হইয়াছে। "হরি! হরি! 'গুণ হো'য়ে দোষ হ'ল বিগ্যার বিগ্যায়!' আমিও "পরিষ্কার ভাবেই" ইত্যাদি পরিষ্কৃত ভাবে লিখিতেছি, এই সম্বর্ত্তবচনে শূদ্রের দশদিন অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব বিহিত হয় নাই, নয় দিনমাত্র শূদ্রের অঙ্গ অস্পৃশ্য হয় সূচিত হইয়াছে। দশম দিনে অঙ্গ স্পৃশ্য হয় বলা হইয়াছে। অষ্টমে দশমে চৈব স্পর্শঃস্যাদ্বৈশ্যশূদ্রয়োঃ—এই বচনে স্পর্শঃ স্যাৎ বলিয়াছেন। "অস্পর্শঃ স্যাৎ" বলেন নাই। সুতরাং দশম দিনে শূদ্রের অঙ্গস্পর্শে দোষ নাই।

"যানি পশ্যন্ত্যুদাসীনাঃ কর্ত্তা তানি ন পশ্যতি।

উদাসীনেরা যে সকল দোষ দেখিতে পায়, সে সকল দোষ কর্ত্তার চোখে পড়ে না। উদাসীনও সময়ে সময়ে অন্যতর পক্ষে সমাসীন হইয়া পড়েন, নতুবা এমন কেন হইল? প্রবাদ আছে,—নিচুল নামে জনৈক পণ্ডিত কালিদাসের সহায় ছিলেন। তিনি দেখিয়া দিলে তাঁহার লেখা নির্ভুল হইত। পরম্পরায় শুনিয়াছি—কোন নিচুল মহাপণ্ডিত প্রতিবাদ দেখিয়াছেন। তথাপি দিগ্‌গজের স্থূলহস্তের অবলেপ সহ্য করিতে হইল। বোধকরি ভুল ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মাথাও গরম হইয়া থাকিবে তাই নরম করিবার জন্য এবং ভুল নানা কারণে হয় এইটুকু বুঝাইবার জন্য ব্যুৎক্রমে দ্বিতীয় ভুলের অবতারণা অগ্রে করিলাম।

"তস্মাদজ্ঞানমূলোঽয়ং সংসারঃ পুরুষস্য হি।"

ভোলার ভুলে সংসার, সে সংসারে জন্মিয়া নির্ভুল কেমন করিয়া হইবে? আমার মত ব্যক্তির ভুল পদে পদে হওয়ার সম্ভাবনা। প্রতিপদে না হইয়া প্রতিবাদকর্ত্তার মতে দুটী হইয়াছে, ইহা আমার সৌভাগ্য। ফলকথা প্রতিবাদকর্ত্তা যদি নিজের ভুল সংশোধন করিতে গিয়া "শূদ্রের দশদিন অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব" বিকারে নিরাকার বলিয়া অব্যাহতি পান, তবে আমরা কি কোন আকারে অব্যাহতি পাইতে পারি না? বস্তুতঃ নিরাকারেও নিস্তার নাই।

আর একটী কথা এইখানে বলিয়া রাখি, প্রতিবাদকর্ত্তা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া 'ব্রাহ্মণ-সমাজ' সম্পাদক মহাশয়কে ইঙ্গিতে অনুরোধ করিয়াছেন—এরূপ ভ্রান্ত প্রবন্ধ যেন "ব্রাহ্মণ-সমাজে" ছাপান না হয়। আমিও উল্টা গাইতে পারি—এরূপ ভ্রান্ত প্রতিবাদ যেন আর ছাপান না হয়। কিন্তু সে অনুরোধ করিব না; কারণ পরস্পরের ভ্রম প্রদর্শনে আসল কথা বাহির হয়।

শিষ্য—প্রতিবাদ-কর্ত্তা যৌবনসুলভ চপলতায় আপনাকে আক্রমণ করিয়াছেন। আপনি সোজাসুজি প্রতিবাদ না করিয়া কেন তাঁহার অনুকরণ করিতেছেন?

গুরু—বাপু হে! সোজাসুজি বলিলে প্রবন্ধ মিষ্ট হয় না। মিষ্ট না হইলে লোকে পড়ে না। তাই মিষ্ট চিনির পাকে অমিষ্ট মিষ্ট করিতে হয়। এখন আসল কথা বলি প্রতিবাদ-কর্ত্তা লিখিয়াছেন—

"তুল্যকালব্যাপী জ. নমরণাশৌচ হইলে মরণাশৌচ দ্বারাই অর্থাৎ মরণাশৌচ শেষ হইলেই শুদ্ধি হইবে। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। 'সূতকে মৃতকং চেৎ স্যান্ মৃতকে সূতকং তথা। মৃতেন সূতকং গচ্ছেন্নেতরৎ সূতকেন হি।' এই লঘুহারীত বচন দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে তুল্যকালব্যাপী মরণাশৌচ দ্বারাই জননাশৌচ নিবৃত্তি হয়॥" কেবল এ বচন দ্বারা "তুল্যকালব্যাপী" পাওয়া যায় না। মরণাশৌচ দ্বারা জননাশৌচ যায়, এইটুকু মাত্র পাওয়া যায়। আসল কথা—

"অঘানাং যৌগপদ্যে তু জ্ঞেয়া শুদ্ধির্গরীয়সা"।

অর্থাৎ অশৌচসঙ্কর হইলে গুরু অশৌচে লঘু অশৌচ যায়। এই গুরুত্ব বুঝিবার জন্য বচনের অবিরোধী যুক্তির শরণাপন্ন হইতে হয়।

শিষ্য—"মরণোৎপত্তিযোগে তু গরীয়ো মরণং ভবেৎ।" এই আপ্তের বচন বলে জননমরণের মধ্যে মরণ গুরু পাওয়া যাইতেছে। বাচনিক অর্থে ন্যায়ের অবকাশ নাই।

গুরু—ঠিক কথা; কিন্তু আপ্তের মনের ভাব না বুঝিলে আপ্ত ও অনাপ্ত হইয়া পড়েন। তাহার সাক্ষী যুধিষ্ঠির। সত্যবাদী যুধিষ্ঠির বলিলেন, "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ"। কথাটি ঠিক, কিন্তু যুধিষ্ঠির যে অর্থে 'অশ্বত্থমা' বলিয়াছেন, সে অর্থ দ্রোণে সঞ্চারিত না হওয়ায়, তাঁহার বাক্য মিথ্যা হইয়া পড়িল। তাই প্রথমতঃ তাঁহার নরকদর্শন ঘটিল। সুতরাং আপ্তের ভাব অন্যের মনে সঞ্চারিত না হইলে আপ্তও অনাপ্ত হইয়া পড়েন (একথা সাংখ্য প্রবচনভাষ্যে বিবৃত আছে) তাই প্রাচীন ঋষিরা আজকাল অনাপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন, আর পাশ্চাত্য মনীষারা আপ্ত হইয়াছেন। একথা প্রসঙ্গক্রমে বলিলাম।

মরণাশৌচের স্বতঃ গুরুত্ব থাকিলে স্বল্পকালীন মরণাশৌচে দীর্ঘকালীন জননাশৌচ যাইত। সুতরাং বচনান্তরের সহিত একবাক্যতা-বলে এবং যুক্তিবলে আপ্তবচনের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে হইবে। বাচনিক অর্থে ন্যায়ের অবকাশ নাই ইহার তাৎপর্য্য যুক্তিবলে বচনলব্ধ সিদ্ধান্তের অন্যথা করিতে নাই, কিন্তু বচনের নাম শুনিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া যুক্তির পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে নাই। যুক্তি নিরপেক্ষ বচনে ধর্ম্মহানি হয়॥

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।"

শঙ্করভাষ্য। ২।১।১১

অর্থাৎ ঋষিরা যে ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের সাহায্যে তাহার সমর্থন করে, সেই ধর্ম্ম বোঝে, অপরে বোঝে না।

জননাশৌচ অপেক্ষা মরণাশৌচ যে গুরু, ইহারও সুন্দর যুক্তি আছে। সে যুক্তি কিছু বড়, অপর দিনে বলিব। ফলকথা ঋষিরা একটুকুও ফাঁকা কথা বলেন নাই।

জননাশৌচ হইলেও বৈদিক কর্ম্মে অধিকার থাকে না, মরণাশৌচ হইলেও বৈদিক কর্ম্মে অধিকার থাকে না। এ অংশে উভয়ের তুল্যতা; কিন্তু মরণাশৌচ অস্পৃশ্যতাদি কতকগুলি

ধর্ম্ম আছে, সে সকল ধর্ম্ম জননাশৌচে নাই। জননাশৌচে এই সব ভার না থাকাতেই কালের সমতা সত্ত্বেও লঘু হইয়া পড়িয়াছে। তাই বলিয়াছেন "মরণোৎপত্তিযোগে তু গরীয়ো মরণং ভবেৎ" ফলকথা—

"অঘানাং যৌগপদ্যে তু জ্ঞেয়া শুদ্ধির্গরীয়সা"

এ সংসারেও লঘু গুরুর অনুসরণ করে। অশৌচে সে নিয়ম লঙ্ঘিত হইবে কেন? বচনান্তরের সহিত একবাক্যতাবলে গুরু লঘু বিচার করিতে হয়। যে অঙ্গস্পৃশ্যতাবলে মরণ গুরু হইয়াছে, ততোধিক অঙ্গাস্পৃশ্যতাবলে জননবিশেষ কেন গুরু হইবে না, অথবা কেন সমান হইবে না? ইহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। যদি বল শূদ্রার প্রসবে যে অঙ্গাস্পৃশ্যতা হয়, উহা জননাশৌচের ধর্ম্ম নয়, উহা প্রসবাশৌচের ধর্ম্ম, অন্যথা পিতার অঙ্গ অস্পৃশ্য হইত। প্রসবাশৌচ জননাশৌচবিশেষ, অন্যথা সঙ্কর হইত না। যদি বল, প্রসবনিবন্ধন অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব নৈমিত্তিক। নৈমিত্তিক অঙ্গস্পৃশ্যত্ব গুরুত্বের প্রযোজক হয় না! তাহা যদি না হইত, এক দিনে সপিণ্ডদ্বয়ের মরণ হইলে, সর্ব্ব গোত্রে যাবদশৌচ অস্পৃশ্য হয়। সে অশৌচ নৈমিত্তিক-অস্পৃশ্যতাবলে গুরু হইয়া অঘবৃদ্ধি-মদাশৌচের তুল্য কেন হয়?

শিষ্য—"জাতমাত্রস্য বালস্য যদি স্যান্মরণং পিতুঃ।
মাতুশ্চ সূতকং তৎ স্যাৎ পিতা ত্বস্পৃশ্য এব চ॥

অর্থাৎ জাতমাত্র বালকের মৃত্যু হইলে মাতা পিতার স্বজাত্যুক্ত অশৌচ হয়। বেশীর ভাগ পিতার যাবৎ অশৌচ অঙ্গ অস্পৃশ্য হয়। আপনার মতে এ অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব বশতঃ অশৌচ গুরু হইতে পারে?

গুরু—এখানে ঐ অঙ্গাস্পৃশ্যতা মরণনিবন্ধন, জননিবন্ধন নয়। মরণাশৌচ লঘু বলিয়া জননাশৌচের অধীন হইয়াছে, অধীনের স্বাধীনতা না থাকায় উহার অঙ্গ গুরুত্বের প্রযোজক হয় না।

শিষ্য—বেশ, সপিণ্ডমরণে শূদ্র জাতির ৯ দিন মাত্র অঙ্গ অস্পৃশ্য হয়, এবং ত্রিরাত্র মহাহবিষ্য করিতে হয়। কিন্তু প্রসবে মাতার ১৩ দিন মাত্র অঙ্গ অস্পৃশ্য হয়। যেমন অঙ্গাস্পৃশ্যতা ৪ দিন বেশী, তেমন মহাহবিষ্য নাই। অতএব প্রসবাশৌচ সপিণ্ডমরণাশৌচ অপেক্ষা লঘু বলিব।

গুরু—একেবারে লঘু না বলিয়া সমান বলিলেই বা হানি কি? গুরু না বলারই বা কারণ কি?

শিষ্য—আপনার পক্ষেই বা বিনিগমনা কি?

গুরু—ব্রাহ্মণের পিতৃবিয়োগে দশদিন অশৌচ হয়; আর বারদিন মহাহবিষ্য করিতে হয়। এবং ৩ দিন মাত্র অঙ্গ অস্পৃশ্য হয়। একদিনে দুইজন সপিণ্ড মরিলে, দশদিন অশৌচ

যাবৎ অঙ্গ অস্পৃশ্য হয়, এবং ৩ দিন মহাহবিষ্য করিতে হয়। ব্যবকলন করিলে মহা-গুরু মরণে যেমন ৯ দিন মহাহবিষ্য বেশী, তদ্রূপ সপিণ্ডমর মরণে ৭ দিন অঙ্গাস্পৃশ্যতা অধিক। এইরূপ স্থলে যদি ৯ দিন মহাহবিষ্য ৭ দিন অঙ্গাস্পৃশ্যতার সমান হয়; তবে সপিণ্ড-মরণে ৩ দিন যাবৎ মহাহবিষ্য প্রভৃতির ৪ দিন বেশী অঙ্গাস্পৃশ্যতা অপেক্ষা লঘু কেন না হয়? অথবা সমান কেন না হয়? আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধারণা হয় না। মহাবুদ্ধিতে ভাল না লাগে অশৌচে মতভেদের অভাব নাই, বোঝার উপর শাক-আটিটা তত ভারি হইবে না। সুতরাং যাহার যেমত ভাল লাগে, তিনি সেই মতে চলিতে পারেন।

ভিন্ন ভিন্ন বিচারক একই আইন বলে ভিন্ন ভিন্ন রায় প্রকাশ করেন। চরমে ফুল বেঞ্চের বিচার অভ্রান্ত বলিয়া মানিত হয়। নিরপেক্ষ পণ্ডিতবর্গ আমার ফুলবেঞ্চ। প্রতিবাদ-কর্ত্তা রায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমিও মোশনে আবার রায় প্রকাশ করিলাম। দুই রায় অগ্রপশ্চাৎ দেখিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্তই সিদ্ধান্ত।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

হিন্দুস্থানি—পর্ব্ব।

"বার মাসের তের পর্ব্ব"—বঙ্গদেশীয় প্রবচন। হিন্দুস্থানে এরূপ কোন প্রবাদ নাই, কার্য্য-কালে কিন্তু একত্ব আছে। হিন্দুর অনুষ্ঠানপদ্ধতি সর্ব্বত্রই এক। একই শাস্ত্রের অনুশাসনে এই বিরাট বিশাল হিন্দুসমাজ পরিচালিত—মাত্র দেশভেদে সামান্য পরিমাণে কিছু পার্থক্য আছে। উপরের প্রবাদ বাক্য হিন্দুস্থানে প্রচলন না থাকিলেও কার্য্যে যথেষ্ট মিল আছে।

বিশাখানক্ষত্রের আবির্ভাব সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পুনঃ বিশাখার উদয় সময় পর্য্যন্ত সময়কে শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ মাসনামে বিভাগ করিয়া পারত্রিক এবং ব্যাবহারিক আচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বাঙ্গলাদেশে প্রতিমাসে একটা না একটা পর্ব্বানুষ্ঠান লেগেই আছে। এই কারণ বঙ্গভাষায় এই প্রবাদ প্রচলিত আছে। হিন্দুস্থানে প্রতিমাসে বিশেষ কোন পর্ব্বানুষ্ঠান নাই। কিন্তু মাস বিশেষে অল্পাধিক পারত্রিক উৎসব আছে।

আমরা অদ্য সেই অনুষ্ঠানসমূহের কাহিনী অবলম্বন করিয়া "হিন্দুস্থানিপর্ব্ব" নামে প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

শ্রবনানক্ষত্র যখন রাশিচক্রের কল্পিত রেখায় অর্দ্ধপথে উদয় হয় অর্থাৎ শ্রাবণমাসের তৃতীয়া তিথিতে "তীজ"নামে পর্ব্ব উপস্থিত হইয়া আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিকের প্রথম সময় পর্য্যন্ত "নবরাত্রি" নামক অনুষ্ঠানের সময় পর্য্যন্ত পর্ব্বাহগুলি দ্রুতগতিতে সুসম্পন্ন হয়। তৃতীয়া তিথির পূর্ব্ব ৩।৪ দিন হইতে-তীজ, অর্থাৎ তৃতীয়াব্রতানুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ইহার অগ্রে কিন্তু নাগপঞ্চমীব্রত নিষ্পন্ন হয়। বঙ্গে যাহাকে মনসাপূজা কহে, হিন্দুস্থানে তাহাকে নাগপঞ্চমী কহে।

বাঙ্গালি বঙ্গভাষার জনয়িতা, উৎকর্ষদাতা এবং প্রসারক। বঙ্গের কবিগণই এই কীর্ত্তি-লাভের পূর্ণ অধিকারী। খাঁটি বঙ্গীয় কবিগণের লিখিত এবং লিখনসঞ্জাত শক্তিমাহাত্ম্যঘটিত "পালা" নামক সঙ্গীতময়ী কবিতাপ্রচারপ্রথা বঙ্গের অধিকাংশ সাধারণ অধিবাসিগণ দেবদেবীর বিভিন্ন নামে ভক্তির সহিত পূজা করিয়া থাকেন। মঙ্গলচণ্ডী, গাজন্ ধর্ম্মঠাকুরের পূজা, শুভচণ্ডী, সুবচনী, মনসা, শনিপূজা, সত্যনারায়ণ ইত্যাদি পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলিকে বাঙ্গালি অতি যত্নের সহিত পূজা করিতেছেন। হিন্দুস্থানে এরূপ কোন অনুষ্ঠান নাই। এই দেশে পুরাণ-প্রচারিত অনুষ্ঠানই অধিক। এই কারণে বঙ্গের মনসা পূজা এদেশে নাগপঞ্চমী নামে অভিহিত।

এই নাগপঞ্চমী ব্রত সম্পূর্ণ পৌরাণিক ক্রিয়া। এই সময় সমগ্রহিন্দুস্থানে কার্য্যের পূর্ব্ব হইতে আয়োজন হইতে থাকে। বঙ্গে যেমন মনসাপূজার জন্য মাটির সর্পযুক্ত ঘট সংগ্রহ হইয়া থাকে, হিন্দুস্থানে সেইরূপ মাটির ঘট এবং কাগজে চিত্রিত সর্প প্রতি গৃহস্থের গৃহে উপস্থিত করা হয়। রাত্রিপ্রভাতে প্রত্যেক পল্লীর বালকগণ চিত্রিত সর্প লইয়া বিক্রয় জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতেছে, আর বলিতেছে,—

"ছোট গুরুকা বড়গুরুকা নাগ লেনা ?"

গৃহিণীগণ আবশ্যকানুযায়ী বা ইচ্ছানুযায়ী পয়সায় ৩।৪টী ক্রয় করিতেছেন। কাশীতে নূতন আসিয়াছিলাম—অর্থাৎ হিন্দিভাষা যখন ভাল বুঝিতাম না—অথবা হিন্দুস্থানীর সুরবোধ ছিল না—তখন একদিন নাগপঞ্চমীর সময় প্রাতে শয্যায় থাকিয়া—এই শিশুকণ্ঠধ্বনি শুনিয়া, আর তাহাদের হস্তে চিত্রিত সর্প দেখিয়া সঙ্গীকে বলিয়াছিলাম ছেলেরা বোধ হয় পাঠশালায় যাইতেছে। কোন দুষ্ট ছেলেকে শিক্ষকের আদেশে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, তাই আমাদের বাল্যকালে শ্রুত—

গুরুমহাশয় গুরুমহাশয়
তোমার পড়ো হাজির
বিচার করে মেরো বেত এই ছোড়া পাজির
নেপলা যেন ঘাড়ে চড়ে চল্লো শ্বশুরবাড়ী
হাজির না ক'রতে পারি খাবে বেতের বাড়ী।

ইত্যাদি

ছড়ার ন্যায় ছোট গুরু বড় গুরু বলতে বলতে যাচ্ছে। কিন্তু এখন দেখি তাহা নহে। নাগপঞ্চমীর জন্য ছোট বড় নাগ লইয়া ফিরি করিতেছে। এই নাগপঞ্চমী হইতে হিন্দুস্থানে পর্ব্বারম্ভের সূত্রপাত হয়। ক্রমে হিন্দোলা, তীজ, বাজরী, নবরাত্রি, রামলীলা, দেওয়ালি কুথার, রাস, তীলুয়াসংক্রান্তি, খেচরিসংক্রান্তি, হোলি এবং বুড়ামঙ্গল ইত্যাদি পর্ব্ব আচরিত হয়। এই কারণেই বলিয়াছি হিন্দুস্থানে উপরের প্রবাদ বচন নাই বটে, কার্য্যকালে কিন্তু মিল আছে।

তীজ—ইহা শ্রাবণ মাসে হিন্দোলা অর্থাৎ ঝুলন হইবার পর হইতে আরম্ভ হয়। তৃতীয়া তিথিতে এই উৎসবের নির্দ্দিষ্ট দিন। এই জন্য ইহার নাম তীজ। এই পর্ব্বটি স্ত্রীমহলের বড় আদরের বস্তু। ইহা একটী ব্রত বিশেষঃ। তীজ আরম্ভ হইবার ৩।৪ দিন অগ্র হইতে পল্লীগুলি সঙ্গীত কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে। ইহার পরেই বাজরী পর্ব্ব উপস্থিত হয়। কামিনীকুল নির্দ্দিষ্ট দিনের অগ্রে ৩।৪ দিন রাত্রিতে জ্যোৎস্নালোকে বসিয়া বাজরী তালিম (Rehearsal) দিতে থাকে। এই গীততালিম ব্যাপারে পুরুষের আদৌ কিন্তু স্থান নাই। কামিনীগণ একটী সামান্যপ্রকারের খোল আর এক জোড়া করতাল লইয়া ৭।৮ জনে স্থানে স্থানে উন্মুক্ত ফুল্লজ্যোৎস্নাপুলকিত প্রাঙ্গণে কিম্বা গৃহপার্শ্বে ক্ষুদ্র দীপাধার সমীপে বসিয়া কার্য্যারম্ভ করে। এই সময় গৃহস্থিত পুরুষগণ কেহ হয় তো শিশুরক্ষণে কেহ বা গৃহকার্য্যে অথবা নিদ্রার কোলে অবস্থান করে। এই তালিমের বাজনা এবং তাল প্রায়ই একরূপ। কোন কোন গীতে সুরের সামান্য মাত্র প্রভেদ আছে। যে রমণী বাদ্য কারিণী তিনি মধ্যস্থলে বসিয়া থাকেন, সঙ্গীতকারিণীগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া তাঁহাকে তারাঘেরা চন্দ্রিকাশালিনী চন্দ্রমার ন্যায় শোভা দেখাইয়া গীতঝঙ্কারে নীরব রজনীকে মুখরা করিয়া তুলে। এই সঙ্গীতকারিণীগণের গীতগুলি বহুপ্রকারের আছে। কিন্তু প্রেমসঙ্গীতই অধিক। তবে দুই একটী ব্যঙ্গ সঙ্গীতও আছে। পূর্ব্বে জানিতাম যে হিন্দুস্থানে কেবল হোলিতেই অশ্লীল সঙ্গীত গীত হয়। কিন্তু এখন দেখি যে উৎসবমাত্রেই প্রায় একই ভাবের সঙ্গীত গীত হয়। তবে শ্লীলতাময় সঙ্গীতও আছে। গুটিকয়েক সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে এই সকল গ্রাম্য-গীতে যথেষ্ট কবিত্বসৌন্দর্য্য আছে।

যাহারা এই সকল সঙ্গীত রচনা করে—তাহারা শিক্ষিত নহে। একে হিন্দুস্থানের সাধারণ লোকসমূহ পূর্ব্বকালের ভারতীয় ভাবপ্রবণতা লইয়া বাস করে—তাহার উপর পূর্ব্বকার অনার্য্য আচার-ব্যবহারে ইহারা প্রায়ই অভ্যস্ত। আবার মুসলমান সংস্পর্শজনিত নিম্নশ্রেণীর রীতিনীতি অদ্যাপি যথেষ্ট আচরিত। সহর ভিন্ন "দেহাদ" অর্থাৎ পাড়াগ্রামের অধিবাসিগণ বর্ত্তমান সভ্যতার আদৌ আস্বাদ পায় নাই। বাঙ্গলার ন্যায় এই প্রদেশে পাশ্চাত্য ভাব আদৌ নাই। যে দুইদশ জন বর্ত্তমান ভাবপ্রবণ ব্যক্তি আছেন তাঁহারাও পূর্ব্বকালের আচার-ব্যবহার অনুষ্ঠান-পদ্ধতি একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। কাজেই অল্প হিন্দি-জানা স্বভাবকবিগণ এই সকল সঙ্গীত প্রস্তুত করিয়া পল্লীগ্রামের রসিকাগণকে শিক্ষা দেয়।

পর্ব্বদিনে তাহাই গীত হয়। এই সকল সঙ্গীতের ভাষা মার্জ্জিত নহে। একদিন রাত্রে একটী ২১।২২ বর্ষের অর্দ্ধসভ্য আহিরযুবক গাইতেছিল—

কাঁটা লাগেরে দেবরিয়া—
তুকে সঙ্গ চলন না যায়।
পাঁজরে ডগরা চলন না যায়॥
আঁধি রাতি মোঁয় লেওনে আও
রাস্তা ছোড়কে রাস্তা যাও।
শাস ননদিসে পুঁছ নেহি আও।
চলত চলত মোর পীড়লি থাকি—সগরি পীড়ায়।
আপন মহনমে মঁয় আলবেলি
যৌবন খেলয় ফুল চামেলি—
ধূপ পড়ে কুমলায়॥

অনুবাদ—

চলা নাহি যায় দেবর কাঁটা লাগে পায়।
তোর সাথে তাড়াতাড়ি চলা বড় দায়॥
দেখ ড্যাকরা দেখ পাজি যেতে নাহি পারি।
অর্দ্ধরাতে আমাকে আনলে চুরি করি॥
রাস্তা ছেড়ে মরি অন্য রাস্তায় যাইয়া—
শ্বাশুড়ী ননদীর কাছে—নাহি জিজ্ঞাসিয়া।
চলিতে চলিতে হাঁটু হইল অবশ।
না পারি চলিতে আর শরীর অবশ॥
আপনার ঘরে ছিনু আলবল প্রায়
যৌবন চামেলি সম শোভিত তাহায়।
রৌদ্র তাপে আজ বুঝি শুকাইয়া যায়॥

এই গীতটি শুনিয়া আমার এক বন্ধু কহিলেন—বাহবা কবিত্ব, গানটী লিখিয়া লও ভাই। আমি যুবককে ডাকিলাম, গানটি লিখিয়া লইলাম। সেই দিন হইতে বাজরী গীত শুনিলে তাহার মাধুর্য্য বিচার করিতে লাগিলাম। মোটের উপর বুঝিলাম পল্লীনারীগণ সুন্দর কবিত্বময় সঙ্গীত গান করিয়া হিন্দিভাষার গৌরব প্রচার করিয়া থাকে। প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা জন্য এইস্থানে একটা মোটামুটি পর্ব্বগুলির পরিচয় লিখিত হইল।

(১) হিন্দোলা—ঝুলন। (২) তীজ—তৃতীয়া ব্রত। (৩) বাজরী—ভাদ্রের কৌতুকময় উচ্ছ্বাস। (৪) নবরাত্রি—দুর্গাপূজার অগ্রবর্ত্তী নয় দিনের সংযম। (৫) রামলীলা—রামায়ণ অভিনয়। (৬) কুথার—আখিনী সংযম। (৭) দেওয়ালি—দীপান্বিতা। (৮) রাস শ্রীকৃষ্ণের

নারীসহ বিহার। (৯) তীলুয়া সংক্রান্তি পৌষ-পার্ব্বণ। (১০) খেচরীসংক্রান্তি—নবান্ন। (১১) হোলি—দোলোৎসব। (১২) বুড়ামঙ্গল—ইত্যাদি।

এই বুড়ামঙ্গল উৎসবটী মাত্র কাশী মহানগরীতেই অনুষ্ঠিত—বর্ত্তমান কাশী নরেশের আদি-পুরুষ বৃদ্ধ বলবণ্ড সিংহ চৈত্রমাসে এই উৎসবটীর প্রবর্ত্তন করেন। এই সময় কাশী-রাজধানী রামনগর হইতে বড় বড় কাচ্ছা (নৌকা) সুসজ্জিত হইয়া গঙ্গাবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে বহু প্রকারের কৌতুকপ্রবাহ বহাইয়া নরনারীগণকে তিন দিন কৌতুক-কুহকে আমোদিত রাখে। এই উৎসব হিন্দুস্থানের অন্য কোন স্থানে নাই। এই সকল পর্ব্বের মধ্যে বাজরী পর্ব্বেই অধিক পরিমাণে সঙ্গীত কামিনীকণ্ঠে গীত হয়। যে সময়ে আহির-যুবক গীতটী লিখিয়া দিতেছিল, সেই সময় দূরে একটী প্রবীণা গোড়কামিনী তরকারী বিক্রয় করিতে আসিয়া ক্রয়কারিণী কামিনীগণের অনুপস্থিতি-নিবন্ধন আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া একটী গান করিতেছিল। আহির-যুবক তাহা শুনিয়া কহিল, "বাবুসাহেব শুন্‌লেও ক্যায়সে বাজরী"— আমি তখন বুঝিলাম এক শ্রেণীর সঙ্গীতের নামই বাজরী। এই সঙ্গীতগুলি অধিকাংশই নবনারীর প্রেম-কাহিনীতে পূর্ণ। ভাবের আবেগতায় আর সুরের ঝঙ্কারে শ্রোতা মাত্রেই উহা শুনিয়া মুগ্ধ হয়। অনেক তোষামোদ করায় -

ঘেরি এলি কালি হো বদ রোঁয়া
ঘরওয়াসে নিকালি ননদী ভৌজিয়া—
ইক দোন জুড়ি আয়।
ঘেরি এলি কালিহো বদরোঁয়া
ভৌজিকা শোভা লাল টিকিওয়া ননদিকা রোরি রে
সামেলিয়া—ভৌজিকো লাল ঝুলুওয়া ননদিকা
চেলি—ইকদোনো জুড়িয়ে সামেলিয়া তুকো
ভুলন ন যায়। ইত্যাদি।

অনুবাদ।

কালমেঘে ঘিরেছে আকাশ
ননদীর সহ বধূ ত্যজে গৃহ বাস,
আসিয়াছে দু'জনাতে হইয়া বাহির
লাল টিকা বধূর ভালে রোরি ননদীর।
চেয়ে দেখ শ্যামচাঁদ শোভা যুবতীর—
লোহিত ঝুলপী পরি বধূ চলিয়াছে
চেলিপরা ননদিনী শ্যামপানে চায়। ইত্যাদি।

গীত শুনিতে শুনিতে সুরের ঝঙ্কারে আর সঙ্গীতকারিণীর চটুল চাহনীতে মুগ্ধ হইয়া যুবকের নিকট আরও দুইটি সঙ্গীত লিখিয়া লইলাম। কিন্তু তত ভাবসৌন্দর্য্য বা পূর্ণত্ব পাইলাম না। বলা বাহুল্য বাজরী গীতের রসাস্বাদন কিন্তু পূর্ণরূপই পাইয়াছিলাম। যুবক গাহিল—

ভরণেদে গাগরী না ছোড় গারি দিবুরে
মঁয় আপন পিতাকো জাই পাণি ভরণে কুয়া পর আই
মঁয় গারি কি বাসুকি না খাইরে।
ছোড়রে শ্যাম ডোরি লই কহুজে কোড়ি কোড়ি রে
মঁয় তেরহ বরষ ছোড়ি রে।
তু ভরণে দে গাগরী রে।

অনুবাদ—

কলসী ভরিতে দেও নইলে দেব গালি
নিজ পিতার কন্যা আমি সৎপথে চলি—
জল লইতে কুয়ার কাছে আসিয়াছি আমি
কুকাজে কুমতি দিও নাকো তুমি।
ছেড়ে দাও দড়ি, আমি দাঁড়াইতে নারি
তের বছরের মেয়ে লজ্জায় আমি মরি। ইত্যাদি।

খ। তেরি ছল বল হ্যায় নেয়ারি—
তেরি ছল বল হ্যায় নেয়ারি
বাকি ছাবেলি সামেলিয়া জলে।
আজ ছোড়ামি হাত—নেহি ছোনেকি বাত
করো গাঁউরোসে গাও বা রা বা।

অনুবাদ—

তোমার ছল বল হইল বৃথা—
বন্ধু নাহি হাবভাব হেথা
আজ ছোড় মোর হাত
নাহি হবে কোন বাত।
পল্লীনারীর গমনে ক'রনা ব্যাঘাত। ইত্যাদি

এই গীতটি গ্রামোফণে পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ইহার সুরে মদিরা মাখা আছে, শুনিলেই নেশা ধরে—সৌখিন যুবকের হৃদয়ে বিলাসের উন্মাদনা আনিয়া বিহ্বল করিয়া তুলে, এইরূপ বহু সঙ্গীত বজরী পর্ব্বে গীত হয়। এদেশের উৎসব মাত্রেই সঙ্গীতের প্রচলন অত্যধিক। কামিনীমণ্ডলী ইহার প্রয়োগকর্ত্রী। এমন কোন একটী পর্ব্ব দেখা যায়না, যাহাতে কামিনীগণ সঙ্গীত আমোদ উপভোগ করেনা। ধনীর প্রাসাদ হইতে দীনের কুটীর পর্য্যন্ত সঙ্গীত-স্রোতে প্লাবিত। বিবাহ-উৎসবে উচ্চশ্রেণীর গৃহস্থ-গৃহে বরানুগমন হইতে বিবাহের শেষ দিন পর্য্যন্ত সঙ্গীতামোদে বিবাহ-মন্দির উচ্ছ্বসিত থাকে। ইহা কিন্তু বড় অশ্লীল।

হিন্দুস্থানের অসূর্য্যম্পশ্যা কামিনীগণ ঘোমটায় মুখ আবৃত করিয়া নীললোহিত বর্ণের বস্ত্র

উড়াইয়া বাঁশরীতানে বাঁশরী তুল্য সুরে প্রকাশ্য রাজপথে গান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না। এমন কি কোন উৎসবে যদি দৈবঘটনায় সঙ্গীত না হয়, তাহা হইলে উচ্চশিক্ষিত যুবকগণ পর্য্যন্ত অমঙ্গলাশঙ্কা আর অসন্তুষ্টি বোধ করেন। সংস্কারে এমনিই মদিরা মাখা যে লোকে বুঝিয়াও তাহার কুহক হইতে অব্যাহতি পায় না। সময় সময় পর্ব্বদিন উপলক্ষ্যে দুই দল নারীতে সঙ্গীতকলহ পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। ইচ্ছা ছিল এই সকল সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া বঙ্গভাষার অঙ্গে একটা শ্রীধারণ করাই, কিন্তু পারিলাম না। বড় অশ্লীল নেহাৎ গ্রাম্যকৌতুক। বঙ্গের যেসকল রসিকপুরুষ এই সকল সঙ্গীত শুনিতে ইচ্ছুক, তিনি হিন্দুস্থানের কোন বিবাহ বাড়ী উপস্থিত হইবেন।

বিবাহসঙ্গীতে বৈবাহিক বৈবাহিকীর বড় বিপদ। যুবতীগণ অষ্টালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া একস্থানে বসিয়া বরের চৌদ্দপুরুষের সপিণ্ডীকরণ করিতে থাকে। বলা বাহুল্য ইহা কন্যা-পক্ষের কুটুম্বিনীগণের আপ্যায়ন। ইহারা বরকর্ত্তার বাড়ীর টিক্‌টিকিটি হইতে লবণতেলের আধারটিকে পর্য্যন্ত পরিশুদ্ধ করিতে থাকে। তখন সুরসিক বরযাত্রী ভায়ারা পানের খিলি ফুলের তোড়া সুরকীর গুড়া পাথরের কুচি ছুড়িয়া যুবতী সঙ্গীতকারিণীগণের বক্ষ-স্থলকে আক্রমণ করেন। ঘটনা বশত যদি বরপক্ষের দুইচারিটী রসিকা উপস্থিত থাকেন তাহা হইলে উৎকৃষ্ট সঙ্গীতকলহ আরম্ভ হইয়া পথিকগণকে পর্য্যন্ত প্রফুল্ল করিয়া তুলে। এই সঙ্গীতকলহ আর বাঙ্গালায় "মেঠোকবি" একি ধরণের শ্রুতিবিষয়ে বা অশ্রাব্যে। এই সকল সঙ্গীত শেলধারা ধোবা নাপিত কামার কুমার পুরোহিতকে পর্য্যন্ত বিদ্ধ করে। রসিকাগণ গাইতেছে—

কাঁহে যাওত হয়ে পণ্ডিতিয়া
মুমে মন্ত্র হাতমে কুশা
বৈঠেত কাঁহে ফেরত দিশা
তেরি গোড়মে ধুরি কাণমে চোরি
ভাঙ্গিকো সাথমে বাহার তেরি লড়কিয়া। ইত্যাদি।

আবার স্বর্ণকার যদি নিয়মমত সময় বিবাহের গহনা যোগাইতে না পারিল গায়িকাগণ অমনি তাহার নামে গাইয়া উঠিল।

ক্যায়সি তেরি হাল সোনারিয়া
চাঁদিকি সোণেকি পুঁচমে ঘেরত তেরি মাইয়া
বুড়িয়াকি ঝুলওয়া পোহছাল গোড়িয়া
কাঁহে রেক্তে এই লোয়ালি লড়কিয়া
আওরে ভগবা মুমে দিউঙ্গে স্মরণ রস রসিয়া।

অনুবাদ। কিবা তোর হাল ওরে স্বর্ণকার।
সোণারুপার চৌপে ঘেরা জননী তোমার।

পদে ঝুলপি নোটাইয়া পড়িছে বুড়ীর
কেন পড়ে আঁখিনীর এ কাজে খুকীর
আয় ডেকরা ওলের রস মুখে তোর দিয়ে
হারামকির প্রতিশোধ লই মোরা গিয়ে। ইত্যাদি।

উৎসব দিনে সঙ্গীতকলহ ব্যাপারে স্থানে স্থানে মারামারি কাটাকাটি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। তবে কথা এই যে সমস্ত পর্ব্বের গীত মাত্রই যে অশ্লীল তাহা নহে। একদিন ভাদ্র-রজনীর জ্যোৎস্নাবিধৌত নীরব নিশীথ গগনতলে দাঁড়াইয়া একটী বাজরী শুনিতে শুনিতে দূরের একটী সুসজ্জিত সঙ্গীতমণ্ডপ হইতে একমাত্র কামিনীকণ্ঠে একটী গীত শুনিয়া বুঝিলাম যে এই উৎসবে ধর্ম্মসঙ্গীত এবং শ্লীলতা সঙ্গীতও গীত হইয়া থাকে। যথা—

দুঃখেতে দেওকি রতিয়া বিতরি
কৃষ্ণকো জনম ভৈল
যাই দেবকি যাতু দেওকি জাগায়ল
দুঃখায়ল বিতরি রতিয়া।
লেকে বসুদেও কানাইয়াকো চলল ন
যমুনা মাই ফুকারি ছোড়ে বসুদেও
গেল ঘাবরাই যমুনা গেল শুখাই
দুঃখায়ন বিতরি রাতিয়া। ইত্যাদি।

এই গীতটিতে বিশেষ কোন শব্দ বা মাধুর্য্য নাই, কিন্তু বিশুদ্ধতা আছে বলিয়া লিখিয়া লইয়াছিলাম। আবার বহু অনুরোধ করিয়া আর একটী গীতের অর্দ্ধ শুনিয়া লইলাম। যথা—

"ভোলাকে দেখে মগনভায়ে চোলা
কেহ উড়ায়ে ডাল ডালিয়া কেহ চড়ায়ে বেল পড়িয়া।"

এই সমস্ত সঙ্গীত ব্যতীত হোলিতে আর কাশীর বুড়ামঙ্গলে অশ্লীল গান করা এই দেশের চিরাচরিত প্রথা। দুই একস্থানে হোলিতে অপেক্ষাকৃত শ্লীলতাময় সঙ্গীতও শুনিয়াছি। যথা

মধুবনওয়ামে কানাইয়া কাহে রোখে ডগরি
মঁয়যমুনাকি তীরে যাউঙ্গেরে ।
পানিয়া ভরনে কান্হা মেরি খালি গাগরী।
কালিহি পাণি ঘাটওয়া পর ভইন বড় দেরি
ছামকো লাগল পারি লেকে ননদিয়া ঝগড়ি।
মেরওয়া বদরিয়া ভিজে চুনারি। ইত্যাদি।

অনুবাদ। মধুবনে ঘড়া কাড়ি কানু লও কেনে
যমুনার তীরে যাব আমি আনমনে।

জল ভরে দেও কালা এ শূন্য ঘড়ায়
কাল ঘাটে বড় দেরি আমার হওয়ায়
ননদ ঝগড়া করি দেয় গালাগালি
বাদলায় ঘিরিবে মোর ভিজিবে চুনারি। ইত্যাদি।

আজকাল শিক্ষার গুণেই হউক, আর রেলওয়ের অবাধ গতিতে হউক বা বহুদেশীয় লোকের সমাগমেই হউক, কিম্বা পুলিষের শ সনগুণেই উক, এই সকল অশ্লীল ভাব অনেকটা তিরোহিত হইয়াছে।

হিন্দুস্থানের গ্রাম্যগীতি অধ্যায়ে আবার আর এককপ সাধারণ সঙ্গীত আছে। উহাকে পূর্ববঙ্গের "বারাসিয়া" সঙ্গীতের সহিত তুলনা করা যায়। মাত্র কৃষকগণই ইহার গায়ক। বাঙ্গালি কৃষক যখন ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে বা পাটের জ.ল ও এক হাটু জল মধ্যে থাকিয়া বা আকণ্ঠ ডুবাইয়া হর্ষচিত্তে গাইতে থাকে—

"ওরে নটবর—বা পান খেয়ে গেসি া'র কবিরাজ" ইত্যাদি। হিন্দুস্থানি কৃষকও সেই-রূপ মাথায় প্রকাণ্ড ভার লইয়া বা গোপ বসিয়া দুই হাতের অঙ্গুলি দুই কর্ণে সংলগ্ন করিয়া ও—ও -ও—বলিয়া প্রায় মিনিট কুড়ি সুর টানিয়া গাহিতেছে—"মুমে ভাটকাইয়া বকরি লিয়া রসুয়া ভরলি" ইত্যাদি। অর্থাৎ সে নিমগ্ন হইয়া ক ভেঙ্গচাইয়া বকড়ী লইয়া চলিলি ইত্যাদি। এই সকল সঙ্গীত শুনিলে বাঙ্গালি প্লীহা চমকান রোগের দ্বিতীয় একটা উদ্দীপন কারণ উপস্থিত হয়। অথচ যাহারা হিন্দুস্থান প্রবাসী বা ভ্রমণকারী তাহারা সহস্রগুণে ধীরগম্ভীর ব্যক্তি হইলেও না হাসিয়া নীরব থাকিতে পারেন বলিয়া আদৌ বিশ্বাস করিতে পারিনা।

ইহার পর নবরাত্রি, তীলুয়াসংক্রান্তি প্রভৃতি পর্ব্বের পরিচয় শুনুন।

নবরাত্রি। ইহ দুর্গাপূজার অগ্রবর্ত্তী নয়দিনের সংযম। বঙ্গে যে সময় শরতের সুধ স উঠিয়া শেফালি ফুলের সুবাসে শরৎশশী জ্যোতিকে ভরপূর করিয়া তুলে, বাঙ্গালি ভক্ত গায়ক গাইতে থাকে "শরতে সারদা আসিল আবার" ইত্যাদি। তখন হিন্দুস্থানে শরৎঋতুর আভাষমাত্র পায় আভাষ বলিলাম কেননা এই অঞ্চলে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত ব্যতীত অপর ঋতু পর্য্যায় বড় অল্প। যাহা হউক হিন্দুস্থানি গৃহিগণ রামলীলা আর দেওয়ালির জন্য প্রস্তুত হইবার অগ্রে এই নবরাত্রি পর্ব্বানুষ্ঠান করে।

এই সময় ধর্ম্মপ্রাণ গৃহিনীগণ ব. গৃহস্বামিগণ উপবাস করিয়া পবিত্র শরীরে গৃহে দেবার্চ্চ ার আয়োজন করিয়া নববস্ত্র পরিধান করতঃ সুখাদ্যে বালক-বালিকাগণকে তৃপ্ত রাখিয়া ধর্ম্মালাপে আর ধর্ম্মসঙ্গীতে দিন অতীত করে। কাশীর দুর্গা বাড়ীতে এই সময় প্রকাণ্ড মেলা বসিয়া যায়। অন্যস্থানে দেবালয় বিশেষে উৎসব হয়। কামিনী গণ দলে দলে নানা বর্ণের ওড়না উড়াইয়া মেলা স্থানের শোভা সংবর্দ্ধন করেন। কুলমহিলা-গণ পর্য্যন্ত এই সময় শত শত লোকের সহ ভ্রমণ করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ রাখেন না।

এই নবরাত্রিপর্ব্বে বিশেষ কোনরূপ সঙ্গীতাপাদ নাই। তবে বিশেষ অশ্লীল সঙ্গীত এই সময় বড় গীত হয় না। দুই একটা গীতের দুই চারি চরণ উদ্ধৃত করিয়া নবরাত্রি পর্ব্বালোচনা শেষ করিব। যথা—

ঝুলত রাধাপ্যারি গাওত ব্রজনারী
কান্হা পেগ চালাওয়ে।

গরজত মেঘ ঘনছায় হিমঝিম পড়ে বারি—ডরত নাহি সুকুমারি! কান্হ্যা পেগ চলাওয়ে। শোভে নবত বদমকি ডারি—প্যারীকো হার বিজরীসম চমকে পহিনে সুরথ সারি ঝুলত রাধা প্যারি। কান্হ্যা পেগ চালওয়ে।

অনুবাদ।

কানু চালাইবে দোলা ঝুল বাধা প্যারি
গাইবে ঝুলন গীতি যত ব্রজনারী।
গগনে গরজে মেঘ ছায়া বিস্তারিয়া।
হিমঝিম পড়ে বারি ধরণী তিতিয়া।
নবকদমের মালা করিয়া ধারণ
দোলায় দিতেছে পাক্ শ্রীরাধারমণ
ভয় নাই সুকুমারী হে ব্রজসুন্দরি
তোমারি বসন হার চমকে বিজুলী। ইত্যাদি।

রামলীলা। হিন্দুস্থানের এই পর্ব্বটিকে বুঝিতে বাঙ্গালি সাধারণের কোন অসুবিধা নাই। কেননা ইহা লইয়া রামায়ণ অভিনয়। বিশেষ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী রামলীলার মাঠে বাঙ্গালি ইহার পূর্ণ পরিচয় পাইয়া থাকেন। বিজয়ার দিন সন্ধ্যায় সূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদ হইতে আরম্ভ করিয়া রাবণবধ, ভরতমিলন ইত্যাদি হইয়া তবে কার্য্য শেষ হয়। কাশীর প্রথমদিনের উৎসবকে "নাককাটাইয়া" কহে। একটী কাগজে সুসজ্জিতা রাক্ষসীমূর্ত্তি দুইহাত নাক ঝুলাইয়া রামলক্ষ্মণ বেশধারী শিশুবয়স্ক দুইটি বালকের দ্বারা ছিন্ননাসিকা হইয়া কান্দিতে কান্দিতে চলিয়া যায়, তাহার পর কাগজের বৃহদাকার আবরণমধ্যে সজ্জিত দশমুণ্ড রাবণ সীতা হরণ করিয়া লইয়া যায়। ইহার অগ্রে কিন্তু মায়ামৃগ দর্শন—খরদূষণ বধ হইয়া থাকে। এই উৎসবে অর্থব্যয় বড় অধিক হয়। ব্যবসায়িগণই ইহার রক্ষক। কারবারের উপবিহ্ন দেববৃত্তি হইতে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। ইহাতে সাধারণের মধ্যে রামায়ণ ভিন্ন অন্য গান নাই। তুলসীদাসী রামায়ণ স্থানে স্থানে বড় শ্রদ্ধাভক্তির সহিত গীত হয়। ইহা দেখিবার শুনিবার পর্ব্ব।

কুথার। আশ্বিনী-ব্রত—এই পর্ব্বে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য কাহিনী নাই। শক্তি-মন্ত্রে দেবারাধনা খাদ্যদ্রব্যের রসাস্বাদন ব্যতীত কুথার পর্ব্বে কোনরূপ কৌতুকজনক ক্রিয়া নাই। এইজন্য ইহা সর্ব্বসাধারণ গৃহস্থের মধ্যে প্রচার নাই। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ রাজপুত, লালা, বৈশ্য এবং উচ্চশ্রেণীর শূদ্রসংসারেই কুথারের অনুষ্ঠান। যাজনিক ব্রাহ্মণ-

মণ্ডলীর এই সময় একটী বিশেষ লাভের ব্যবসায় চলে। দীর্ঘকালের পুরাতন বস্ত্র আর মোটামোটা হিন্দি লেখা পুঁথি লইয়া—ব্রাহ্মণগণ প্রকাণ্ড টিকি ঝুলাইয়া ফোঁটা কাটিয়া নগ্নপদে যজমান-বাটীতে উপস্থিত হইয়া পদপ্রক্ষালন না করিয়াই পূজার স্থানে মিনিট দুই বসিয়া মিষ্টদ্রব্য আর চাউল পায়েস লইয়া প্রস্থান করেন। সকল গৃহস্থ-বাড়ীতেই পুরোহিতের নামে সঙ্কল্প হয়। পূজার পদ্ধতি বাঙ্গালা দেশের ন্যায় নহে। পুরোহিতের গমন, আর জলফুল ছড়ানই কার্য্য।

এই দিন স্থানে স্থানে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ড চড়ান—অর্থাৎ শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া হইয়া থাকে। ইহা এক অদ্ভুত প্রকৃতির ক্রিয়া—যজমান মাত্র হাত নাড়িয়া সজ্জিত পিণ্ডগুলি জলসহ বিস্তৃত কুশার উপর বা গঙ্গাগর্ভে নিঃক্ষেপ করিতেই পুরহিতমহাশয়—"বাপকা পিণ্ড চড়াও, মাইকা পিণ্ড চড়াও" বলিয়া অনবরত "রামগঙ্গা বিশ্বনাথজি" বলিয়া যাইতেছেন। পিণ্ডদাতা নীরব—গোত্র উল্লেখ নাই, মন্ত্র নাই, এই এক অভূতপূর্ব্ব শ্রাদ্ধ। কুথারের পর্ব্ব এইরূপে শেষ হয়।

দেওয়ালি।—ইহা এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসব বা পর্ব্ব। সমগ্র হিন্দুস্থানব্যাপী অনুষ্ঠান। প্রত্যেক জেলায় ইহা বিভিন্নরূপে আচরিত হয়। দীপদান প্রথা কিন্তু সর্ব্বত্রই তুল্য। বঙ্গের দীপান্বিতার সহিত ইহার পূর্ণ তুলনা হয়। বাঙ্গালিরা "ভূতচতুর্দ্দশিতে" যেরূপ গৃহে বাহিরে শূন্যে দীপ দিয়া রজনীর আঁধার আলোকের অভিযানে উদ্দীপিত করেন-এই দেওয়ালি পর্ব্বেও সমগ্র হিন্দুস্থান সেইরূপ আলোক-মালায় সুসজ্জিত হইয়া হাসিতে থাকে। দীনদরিদ্র সকলি সাধ্যানুযায়ী স্ব স্ব গৃহ আলোকিত এবং সজ্জিত করিয়া থাকে। এমন কি অনেক মুসলমান-বাড়ীও আলোকমালায় সজ্জিত হয়।

সহরগুলির এই দিনের আলোকিত গৃহ আর তারকা-খচিত নীল আকাশ প্রায়ই একরূপ। এই পর্ব্বে "জুয়াখেলার" বড় অধিক প্রচলন। এমন কোন ইতর ভদ্র নাই যিনি জুয়াখেলাকে একটা বাৎসরিক মঙ্গলামঙ্গল চিহ্ন না বলিয়া বুঝেন। মহাজনগণ এই সময় দশহাজার বিশহাজার টাকা পর্য্যন্ত হারিয়া গিয়া পুনরায় আগামী বর্ষের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। শুনিয়াছি দিল্লী আজমির অঞ্চলে এবং পাঞ্জাবে নাকি স্ত্রী পর্য্যন্ত লোকে এই খেলায় হারিয়া থাকেন। অনেক বাড়ীঘর যে হারিতে হয়, ইহা অযোধ্যা প্রদেশে দেখিয়াছি। যে কণোজের নামে বঙ্গের উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ মহাগৌরবান্বিত, সেই কণোজের বর্ত্তমান ব্রাহ্মণশ্রেণী এই দেওয়ালির জুয়াখেলার প্রতিষ্ঠাতা। এই প্রথাটি সভ্যতামূলক নহে বলিলে—বহু কণোজি ব্রাহ্মণ মহাভারত প্রভৃতির দ্যূতক্রীড়ার কথা তুলিয়া ইহা যে শাস্ত্রানুমোদিত খেলা ইহাই প্রমাণ করেন।

এই পর্ব্বে হিন্দুস্থানের কৃষিসমাজের একচেটিয়া অধিকার, তবে কোন কোন মধ্যবর্ত্তী গৃহস্থ গৃহে হয় না তাহা নহে। ধনীর গৃহে কিন্তু ইহার আদৌ অনুষ্ঠান নাই। সম্ভবতঃ কৃষকগণ সারাবৎসর—বাজরা নাতুয়া-ঘট ইত্যাদির আটা খাইয়া বর্ষের শস্য প্রাপ্তির প্রথম

সূচনায় এই খেচরীসংক্রান্তি করিয়া তৃপ্তিজনক খাদ্য উদর পূরণ করে বলিয়া ইহা তাহাদেরই পর্ব্ব।

তিলুয়া সংক্রান্তি। বঙ্গে যখন শীত ঋতুর পূর্ণ আবির্ভাব, মাঠে ধান্যের ক্ষেত্রে হরিৎ বর্ণের ধান্যশীষ বায়ুতরঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া বঙ্গীয় কৃষকের বহুদিনের আশা পূর্ণ করিতে গড়াইয়া গড়াইয়া পড়ে বিলে ঝিলে অগণ্য মৎস্যকুল ধৃতহইয়া খাদকের রসনার তৃপ্তিদানে আত্মত্যাগ করে, খর্জ্জুররসশালিনী বঙ্গভূমি যখন "মধুবাতামযী" হইয়া উঠে, তখন বঙ্গে পৌষপার্ব্বণ উপস্থিত হয়। বঙ্গ গৃহী এইসময় চাউলের গুড়া আর খর্জ্জুররসসারে পৌষপার্ব্বণোৎসব আরম্ভ করেন। হিন্দুস্থানী গৃহী খর্জ্জুররসসারের অভাবেই হউক, আর পিষ্টকের প্রকারভেদ অভাবেই হউক, তিল আর ইক্ষুরসসারে পরমান্ন প্রস্তত করিয়া দেবতা আর উদর উপদেবতার সেবা করেন। বঙ্গের পৌষপার্ব্বণে ঢেকি কুলা সরার আদর অধিক। হিন্দুস্থানে নববস্ত্র, তিল, গুড়, আর যবের গুঁড়ার আদর অধিক। কাশী অঞ্চলের তীলুয়া সংক্রান্তির যবাগু খাইতে নিতান্ত অপ্রিয় নহে, ইহা দেওয়ালীর পরের উৎসব বলিয়া রামমণ্ডপ বিরচিত ধনীর গৃহ দেওয়ালীর চিত্রিতশয্যার সহিত দর্শকের মনস্তুষ্টি করিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

আয়ুঃ।

জীবনে সকলেরই সাধ ও মরণে অনিচ্ছা; কিন্তু অনিচ্ছা হইলে কি হইবে? সকলেই যে দ্রুতবেগে মৃত্যুর পথে অগ্রসর। প্রাক্তনকর্ম্ম অনুসারে যিনি যতটুকু আয়ুঃ পাইয়াছেন, তাহাও কি ঠিক থাকিতেছে? কথনই না। মনুষ্যের ঐহিক কর্ম্মদ্বারা নির্দ্দিষ্ট জীবনকালের হ্রাসবৃদ্ধি হইতেছে।

মনুসংহিতায় প্রশ্ন হইয়াছিল, শতায়ুঃ মনুষ্য অকালে মরে কেন? তাহারই উত্তর হইল;—

অনভ্যাসেন বেদানাং আচারস্য চ বর্জ্জনাৎ,
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি।

মনু ৫ম অধ্যায়।

বেদের অনভ্যাস, সদাচার পরিত্যাগ, আলস্যও অন্নদোষ এই সকল কারণে মৃত্যু বিপ্রগণকে হিংসা করিয়া থাকে। যাহারা সদাচারী, ধার্ম্মিক ও পবিত্র ভাবাপন্নজাতি, তাহাদের পক্ষেই বিশেষভাবে এই সকলের বিপর্য্যয় মৃত্যুর প্রধানতম কারণ বলিয়া গণ্য হয়। লোক গণনায়

হিসাব দেখিলে বুঝা যায় হিন্দু-সমাজে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উন্নত জাতিতে মৃত্যু সংখ্যা দিনদিন ভয়ঙ্কর ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে।

মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে আয়ুক্ষয়ের যে সকল কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে, বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতিতে প্রায় সকলটাই বিদ্যমান। একে একে তাহার আলোচনা করা হইতেছে।

বেদের অনভ্যাস শব্দে কেবল বেদাধ্যয়নের অভাব নহে, সন্ধ্যাবন্দনাদির অভাব ও বেদের অনভ্যাসরূপ আয়ুঃ ক্ষয়ের প্রধানতম কারণ মধ্যে গণ্য।

মনুসংহিতায় লিখিত আছে—

ঋষয়ো দীর্ঘসন্ধ্যত্বাদ্দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়ুঃ।
প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ব্রহ্মবর্চ্চসমেব চ॥

(৪র্থ অঃ ৯৪ শ্লোক)

ঋষিগণ প্রত্যহ মন্ত্রজপ ও প্রাণায়ামাদি অঙ্গবিশিষ্ট সন্ধ্যার উপাসনা করিতেন, তাহাতেই তাঁহারা দীর্ঘায়ু, প্রজ্ঞা, যশঃ কীর্ত্তি ও ব্রহ্মতেজ লাভ করিয়াছিলেন।

এই সন্ধ্যাহ্নিকের উপকারিতা যে ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণই উপভোগ করিবেন এমন নহে; ভগবান মহেশ্বর তন্ত্রশাস্ত্রে শূদ্র জাতিকেও ব্রাহ্মণাদির প্রায় সমানাধিকার প্রদান করিয়া বলিয়াছেন,—

সন্ধ্যাত্রয়ং যথা কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণো বিধিপূর্ব্বকম্।
তন্ত্রোক্তবিধিপূর্ব্বন্তু শূদ্রঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ॥

যেরূপ ব্রাহ্মণ বিধিমত ত্রিসন্ধ্যার উপাসনা করেন, শূদ্র জাতিরাও তন্ত্রোক্ত বিধানে সেইরূপ ত্রিসন্ধ্যার উপাসনা করিবেন। এই সন্ধ্যার এতই প্রয়োজনীয়তা যে অশৌচাদিতে বৈদিক সন্ধ্যার নিষেধ থাকিলেও তান্ত্রিক-সন্ধ্যা কর্ত্তব্য। সন্ধ্যা না করিয়া, ইষ্টমন্ত্র জপ না করিয়া, কেহই জল গ্রহণ করিবে না;—শাস্ত্র বলেন,—

অস্নাতাশী মলং ভুঙ্‌ক্তে অজপ্তা পূয়শোণিতং

বৈধস্নান না করিয়া যাহারা খায়, তাহারা বিষ্ঠা খায়, এবং ইষ্টমন্ত্র জপ না করিয়া ভোজন করিলে পূঁয ও শোণিত ভক্ষণ হয়।

হায়! শাস্ত্রে যে মন্ত্রজপের এত প্রয়োজনীয়তা এবং তদভাবে কি বীভৎস জুগুপ্সা বর্ণিত আছে,—বর্ত্তমান হিন্দুনামে পরিচয়প্রদানকারী সকল ব্যক্তি কি তাহার স্মরণ করেন?

এই পতিত সমাজে কত ষষ্টি বর্ষীয় বৃদ্ধ—এখনও (মরণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও) বৈধস্নান, সন্ধ্যা বা ইষ্টমন্ত্র জপাদির সম্বন্ধ রাখেন না। তাহাদের সারা জীবনই বিষ্ঠা ও পূঁয শোণিত ভক্ষণে অতিবাহিত হইতেছে; এমন পশুতা যে জাতিতে প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহাদের কল্যাণ হইবে কেন?

আমরা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই ও ব্রীড়ায় মস্তক অবনত করি। গ্রাম্য পাঠশালায় মুসলমান শিশুরা নমাজের সময় হইলে ক্লাসের পড়াশুনা ফেলিয়া সকলে একযোগে শিক্ষক হইতে বিদায় লইয়া "নমাজ" পড়িয়া আসে। মৎস্যজীবী মাছের প্রয়োজনীয় বিক্রয় বন্ধ দিয়া হাত পা ধুইয়া বাজারের নিকটের দীর্ঘিকাতীরে "নমাজে" বসিয়া পড়ে। কিন্তু হয় ত তাহাদের সুশিক্ষিত হিন্দু-শিক্ষক ও জমিদার এযাবৎ সন্ধ্যাহ্নিকের সম্বন্ধ না করিয়া স্বকীয় পশুতার পোষণই করিতেছেন।

কত সভাসমিতিতে দেখিয়াছি মুসলমানেরা নমাজের সময় সভার আবশ্যকীয় কার্য্য ফেলিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদিবিহীন হিন্দু ভ্রাতৃবর্গের বদনে মসীক্ষেপ করিয়া ভগবদুপাসনায় মনোনিবেশ করে। আমরা শুনিয়াছি মুসলমান মধ্যে জাতিভেদ ও অন্নবিচার শিথিল থাকিলেও বেনমাজীর (সন্ধ্যাদিবিহীনের) অন্ন তাহাদেরও অগ্রাহ্য।

আমরা সভ্যতাভিমানী শিক্ষাগর্ব্বে গর্ব্বিত, কিন্তু আমাদের ঈদৃশ অধঃপতন (?) সনাতনধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণ মধ্যে এইরূপ লোকের (সন্ধ্যাদিবিহীন) সংখ্যা যে অভাবনীয়ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। নিজে সংস্কারহীন, স্ত্রীপুত্রাদি ও অসংস্কৃত, সুতরাং ইহাদের তীর্থযাত্রা, পিতৃশ্রাদ্ধাদি, ধর্ম্মকর্ম্ম সমস্তই পণ্ড হইতেছে। আর যাহারা বৈধসংস্কার-যুক্ত ও সন্ধ্যানুষ্ঠানপরায়ণ তাহারাও অসংস্কৃত ব্যক্তিদের অন্নাদি ভোজন করিয়া নিজ নিজ সাধনলব্ধ শক্তিটী হারাইতেছেন।

বিধিমত সন্ধ্যাদি অনুষ্ঠানের মুখ্যফল পারলৌকিক উন্নতি ও ভগবৎকৃপালাভ, তাহার আনুষঙ্গিক ফল সুস্থদেহে দীর্ঘকাল জীবিত থাকা এবং মেধা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, কবিত্বও অভিলষিত বিষয় লাভ।

অধুনা শুনিতে পাই চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক প্রধানতম সভ্যসমাজে প্রচারিত হইতেছে যে সূর্য্যোদয়ের ও সূর্য্যাস্তের সন্ধিকালে শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণের ধ্যানদ্বারা দেহের বায়ু, পিত্ত ও কফ সাম্যভাব ধারণ করে, তাহাতেই দেহে রোগ জন্মিতে পারেনা, ধাতু বৈষম্যেই রোগের আবির্ভাব ও সাম্যেতিরোভাব, ইহ সর্ব্ববাদিসম্মত।

সন্ধ্যাদ্বারা প্রত্যহ এই কার্য্য অতি নিপুণভাবে সম্পন্ন হয়। যেমন একদিকে শ্বেতাদি বিভিন্নবর্ণযুক্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি ঐশী মূর্ত্তির বা বিভিন্ন বর্ণ বিশিষ্ট মূলাধারাদি চক্রও চক্রস্থ দেবতার ধ্যানে, ধ্যানশক্তির প্রাবল্য ও যোগোক্ত সংযম শক্তির ক্রমশঃ পরিপুষ্টি হয়, তেমনি অপর দিকে ইহা দ্বারা দৈনন্দিন অপচারজনিত ধাতুবৈষম্য দূরীকরণপূর্ব্বক দেহকে সুস্থ ও সবল করা হইয়া থাকে।

দেহকে দীর্ঘকাল স্থায়ী ও নীরোগ করিবার অপর প্রধান উপায় প্রাণায়াম্ বা প্রাণসংযম প্রাণিগণের শ্বাসায়তন ও শ্বাসসংখ্যার অনুপাতে আয়ুষ্কাল নির্ণীত হয়। যাহাদের শ্বাসসংখ্যা অল্প তাহারা দীর্ঘায়ু হয় এবং যাহাদের অধিক তাহারা অল্পায়ু হইয়া থাকে।

কয়েকটী প্রাণীর মিনিটে শ্বাস সংখ্যা ও প্রাকৃতিক পরমায়ুর হিসাব দেওয়া হইতেছে।

প্রাণী	প্রতিমিনিটে	প্রাকৃতিক শ্বাস সংখ্যা	প্রাকৃতিক পরমায়ু
শশক	,,	৩৮।৩৯	৮ বৎসর
কপোত	,,	৩৬।৩৭	৮।৯
বানর	,,	৩১।৩২	১০।১১
কুকুর	,,	২৮।২৯	১৩।১৪
ছাগল	,,	২৩।২৪	১২।১৩
বিড়াল	,,	২৪।২৫	১২।১৩
অশ্ব	,,	১৮।১৯	৪৮।৫০
মনুষ্য	,,	১২।১৩	১০০
হস্তী	,,	১১।১২	১০০
সর্প	,,	৭।৮	১২০।১২২
কচ্ছপ	,,	৪।৫	১৫০।১৫৫

মনুষ্যের যে শতবৎসর পরমায়ুর কথা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল হৃষ্টপুষ্ট পুণ্যকর্ম্মা, শক্তিশালী নীরোগ মনুষ্য পক্ষে। কলির মনুষ্য স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, এক্ষণে তাহাদের শ্বাসসংখ্যা মিনিটে ১৫।১৬ বারে উঠিয়াছে, জীবনকালও ক্ষীণ হইয়াছে, মিনিটে ১৫ হিসাব ধরিয়াই তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হইয়াছে মনুষ্য দিবসে একুশ হাজার ছয়শত অজপা বা শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পন্ন করে। এইত গেল শ্বাস সংখ্যার কথা,—এক্ষণে শ্বাসায়তনের কথা বলিব।

পবনবিজয় স্বরোদয় গ্রন্থে লিখিত আছে, দেহাদ্বিনির্গতোবায়ু স্বভাবাদ্দ্বাদশাঙ্গুলিঃ। গমনে ষোড়সাঙ্গুষ্ঠো ভোজনে বিংশতিস্তথা। চতুর্ব্বিংশাঙ্গুলিঃ পান্থে নিদ্রায়াং ত্রিংশদঙ্গুলিঃ। মৈথুনে ষড়ত্রিংশছক্তং ব্যায়ামে চ ততোঽধিকম্। স্বভাবেঽস্য গতে মূলে পরমায়ুঃ প্রবর্দ্ধতে। আয়ুঃ ক্ষয়োঽধিকে প্রোক্তো মারুতে চাম্বরোদ্গতে।

দেহ হইতে নির্গত বায়ু নাসিকা হইতে স্বভাবতঃ দ্বাদশাঙ্গুলি দীর্ঘ হয়। গমনে ষোল, ভোজনে বিশ, দ্রুতবেগে পথ পর্য্যটনে চব্বিশ, নিদ্রায় ত্রিশ, মৈথুনে ছত্রিশ এবং ব্যায়াম কালে তাহাহইতেও দীর্ঘায়তন হয়।

শাস্ত্রীয় প্রক্রিয়া দ্বারা এই বায়ুকে স্বভাব পরিমান দ্বাদশ অঙ্গুলি অপেক্ষা ন্যূন পরিমাণ করিতে পারিলে পরমায়ুঃ বৃদ্ধি পায়। আর মিথ্যা আহার, বিহার ও অনৈসর্গিক কুকাণ্ডে আয়তন বৃদ্ধি পাইলে, আয়ুঃক্ষীণ হইয়া যায়; শ্বাসের আয়তনগত ও সংখ্যাগত ন্যূনাধিক্য অনুসারে আয়ুকালের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

মনুষ্য প্রাণায়াম ও মন্ত্রজপাদি দ্বারা এই দ্বাদশঅঙ্গুলিপরিমিত শ্বাসকে চতুরঙ্গুল করিতে

পারে এবং মিনিটে ১৫বারের শ্বাসসংখ্যা ৭।৮ বারে আনিতে পারে, তাহা হইলে প্রতিদিন কত প্রাণ সঞ্চিত থাকিয়া যায় এবং ক্রমশঃ প্রচুরভাবে আয়ুর্বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

কিন্তু প্রাণায়াম অভ্যাস বাল্যকাল হইতেই করিতে হয়। যখন হৃৎপিণ্ড কোমল থাকে, ফুস ফুস যন্ত্র যখন মৃদু, তখন হইতেই অল্পে অল্পে তাহাতে বায়ুর আঘাত করিতে থাকিলে উহা ক্রমশঃ তীব্রতর আঘাত সহ্য করিবার উপযুক্ত হয়। এইজন্যই ব্রাহ্মণবালকগণ ৭।৮ বৎসরে উপনীত হইয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া থাকেন, এবং স্ত্রী শূদ্রেরাও ষোল বৎসরে যথাবিধি দীক্ষিত হইয়া গুরূপদেশানুসারে প্রাণায়ামাদির অভ্যাস করিবেন, এইরূপ উপদেশ শাস্ত্রে আছে।

পরন্তু হঠাৎ ৫০ বৎসরের বয়সে তীব্রভাবে উৎকট প্রাণায়াম আরম্ভ করিলে অতি শীঘ্রই যমরাজের আতিথ্য গ্রহণ করিতে হয়। এই সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রীয় ঘেরণ্ড-সংহিতায় লিখিত আছে,—

ক্রমেণ সেব্যমানোহসৌ নয়তে যত্র চেচ্ছতি।
প্রাণায়ামেন যুক্তেন সর্ব্বব্যাধিক্ষয়ো ভবেৎ ॥
অযুক্তাভ্যাসযোগেন সর্ব্বব্যাধিসমুদ্ভবঃ।
হিক্কা শ্বাসশ্চ কাশশ্চ শিরঃ কর্ণাক্ষিবেদনাঃ।
জায়ন্তে বিবিধা রোগাঃ পবনস্য ব্যতিক্রমাৎ ॥

অভিজ্ঞ সদ্‌গুরুর উপদেশে অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে প্রাণায়াম আরম্ভ করিলে, এই প্রাণকে ইচ্ছা অনুরূপ যথা তথা অর্থাৎ ভ্রূমধ্যে, নাসিকাগ্রে, মস্তকে বা পাদাগ্রে লইয়া যাইতে পারিবে। উচিতরূপে অনুষ্ঠিত প্রাণায়ামে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয়। আর অনুপযোগিরূপে আচরিত প্রাণায়াম হইতে নানাবিধ ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রাণবায়ুর ব্যতিক্রমে হিক্কা শ্বাস, কাশ, শিরোবেদনা, কর্ণ ও নেত্ররোগ প্রভৃতি নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধি জন্মিয়া সাধকের জীবন নষ্ট করিয়া ফেলে।

শাস্ত্রদর্শী অভিজ্ঞ সদ্‌গুরুর নিকট প্রাণায়ামাদি শিক্ষা করিতে হয়, অযুক্ত প্রাণায়ামাদির ফলে কাশীধাম প্রভৃতি স্থানে সন্ন্যাসীর শিষ্য অনেক বাবুর হৃদ্রোগ, যক্ষ্মা, শ্বাস প্রভৃতি রোগোৎপত্তির সংবাদ আমরা অবগত আছি। সন্ধ্যাদি লঘু প্রাণায়ামে অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

অতএব প্রাণায়াম অপেক্ষা প্রাণসংযমের এবং দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হইবার অপর সহজ উপায় মন্ত্রজপ, এই মন্ত্র জপই সন্ধ্যার মুখ্য। স্বস্তিকাদি স্থির সুখকর আসনে ঋজুভাবে উপবেশনপূর্ব্বক ভ্রূমধ্যে বা নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে যথানিয়মে দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট নাদবিন্দুযুক্ত স্বকীয় রাশ্যাদির অনুকূল বীজমন্ত্র জপ করিতে থাকুন, দেখিবেন আপনার দ্বাদশ অঙ্গুলআয়তন শ্বাস তখন ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতেছে এবং মিনিটে ১৫ বারের শ্বাস সংখ্যা ৭।৮ বারেরও ন্যূন হইতেছে, এইরূপ প্রতিদিন প্রাণ সঞ্চয় করিয়া সুস্থদেহে দীর্ঘকাল জীবিত থাকা যাইতে পারে। সুতরাং মন্ত্রজপ প্রাণ সংযমের বিশেষ উপকারী।

মন্ত্র জপের পরিপাকে আরও অনেকরূপ অলৌকিক—শক্তিলাভ করা যায়, কবিত্ব, বাক্‌পটুত্ব ও অভিলষিত বিষয়প্রাপ্তি মন্ত্রযোগে সাধিত হয়। একদিন স্বনামপ্রসিদ্ধ সাধক উকীল শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী বলিয়াছিলেন,—"আমি সংস্কৃতভাষা পর্য্যন্ত জানিতাম না। কিন্তু ইষ্টমন্ত্র জপের ফলে আমার হৃদয়ে দুরূহ দর্শন-শাস্ত্রের অর্থও প্রকাশ পাইতেছি।"

যে নৈষধকাব্য জগতে অদ্বিতীয় বলিয়া চিরকাল সম্মানিত তাহাও মন্ত্রজপেরই ফল। এই অলৌকিক কাব্যের লেখক, নৈষধচরিতের প্রত্যেক সর্গের শেষভাগে—ভক্তি পরিপ্লুত হৃদয়ে বলিয়া গিয়াছেন ;—

তচ্চিন্তামণিমন্ত্রচিন্তনফলে শৃঙ্গারভঙ্গ্যামহা, কাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে ····সুতরাং মন্ত্রযোগে সাধিত না হয় জগতে এমন কিছুই নাই। তাহাতেই শাস্ত্রকারগণ বলেন,—

"দুর্ভগত্বং বৃথালোকঃ সহতে সতি সাধনে।

সাধন থাকিতে লোক বৃথা, দুঃখ্য দারিদ্র্য সহ্য করে।

২। আয়ুক্ষয়ের দ্বিতীয় হেতু আচারবর্জ্জন। শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ মান্য করা ও শাস্ত্রোপদেশানুসারে আচরণ করার নাম সদাচার; এবং তাহার বর্জ্জনই সদাচার ত্যাগ। ঋষিগণ অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্" ত গুলিও প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন। সূক্ষ্ম ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্ট বিষয়েও তাঁহাদের প্রজ্ঞা প্রতিহত হইতনা। তাঁহারা মানবের হিতের জন্য বিবেচনা-পূর্ব্বক যে সকল বিধিনিষেধ করিয়া গিয়াছেন। আহার, বিহার প্রভৃতি বিষয়ে যে সমুদয় নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার অন্যথা করিলেই অজ্ঞান মনুষ্যের আয়ুক্ষয় হইবে। শারীরিক মানসিক নানারূপ অবনতি ঘটিবে।

ঋষিপ্রণোদিত বিধি নিষেধের মূলে আধুনিক মনীষিগণ বিজ্ঞান-সম্মত সত্যসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাদের সূক্ষ্মদর্শিতা ও জনহিতৈষণায় বিস্মিত হইতেছেন।

সদাচারী না হইলে প্রকৃত শাস্ত্রার্থই হৃদয়ে প্রকাশ পায়না, বুদ্ধি সুমার্জ্জিত হয় না, অপিচ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে বিরুদ্ধদর্শন ঘটিয়া থাকে। এই জন্যই কি স্বাস্থ্য, কি দীর্ঘজীবন, কি জ্ঞানপূরণ, সকল বিষয়েই সদাচার রক্ষা মূল কারণ বলিয়া নির্ণীত হয়।

৩। আয়ুঃক্ষয়ের তৃতীয় কারণ আলস্য, আলস্যদ্বারা শরীরেরও মনের কিরূপ অকর্ম্মণ্য-ভাবও ক্ষয় হয়, তাহা আর ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হইবে না।

বর্ত্তমান সমাজে প্রকৃত কর্ম্মঠ লোকের অল্পতা, সমাজের অনেকেই অলস, অন্ততঃ শারীরিক পরিশ্রমবিহীন, দৈহিক পরিশ্রমাভাব অকালমৃত্যুর অন্যতম কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট। অন্য প্রকারে না হইলেও যোগোক্ত আসনাদি দ্বারাও দেহকে কর্ম্মপটু রাখা প্রয়োজন।

৪। আয়ুঃক্ষয়ের চরম হেতু অন্নদোষ, অন্নদোষ যে র্ত্তমান ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উন্নত জাতিতে কত প্রকারে প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

প্রথমতঃ মাস, তিথি, পক্ষ দিন অনুসারে যে সকল দ্রব্যের ভক্ষ্যাভক্ষের ব্যবস্থা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, অধুনা সর্ব্বত্র তাহা সম্যক্‌রূপে প্রতিপালিত হয় না।

তৎপর খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল, সেই অপদ্রব্য মিশ্রণরূপ কৃত্রিমতা ও অপবিত্রতা, মনুষ্যের আয়ুঃক্ষয়ের প্রাধানতম কারণরূপে দণ্ডায়মান। ঘৃত মধ্যে সর্পের বসা পর্য্যন্ত মিশ্রিত হওয়ার সংবাদ জানা যাইতেছে; এইরূপ তৈল, মধু, গুড় প্রভৃতি অধিকাংশ অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যে নানারূপ অপদ্রব্য মিশ্রিত থাকিয়া মনুষ্যের প্রাণহানির কারণ হইতেছে।

তৃতীয় ভোজনে অপবিত্রতা, যে সকল জাতি পিতৃপুরুষানুক্রমে সদাচারী এবং যাহারা শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ মান্য করিয়া চলিতেছে, এমনিই পবিত্র উপাদানে তাঁহাদের দেহ গঠিত যে হঠাৎ তাহাতে অপবিত্রতা স্পর্শ করিলে, তাঁহাদের দেহের ও মনের ক্ষতি ঘটিয়া থাকে, এই নিমিত্ত অতি পবিত্রাচার বিশ্বস্ত সুহৃদবর্গ ব্যতীত ভোজন ব্যাপারের ভার অন্য হস্তে ন্যস্ত করা বিধেয় নহে।

জননী, ভগিনী, গৃহিণী প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ব্যক্তিরাই প্রত্যহ পবিত্রভাবে অন্নাদি প্রস্তুত করিবেন। স্বয়ং সুস্নাত ও কৃতাহ্নিক হইয়া ভগবান্‌কে অন্ন নিবেদন করিয়া, স্বর্ণাঙ্গুরীয়যুক্ত-হস্তে সুপ্রোক্ষিত ও অভিমন্ত্রিত অন্ন ভোজন করিবে। সুবর্ণ বিষদোষসংশোধক, তাহার সংসর্গে অন্নদোষ দূরীকৃত হয়। দৃষ্টি বিষাদির প্রতীকারার্থেও মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। নিভৃতে বসিয়া নিঃশব্দে ভোজন করিবে, যাহার তাহার প্রস্তুত বা স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করা নিষিদ্ধ।

ভোজন ব্যাপারে সংসর্গদোষ এতই প্রবল যে এক পংক্তিমধ্যে বা এক ছায়ার নীচে পতিত পাপচারী কুষ্ঠরোগী প্রভৃতি থাকিলে তথায় ভোজন করিবেনা, এমন কি যে অন্নে পতিতাদির স্বামিত্বের অভিমান আছে, অর্থাৎ "ইহা আমার" এইরূপ দৃঢ় ধারণা যে অন্নের উপর পতিতাদির বর্ত্তমান, তেমন অন্নভোজন শারীরিক মানসিক ক্ষতিকর। হিতকামী বাগ্‌দুষ্ট অন্নপর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিবে।

ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ মানুষের ঐহিক পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য এই সকল ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। মম্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ বহুতর নিদর্শন আছে, একটীমাত্র উল্লেখ করিতেছি,—

রাজান্নং তেজ আদত্তে শূদ্রান্নং ব্রহ্মবর্চ্চসং।
আয়ুঃ সুবর্ণকারান্নং যশশ্চর্ম্মাবকর্ত্তিনঃ॥

রাজার অন্নে শারীরিক তেজ হানি, শূদ্রান্নে তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চস ক্ষতি, সুবর্ণকারের অন্নে তেজ ব্রহ্মবর্চ্চস ও আয়ুঃক্ষীণ হয়, আর চর্ম্মকারের অন্নে তেজ ব্রহ্মবর্চ্চস আয়ুঃ ও যশঃ নষ্ট হইয়া থাকে।

এই যেমন অন্নদোষে হানির কথা বলিলাম তেমনি অন্নের গুণে শারীরিক মানসিক উন্নতি ও আয়ুর্বৃদ্ধির কথাও বলিব। পবিত্র লঘু স্থির আহার স্বাস্থ্যের মূল। "অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং" ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত-স্বরূপ, সুতরাং এই অন্ন ব্যাধিনাশক ও শারীরিক মানসিক সজীবতা সম্পাদক। সাধারণের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র হইলেও, গুরু ও ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট পরম পবিত্র, দেহ ও মনের পবিত্রতা এবং আরোগ্যদায়ক। পংক্তি মধ্যে পাপী থাকিলে পংক্তি ত্যাগ করিবে, কিন্তু পবিত্রাচার সুব্রাহ্মণ পংক্তিপাবন হইয়া থাকেন।

অন্নে এই সকল গুণাগুণের বিষয় চিন্তা করিয়া তদনুসারে ব্যবহার করিলে অন্নদোষ হইতে অকাল মৃত্যু ঘটিত না। নিদান ত্যাগই সকল প্রকার হানির প্রধান প্রতিকার, এই সকল কথা স্মরণ করিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করিলে কখনই সমাজে অকাল-মৃত্যু বর্দ্ধিত হইত না, কতদিনে সমাজের সুবুদ্ধি হইবে ?

শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্যসাঙ্খ্যতীর্থ।

সন্ধ্যা-ব্যবস্থা।

"প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-পরিবারস্থ প্রত্যেক উপনীত ব্যক্তি যাহাতে ত্রিসন্ধ্যোপাসনা যথাশাস্ত্র করেন এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মণোচিত সদাচার রক্ষা করেন, তদ্বিষয়ের ব্যবস্থা।"

সদাচারপূত আর্য-ঋষিবংশাধ্যুষিত বর্ষশ্রেষ্ঠ ভারতে এক সনাতনধারা যুগযুগান্ত হইতে আসমুদ্রহিমাচল বহিয়া চলিতেছে। এই বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতের মধ্যদিয়াও সে প্রবাহ চিরকালই আত্মবিকাশ করিয়া স্বীয় অস্তিত্বের পরিচয় প্রদান করিবে। সেই অমৃতময়ী ধারা কখনও একেবারে বিশুষ্কতা প্রাপ্ত হয় নাই এবং হইবেও না। বৃক্ষকোটরস্থ সুগুপ্ত বহ্নির ন্যায় জাতিয়তার নিভৃত কোটরে লোক-লোচনের অন্তরালে তাহা অবস্থান করিতেছে। ফল্গুনদীর বারিপ্রবাহের ন্যায় তাহা অতি সঙ্গোপনে মর্ম্মে মর্ম্মে মিশিয়া রহিয়াছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই এবং কোন কালে যাইবেও না। বর্ত্তমান নবপরিবর্ত্তনের অন্তরাল হইতেও তাহার স্বকীয় শক্তির বিকাশের সূচনা দেখা যাইতেছে তাই আজ এই নবীনজাগরণের দিনে, ব্রাহ্মণ-মহাসভার মধ্যদিয়া জাতীয় আত্মবোধ আপন অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।

আমি কে ? এই প্রশ্ন যতদিন না মানবহৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়, ততদিন তাহার আত্মবোধের সম্ভাবনাই থাকে না। এই আমি কে ? আমার কর্ত্তব্য কি ? কোন্ মহাপুরুষের বংশে আমার জন্ম ? ইত্যাদি প্রশ্ন হইতেই মানব আপন আপন কর্ত্তব্যের সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইতে পারে। তাই আমাদিগকে একবার ভাবিয়া দেখিতে হইবে আমি কে ? যে ব্রাহ্মণ-জাতির কথা অতীতের ইতিহাসে দেখিতে পাই, যে ব্রাহ্মণ-জাতির কথা আমরা পুস্তকাদিতে প্রতিনিয়তই পাঠ করিয়া থাকি, এমন কি ঋষিপ্রবর মনু একদিন যে ব্রাহ্মণের বিষয় বলিতে যাইয়া—"এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ" ইত্যাদি গগনস্পর্শী সগর্ব্বোক্তি করিয়া জগতের সমক্ষে আত্মবোধের পূর্ণভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই সাহ্লাদগদগদকণ্ঠে বিনিঃসৃত উক্তির লক্ষ্যস্থল ব্রাহ্মণ আমি কি ? সেই আসমুদ্রক্ষিতিপতি সম্রাট্‌কুলভূষণ বিশ্বামিত্র যে

ব্রাহ্মণের শক্তির নিকট পরাভূত হইয়া "ব্রহ্মবলং পরং মহৎ" বলিয়া স্বীয় সমুন্নত মস্তক নগ্নপদ, পর্ণকুটীরাশ্রয়ী, নিরন্ন ব্রাহ্মণের পাদমূলে অবনত করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন; আমরা কি সেই ব্রাহ্মণ? একদিন আসমুদ্রহিমাচল যে ব্রাহ্মণের সামধ্বনি ঝঙ্কারে মুখরিত হইয়া জগতকে চমৎকৃত করিয়াছিল আমরা কি সেই ব্রাহ্মণ? তাই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় আমরা কে?- সে সদাচার, সে ত্যাগ, সে পরার্থপরতা, সে সংযম প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত গুণ না থাকিলে, আমরা সেই সনাতন ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিব কেমন করিয়া? আমাদের সমস্তই ত একদিন ছিল। আমরা হেলায় সে সম্পদ হারাইতে বসিয়াছি। তাই কবির কথা মনে হয়।

"ধৃতঃ শরীরেণ মৃতঃ স জীবতি"

আমরা ধনবানের বংশধর হইয়াও নির্ধন হইতে বসিয়াছি, ইহা আক্ষেপের বিষয় নহে কি? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন।

বিহিতস্যানমুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃপতন মৃচ্ছতি॥

যে দিন হইতে আমরা বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ হইয়াও বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়াছি, শাস্ত্র-বিগর্হিত অসদাচারে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, ইন্দ্রিয়ের দাসত্বে নিযুক্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারের প্রবল বন্যায় ভাসিয়া চলিতেছি, সেইদিন হইতেই আমাদের পতন আরম্ভ হইয়াছে, মুগ্ধ পতঙ্গের ন্যায় বাহ্যিক চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া অসদাচাররূপ-বহ্নিতে ঝম্পপ্রদান পূর্ব্বক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বসিয়াছি, তাই শাস্ত্রের কথা মনে হয়

অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্ব্বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥

বেদপাঠ ত্যাগ, সদাচারের পরিবর্জ্জন, আলস্য এবং অন্নদোষসমূহ আমাদিগকে যে প্রতিনিয়ত মরণের পথে লইয়া যাইতেছে, তাহা আমরা একবারও কি চিন্তা করিব না।

ইহা একটা অতীব আশ্চর্য্যের কথা যে ব্রাহ্মণ-বালক উপনীত হইয়াও তাঁহার জীবন-মরণের সাথী, সর্ব্বসম্পৎপ্রসূ, আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় ত্রিসন্ধ্যা যে সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, একথা ভুলিয়া যাইতেছেন। শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

"বিপ্রোবৃক্ষ স্তস্য মূলং হি সন্ধ্যা
বেদাঃ শাখা ধর্ম্মকর্ম্মাণি পত্রম্।
তস্মান্মূলং যত্নতো রক্ষণীয়ং
ছিন্নে মূলে নৈব শাখা ন পত্রম্॥"

ছিন্নমূল বৃক্ষ যেমন অচিরকাল মধ্যে ভূপতিত হইয়া বিগত চেতন হয়, তদ্রূপ বিপ্ররূপ বৃক্ষের সন্ধ্যারূপ মূলদেশ সুরক্ষিত না হইলে তাহার চৈতন্য ও সুরক্ষিত হইতে পারে না। জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে হইলে স্ব স্ব বর্ণোচিত কর্ত্তব্যসমূহ যথাশাস্ত্র

প্রতিপালন অবশ্য করিতে হইবে। লৌকিক হিসাবে দেখিতে গেলেও ইহা অতি সত্য। যিনি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহাকে সদাচারপূত হইয়া যথাবিধি ত্রিসন্ধ্যা সন্ধ্যাদেবীর উপাসনা করিতে হইবে। শাস্ত্র বলিতেছেন ! -

"সন্ধ্যাহীনো শুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।

যদন্যৎ কুরুতে কিঞ্চিন্ন তস্য ফলভাগ্ ভবেৎ॥"

সুতরাং জীবন মরণের সম্বল এই সন্ধ্যোপাসনা যিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার অকরণীয় কার্য্যই বা আর কি থাকিতে পারে?

বহুশাস্ত্রালোচনায় জানিতে পারা যায় যে এই সন্ধ্যাবিধি এবং সূর্য্যোপাসনাদির অভ্যন্তরে এমন একটী অলৌকিক শক্তি নিহিত আছে, যাহার বলে ব্রাহ্মণ সহজেই ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন। পরন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষেও ইহা যে পরম উপযোগী তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

কেননা যথারীতি উপাসনা করিতে হইলেই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উত্থান এবং যথাশাস্ত্র স্নানাদি নিয়মিতরূপে করিতে হইবে। যে কোনও দেশের যে কোনও উন্নত জাতির সামাজিক বিধি ব্যবস্থার বিষয় আলোচনা করিতে গেলেই দেখিতে পাওয়া যায়, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য দেশ কালপাত্রানুসারে কোন না কোন স্থায়ী নিয়ম তাঁহারা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। সে হিসাবেও দেশকালপাত্রানুসারে আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর এই নিয়মসমূহ ও আমাদের অবশ্য প্রতিপাল্য হইয়া পড়ে। আমরা কেহ কেহ আপাতমধুর বৈদেশিক প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া পরদেশী বন্ধুর গলা ধরিয়া, পরের পায়ে সর্ব্বস্ব বলিদানের ব্যবস্থা করিতেছি সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে বলিতে ইচ্ছা হয় " পামরী-বদন লোলুপো বুধা ন হি বেত্তি কুলজাধরামৃতং॥" "আমার পূর্ব্ব পুরুষ জগৎপূজ্য আর্য্যঋষিকুল যে পথানুসরণ করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, আমি সে পথে না যাইয়া বিপথগামী হইলে, আমার ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার ময় হইবে তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে কি ? দক্ষসংহিতায় দেখিতে পাই।

"সন্ধ্যা যেন ন বিজ্ঞাতা সন্ধ্যা নৈবাপ্যুপাসিতা।

জীবন্নেব ভবেচ্ছূদ্রো মৃতঃ শ্বা চাভিজায়তে॥"

এই সন্ধ্যাত্যাগকারী যে কোন দৈবাদি কার্য্য করিবেন, তাহাতে তিনি কোন রূপই ফলভাগী হইতে পারিবেন না, সুতরাং সর্ব্ববিধ ধর্ম্মকার্য্য করিবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে যথাশক্তি সন্ধ্যাদেবীর আরাধনা করিতেই হইবে।

শাস্ত্র বলিতেছেন —

"এবাং বুদ্ধিশুদ্ধিঃ পরং প্রয়োজনং"।

অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণের পক্ষে সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কার্য্যানুষ্ঠানই একমাত্র কর্ত্তব্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যেমন মলিন দর্পনে কোনরূপ বস্তুই উত্তমরূপে প্রতিবিম্বিত হয়না, যেমন অপরিষ্কৃত জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিখণ্ডে উপ্ত বীজ অঙ্কুরোদ্গমের উপযোগিতা লাভ করেনা, সেইরূপ নির্ম্মল অন্তঃকরণ ব্যতীত ভগবানের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়না

অথবা তাদৃশ অপরিষ্কৃত হৃদয়নিহিত বীজ সফলতাও লাভ করিতে পারেনা সুতরাং এই সন্ধ্যোপাসনা প্রভৃতি নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানরূপ কর্ম্ম সংযোগে আত্মার মলিনতা বা আত্মস্থ অসদ্বৃত্তি-রূপ জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে।

তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন ;—

সন্ধ্যামুপাসিতা যে তু সততং সংসিতব্রতাঃ।
বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ং॥

হঠাৎ আমার বাল্যজীবনের একটী কথা মনে পড়িয়া গেল। সেই সারস্বত-মন্দিরের দ্বারদেশে আগমনের বহুপূর্ব্বে একদিন পরমপূজ্যপাদ পিতৃদেব শিখাইয়াছিলেন "ষট্কর্ম্ম শালিত্বং ব্রাহ্মণত্বং" পরে যখন পরাশর-সংহিতায় দেখিতে পাইলাম—

"সন্ধ্যা স্নানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতার্চ্চনং।
বৈশ্বদেবাতিথেয়ঞ্চ ষট্‌কর্ম্মাণি দিনে দিনে॥"

তখনই বুঝিলাম সন্ধ্যাত্যাগীর পক্ষে ব্রাহ্মণত্বের দাবী করা বৃথা। পরন্তু পঞ্চযজ্ঞ প্রভৃতি জনিত পাপক্ষয় করিতে হইলেই, ত্রিসন্ধ্যা যথাশাস্ত্র সন্ধ্যা করিতে হইবে। শাস্ত্র বলিতেছেন—

নিশায়াং বা দিবা বাপি যদজ্ঞান কৃতং ভবেৎ।
ত্রিকালং সন্ধ্য করণাৎ তৎসর্ব্বং বিপ্রনশ্যতি॥

এই ত্রিসন্ধ্যাকারী সর্ব্বথা আত্মপবিত্রতা রক্ষা করিয়া সহজেই পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন, তাই শাস্ত্র সমস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং যস্ত্রিসন্ধ্যাং করোতি চ।
স চ সূর্য্যসমোবিপ্র স্তেজসা তপসা সদা॥
তৎ পাদপদ্মরজসা সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা।
জীবন্মুক্তঃ স তেজস্বী সন্ধ্যাপূতোহি যোদ্বিজঃ॥
তীর্থানি চ পবিত্রাণি তস্য সংস্পর্শমাত্রতঃ।
ততঃ পাপানি যান্ত্যেব বৈনতেয়াদিবোরগাঃ॥

এই কথাটী সন্ধ্যার্থ বিশ্লেষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, সংক্ষেপে সে বিষয়ে একটু বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

সেই সর্ব্বারাধ্য পরমপুরুষ ভগবানের প্রেম-সমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন করিবার জন্যই মানবাত্মার জগতে আবির্ভাব হইয়াছে, এবং ঐরূপ আত্মবিসর্জ্জনই স্বরূপত্বলাভ অর্থাৎ জীবের শিবত্ব লাভ বা বিন্দুর সিন্ধুতে গমন। এই যে তত্ত্ব, ইহাই মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য ও যথার্থ পরিণতি। এ সিদ্ধান্ত সর্ব্বদেশের সর্ব্ব সাধুজনসম্মত। যে ব্যক্তি যথার্থ সন্ধ্যার উপাসক, তাহার জীবনে ঐ তত্ত্ব ফুটিবেই ফুটিবে। ইহা সন্ধ্যার মন্ত্রার্থ আলোচনা করিলেই সুন্দরভাবে বুঝিতে পারা যায়। সন্ধ্যাকে প্রাণায়াম, আচমন, আপোমার্জ্জন, অঘোমর্ষণ, সূর্য্যোপস্থান, গায়ত্রী-ধ্যান, জপ, সাধারণতঃ এই কয়ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রাণায়ামের

প্রথমে ভূরাদিস্বষ্টি প্রপঞ্চকে অমৃতজ্যোতিস্বরূপ সবিতার বরণীয় ভর্গোরূপে ধ্যেয় বলা হইয়াছে। পরে "যতোবা ইমানি ভূতানি যায়ন্তে" "অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং" ইত্যাদি শ্রুতিসম্মত সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়-শক্তিকে ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিবরূপে ধ্যেয় বলা হইয়াছে। সুতরাং এই ধ্যান দ্বারা মানবাত্মার পূর্ব্ববর্ণিত চরম উদ্দেশ্য আসিবেই। পরে আচমনে জ্ঞানাজ্ঞানকৃত পাপরাশিকে দাহ্যরূপে কল্পনা করিয়া ব্রহ্মাগ্নিতে তাহার হোমের বিধান করা হইয়াছে। ইহাও ঐ উদ্দেশ্যের পথ প্রদর্শক। আপোমার্জ্জনে ভগবানের জলময়ী মূর্ত্তিকে "উশতীরিব মাতরঃ" বলিয়া মাতৃভাবে আহ্বান করা হইয়াছে। পরমস্নেহময়ী মাতা যেমন মলপঙ্ক-বিদূষিত সন্তানকে শুদ্ধ ও পরিষ্কৃত করিয়া ক্রোড়ে স্থান দান করেন, ভগবানের জলময়ীমূর্ত্তি আমাকে তাহাই করুন, ইহাই প্রার্থনা করা হইয়াছে। অঘোমর্ষণে নির্গুণব্রহ্ম হইতে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব সর্ব্বাধারত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সূর্য্যোপস্থানে অমৃতজ্যোতিকে "পশ্যেম শরদঃ শতং" "জীবেম শরদঃ শতং" শৃণুয়াম: শরদঃ শতং" বলিয়া নিজের দৈনন্দিন ব্যাপারের সহিত অনুস্যূত করা হইয়াছে। গায়ত্রীতে সমগ্র বিশ্বের সমগ্র মনোবৃত্তির কর্তৃত্ব রূপে ব্রহ্মে অনুভব পূর্ব্বক "ধীমহি" বলিয়া ধ্যানের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাই সন্ধ্যার সংক্ষিপ্ত সারার্থ। এই অর্থ অতি মহান, অতি বিশাল। ইহা আত্মধ্যানে বুঝিবার পদার্থ, ইহা পরকে বুঝাইবার জিনিস নহে। ইহা সাধনসিদ্ধ সত্যসিদ্ধান্ত। সুতরাং, যে সন্ধ্যাদেবী আত্মার পাপ পুণ্যের জমা খরচ ভগবানের দরবারে পৌছাইয়া দেন, যে সন্ধ্যা ভগবানের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কর্তৃত্বরূপ সর্ব্বকর্তৃত্ব, সর্ব্বাধারত্বরূপ প্রমাথি সঙ্গীত, ত্রিসন্ধ্যা গান করেন, যে সন্ধ্যা ভগবৎ-শক্তিতে মাতৃত্বের অনুভূতি আনয়ন করেন, যে সন্ধ্যা জীব শিবের সম্বন্ধ যথার্থভাবে বুঝাইয়া দেন, তাঁহার উপাসনা যে অবশ্য কর্তব্য, তাঁহাকে ত্যাগ করা যে, অতি বড় আত্মহত্যা এবং অত্যন্ত স্বার্থহানিকর কর্ম্ম, ইহা কি ব্রাহ্মণকে এখনও বুঝাইতে হইবে? যে সন্ধ্যা ভগবানের গানে পরিপূর্ণ, তাহার উপাসনায় যে জীবের স্বরূপস্থ লাভ হয়, বিন্দুর সিন্ধুতে গমন হয়, এবং মানবাত্মার চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, ইহা সহজেই বুঝা যায়।

সুতরাং যে ব্যক্তি এতাদৃশ সন্ধ্যাকে যাবজ্জীবন উপাসনা করেন, তিনি যে সূর্য্যাসম তেজস্বী হইবেন, তাহার দ্বারায় যে "কুলংপবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা ভাগ্যবতী", হইবেন তাহাতে সন্দেহ কি?

সভ্য মহোদয়গণ!

এখন বোধ হয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে ইহ কালের সম্পৎ এবং পরকালের পরম সহায় সন্ধ্যাদেবীর উপাসনায় যাহারা বিগতস্পৃহ তাহারা আপন জীবনে যে মহা ভ্রমান্ধকারে পতিত হইতেছেন তাহার সংশোধনের সময় থাকিতে থাকিতে তাঁহাদের সাবধান হওয়া উচিত। যে কোনও ধর্ম্মাবলম্বীই যখন স্ব স্ব ধর্ম্মানুমোদিত উপাসনায় আত্মগৌরবানুভব করেন, তখন আমরাই বা কেন সে গৌরব অনুভব করিয়া চরমে রৌরবের ভয় বিদূরিত করিব না?

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমগ্র জাতির অপেক্ষা সমস্ত বর্ণের অপেক্ষা আমাদের যাহা বিশেষত্ব তাহাতেই সন্ধ্যা। এমন শ্রেষ্ঠ উপাসনা এমন শ্রেষ্ঠ ভাবতত্ত্ব আর কাহারও নাই। হে আধ্যাত্মিক ভারতের ব্রাহ্মণ! হে ঋষি তপস্তপ্ত আর্য্য ভূমির ব্রাহ্মণ! তুমি বর্ত্তমানে এই উপাসনাচ্যুত হইয়া কি ছিলে, কি হ'লে, কি হ'তে চলিলে? তাহার চিন্তা করিবে কি? হে সুপ্তসিংহ! আবার প্রবুদ্ধ হও। আবার তোমার পূর্ব্ব পুরুষের মত "আমি না করিলে সন্ধ্যা সন্ধ্যা কি যাইতে পারে" বলিয়া সন্ধ্যাদেবীকে আত্মার চরম অনুভূতির সঙ্গে মিশাইয়া দেও! আবার বিশ্বের শিষ্যত্বের উপর গুরুত্ব স্থাপন কর। আবার বল "যাবন্মেরু স্থিতাদেবা যাবদগঙ্গা মহীতলে। চন্দ্রার্কৌ গগনে যাবত্ত তাবৎ ব্রহ্মকুলে বয়ং" ব্রাহ্মণ তোমার এই দৃঢ়তা দেখিয়া জগৎ প্রবুদ্ধ হইবে, আবার ভারতের সেই দিন ফিরিবে আবার তোমার "মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" হইবে, তোমার ধর্ম্ম মধুময়, কর্ম্ম মধুময়, সর্ব্ব মধুময় হইবে। তাই বলি ব্রাহ্মণ!

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত"

শ্রীঅনন্তকুমার শাস্ত্রী।

জাতি বা বর্ণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গত আশ্বিন সংখ্যায় জাতি বা বর্ণ শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিত ম্যাক্স মূলার সাহেব কেবল ভ্রান্তি বশতঃ তাদৃশ মীমাংসায় অগ্রসর হয়েন নাই। বিজাতীয় বুদ্ধি বিশিষ্ট হইলেও তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়ী ছিলেন।

এত অধ্যবসায়ে যে তিনি হিন্দু সাধারণ বুদ্ধিগম্য চাতুর্ব্বর্ণ্যবোধক বেদের মোটা কথাগুলিও বুঝিতে পারেন নাই একথা আমরা স্বীকার করি না—তিনি যে বুঝিয়াও খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যে আকাশে জাল পাতিয়া নিজের অসাধারণ নৈপুণ্য ও স্বধর্ম্মানুরাগ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা ঋকবেদ হইতে ও তাঁহার স্বীকার উক্তি হইতে গতবারে আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, সে চেষ্টা কতটা ফলবতী হইয়াছে তাহা পাঠকগণই বিবেচনা করিবেন। সাহেবপুঙ্গবের ঐ সকল উদ্দেশ্য জানিয়াও যাঁহারা ঐ ভ্রান্তমতের পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য আমাদের এই প্রবন্ধ নহে, যাঁহারা অজ্ঞতাবশতঃ ঐ সকল সিদ্ধান্তকে সত্য ও সমীচীন বলিয়া মনে করেন তাহাদের জন্যই আমাদের এই প্রবন্ধের অবতারণা। তাই এবার আমরা ঐ জাতিভেদের নবীনত্ব—সংস্থাপকম্যাক্সমূলারী মতের পরিপোষক রূপে বেদ ও ইতিহাস পুরাণাদি হইতে যে সমস্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়া থাকে তাহারই আলোচনায় অগ্রসর হইলাম।

উপনিষদ্‌ও পুরাণ ও মহাভারত হইতে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়া থাকে, পাঠকগণের সুবিধার জন্য তাহার মধ্যে কতিপয় প্রধান প্রমাণের বঙ্গানুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

"আদিতে কেবল ব্রাহ্মণই ছিল," বৃহদারণ্যক,

"কৃতযুগে তাহারা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কোন কর্ম্ম করিত না, তখন বর্ণবিভাগ ও সঙ্কর বর্ণ ছিল না,"……… ॥ (বায়ুপুরাণ নবমাধ্যায়)

বর্ণের বিশেষত্ব নাই ব্রহ্মদ্বারা সৃষ্ট, সুতরাং সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়। মনুষ্যগণ কর্ম্মের দ্বারা বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। (মহাভারত শান্তিপর্ব্ব)

এই সকল প্রমাণের দ্বারা জাতিভেদের কৃত্রিমত্ব মতাবলম্বিগণ বুঝাইয়া থাকেন যে আদিতে একমাত্র ব্রাহ্মণই ছিল প্রথমতঃ কোনই বর্ণবিভাগ ছিল না, পরে মানবকর্ত্তৃক কর্ম্মানুসারে বর্ণবিভাগ গঠিত হইয়াছে, জাতিভেদ জন্মগত নহে।

শাস্ত্রোক্ত এই সকল প্রমাণ আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু এই সকল প্রমাণ দ্বারা উক্ত মতাবলম্বীগণ যেরূপ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, আমরা তাহা পারিলাম না। কারণ আমাদের কোন মীমাংসা করিতে হইলে—প্রমাণের গ্রন্থগুলি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া উপক্রম উপসংহারপর্য্যন্ত মিলাইয়া দেখা (সেই গ্রন্থের অপরাংশের সহিত বা গ্রন্থান্তরের সহিত) বিরোধ সম্ভব হইলে তাহার পরিহার করিয়া মীমাংসা ক্ষেত্রে উপনীত হইতে হয়। তাঁহাদের ন্যায়—তাঁহাদের স্বমতসমর্থক কোন একটী অংশ পাইলে আর গ্রন্থ সঙ্গতির অপেক্ষা না করিয়া বা গ্রন্থ বিরোধ পরিহার না করিয়া আমরা কোনই মীমাংসায় অগ্রসর হইতে পারি না। আমরা বুঝি "গ্রন্থস্ত গ্রন্থান্তর মেব টীকা" আমরা বুঝি "সম্ভবত্যেক বাক্যত্বে বাক্যভেদো ন চেষ্যতে।" প্রকরণাধীন একই শব্দের বহুবিধ অর্থ হইয়া থাকে। "যেমন ভোজন প্রকরণে সৈন্ধব মানয় প্রয়োগ এবং যুদ্ধপ্রকরণে সৈন্ধব মানয় প্রয়োগ এই উভয় প্রয়োগের অন্তর্ভূত একই সৈন্ধব শব্দ প্রকরণ বিভিন্নতা নিবন্ধন লবণ ও ঘোটক অর্থের বোধক হয়, অর্থাৎ ভোজন প্রকরণে লবণ ও যুদ্ধ-প্রকরণে সিন্ধু দেশীয় ঘোটকে বুঝাইয়া থাকে, সেইরূপ গ্রন্থলিখিত বাক্যার্থের সহিত স্বগ্রন্থের বা গ্রন্থান্তরের বিরোধী হইলেও ঐকমত্য স্থাপনার্থ গ্রন্থকারের তাৎপর্য্যানুসন্ধান দ্বারা আপাত বাধ্য অর্থেরও পরিবর্ত্তন হয়। ইত্যাদি ভাবিয়া এতটা পরিদর্শন করিয়া যাহাদিগকে মীমাংসাক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হয় তাহাদের সহিত একদেশদর্শীদের মতবৈষম্য স্বভাবসিদ্ধ, সুতরাং তাঁহাদের মীমাংসায় ও আমাদের মীমাংসায় পার্থক্য হইয়া পড়ে, তাই আমরা তথোক্ত প্রমাণ তথাকথিত গ্রন্থে অবলোকন করিয়াও তাঁহার দ্বারা ঐরূপ মীমাংসা করিতে পারিলাম না।

বৃহদারণ্যকে "আদিতে মাত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন" যেমন জানিতে পাই, তেমন আবার তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে "ব্রাহ্মণজাতি দেবতা হইতে উৎপন্ন শূদ্র অসুর হইতে উৎপন্ন" একথাও দেখিতে পাইতেছি। এবং ঐ বায়ু পুরাণের নবম অধ্যায়েই আবার দেখা যায়, ব্রহ্মার যে সকল মানসপুত্রগণ কৃতযুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারাই আবার ত্রেতাযুগে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন"।

বৃহদারণ্যকের ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের উক্তি দ্বয়ে পরস্পর বিরোধ "আবার বায়ু পুরাণের ঐ

নবমাধ্যায়াভিহিত”, তাঁহারাই ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন। একথাও জন্মগত জাতিভেদকে প্রমাণিত করিতেছে, যদি জন্মদ্বারা জাতিভেদ না হইত তবে ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন একথা লেখার কোনই প্রয়োজন ছিল না, জন্ম পরিগ্রহ লইয়া জাতিভেদ হইয়াছিল বলিয়াই জন্মগ্রহণ লিখিতে হইয়াছে, অথচ ঐ অধ্যায়ে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কৃতযুগে জন্ম পরিগ্রহ করিলেও বর্ণভেদ ছিল না, একবার বলা হইল জন্মসত্বেও বর্ণভেদ ছিল না আবার বলা হইল জন্মতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্ররূপে তাঁহারা প্রকাশিত হইয়াছিলেন, সুতরাং বলিতে গেলে, একই গ্রন্থের একই অধ্যায়ে এইরূপ বিরোধের সৃষ্টি” এইরূপ বিরোধ পরিহার করিয়া মীমাংসা করিতে হইলে গ্রন্থের উপক্রম উপসংহার মিলাইয়া গ্রন্থান্তরের সহিত একবাক্যতা করিয়া ইহাই বলিতে হয় যে, কৃতযুগে প্রথমতঃ স্থূল শরীরের আবির্ভাব হয় নাই, কৃত ও ত্রেতার সন্ধিতে স্থূলদেহের সৃষ্টি হইয়াছিল, “রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে আছে “যে যুগে মনুষ্যের স্থূল দেহ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা ত্রেতাযুগ” পুরাণাদিতে যুগ সন্ধিকে অর্থাৎ পূর্ব্বযুগের শেষভাগকে পরযুগের অন্তর্ভুক্তও করা হইয়া থাকে, যেমন দ্বাপরের সন্ধিতে আবির্ভূত যুধিষ্ঠিরাদিকে কলির রাজাও বলা হয়, অতএব কৃতযুগের শেষভাগে স্থূল শরীরের সৃষ্টি হইলেও রামায়ণে তাহাকে ত্রেতাযুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করায় কোন বিরোধের সম্ভাবনা নাই। এবং কৃতযুগের ক্ষত্রিয় রাজা বলিয়া যাঁহারা পুরাণাদিতে অভিহিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে উভয় যুগের রাজা বলা যায় বলিয়া “কৃতযুগের রাজা” পুরাণাদির এই অভিধানও অসঙ্গত হয় না।

আর্য্যশাস্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনায়ও জানাযায় যে প্রথমে সূক্ষ্ম সৃষ্টি, পরে স্থূল সৃষ্টি, প্রথমে সূক্ষ্ম শরীর, পরে স্থূল শরীর, বায়ুপুরাণে যে কৃত যুগের উল্লেখ দেখা যায় উহা সন্ধ্যাংশ বিরহিত কৃতযুগ ঐ সময়ে স্থূলশরীরের সৃষ্টি হয় নাই। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের উক্তিদ্বারাই তাহা জানাযায়। সৃষ্টির প্রারম্ভে, ব্রহ্মার মন হইতে যে দুই শ্রেণীর পুত্র উৎপন্ন হয়েন, তাঁহারা সূক্ষ্মশরীরী, এক শ্রেণী সনক সনন্দাদি, তাঁহারা তপোলোকবাসী ও নিবৃত্তি ধর্ম্মাবলম্বী, অপর শ্রেণী মরীচি অঙ্গিরা প্রভৃতি তাঁহারা জনলোকবাসী ও প্রবৃত্তি ধর্ম্মাবলম্বী, স্থূলশরীরের ক্রম পরিণতির পূর্ব্বে তাঁহারা জনলোক হইতে ত্রিলোকীতে সূক্ষ্ম শরীরে প্রকাশিত হইয়া,নিষ্কাম-ধর্ম্মের উপাসনায় রত থাকার ফলে, তাঁহাদের ভোগ দেহ অর্থাৎ স্থূল শরীর উৎপন্নই হয় নাই। নিষ্কাম ধর্ম্মের উপাসনায় কর্ম্মজনিত ফল সম্ভূত হয় না, অগ্নিপাকে যেমন বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকাশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, ভর্জ্জিত বীজ যথা বিধানে উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপ্ত হইলেও তাহা হইতে অঙ্কুর সমুৎপন্ন হয় না, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নিপাকে কর্ম্মের ফলোৎপাদিকা-শক্তি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া যায়। ভগবান নিজেই বলিয়াছেন “জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুনঃ” সুতরাং বাসনাবিরহিত কর্ম্মে ভোগের বীজ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়। কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট অর্থাৎ ভোগজনক সংস্কারবিশেষ উৎপন্ন হইলেই তাহার ভোগের জন্য ভোগায়তন দেহের প্রয়োজন। প্রয়োজন অনুসারেই সৃষ্টি—সুতরাং কৃতযুগের আদিতে স্থূলদেহের সৃষ্টিই হয় না। কালবশে

রজোগুণ প্রাবল্যে ক্রমশঃ মানসপুত্রগণ বাসনা তাড়িত হইয়া যখন প্রবৃত্তিমার্গে ক্রিয়া-পরায়ণ হইলেন তখনই তাঁহারা ক্রিয়াফলভোগের জন্য ভোগায়তনস্থূল শরীরে ত্রেতার প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাল-শক্তিবশে ক্রিয়াশীল রজোগুণ সত্ব ও তমোগুণের সহিত যে যে সূক্ষ্মশরীরে যেমন যেমন অংশানুসারে পরিনাম প্রাপ্ত হইয়াবুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ করিয়াছে। তদনুরূপ বাসনাসিদ্ধির সাধক ভোগায়তন স্থূলশরীরে তাঁহারা ত্রেতাযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবান-দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নাম ও তদনুরূপ কর্ম্ম বিভাগ লাভ করিয়াছিলেন, নৈমিত্তিক প্রলয়ে ত্রিলোকীর ধ্বংস হয় অর্থাৎ ভূলোক, ভুবলোক, ও স্বর্গলোক বিনাশ প্রাপ্ত হয়, আবার কল্পারম্ভে ক্রমপরিণতিক্রমে ঐ ত্রিলোকীর প্রথমতঃ সূক্ষ্ম, পরে স্থূলরূপে উৎপত্তি হইতে থাকে সুতরাং সূক্ষ্মশরীরেই বর্ণত্বের সৃষ্টি, আর স্থূলশরীরেই তাহার বিকাশ, আর এই বিকাশ অবস্থাতেই বর্ণ অর্থাৎ নাম এবং কর্ম্মের বিভাগ ইহাই বোঝা যায়।

বৃহদারণ্যকেই বর্ণিত হইয়াছে—ব্রাহ্মণ জাত্যভিমানী ব্রহ্মা, ক্ষত্রিয় জাত্যভিমানী ইন্দ্র বরুণাদি এবং বৈশ্য জাত্যভিমানী বসুদেবতা, শূদ্রজাত্যভিমানী তমোবহুলা পৃথিবীদেবতার উৎপত্তি হয় সুতরাং এই সকল আলোচনা পূর্ব্বক মীমাংসায় উপনীত হইতে হইবে আদিতে যখন সকাম কর্ম্ম ছিল না, তখনই বর্ণভেদ ছিল না, ক্রমে কালশক্তি বলে বাসনা তাড়িত ক্রিয়ার ফলে সূক্ষ্মশরীরে বর্ণত্ব উৎপন্ন হইয়া স্থূল শরীরে বিকাশ হইয়া পড়ে এইটাই মীমাংসা করিতে হয়, ঐ সকল মানসপুত্র সূক্ষ্মশরীরের বর্ণত্ব বিকাশ উপযোগী পৃথক পৃথক স্থূলদেহ প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণাদি নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। একথাটা আরও একটু বিশদভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক, অহঙ্কারের সহিত বুদ্ধি, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, এই সপ্তদশ অবয়বেই সূক্ষ্মশরীর গঠিত এই লিঙ্গশরীর ত্রিগুণাত্মক ও প্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী, ইহারা স্থূল দেহকে পরিত্যাগ করিলে মৃত্যু ও গ্রহণ করিলে জন্ম বলা হয়, এই সূক্ষ্মশরীরধারী চৈতন্যই জন্মমৃত্যুশীল ব্যবহারিক জীব নামে অভিহিত। বুদ্ধি অহঙ্কার ও মন এই তিনটীকে অন্তঃকরণ বলা হইয়া থাকে সাধারণতঃ আমরা ইহাকে মনঃ নামে অভিহিত করিব, এই ত্রিগুণাত্মক মনের যে বৃত্তির অনুশীলন যত বেশী হইবে সেই বৃত্তিই তত প্রবল হইয়া উঠিবে প্রবলতম হইলেই আমরা ইহাকে অভ্যাস বলি, জন্মান্তরীন অভ্যাস জনিত প্রবলতম সংস্কারই স্বভাব, পূর্ব্বজন্মে যে যে মনোবৃত্তির প্রবলতম অভ্যাস জন্য প্রবলতমসংস্কার উৎপন্ন হয়, পরজন্মে তাহা আপনা হইতেই কার্য্যোন্মুখী হইতে থাকে, এমন কি তাহার গতির রোধ করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে, তাই শৈশব হইতেই এক এক জন এক এক স্বভাব সম্পন্ন হয়, ঐ স্বভাব প্রতি ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও উহা সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত (১) সত্ব রাজোসিক, (২) রজঃ সাত্তিক, (৩) রজ তামসিক, (৪) তমো রাজোসিক।

জাতি,—বস্তু-বিভাজক ধর্ম্ম বা ভাব বিশেষ, প্রাণীর যে ধর্ম্মদ্বারা প্রাণীকে আমরা বিভাগ করি, মনুষ্যের যে ধর্ম্ম বা ভাববিশেষ দ্বারা আমরা পশু হইতে মানবকে পৃথক করিয়া থাকি, প্রাণির বা মানবের এই ধর্ম্ম বা ভাবই জাতি। ক্রমশঃ।

শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি।

তপোবন স্মৃতি।

এই কি সে দেশ, আহা এই কি সে দেশ,
ধ্বনিত সতত যেথা ছত্রিশ-রাগিণী :—
'ত্রিতন্ত্রী' নিঃস্বন সহ, তপোধন মুখে?
কাব্য পারিজাত তলে নাচিত যথায়
পূত শৈবলিনী, স্পর্শি দেবর্ষি-চরণ।
গাহিত জীমূত-মন্দ্রে কবীন্দ্র-ব্রাহ্মণ
অনন্ত মধুর স্বরে; ছত্রিশ-রাগিণী,
মূর্ত্তিমতী হয়ে সদা আনন্দে করিত
ক্রীড়া রাগ তানে মিলি;—আপনা পাসরি।
কোথা সেই তপোবন? কোথায় তাপস?
স্বর্গীয় সুষমা ময় কোথা বায়ুরাশি?
কোথায় ঋত্বিক ঋষি? কোথা যজ্ঞবেদী?
কোথা হবির্গন্ধ-ধূম, ছাইত গগন
যাহা নব-জলধরবেশে? হায় কাল!
হরিয়াছ স্বরগের শোভা। নাহি সেই
বশিষ্ঠ, বাল্মিকী, ব্যাস, নাহি মহাতপা
দেবর্ষি, রাজর্ষি, নাহি বেদ মুখরিত
অনিন্দ্য-নন্দন বন, নাহিক তাপস,
নাহি ব্রহ্মতেজঃ; এবে নাহি সে গৌরব!
চির কুহেলিকা মাঝে, হয়েছে বিলীন
দীপ্ত-মধ্যমণি-শিরোভূষা হ'তে। প্রাণ-
কাঁদেরে স্মরিতে সেই গৌরব-আলেখ্য
খানি। আসিবেনা আর সেই পিকরাজ
স্বভাবের ফুলবনে? তবে কে সিঞ্চিবে
অতুলনা নবরস, তুলি মধুর কাকলী?
কে ঢালিবে উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদে অমৃতের
ধারা? মন্ত্র-মুগ্ধপ্রায় কাঁদাবে জগত
কে'রে? ডুবিবে কি বঙ্গ-রঙ্গভূমি এবে
প্রলয়-পয়োধিজলে চির অন্ধকারে?
আবৃত কুহেলি জালে হবে আর্য্য-রবি?

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

সামাজিক-প্রসঙ্গ।

শ্রীপঞ্চমী।

বিবুধজননি বিদ্যাবিধায়িনি মা গো! মাঘমাসের শুক্লাপঞ্চমী যে তোমার প্রিয়তিথি, ঐ তিথিতে তোমার প্রিয়সন্তানগণ তোমার আর্চ্চনা করিয়া চিরসেব্য লেখণী মস্যাধার সেবায় বিরত হইয়া তোমার গুণগানে সারস্বতোৎসব সমাপন করিতেন, তুমিও মা! তোমার প্রিয় সন্তানগণ কর্ত্তৃক তোমার প্রিয়তিথিতে আর্চ্চনা গ্রহণ করিতে, তোমার প্রিয়ভারত ভূমিতে বৎসরান্ত একদিন আসিয়া অমৃতজ্ঞানরত্নপ্রদান করিয়া মাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে। ভারতবাসির গৃহে গৃহে তখন মাতৃভক্তির প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইত। সারা বৎসব তোমার সেবাকরিয়া তোমার আগমন আশায় উৎফুল্ল হইয়া হিন্দুর আবাল বৃদ্ধ বণিতা তোমার প্রিয় তিথিতে তোমার উৎসবে মাতিয়া উঠিত। তোমাব অর্চ্চনানন্দে উন্মত্ত হিন্দুসন্তানগণকে তুমিও মা! মাতৃস্নেহ সলিলে পরিপূত করিয়া অমূল্য সম্পদ প্রদান কবিতে কুণ্ঠিত হওনাই, হায় মা! আজ এই তোমার সেই প্রিয় তিথিপঞ্চমীতে সেই সকল অতীত স্মৃতি এ হৃদয়কে আকুলিত করিতেছে মা! প্রতিবৎসরই তো মা তোমাব পূজার অনুষ্ঠান এখন ও হিন্দু গৃহে দেখিতেপাই কিন্তু যাহা ইতিহাসে পইয়াছি তাহাতো দেখিনা মা! সেই মাতৃভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাস, সেই সারস্বতোৎসবেব প্রবল মত্ততা, তোমার অর্চ্চনার সেই জীবন্ত আনন্দ আব এভারতে দেখিতে পাইনা, এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় আবাল, বৃদ্ধ, যুবা, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র, রাজা, প্রজা, গুরু-শিষ্য নিজ অভিমান ভুলিয়া, সম্বন্ধ ভুলিয়া সমভাবে সারস্বতোৎসবে মা। মা রবেব আকুল আহ্বানে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করে না মা! এখন প্রায় সকলেই মতৃসেবায় বিরত হইয়া বিমাতার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছে, কেবল দুই চারিজন কমলার কৃপালাভে অসমর্থ ব্যক্তিকেই তোমারউৎসবে রত দেখিতে পাই, তাহাও বুঝি কায়মনোবাক্যে নয় মা! তাই বুঝি মা! তোমার এই বড় আদরের ভারতের প্রতি এই বিরক্তি, তাই বুঝি আজ অতুল সম্পদের অধিকারী, অমূল্য জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডারের এক মাত্র অধিকারী ভারত সন্তানের এই দুরাবস্থা। তোমার সেবায় অনাদর করিয়া তোমার সপত্নী সবার রত তোমারই প্রিয়সন্তান,.তাই বুঝি মা তুমি আর তোমার চিরআদরের ভারতে তোমার প্রিয় তিথিতে ও আগমন করনা মা! নতুবা অন্য কোন অপরাধে তোমার স্নেহে ভারত-সন্তান বঞ্চিত হয় না। ইতিহাস তো এই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, দস্যু রত্নাকরকে সকলেত্যাগ করিলেও তুমি সে মহাপাপীকে তো পরিত্যাগ কর নাই মা! সেই মহাপাপী ও একদিন তোমার মাতৃ-স্নেহের অমৃতধারায় সিঞ্চিত হইয়া রত্নাকর কবি হইয়া ছিলেন, সকলের ঘৃণ্য নির্ব্বোধ কালিদাসও তোমরই স্নেহে মহাকবি হইয়াছিলেন, তাই মনে হয় মা! তোমার সেবা পরিত্যাগ করিয়া—

তোমার সেবক সন্তান গণকে অবজ্ঞা করিয়া—কেবলমাত্র কমলার সেবাই তোমার এই অকৃপার নিদান, যেদিন যেরূপে তোমার স্বপত্নী সেবা বিরত তোমার সেবারত তোমার প্রিয়সন্তান সমাজে অনাদৃতও উপেক্ষিত, সেইদিন সেইক্ষণ হইতেই মা! তুমি ভারতের প্রতি বিরক্ত ইহাই ভারতীয় ইতিহাস তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছে, আর সেই বিরক্তির ফলেই আজ ভারতীয় অমূল্যরত্ন জ্ঞান ভাণ্ডার কালের অতলগর্ভে নিমগ্ন, তোমার এই প্রিয়পঞ্চমী তিথিতে আজ এইসকল কথা জাগাইয়া তুলিয়াছে মা! মা সারদে? তুমিই তো মা! সুমতি কুমতি বিধায়িনী! তবে কেন মা! তোমার প্রিয় ভারত সন্তানগণের এই কুমতি? এ কুমতি কি তুমি দূরকরিতে পারনা মা? সন্তান যতই অপরাধী হউক। মা কি তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে মা? তাই বলিমা! একবার তোমার অবোধ সন্তানের অপরাধ ভুলিয়া স্নেহ দৃষ্টি প্রদান করিয়া দীনহীন সন্তানে সুমতি স্থাপন কর মা! আবার গৃহে গৃহে তেমনই ভাবে তোমার উৎসবদর্শন করিয়া কমলাবিদ্বিষ্ট তোমার চির সেবক সন্তানগণের সমাদর দর্শন করিয়া এই তাপিত প্রাণ শীতল করি, ভারতের গৃহে গৃহে আবার অধ্যয়ন অধ্যাপন স্থাপিত হউক!

সমাজের অধঃপতনের মূল?

যে সমাজে একদিন সকল শান্তির লীলা নিকেতন ছিল, যে সমাজে একদিন সর্ব্ববিধ উন্নতির চরম অভ্যুদয় হইয়াছিল, যে সমাজে একদিন অকাল মৃত্যু দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি ইতিহাসেই জানিতে হইত; চৌর্য্য প্রতারণা বঞ্চনা প্রভৃতি কেবল মাত্র শব্দেই পর্য্যবসান হইত, আজ সেই সমাজ অশান্তির চির রঙ্গভূমি,অকাল মৃত্যু ও আধি ব্যাধি আজ তাহার নিত্য সহচর, গৃহে গৃহে চৌর্য্য প্রবঞ্চনা প্রতারণা –" পিতাপুত্রে পতি পত্নীতে গুরুশিষ্যে সর্ব্বত্রই প্রতারণা প্রবঞ্চনা, সর্ব্বত্রই অশান্তি রাক্ষসীর ভীষণ মুখ ব্যাদান, কেন এমন হোল! কাহার দোষে কিসের অভাবে আজ সোনার ভারতে সকলগুণের পূর্ণ আধার সকল সমাজের পূর্ণ আদর্শ হিন্দু সমাজের এই ভীষণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল, কে এই দুর্ভাগ্যের বিধাতা, কেবল মাত্র কালকে দোষী করিলে চলিবে না, কালতো চিরকালই আছে, কালেরই বা পরিবর্ত্তন হয় না কেন? আর কাল শক্তিকেও তো ক্রিয়া দ্বারা বাধিত হইতে দেখা যায়, শীতকালের শক্তি শীত, শীতবস্ত্র ব্যবহার করিলে আমরা তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাই। এই ভীষণ পরিবর্ত্তনের কারণ কাল শক্তি স্বীকার করিলে ও, তাহার হাত হইতে উদ্ধারের জন্য আমরা সেই রূপ শীতপ্রতিক্রিয়ার ন্যায় প্রতিক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে পারিলেও তো এই ভীষণ দুরাবস্থা আমাদিগকে এভাবে আয়ত্ত করিতে পারে না; সুতরাং কালের দোষ দিয়া নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া কাল শক্তির কথা ছাড়িয়া দিয়া, সমাজ কিসের অভাবে, কাহার দোষে, এই ভয়ঙ্কর যাতনানলে দগ্ধ হইতেছে, তাহার অনুসন্ধান একবার করিয়া দেখা যাউক।

সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই জ্ঞানবল, জনবল এবং ধনবল এই ত্রিবলের পূর্ণ আবির্ভাবেই সমাজ পূর্ণরূপে বিকাশ পায়, জ্ঞানবলে দীর্ঘজীবন ও সুন্দর স্বাস্থ্যপূর্ণ সবল দেহ লাভেব এবং মনসিক

উন্নততা লাভের ও অনায়াসে ধন সংগ্রহের উপায়লাভের বিধিব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হয়, জনবলে ঐসকল বাধা বিঘ্ন বিদূরিত হইয়া জ্ঞানবল বিহিত উপায় অনুষ্ঠিত হইলে প্রচুর ধনবল সঞ্চিত হয়, ঐ সঞ্চিত ধনবল জনবলের সহায় হইয়া আবার জনবলকে পরিপোষণ করিয়া জনবলের সহিত জ্ঞানবলের চরমে মিলিত হয়। শ্রদ্ধাবান জনগণ ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করিয়া যেমন ত্রিদিবের সুখশান্তি লাভের অধিকারী হয়, সেইরূপ এই:ত্রিবল সঙ্গমে যে সমাজ শ্রদ্ধার সহিত অবগাহন করিতে পারে, সেই সমাজই স্বর্গীয় সুখশান্তির একমাত্র অধিকারী হইয়া পৃথিবীর আদর্শরূপে পরিগণিত হয়। জ্ঞানীর জ্ঞানবল জনাতির জনবল ধনীর ধনবল যে সমাজে সমাজ সেবার জন্য সম্মিলিত হয় না, সে সমাজের সুখশান্তি আকাশ কুসুমের ন্যায় অলীক অর্থাৎ কথার কথা মাত্র। যে স্থানে জ্ঞান ধন ও জন মাত্র নীচ আত্মস্বার্থে নিয়োজিত, সে স্থানে কেবল প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার তাণ্ডব নৃত্য, রাজশক্তি সহস্র চেষ্টায়ও সে প্রতারণাদিদোষ দূরীভূত করিতে পারেন না, সে স্থানে ধন রাশিরাশি উৎপন্ন হইলেও কোটী কোটী লোক অনশনে অর্দ্ধাশনে জীবন ত্যাগ করিয়া থাকে, সে স্থানে দূর হইতে বাহ্যিক চাকচিক্য দর্শনে উন্নতি বলিয়া ভ্রম হইলেও ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় সর্ব্বত্রই অশান্তি ও অসন্তোষ বহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, অবিরাম চেষ্টায় ও সমাজ অঙ্গের সে দাহ নিবারিত হইতেছে না, বরং সে চেষ্টায় অগ্নি আরও তীব্রভাবে প্রজ্জ্বলিত হইয়া লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনকে ভস্মসাৎ করিতেছে।

আবার যে সমাজ তথাকথিত ত্রিবেণী-সঙ্গমে নিত্যস্নাত সে সমাজ মুষ্টিমেয় হইলেও পূর্ণপ্রভায় প্রকাশিত হইয়া অন্যের দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিতেছে কোন প্রবলশক্তিই তাহার পাদমূল স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না, সকলই চকিতনেত্রে তাহার প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। এই সকল প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া আমরা আমাদের অতীত সামাজিক ইতিহাসের সহিত মিলাইলে দেখিতে পাই—একদিন এই সমাজের জ্ঞানবল জনবল ধনবল সমাজ স্বার্থে মিলিত হইয়া প্রয়াগের যুক্ত ত্রিবেণীর ন্যায় পূতধারায় এই বর্ণাশ্রম-সমাজকে প্রতিনিয়তঃ নির্ম্মল করিত, বর্ণাশ্রমি সমাজ তথোক্ত ত্রিবেণীতে নিত্যস্নায়ী হইয়া সর্ব্ববিধ সম্পদ-সুষমার অধিকারী হইয়াছিল, তাই 'একদিন হিন্দুকবি মুক্তকণ্ঠে গাহিয়াছিলেন - "দিবোঽপি বজ্রায়ুধ ভূষণায়া হ্রীণীয়তে বীরবতী ন ভূমিঃ" তাই একদিন মহাকবি কালিদাস রঘুর রাজত্বকালের সমাজ বর্ণনায় "শ্রুতৌ তস্করতাস্থিতা" লিখিতে সাহসী হইয়াছিলেন, তাই একদিন গ্রীক পর্য্যটক তথাকথিত ত্রিবেণীর ক্ষীণরেখামাত্রাবশেষে দেখিয়া গিয়াছিলেন, কাণ্যকুব্জের রাজপথে সপ্তাহ পর্য্যন্ত সুবর্ণহার পতিত রহিয়াছে, আর এখন সেই সমাজে জ্ঞানীর জ্ঞান, ধনীর:ধন, জনাধিপের জন, সমাজস্বার্থে মিলিত না হইয়া নিজ নিজ স্বার্থে নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, আর এখন সমাজ সে ত্রিবেণীর সুধাধবলিত পূতধারায় প্লাবিত হয় না,:সেই পবিত্র জীবনের অভাবে এখন বর্ণাশ্রম সমাজ-জীবন হীন, ক্ষীণ মৃতপ্রায়, তাই সমাজের এই ভীষণ অবস্থা। এই মৃতপ্রায় সমাজে জীবনীশক্তি আনিতে হইলে আবার আমাদিগকে যুক্তত্রিবেণী স্থাপন করিতে হইবে, জ্ঞানবল, ধনবল,

জনবল সমাজ-চরণমূলে সম্মিলিত করিতে হইবে, তবেই ত্রিবেণীর পূতধারায় সমাজ-অঙ্গের সকল ক্ষত, সকল যাতনা প্রশমিত হইবে,—নবজীবন লাভে বর্ণাশ্রম-সমাজ আবার পূর্ব্ব সম্পদ-সুষমার পূর্ণ অধিকারী হইবেন, ত্রিবলের অভ্যুদয় ব্যতীত এ অধঃপতন নিবারণের কোনও সম্ভাবনা নাই, সমাজের এই অধঃপতনে ইতিহাসও এই সাক্ষ্যই প্রদান করিতেছে যেদিন যে মুহূর্ত্তে জ্ঞানী সমাজস্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র আত্মবিলাসস্বার্থের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তুচ্ছ অর্থের জন্য রাজা জয়চন্দ্রের সর্ব্বনাশ সাধনে নিজ জ্ঞানবল প্রয়োগ করিয়াছিলেন, যেদিন ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রলোভনে জ্ঞানী পশুপতি নিজের জ্ঞানবলকে তুচ্ছ স্বার্থসাধনে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, সেই দিন, সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্ত হইতেই বর্ণাশ্রমির সর্ব্বনাশ আরম্ভ, যেদিন যে মুহূর্ত্তে জ্ঞানবল-বিহিত বিধিনিষেধ পদতলে দলিত করিয়া দাম্ভিক ক্ষত্রিয় রাজগণ ক্ষুদ্র স্বার্থের সাধনায় জনবলের নিয়োগ করিয়াছেন, সেই দিনই বর্ণাশ্রম সমাজের পূর্ণ অবনতির আবির্ভাব, সেই হইতেই ধনবল বিকৃতভাবের পোষণ করিয়া আসিতেছে, তাহারই ফলে বর্ণাশ্রম সমাজের এই ভীষণ পরিবর্ত্তন। ইতিহাস আলোচনায়ও আমরা ইহাই দেখিতে পাই। মুসলমান রাজত্বকালে আমাদের সমাজে এ সকল অবনতি নিবারণের উপায় অসম্ভব ছিল, কিন্তু ইংরাজ-রাজত্বে আমাদের সামাজিক অবনতি নিবারণ করিবার উপায় বাধিত হয় নাই। ইংরাজ রাজা কখনও আমাদের সমাজের বা ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন না—সুতরাং আমরা রাজাকে দেবতা মনে করিয়া তাঁহার শাসন নতমস্তকে স্বীকার করিয়া জ্ঞানীর জ্ঞানবল-বিহিত বিধিনিষেধশাস্ত্র হিন্দু জমিদারগণের সহায়তায় এবং ধনীর ধনবলে অনুষ্ঠান করিয়া আবার আমরা রোগ, শোক, অকালমৃত্যু ও দুর্ভিক্ষ মহামারীর হাত হইতে এখন অনায়াসে উদ্ধার হইতে পারি।

প্রকৃত শিক্ষার উপায়।

১। কেবল পুস্তক পড়িলেই প্রকৃত শিক্ষা হয় না। প্রকৃত শিক্ষার কারণ কেবল পুস্তকের অধ্যয়ন নহে ; মনের উৎকর্ষসাধন, শিক্ষার একটী প্রধানতম কারণ, অবশ্য আর্য্যশাস্ত্রবিহিত সংস্কার দ্বারাই প্রধানতঃ মনের উৎকর্ষ সাধিত হয়, চিত্তে নির্ম্মলতার আবির্ভাব হয়, ইহা আমরা সর্ব্বথা স্বীকার করি, কিন্তু তাদৃশভাবে সংস্কৃত হৃদয়েও সংসর্গের দোষে আবিলতা থাকিতে দেখা যায়, এই জন্যই শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে প্রকৃত বিবেক আর সৎসঙ্গ এই দুইটী মানবের চক্ষুঃ, ইহার একটীও যার নাই সে অন্ধ, অতএব কেন সে কুৎসিত পথে যাইবে না ?* পক্ষান্তরে সংস্কার বিহীনে ও সৎসঙ্গের ফলে মনের উৎকর্ষলাভের দৃষ্টান্ত বিরল নহে, ম্লেচ্ছরাজ্যের বিপুল প্রভাবকালেও ভগবচ্চৈতন্যদেবের সংসর্গে পরম দুষ্ট জগাই-মাধাই প্রভৃতির ও চিত্তের উৎকর্ষ লাভের কথা চৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে

*সৎ সঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নির্ম্মলং নয়নদ্বয়ং।
যস্য নাস্তি নরঃ সোঽন্ধঃ কথং ন্যাপদমার্গগঃ ॥

দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থেই এক স্থানে লেখা আছে "আপনি আচরি প্রভু জগৎকে শিখায়" বস্তুতঃ ইহা অতি সত্য, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও নিজমুখে বলিয়াছিলেন, শ্রেষ্ঠ যেরূপ আচরণ করেন সকলেই সেইরূপ আচরণ করে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আচরণের দ্বারা যেটী প্রমাণিত করেন সাধারণ লোক তাহারই অনুবর্ত্তন করে,* সুতরাং এই সকল আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারি, সংসর্গের ফলে চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন হয় এবং সতের আচারের অনুকরণে অর্থাৎ সদাচারের অনুষ্ঠানে এই পরিবর্ত্তন ক্রমশঃ স্থায়িরূপে পরিণত হয়, বর্ত্তমান সময়ে সৎসঙ্গই মানসিক উৎকর্ষ লাভের একমাত্র কারণ। হিন্দুর শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট সংস্কার মানস উৎকর্ষের প্রকৃষ্ট কারণ হইলেও বর্ত্তমান সময়ে তাহার যথাবিধি অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, যেহেতু আমরা আন্তরশক্তি হইতে একরূপ স্খলিত হইয়া পড়িয়াছি যে সেই সকল সংস্কারের প্রতিও সম্পূর্ণভাবে আস্থা স্থাপন করিতে পারিনা। তাই সংস্কার সংস্কাব করিয়া চিৎকাব করিলেও সে কথায় আর এখন কেহ কর্ণপাত করিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না, সুতরাং এক্ষেত্রে যাহা অপেক্ষাকৃত অনায়াসলভ্য তাহারই চেষ্টা করা উচিত। ভগবচ্চৈতন্য দেবের ন্যায় উৎকৃষ্ট সৎসঙ্গ সকল সময় সকলেব ভাগ্যে ঘটে না, কিন্তু তাই বলিয়া এখনও সৎসঙ্গের অভাব হয় নাই ইচ্ছা করিলে এখনও আমরা অনেকেই সৎসঙ্গ লাভ করিতে পারি, তাহাব ফল মহাপ্রভুর সংসর্গজাত ফলের ন্যায় না হইলেও অনেকটা সুফলপ্রদ সন্দেহ নাই। এই বিকৃত সমাজে এখনও সৎসঙ্গেরপ্রতি শ্রদ্ধা একেবারে তিরোহিত হয় নাই এখনও চেষ্টা করিলে অনেকেই সৎসঙ্গে আকৃষ্ট হইয়া মানসিক বলে বলীয়ান হইতে পারেন, ভগবান্ নিজেই ভগবৎ-গ্রন্থে বলিয়াছেন।* সৎসঙ্গে হৃদয় ও কর্ণের বিকার নিবারক অত্যদ্ভুতরহস্যপূর্ণ আনন্দ কর আমার কীর্ত্তিকথার আলোচনা হয়। তাহার ফলে দুরাচার ব্যক্তির ক্রমে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়া থাকে। সৎসঙ্গ যাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে তাঁহাবা সকলেই এই এই শ্লোকের বর্ণে বর্ণে ভগবদুক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা সৎসঙ্গলাভ সমর্থ হয়েন নাই। তাঁহারা একটীবার সৎসঙ্গ করিয়া ইহার সত্যতা পরীক্ষা করিতে পাবেন, যতই বিদ্যা শিক্ষা করুন না কেন; মনের উৎকর্ষ না হইলে সে শিক্ষায় প্রকৃত শিক্ষা হয় না এ কথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার না করিয়া পারেন না, সুতবাং মনোবল সংগ্রহ করিতে হইলে আপাততঃ সৎসঙ্গ করা বই উপায়ান্তর নাই, সৎসঙ্গের ফলে শাস্ত্রে ও সদাচারে বিশ্বাস জন্মিলে ক্রমশঃ সমাজের সংস্কার কার্য্যের আবির্ভাব হইতে পারে। পুরাকালে ধনির বিলাস ভবন প্রসূত অতি আদরের সন্তানও বনচারী জটাজুটধারীর নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অরণ্যবাসী

---

*যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥
গীতা

সতাং প্রসঙ্গাৎ মমবীর্য্য সম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথা।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি, শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতে॥

হইয়া তাহার সংসর্গে বিদ্যাশিক্ষা করিত, সুতরাং শিক্ষার কালেই তাহাদের সংসর্গফলে চিত্তের উৎকর্ষ স্বতঃই ফুটীয়া উঠিত, পরবর্ত্তীকালেও টোলের শিক্ষা সেই অনুকরণে সম্পন্ন হইত, ইদানীং তাহার কোথাও কিছুমাত্রও অনুকরণ নাই, স্কুলকলেজে সংসঙ্গের ত কোনই সম্ভব নাই। সুতরাং পৃথক্‌ভাবে প্রত্যেক ছাত্রের যাহাতে সংসর্গলাভের উপায় হয় তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে করা কর্ত্তব্য অন্যথা প্রকৃত শিক্ষার আর অন্যবিধ উপায় বর্ত্তমানে সম্ভব হইতে পারে না।

সংবাদ।

মাগুরা শাখা ব্রহ্মণ-সভার তত্ত্বাবধানে সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

বর্ত্তমান সময়ে নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে দেশে শিক্ষার বিস্তার আশানুরূপ সন্দেহ নাই, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না সাধারণ পল্লী সমাজের অবস্থা এত উন্নত না হইলেও লোকের ধর্ম্মকর্ম্মে মতি ছিল, প্রায় অধিকাংশ পল্লীতেই ২।৪ জন অধ্যাপক পাওয়া যাইত, "তীর্থের ছড়াছড়ি না থাকিলেও বিদ্যারত্ন ন্যায়ালঙ্কার শিরোমণির অভাব ছিল না, এখন সেদিন নাই সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই দেশ স্বেচ্ছাচার স্রোতে ভাসমান হিন্দু আচারভ্রষ্ট,—ব্রাহ্মণ অধঃপতিত—বিপথগামী, বৈশ্য, শূদ্র, ক্ষত্রিয় ভূস্বামীগণ স্বধর্ম্ম রক্ষণে—ব্রাহ্মণপ্রতিপালনে একান্ত সঙ্কুচিত পরন্তু অক্ষম—ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল। কুল ললনাও ব্রত নিয়মে উৎসাহহীনা, বয়োবৃদ্ধেরা সন্ধ্যাহ্নিকে বিরত, পূজাপর্ব্বাহ আমোদ প্রমোদের জন্য, দেব দেবীর ভোগের সহিত ইংরাজী খানার আয়োজন। পূজার ছুটিতে পশ্চিম যাত্রা—(গোঁড়া হিন্দুর বার্ষিক কর্ম্মঃ) এই সবই এখনকার বর্ত্তমান আদর্শ হিন্দুগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যেই প্রায় গণ্য হইয়াছে। যজন যাজন ব্যবসা হীনবৃত্তি বলিয়া ব্রাহ্মণসন্তানদের পরিত্যাজ্য হইতে চলিল, তিলক নামাবলীধারী ব্রাহ্মণ সং রূপে গণ্য—কৌতুক তামাসার পাত্র, যেখানে রং তামাসা সেই খানেই ব্রাহ্মণের এই চিত্র—এই সংস্কারের যুগে সকল জাতির সকল জিনিসের আধুনিক সংস্করণ চলিতেছে, দেশ কাল পাত্র অনুসারে উহা মুখরোচক ও চিত্তাকর্ষক, সুতরাং নবভাবের কাটতী বাজারে খুববেশী—এই শ্রেণীর সংস্কারকেরা উচ্চ শ্রেণীর ব্যবসায়ী নিশ্চিতই কিন্তু শাস্ত্রবিশ্বাসী বা মৌলিকতাপ্রিয় নহেন একথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—কালওয়াতের সুর অনেক সময় সাধারণের শ্রুতি সুখকর হয় না, কিন্তু সে জিনিস খাঁটী। রামায়ণে ও কীর্ত্তনে হারমোনিয়মের সুর বেথাপ। সংগীত শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত দেশীয় বিদেশীয় রাগের তারতম্য বুঝিতে পারেন না, আমরা কিন্তু হার-মোনিয়ম দেখিলেই খুসী হই, আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের ট্যাবলেট প্রস্তুত করা প্রয়োজন কিনা আমরা বুঝিতে পারি না, আমাদের বিশ্বাস যাহার যাহা তাহার তাহাই ভাল - মিশ্রিত জিনিসটাই সুস-

নীয়। উন্নতির চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু তা বলিয়া লৌহ স্বর্ণ হইবে না, কাকও ময়ূর হইবে না, উপরে চাকচিক্য রং ঢং ফলান যায় বটে আসল বস্তুর পরিবর্ত্তন একান্ত অসম্ভব। ভাল হউক মন্দ হউক সংস্কার অবশ্যম্ভাবী, কালস্রোতও অনিবার্য্য, তাই চেনা ব্রাহ্মণের ফোঁটা চাই, সভা করিয়াও ব্রাহ্মণ হইতে হয়। তাই মনে হয় ব্রাহ্মণ সভার সৃষ্টি সময়োপযোগী, ব্রাহ্মণসভা সকল ব্রাহ্মণকেই সুব্রাহ্মণ না করিতে পারুন অন্ততঃ পক্ষে সমাজে অব্রাহ্মণের সংখ্যা বর্দ্ধিত না হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন। নানা কারণেই ব্রাহ্মণ জাতির অধঃপতন ঘটিয়াছে, নানা কারণেই অনেক ব্রাহ্মণসন্তানেরা স্বপদ হইতে নিয়ে পতিত হইয়াছেন—এখন আমরা ঠাকুর বলিয়া ডাকিলে অপমান মনে করি, বাবু বলিলেই প্রাণটা সুখী হয়, অবস্থা এত দুরই গড়াইয়াছে, অবশ্য পেটের দায়ে ইংরাজী ভাষা শিখিতে হয় কিন্তু নিজের জাতীয় গৌরব নষ্ট করি কেন? এ চিন্তাকরা ব্রাহ্মণ মাত্রেরই কর্ত্তব্য—দেহ মন পবিত্র রাখার জন্য, এই নানাবিধ ব্যাধি প্রপীড়িত দেশে সুস্থ দেহে দীর্ঘজীবন লাভের আশায় সদাচারী হওয়া কর্ত্তব্য, সংযম শিক্ষাও যে একান্ত প্রয়োজন ইহা সকলেই বুঝিয়াছেন, আধুনিক বিজ্ঞানও ইহার পোষকতা করে। বিকৃত শিক্ষায় সমাজে পাপের স্রোত প্রবহমান, মনে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করিলেও পাপ হয়, যাঁহারা এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন তাঁহাদেরই বংশধরেরা আজ নরহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে সঙ্কুচিত হইতেছে না।

সৎশিক্ষা সকলেরই আবশ্যক তাহাতে জাতিভেদ রাখা কখনই কর্ত্তব্য নহে কিন্তু কার্য্য গতিতে মানসগতির তারতম্যে সামর্থ্য অসামর্থ্য নির্ণয় করিয়া পৃথক পৃথক জাতি ধর্ম্ম বিশেষে পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষার ব্যবস্থাই যুক্তি যুক্ত ইহা চিন্তাশীল শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রের স্বীকার্য্য তাই ব্রাহ্মণ সভার স্বাতন্ত্র্যভাব—কিন্তু লক্ষ্য সাধারণের উপর, বিদ্বেষপ্রণোদিত বুদ্ধিতে ব্রাহ্মণ-সভা সৃষ্ট হয় নাই একথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, ব্রাহ্মণসভা যেমন স্থানে স্থানে শাখা ব্রাহ্মণ-সভা গঠন করিতেছেন, তদ্রূপ চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা কার্য্যে সভা তেমন মনোযোগী হউন ইহাই আমাদের ধারণা, তাই আমাদের প্রার্থনা আশা করি এই নগণ্য ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রস্তাব আলোচিত হইবে।*

বলিয়াছি আমরা কালস্রোতে ভাসমান, হিন্দু মুসলমান উভয়েরই ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল করিতেছেন। তবে হিন্দুর মাত্রাটা চড়িয়াছে বেশী, শাস্ত্রীয় বা সামাজিক রীতি নীতি লঙ্ঘন করাই যেন খুব বিদ্যাবত্তার পরিচয় ইহাই আমরা মনে করি, আমরা মূর্খ তাই পাণ্ডিত্যের অভিমান। দেখিতে পাই ছাত্রেরা ব্রহ্মচর্য্যের পরিবর্ত্তে বিলাসিতা, বিনয়ের পরিবর্ত্তে উচ্ছৃঙ্খলতা, শিষ্টাচারের পরিবর্ত্তে ঔদ্ধত্যই প্রকাশ করে, প্রাথমিক পাঠশালায় বা স্কুল কলেজে

---

*ব্রাহ্মণসভায় এ আলোচনা পুর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে শাখা-সভা ও তদন্তর্গত চতুষ্পাঠী স্থাপন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার কার্য্য মধ্যে পরিগণিত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার নিয়মাবলী পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। ব্রাঃ সঃ সঃ।

এসকলের প্রকৃত শিক্ষা হয় না। সেজন্ত হিন্দুর দেশে যাহাতে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হয়; সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। মনের সহিত শরীরের বিশেষ সম্বন্ধ ইহা সকলেই জানেন, ভাষার সহিত ও চরিত্রের সেইরূপ সম্বন্ধ আছে পোষাক পরিচ্ছদের সম্বন্ধেও ঐ কথা। হ্যাটকোট বুট পরিধান করিয়া ইংরাজী বকিলে—আর চটী পায় দিয়া নামাবলীধারীরূপে সংস্কৃত বচন আওড়াইলে যে স্বরের পরিবর্ত্তন হয় ইহা আমরা সকলেই বুঝিতে পারি, তাই মনে হয় যাহার যাহা জাতীয় ব্যবসা।তাহা বজায় রাখা জাতিমাত্রেরই কর্ত্তব্য—তার পর সমাজে পুরোহিতের অভাব হইতেছে হিন্দুর নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ লোপ হইবার নহে, ব্রাহ্মণের উপনয়ন, ব্রাহ্মণেতরের অন্নাশন, বিবাহ, আদ্যশ্রাদ্ধ (অন্ততঃ) দুর্গোৎসব প্রভৃতি অবশ্য অনুষ্ঠের কর্ম্ম সম্পন্নেরও তো বিঘ্ন হইতে চলিল, পল্লী সমাজে কাব্যতীর্থেরাই স্মৃতির অধ্যাপক রূপে ব্যবস্থাদি দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দেশবাসী পুনরায় যাহাতে দেবভাষা শিক্ষার অনুরাগী হন, ব্রাহ্মণসভা কায়মনো- বাক্যে তাহার চেষ্টা করুন, ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র আলোচিত হইবে, শাস্ত্রে জ্ঞান ও ধর্ম্মে মতি হইলে, ব্রাহ্মণ পুনরায় সদাচার ফিরাইয়া পাইবেন আবার তাঁহারা স্বপদস্থ হইতে পারিবেন, নতুবা সমাজের মহৎ অকল্যাণ অদূরবর্ত্তী। এখানে আমরা উল্লেখ করিতে বাধ্য, যে আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট, ঈদৃশ প্রয়োজনীয় কার্য্যে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেছেন, স্থানে স্থানে টোলে সাহায্য দিয়া রাজার কর্ত্তব্য প্রতিপালন করেন কিন্তু দুঃখের বিষয়, বৃত্তিপ্রাপ্ত পণ্ডিত মহাশয়েরা (অধিকাংশ স্কুলের পণ্ডিত) ঐ বৃত্তির অপব্যবহার করেন, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা, চতুষ্পাঠীর সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া উপযুক্ত পরিদর্শক নিযুক্ত করিলে সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্য অল্প অল্প হইতে পারে, স্কুলের পণ্ডিত মহাশয়েরা দুই কার্য্য চালাইতে তাদৃশ সময় পান না, তাঁহাদের এ সাহায্য গ্রহণ না করা ভাল। অনেকদিন হইল আমাদের ন্যায় কয়েকজন ক্ষুদ্র ব্যক্তির চেষ্টায় খুলনা জেলার মাগুরা গ্রামে একটি চতুষ্পাঠী সংস্থাপিত হইয়াছিল, সে ৪৬।৪৭ বৎসরের কথা কিছুদিন যাবৎ সুপরিচালিত হইয়া ইহা কালগর্ভে নীত হইয়াছে, বাঙ্গালীর কার্য্যের আরম্ভটা সুন্দর, শেষরক্ষা প্রায়ই হয়না—আমাদের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণ-সমাজের পাঠকবর্গ অবগত আছেন উক্ত মাগুরা গ্রামে একটী শাখা ব্রাহ্মণ-সভা আছে—কিন্তু এ প্রদেশে ব্রাহ্মণ অধিবাসীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প মুষ্টিমেয়, কয়েক ঘর দরিদ্র ব্রাহ্মণ লইয়া স্বতন্ত্রভাবে কোন কার্য্যই চলে না, তাই কপোতাক্ষ তীরবর্ত্তী গ্রামসমূহ সম্মিলিত হইয়া সভার প্রসার বৃদ্ধি করার চেষ্টা হইতেছে। প্রাথমিক অনুষ্ঠান চতুষ্পাঠী সংস্থাপন, সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত কপোতাক্ষ তীরবর্ত্তী তালমাগুরা, কুমিরা, খলিসাখালি প্রভৃতি গ্রাম ভদ্রপল্লী। এই সমস্ত পল্লীর মধ্যস্থলে ইসমলকাটী গ্রামে চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা হইতেছে, এই গ্রাম নিবাসী উৎসাহশীল যুবক শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও খলিসাখালি নিবাস শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ চট্টোপাধ্যায় ইহার প্রধান উদ্যোগী—গত ২৩শে আশ্বিন উক্ত ইস্‌মলকাটী গ্রামে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সাতক্ষীরার উকীল শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ

বসু মহাশয় সভাপতির পদগ্রহণ করিয়াছিলেন—বহুসংখ্যক ভদ্রলোক সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সাতক্ষীরার অন্যতম উকীল সুজনসাহা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজলাল ঘোষ বি,এল মহাশয়ের ন্যায় দেশহিতৈষী ব্যক্তিকে এই শুভানুষ্ঠানে যোগদান করিতে দেখিয়া আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবু চতুষ্পাঠী গৃহনির্ম্মাণের উপযোগী ভূমি, গৃহ-নির্ম্মাণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ্য ১০০৲ এবং খলিসাখালির শ্রীযুক্ত সীতানাথবাবু ৫০০৲ টাকা আপাততঃ দিতেছেন অর্থ সংগ্রহের অন্যান্য চেষ্টাও হইতেছে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সহকাকারী সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তালা—(বি. দে, ইন্)
শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু ঐ

সদস্যগণ—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, গোপালপুর (তালুকদার)
„ ব্রজলাল ঘোষ বি,এল, সুজনসাহা (উকীল সাতক্ষীরা)
„ গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐ
„ গোপালচন্দ্র ঘোষাল, নাংলা (কবিরাজ)
„ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় এল, এম, পি, মাগুরা (গ্রন্থকার শক্তিমঙ্গল)
„ নেপালকৃষ্ণ ঘোষ, (ডাক্তার) মাগুরা
„ পূর্ণচন্দ্র রায় (সব রেজেষ্ট্রার) ঐ
„ সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, (তালুকদার) মাগুরা
„ অম্বিকাচরণ হালদার, জলয়া (পেন্‌সন্ হোল্ডার)
„ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চাঁদকাটী (শিক্ষক)
„ গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ, চাঁদকাটী হেড্ পণ্ডিত, এম, সি, ইন্)
„ ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপাড়া
„ কালীপদ চট্টোপাধ্যায়, (তালুকদার) বাগমারা
„ সীতানাথ চট্টোপাধ্যায়, খলিসাখালি

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বসু, (জমিদার) খলিসাখালি
„ প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, ঐ
„ রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (তালুকদার) কুমিরা
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, (ডাক্তার) কুমিরা
„ ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, (ডাক্তার) কাশীপুর
„ অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ

„ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাগরদাঁড়ী

„ সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (ব্যবসায়) ইসমলকাটী

(ইসমলকাটী নিবাসী অন্য এক ভদ্রলোক)

হেড্ মাষ্টার—

„ বি, দে ইনষ্টিটিউসন তালা

„ এস, সি, „ খলিসাখালি মাগুরা

„ কুমিরা হাই—

„ ধান্দিয়া হাই—

আবশ্যকমত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে। ৯ জন উপস্থিত হইলেই কার্য্যকরী সভার কার্য্য চলিবে।

আমরা অবগত হইলাম কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ যত শীঘ্র সম্ভব হয়, পুনরায় আব একটী সভার অনুষ্ঠান করিয়া বঙ্গীয়ব্রাহ্মণ-সভার প্রতিনিধি স্বরূপ ব্রাহ্মণ-সমাজ পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার তর্কনিধি মহাশয় প্রমুখ কয়েক ব্যক্তিকে সাদর আহ্বান জানাইবেন।

শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বর্ণাশ্রম-সভা।

দ্বারবঙ্গাধিপতির উদ্যোগে এক বিশাল সভার অধিবেশন গত ১লা মাঘ রবিবার অপরাহ্ণে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাকে স্থায়িভাবে রক্ষণ পরিচালন ও বিস্তৃতির জন্য সনাতন-সভা স্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণসম্মিলনের অভিজ্ঞতায় বুঝা গিয়াছে—কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্ম এখনও নির্ব্বাসিত হন নাই, ধর্ম্ম অর্থাৎ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষার জন্য ইচ্ছা অনেকেরই আছে। বর্ণাশ্রম-সভা তাহারই একটা অভিব্যক্তি মাত্র।

কিন্তু এ সভায় বিশেষ চিন্তা করিবার বিষয় আছে। বর্ণাশ্রম সভায় উপদেশক বা বক্তা সদাচাররত ব্রাহ্মণই হইবেন, এরূপ নিয়ম থাকা উচিত। অর্থের প্রভাবে আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিকে এই সভায় প্রধানভাবে গ্রহণ করাও উচিত নহে। পতিত অপতিত, শুদ্ধ অশুদ্ধ সকল ব্যক্তিরই সভায় উপদেশ শুনিবার অধিকার আছে, শ্রোতৃপর্য্যায়ে বসিয়া উপদেশ দানে বঞ্চিত হইয়া যদি কিছু আত্মগ্লানি অনাচারীর আসে, অন্ততঃ তৎপক্ষে সভায় দৃষ্টি করা একান্ত কর্ত্তব্য। যতদিন এরূপ ভাবের পরিচয় না পাই—ততদিন নবপ্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রম-সভা বা তাহার অনুকূল সভার কার্য্যে আশঙ্কান্বিত থাকিব। বর্ত্তমান সময়ে সে আশঙ্কা প্রবল আছে। অতএব আচারপূত ব্যক্তির পক্ষে এই সভা এখনও আনন্দদায়িনী নহে।

সমালোচনা।

উপাসনাতত্ত্ব।—শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, বর্দ্ধমান দাঁইহাট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ, উপাসনাতত্ত্ব লিখিবার অধিকার তাঁহার আছে। সেই অধিকার অনুসারে কর্ম্ম করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন।

উপাসনাতত্ত্বে ৮টী অধ্যায় আছে, ১ম পঞ্চতত্ত্বের প্রকৃততথ্য নিরূপণ,—এই অধ্যায় গ্রন্থকার প্রচুর গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার মীমাংসা ও শ্রৌতস্মার্ত্ত মতের অনুগামিনী। সকল তান্ত্রিক-সম্প্রদায় ইহার সহিত একমত না হইলেও ইহার বিচারপ্রণালীর মীমাংসা সকলকেই মুক্ত-কণ্ঠে করিতে হইবে। ২য় অধ্যায়ে দিব্যভাবের সাত্ত্বিক পঞ্চমকার। মদ্যের স্বরূপ মনাস্থলে গ্রন্থকার কৈবল্যতন্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বহূক্তং পরমং ব্রহ্মনির্ব্বিকারং নিরঞ্জনং তস্মিন্ প্রমদনং জ্ঞানং তন্মদ্যং পরিকীর্ত্তিতম্।

পরম ব্রহ্মজ্ঞানে পরমানন্দ লাভ হয়বলিয়া, সেই জ্ঞান প্রমদন নামে কথিত। প্রমদন বলিয়াই তাঁহার নাম: মদ্য।' এইরূপ পঞ্চমকারেরই পৃথক ব্যাখ্যা আছে। এ বিষয়ে গ্রন্থকারের সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা প্রশংসনীয়। ৩য় অধ্যায় পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব, ৪র্থ অধ্যায় মদ্যপান বর্জ্জন ও সাত্ত্বিক উপাসনা, ৫ম অধ্যায় অনাচারীর ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে ধর্ম্মরক্ষার প্রার্থনা, ৬ষ্ঠ বেদশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত আলোচনা, ৭ম তন্ত্রোক্ত আচার ও শুদ্ধাচার, ৮ম স্মৃত্যুক্ত আচার এবং তপস্যা উপাসনার আবশ্যকতা। প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের কথা আমাদের মনঃপূত নহে। অন্যান্য মীমাংসা সদাচারের অনুকূল এবং প্রায়ই বিশেষ যুক্তিযুক্ত।

সরল ভাষায় এইরূপ প্রয়োজনীয় গভীর বিষয়ের আলোচনাপূর্ণ গ্রন্থ এ সময়ে প্রায়ই রচিত হয় না, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দক্ষতার সহিত সেই কার্য্য করিয়া মাতৃভাষার চরণে নব প্রস্ফুটিত কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থ সমাজে সমাদৃত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য।

গ্রন্থখানিতে বিষয় সন্নিবেশে শৃঙ্খলার অভাব আছে—ইহাই সহনীয় ত্রুটি। আশা করি গ্রন্থকার পুনঃ সংস্করণে সেই ত্রুটি শোধন করিবেন।

REGISTERED No. C—675.

পঞ্চম বর্ষ। { ১৮৩৮ শক, ১৩২৩ সাল, চৈত্র। } সপ্তম সংখ্যা।

হোলীর বাঁশী।

শোন্‌রে ললিতা কোথা বংশী ফুকারে!
দূরগত-মৃদুধীর-মধুর-মেদুরতর
রন্ধ্র-ক্ষরিত সুধাধারে!

ছুটে চল, ছুটে চল—কত আরো আছে বাকি
সেই ত যমুনা, এত দূর কেন জানিনা!
আমারে বংশীস্বরে ডাকিছে,—যেতেই হ'বে
দূর বা নিকট কিছু মানিনা!
পবনবিধুর-বিধুবনে মৃদু সমীরণে,
কাননে গুন্ গুন্ মধুকর গুঞ্জনে
উন্মনা, ঝিনি ঝিনি শিঞ্জিনী-নর্ত্তনে
আবেশ-বিভোরা গোপ-বধূ নিশিজাগরণে
মত্ত কি ঘিরি বধূয়ারে!

দাঁড়াই—যাব না ;—একি, কাঁপে বুক বারবার
দেরীও সহেনা, আর পারিওনা ছুটিয়া—
গগনে চাঁদিমা দেখি হেসে হয় কুটি কুটি
জ্যোছ্‌না উরসে পড়ে লুটিয়া!
নিশ্চল আনমনে চক্ষু মুদিয়া রব,
বক্ষে করিব গুরু কম্পন অনুভব ;
মুগ্ধা অবলা আমি—কি কব—আর কি কব—
লক্ষ হৃদয়-তারে ভিন্ন অযুত রব
বাজিয়া উঠিছে একেবারে!

আবার ডাকিছে ওই! আমার সে কানু কই!
এখনো রয়েছে রাধা তারে ছাড়ি সরিয়া!
তমাল-পাতায় যথা, যমুনার জলে যথা—
আলো-ছায়া জাগে হৃদি ভরিয়া!
নন্দ-দুলাল আজি সেজেছ বড়ই ভালো
সুন্দর দেহে মিশে কালো-লাল—ছায়া-আলো!
কুণ্ডল-চুম্বিত গণ্ড রঙিন্ ফাগে,
গোপবধূ-চুম্বন-অঙ্কন অনুরাগে
কোথাও দিয়াছে মুছি তারে!

কুঙ্কুম-ফাগ্-খেলা খেল্‌না,—কালার পরে
রক্ত আবীরে সাদা জ্যোৎস্না পড়িয়া
অসীম সুন্দরতা ভুবন ভরিয়া রবে
একটি ইন্দ্রধনু গড়িয়া!

আপন বিভিন্নতা রক্ষা করিয়া রবে,
সান্তর সমীচীন সান্দ্র মিলনে রবে
নিত্য বিরাজমান ; কল্প অতীত যবে
বর্ণ সমূহ এক কালায় বিলীন হবে—
কৃষ্ণে সমাধি লভিয়ারে!

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

শ্রাদ্ধে বিরাটপাঠের উদ্দেশ্য।

শ্রাদ্ধে গীতা ও বিরাটপাঠ হিন্দুদিগের চিরন্তনপ্রথার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। গীতা যেমন মহাভারতের অংশবিশেষ, বিরাটও তেমনই মহাভারতের বিরাটপর্ব্ব। শ্রাদ্ধে গীতা-পাঠের উপযোগিতা আমরা কতকটা উপলব্ধি করিতে পারি। আত্মা যে অবিনশ্বর এবং মৃত্যু যে কেবলই দেহের বিনাশ, আত্মার বিনাশ নহে, এই দেহের বিনাশও যে আবার জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নব বস্ত্র পরিধানেরই ন্যায় জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ মাত্র ধারণ, মৃত্যু যে আমাদের জীবনের কৌমার, যৌবন, জরারই ন্যায় অবস্থান্তর মাত্র—এই সমস্ত কথাই আমাদের প্রবোধের জন্য গীতাতে অতীব হৃদয়গ্রাহী ভাবে প্রচারিত হইয়াছে। এই প্রকারে আমাদের জন্মমৃত্যুরহস্যই কেবল গীতাতে বিবৃত হয় নাই, তৎসঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিশ্বরহস্যই গীতায় বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং গীতাপাঠের দ্বারা আমরা যেমন জীবনের রহস্য জ্ঞাত হইতে পারি—তেমনই সৃষ্টির রহস্যও জ্ঞাত হইতে পারি। এই প্রকারে বেদোপ-নিষদাদি ধর্ম্মগ্রন্থের স্থলবর্ত্তিরূপেই শ্রাদ্ধে গীতাপাঠের উপযোগিতা হইয়াছে।

কিন্তু শ্রাদ্ধে বিরাটপাঠের পূর্ব্বোক্তরূপ কোন উপযোগিতা সহজ দৃষ্টিতে উপলক্ষিত হয় না। বিরাটরাজের রাজধানীতে পঞ্চপাণ্ডবের এক বৎসর অজ্ঞাতবাস ইহাই বিরাটপর্ব্বের বিষয়। শ্রাদ্ধের সহিত উক্ত বিষয়ের কোনরূপ সম্বন্ধই কল্পনায় আসে না। তবে শ্রাদ্ধে বিরাট-পাঠের কোনরূপ উদ্দেশ্য যে শাস্ত্রে কল্পিত হয় নাই, তাহা বলা যাইতে পারে না। আমা-দের প্রত্যেক ধর্ম্মকার্য্যেই একটী সঙ্কল্প করিতে হয়। এই সঙ্কল্পটীতেই উদ্দেশ্যের বা ফলের কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধে বিরাটপাঠেরও একটী সঙ্কল্প আছে। তাহা এইরূপ—"মৎসঙ্কল্পিতবৃষোৎসর্গাঙ্গহোমীয়হবিরক্ষয়ত্বকাম" ইত্যাদি। ইহাতে শ্রাদ্ধীয় যজ্ঞের হবিঃ অক্ষয় হওয়ার কল্পনাই দেখা যায়। কিন্তু বিরাটপর্ব্বের সহিত যজ্ঞীয় হবির যে কি সম্বন্ধ তাহা ইহাতেও পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যাত হয় না। কিন্তু এই আভাস হইতে প্রকৃত ব্যাখ্যাটীর কল্পনা আমরা সহজেই বলিতে পারি ;

বিরাটপর্ব্ব পাঠে বিরাটরাজের এক বিশেষ ঐশ্বর্য্যের কথা আমরা জানিতে পারি · তাহা ইঁহার গোধন বা গোসম্পত্তি। ভারতীয় অন্য কোন রাজারই বোধ হয় এরূপ বিপুল গোসম্পত্তি ছিল না। তাহাতেই ভারতের তৎকালীন অসীম প্রতাপশালী কুরুরাজ দুর্য্যোধনের পর্য্যন্ত বিরাটরাজের গোসম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার প্রবল লোভ উপস্থিত হইয়াছিল। এইজন্য তিনি বিপুল যুদ্ধায়োজন করিয়াছিলেন এবং ইহাতে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি সমস্ত মহারথিগণই যোগদান করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধ "উত্তর গোগৃহের যুদ্ধ" নামেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। সুশর্ম্মা নামক ত্রিগর্ত্তরাজই এই যুদ্ধের প্রধান যুক্তিদাতা ছিলেন। তিনি কুরুসৈন্যের পূর্ব্বে যাইয়া বিরাটরাজ্যের দক্ষিণে দক্ষিণ গোগৃহের গোসকল হরণ করিয়াছিলেন। তৎপর

বিপুল কুরুবাহিনী উত্তরদিকে যাইয়া উত্তর গোগৃহের গোসকল হরণ করে। উত্তর গোগৃহের গোসংখ্যা ছিল ষাইট হাজার। উপরোক্ত গোহরণ ঘটনা বিরাটপর্ব্বের যে অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার নাম হইয়াছে "গোহরণ পর্ব্বাধ্যায়"। উত্তর ও দক্ষিণ উভয় গোগৃহের অপহৃত গোসকলেরই পাণ্ডবগণ-কর্তৃক উদ্ধার হয় এবং এই উপলক্ষেই পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাস হইতে মুক্ত হইয়া সকলের নিকট প্রকাশিত হন। সুতরাং এই গোহরণ ও গো-উদ্ধার ঘটনাই—বিরাটপর্ব্বের প্রধান বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বস্তুতঃ এই গোহরণ ঘটনার সহিতই বিরাটপর্ব্ব শেষ হইয়াছে বলা যায়। "গোহরণ পর্ব্বাধ্যায়েই" বিরাট-পর্ব্বের একরূপ উপসংহার, ইহার পর "বৈবাহিক পর্ব্বাধ্যায়" নামে যে একটী অতি ক্ষুদ্র পর্ব্বাধ্যায় আছে, উহাকে গোহরণ পর্ব্বাধ্যায়েরই অংশ বলা যাইতে পারে; কারণ গো-উদ্ধারের ঘটনায় পাণ্ডবগণের পরিচয় পাইয়াই তবে বিরাটরাজ উত্তরার বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু পাণ্ডবদিগের সহিত গো-উদ্ধার ঘটনার সম্পর্ক হেতুই যে শ্রাদ্ধে বিরাটপর্ব্ব পঠিত হয় তাহা নহে; পরন্তু বিরাটরাজের অতুল গো-সমৃদ্ধি; তৎপ্রতি অশেষ বিভবশালী তদানীন্তন প্রধান কুরুরাজের লোভ এবং পাণ্ডবদিগের অসীম বলবিক্রমে ভীষণ যুদ্ধের পর অপহরণকারী রাজাদিগের হস্ত হইতে ইহার উদ্ধার ইত্যাদি ঘটনাপরম্পরা দ্বারা গো যে কেবল সাধারণেরই ধনরূপে পরিগণিত ছিল তাহা নহে, অপিচ রাজা মহারাজদিগেরও যে মহামূল্য সম্পত্তি-রূপেই গণ্য ছিল, তাহা স্মরণ করিবার জন্যই বিরাটপর্ব্ব পঠিত হয়; ইহাই আমাদিগের অনুমান।

পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক বিরাটরাজের প্রাগুক্ত গোরক্ষণব্যাপার প্রসঙ্গে বিরাটপাঠের পূর্ব্বোক্ত "বৃষোৎসর্গাজহোমীয়হবিরক্ষয়ত্বকামঃ" রূপ সঙ্কল্পের কথা স্মরণ করিলে ইহার প্রকৃত মর্ম্ম আমাদিগের নিকট অনেকটা সুগম হইয়া আসে। বিরাটরাজের গো-সকল যেমন ধর্ম্মবল পাণ্ডবদিগের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কট হইয়াছিল, তদ্রূপ ধর্ম্মপ্রভাবদ্বারা আমাদের গো-সকলও চিরসুরক্ষিত হইয়া যজ্ঞকার্য্যার্থ হবিঃধারণ করুক্, ইহাই সঙ্কল্পের প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়।

সঙ্কল্পে "বৃষোৎসর্গাজ" কথাটার যোগ হইতে আমরা "হোমীয় হবির অক্ষয়ত্ব কামের সঙ্গে" আরও কামনা সংযোগই বুঝিতে পারি। শ্রাদ্ধে যে বৃষ ও তৎসহিত বৎসতরী উৎসর্গীকৃত হয়, তাহাদিগের অক্ষয়ত্বকামও আমরা ইহা হইতে বুঝিতে পারি। বিরাটরাজের যেমন অসংখ্য গো-বংশ ছিল, ইহাদিগের দ্বারাও তেমন গো-বংশের বিশাল বিস্তার হয়, ইহাই বিরাটপাঠের দ্বারা তাহাদের অক্ষয়ত্ব কামনা। বৃষ ও গাভীদানের দ্বারা গোকুলের উন্নতি সাধনের জন্যই বৃষ ও গাভীদান শ্রাদ্ধের প্রধান কার্য্য হইয়াছে, তাহাতেই শ্রাদ্ধ "বৃষোৎসর্গ" নামে অভিহিত হইয়াছে।

হবির জন্যই গোর সম্মান, তাহাতেই শাস্ত্রে গোমাহাত্ম্যকীর্ত্তনে হবিরই উল্লেখ পাওয়া যায় যথা—

ব্রাহ্মণশ্চৈব গাবশ্চ কুলমেকং দ্বিধাকৃতম্ ।
একত্র মন্ত্রাস্তিষ্ঠন্তি হবিরন্যত্র তিষ্ঠতি ॥”

ইতি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে ।

“ব্রাহ্মণ ও গো একই কুল দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে, একেতে মন্ত্র বাস করে, অন্যেতে হবিঃ অবস্থান করে।”

গো-কুলের উন্নতিতেই হবিরও উন্নতি। বিরাটরাজ, পাণ্ডবভ্রাতা সহদেবের সহায়ে গো-জাতির যেরূপ উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় আর কেহই পারেন নাই। সুতরাং বিরাটপাঠে বিরাটরাজেরই ন্যায় গোজাতির উন্নতির দ্বারা হবির অক্ষয়ত্ব সাধনেরই যে কামনা করা হইবে, তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়।

এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে বিরাট রাজ্যে পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস বিরাট-পর্ব্বের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হইলেও বিরাটরাজের পালিত গো-সকলের পোষণ, বৰ্দ্ধন ও রক্ষণই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য হইয়াছিল। অতএব শ্রাদ্ধের বৃষোৎসর্গরূপ গোদানকার্য্যে যে পাণ্ডব-দিগের সেই অত্যুদার গো-সেবার অতুলনীয় পুণ্যকীর্ত্তিকলাপ পরম শ্রদ্ধার সহিত স্মৃত হইয়া আমাদিগের মধ্যে অনুরূপ গো-সেবার উৎসাহ সঞ্চারিত করিবারই জন্য বিরাটপর্ব্বপাঠের অতীব সমীচীন ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

দেবযানী-বিবাহ।

দেবযানী ব্রাহ্মণকন্যা, যে সে ব্রাহ্মণের কন্যা নহে, পরম তপস্বী দৈত্যগুরু ভার্গবের কন্যা, আর তাহার পাণিগ্রাহক চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতি। এমন বিসদৃশ সংঘটন কেন ঘটিল? ব্যবস্থা-দাতা ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বাড়ীতে এইরূপ অব্যবস্থা কেন হইল? কেহ কেহ মনে করেন বুঝি বা পূর্ব্বকালে এইরূপ প্রতিলোমে অসবর্ণবিবাহ ও প্রচলিত ছিল; জাতিভেদ শিথিল ছিল, নতুবা মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রের অননুমোদিত বিবাহ ব্যাপার এমন সুসভ্য সমাজে অনায়াসে সম্পন্ন হইয়া যাইত না।

দেবযানীর বিবাহ বৃত্তান্ত আদ্যন্ত আলোচনা করিলে প্রাচীন সমাজে জাতিভেদের শিথিলতা প্রমাণিত না হইয়া বরং দৃঢ়তাই সমর্থিত হয়।

শুক্রনন্দিনী দেবযানী কামবশে নিজ পিতৃশিষ্য কচকে পতিরূপে বরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কচ এইরূপ শাস্ত্রনিষিদ্ধ প্রস্তাবে অসম্মত হইলে দেবযানী তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন। কচও তাহাকে প্রতিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন :—

"দেবযানি, তুমি যাহা অভিলাষ করিতেছ তাহা নিষ্ফল হইবেই এবং অন্য কোন ব্রাহ্মণ-কুমারই তোমার পাণিগ্রহণ করিবে না, তুমি অচিরেই ক্ষত্রিয় হস্তে নিপতিত হইবে"

বলা বাহুল্য যে, কচের শাপপ্রভাবে তদবধি দেবযানীর হৃদয়ের ব্রাহ্মণোচিত সাত্ত্বিকভাব তিরোহিত হইয়া ঘোর রাজসভাব উদ্‌বুদ্ধ হইল, তজ্জন্যই তিনি সামান্য বস্ত্রবিপর্য্যয়ব্যাপারে ক্রোধে অধীরা হইয়া বৃষপর্ব্বনন্দিনী শর্ম্মিষ্ঠার সহিত হস্তা-হস্তিতে প্রবৃত্ত হন্, তাহারই ফলে অসুররাজকুমারী কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত হন।

এমনি কালে ঘটনাক্রমে সমাগত মৃগয়াবিহারী রাজা যযাতি দক্ষিণহস্তে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে সেই দুর্গম অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার করেন। এই দিন দেবযানী ও যযাতি স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন, কেহই কাহাকে চিনিতে পারিলেন না।

দিনান্তরে দেবযানী সখীগণ সমভিব্যাহারে প্রমোদবনে বিহার করিতেছেন, এমনি কালে মৃগয়াশ্রমে ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া মহারাজ যযাতি জলপানাভিলাষে তপোবনে প্রবেশ করিলেন এবং সখীমুখে জানিতে পারিলেন, ইনিই শুক্রদুহিতা দেবযানী।

দেবযানী রাজার পরিচয় প্রার্থিনী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—

রাজবদ্রূপবেশৌ তে ব্রাহ্মীং বাচং বিভর্ষি চ।
কিং নামা ত্বং কুতশ্চাসি কস্য পুত্রশ্চ শংস মে। ১৩॥

৩০ অঃ মৎস্য পুরাণ।

আপনার রূপ ও বেশভূষা রাজার মতই বটে, কিন্তু বাক্যগুলি ব্রাহ্মণের ন্যায় সুসংস্কৃত, আপনার নাম কি, আপনি কাহার পুত্র, এবং কোথা হইতেই বা এখানে আসিয়াছেন? এই সমস্ত বিবরণ আমায় বলুন।

তখন যযাতি বলিলেন,—

ব্রহ্মচর্য্যেণ বেদো বৈ কৃৎস্নঃ শ্রুতিপথং গতঃ।
রাজাহং রাজপুত্রশ্চ যযাতিরিতি বিশ্রুতঃ॥ ১৪॥

(৩ অঃ মৎস্যপুরাণ)

আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি। আমি রাজার পুত্র এবং স্বয়ংও রাজা, আপনি হয় ত শুনিয়া থাকিবেন আমার নাম যযাতি।

দেবযানী এইরূপে রাজার পরিচয় পাইয়া বলিলেন,—মহারাজ! আমি আপনার অধীনা, আপনি আমার পাণিগ্রহণ করুন, আপনিই আমার বিধাতৃ-নিয়োজিত ভর্ত্তা।

এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া যযাতি সবিস্ময়ে উত্তর করিলেন,—সে কি?

বিদ্ধ্যৌশনসি! ভদ্রং তে ন ত্বামর্হোঽস্মি ভামিনি!
অবিবাহ্যাঃ স্ম রাজানো দেবযানি! পিতুস্তব।

(১৮ অঃ আদিপর্ব্ব মহাভারত)

হে শুক্রনন্দিনি! আপনার মঙ্গল হউক, হে ভামিনি! আমি আপনার ভর্ত্তার উপযুক্ত নহি, আপনি ব্রাহ্মণকন্যা, আমি ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়গণ আপনার পিতার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিবার অযোগ্য।

তখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সম্বন্ধের যৌক্তিকতা প্রদর্শনপূর্ব্বক রাজবাক্যের প্রতিবাদ করিয়া দেবযানী বলিতেছেন,—

সংসৃষ্টং ব্রহ্মণা ক্ষত্রং ক্ষত্রঞ্চ ব্রহ্মসংস্থিতম্।
ঋষিশ্চ ঋষিপুত্রশ্চ নাহুষাস্ত ভজস্ব মাম্॥ ১৯॥

(৬০ অঃ মৎস্যপুরাণ)

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-সংসৃষ্ট, এবং ক্ষত্রিয়গণও ব্রাহ্মণ-সংস্রব শূন্য নহে, (অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ারও পাণিগ্রহণ করিতেন, সুতরাং ক্ষত্রিয়ের সহিত ব্রাহ্মণের সংস্রব আছে। আর ক্ষত্রগণও ব্রাহ্মণ হইতেই উৎপন্ন। পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিলে পর নিয়োগধর্ম্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্ররমণীতে সন্তান উৎপন্ন হওয়ায় বর্ত্তমান ক্ষত্রিয়জাতির বিবৃদ্ধি। আপনি রাজর্ষি ও ঋষিবংশ-সম্ভূত, অতএব হে নহুষনন্দন! আমাকে ভজনা কর।

রাজপরিগ্রহাভিলাষিণী দেবযানী রাজাকে ঋষিপুত্র বলিয়া এস্থানে আর এক সূক্ষ্ম যুক্তি খাটাইলেন। রাজাকে বলিলেন আপনি হয় ত ভাবিতেছেন নিজে অব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণ-নন্দিনীর পাণিগ্রহণ করা অধর্ম্ম, কিন্তু এক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে।

আমি যেমন ঋষিনন্দিনী, আপনিও তেমনি ঋষিপুত্র; আপনি চন্দ্রবংশীয়, চন্দ্র—অত্রিঋষির পুত্র, চন্দ্রপুত্র বুধ, তাহার পুত্র পুরূরবা, পুরূরবার পুত্র আয়ুঃ এবং তাঁহারই পুত্র নহুষ, আর আপনি সেই নহুষের নন্দন। অত্রি ঋষি হইতে আপনার সপ্তম পুরুষ অতিক্রান্ত হয় নাই। মনুর মতেও সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত বীজ সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়। সপ্তমপুরুষের পূর্ব্বে অন্য জাতি-মিশ্রণেও জাতি পরিবর্ত্তন ঘটে না।

মহারাজ! ভাবিয়া দেখুন সেই অত্রি ঋষি আপনার অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ-সপিণ্ড ও লেপভাজ্ পিতৃলোক মধ্যে গণ্য, সুতরাং আপনি ঋষিপুত্র, আপনার মূলে যখন ব্রাহ্মণবীজ আছে, তবে আর এ বিবাহে দ্বিধা বোধ কেন?

এই সকল যুক্তিতর্ক অঙ্গীকার করিয়াও রাজা বলিলেন;—

একদেহোদ্ভবা বর্ণাশ্চত্বারোঽপি বরাননে।
পৃথক্ ধর্ম্মাঃ পৃথক্ শৌচা স্তেষাং বৈ ব্রাহ্মণো বরঃ॥

(২০, মহাভারত আদিপর্ব্ব ৮১ অঃ)

হে সুমুখি! ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণই এক হিরণ্যগর্ভের দেহ হইতে উদ্ভূত হইলেও, তাঁহাদের শৌচ আচার ও ধর্ম্মের বিশেষ পার্থক্য আছে, এই সকল জাতি মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। রাজার কথা—মূলে ব্রাহ্মণ-বীজ থাকিলে কি হয়? আচার-ব্যবহার যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অত্যন্ত পৃথক্।

দেবযানী এই চাল ব্যর্থ হইল দেখিয়া আর এক শক্ত চাল চালিলেন, তিনি রাজাকে বলিলেন আপনি আমার হাতে ধরিয়াছেন, সুতরাং এখন আর আপনিভিন্ন কে আমার পতি হইতে পারে?

দেবযানী বলিলেন,—

পাণিগ্রহোনাহুষায়ং ন পুংভিঃ সেবিতঃ পুরা।
ত্বমেনমগ্রহীদগ্রে বৃণোমি ত্বামহং ততঃ॥
কথন্তু মে মনস্বিন্যাঃ পাণিমন্যঃ পুমান্ স্পৃশেৎ।
গৃহীতমৃষিপুত্রেণ স্বয়ং বাপ্যৃষিণা ত্বয়া॥

মহারাজ! পাণিগ্রহণ মাত্রই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়, ইহা পূর্ব্বাপর প্রচলিত, সুতরাং সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে—কূপ হইতে উদ্ধারকালে আপনি যখন আমার দক্ষিণ হস্ত স্পর্শ করিয়াছিলেন, তখনই পাণিগ্রহণ হইয়া গিয়াছে,—এই হস্তটী ইতিপূর্ব্বে আর কোনও পুরুষ স্পর্শ করে নাই, আপনিই অগ্রে গ্রহণ করিয়াছেন, এই নিমিত্তই আমি আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি।

আমি পতিব্রতা, আপনিও ঋষিপুত্র, অথবা স্বয়ংই রাজর্ষি, আপনি যে হস্ত স্পর্শ করিয়াছেন, তাহা অন্য পুরুষ কিরূপে স্পর্শ করিবে? অন্য পুরুষ এখন এই পাণি স্পর্শ করিলে আমার পাতিব্রত্য বিনষ্ট হইবে।

এইরূপে রাজার সহিত দেবযানীর বহুক্ষণ তর্কবিতর্ক হইল, রাজা সম্মত হইলেন না—অবশেষে নিরুপায় হইয়া দেবযানী বলিলেন,—আমার কথায় প্রত্যয় না হয় "আসুন! আমার বাবার কাছে আসুন, দেখা যাক্ তিনি কি বলেন।" তাহার পর রাজা ও দেবযানী শুক্রাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন। গৃহে প্রবেশ করিতে না করিতেই দেবযানী আগে পড়িয়াই বলিলেন;—

রাজায়ং নাহুষস্তাত! দুর্গমে পাণিমগ্রহীৎ।
নমস্তে দেহি মামস্মৈ লোকে নান্যং পতিং বৃণে॥ ৩১॥
৩০ অধ্যায় মৎস্যপুরাণ।

বাবা! ইনি নহুষপুত্র রাজা যযাতি, ইনিই দুর্গম কূপ হইতে আমাকে হস্তধারণ পূর্ব্বক উদ্ধার করিয়াছিলেন,—আমি আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে ইহারই হস্তে অর্পণ করুন। পাছে শুক্রাচার্য্য অস্বীকার করেন, এইজন্য দেবযানী তাহার স্থিরনিশ্চয় পূর্ব্বেই পিতাকে শুনাইয়া বলিলেন,—"আমি ত্রিলোক মধ্যে অন্য পতি বরণ করিব না।

ভার্গব আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ অবগত হইলেন,—দুহিতার ঈদৃশ ব্যগ্রতাও তাহার মূলীভূত কারণ বৃহস্পতিপুত্রের অভিসম্পাত ও যযাতিরাজার ঋষিপুত্রতা স্মরণ করিয়া এই বিবাহকার্য্যে সম্মত হইলেন।

শুক্রাচার্য্যেরও সম্মতি দেখিয়া রাজা যযাতি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন,—

"অধর্ম্মো মাং স্পৃশেদেবং পাপমস্যাশ্চ ভার্গব।
বর্ণসঙ্করতো ব্রহ্মন্নিতি ত্বাং প্রবৃণোম্যহম্। ৩৩॥

(৩০ অঃ মৎস্যপুরাণ)

হে ভার্গব! এইরূপ অশাস্ত্রীয় প্রতিলোম বিবাহে আমার অধর্ম্ম হইবে, এবং ইহারও পাপ জন্মিবে। বর্ণসঙ্করের ভয়ই আমি অস্বীকৃত হইতেছি, এই নিমিত্তই আপনাকে সবিশেষ অনুনয় করিয়া বলিতেছি, এইরূপ আদেশ করিবেন না।

তখন শুক্রাচার্য্য রাজাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,—

অধর্ম্মাং ত্বাং বিমুঞ্চামি বরং বরয় চেপ্সিতং।
অস্মিন্ বিবাহে ত্বং শ্লাঘ্যো রহঃ পাপং নুদামি তে॥ ৩৪॥

অধর্ম্ম হইতে তোমাকে মুক্ত করিব, তুমি ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর, এই বিবাহে তুমি প্রশংসাভাজন হইবে, আমি গোপনে তোমার পাপ নাশ করিব।

এই শ্লোকের "এই বিবাহে তুমি প্রশংসাভাজন হইবে" এই কথা হইতেই লোকনিন্দার ভয়টা অনুমান করা যায়, এবং গোপনে তোমার পাপের শাস্তি করিব, এই কথা হইতেই কচশাপে দেবযানী ক্ষত্রিয়রমণী হইলেও তাঁহার পাণিপীড়ক ক্ষত্রিয়ের যে পাপ জন্মিবে এই কথাটায় স্পষ্টরূপেই প্রতীতি হইতেছে।

এই শ্লোকটী মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে—

অধর্ম্মাৎ ত্বাং বিমুঞ্চামি বৃণু ত্বং বরমীপ্সিতম্।
অস্মিন্ বিবাহে মা গ্লাসী রহঃ পাপং নুদামি তে॥ ৩৩॥

(আদিপর্ব্ব ৮১ অধ্যায়)

অধর্ম্ম হইতে তোমাকে মুক্ত করিব, তুমি ইচ্ছানুসারে বর প্রার্থনা কর। এই অশাস্ত্রীয় বিবাহ করিতেছ বলিয়া তুমি বিষণ্ণ হইও না, আমি তোমার পাপ নাশ করিব।

ফলকথা, কচের শাপে যযাতি রাজার দেবযানীবিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্যমধ্যে পরিগণিত হইলেও, সমাজনিন্দা ও বর্ণসঙ্করজনিত পাপও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। এই জন্যই মহাতপস্বী শুক্রাচার্য্য নিজ তপোবলে তাহার পাপ দমন করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, এই বিবাহে যে অধর্ম্ম ও লোকনিন্দা হইবে, তাহা শুক্রাচার্য্য স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি নিজতপোবলে তাহার প্রতিকার করিবেন সে স্বতন্ত্র কথা, যোগীদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন পূর্ব্ব সমাজে জাতিভেদের শিথিলতা না থাকিলে দেবযানী ও শুক্রাচার্য্যের হঠাৎ এইরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয় কেন ঘটিল, যযাতির সহিত দেবযানীর বিবাহ সংঘটিত হইবার জন্য ইহাদের এত যত্ন কেন হইল? ইহার উত্তর নিতান্ত দুর্ব্বোধ নহে।

দেবযানী জানিয়াছিলেন কচের অলঙ্ঘ্য শাপপ্রভাবে কোনও ব্রাহ্মণকুমার তাঁহার পতি হইবেন না, তাঁহাকে ক্ষত্রিয়েরই গৃহিণী হইতে হইবে। তাহার পর বিধাতার অখণ্ডনীয় নিয়োগে চন্দ্রবংশধুরন্ধর অধীতবেদবেদান্ত ঋষিপুত্র মহারাজাধিরাজ যযাতি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্পর্শ

করিয়াছেন, ইহাতেই তিনি বুঝিয়াছিলেন—বিধাতা তাহার ভাগ্যে এইরূপ যোগ্য বরই কল্পনা করিয়াছেন।

দেবযানী ব্রাহ্মণনন্দিনী হইয়া অতি প্রগল্ভার ন্যায় এতবড় একটী রাজার সঙ্গে তর্কবিতর্ক করিলেন, তাহা আবার নিজের বিবাহ লইয়া, এ কথাটা অবশ্য সামাজিক হিসাবে অন্যায়ই বটে, তবে উপায় কি ? একেত কচশাপে স্বকীয় ব্রাহ্মণত্ব তিরোহিত হইয়াছে, তিনি তখন একপ্রকার ক্ষত্রিয়াই হইয়া গিয়াছেন। ক্ষত্রিয়ের কন্যা মধ্যে এইরূপ প্রগল্ভভাব কখন কখন দৃষ্টিগোচর হয়। তাহার পর রাজা যযাতি পাণিস্পর্শ করিয়াছেন, তাঁহাকে পতি না করিতে পারিলে সতীত্ব নষ্ট হয়। আর সেই পথে মহান্ অন্তরায় দণ্ডায়মান, দীন ব্রাহ্মণকন্যা, আর রাজা ক্ষত্রিয়, সুতরাং কার্য্যের অনুরোধে এই সকল যুক্তিতর্ক দেখাইতেই হইয়াছে। ভারতে ক্ষত্রিয় কন্যাগণ মধ্যে এই ভাব আরও দেখা গিয়াছে, অতএব দেবযানীর ইহা স্বভাববিরুদ্ধ নহে। সূক্ষ্ম বিচারে দেখিতে পাই এস্থলে যখন ক্ষত্রিয়াই ক্ষত্রিয়ের বা ঋষিকন্যা ঋষিপুত্রের গৃহিণী হইয়াছেন, তখন দেবযানী যযাতি রাজার ঘরে গিয়া দিল্লীর মোগল সম্রাটদের রাজপুত বেগমের ন্যায় স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণপাচক রাখিয়া আহার করিবেন কেন ?

আর এই বিবাহে শুক্রাচার্য্যের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। ভার্গব জানিতেন কচের শাপে দুহিতার ব্রাহ্মণভাব তিরোহিত হইয়াছে, দেবযানী আর ব্রাহ্মণভোগ্যা নহেন, এই নিমিত্তই বিধিকল্পিত সৎপাত্রে কন্যাসম্প্রদানে অস্বীকৃত হইলেন না, বরং তাহাই সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন।

বিশেষতঃ আর কেহ অবগত থাকুক আর নাই থাকুক, শুক্রাচার্য্য জানিতেন—দেবযানী তাঁহার অসবর্ণ ক্ষেত্রসম্ভবা, সুতরাং এই বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইতেছে না। কেননা পুরাণাদিতে প্রকাশ প্রিয়ব্রত রাজার পুত্র বীতিহোত্র, উর্জ্জস্বতী নাম্নী কন্যা শুক্রাচার্য্যের করে সমর্পণ করেন, সেই কন্যার গর্ভেই দেবযানীর জন্ম।

> বীতিহোত্রো বভুবাসৌ রাজা জনকসম্মতঃ।
> কন্যামূর্জ্জস্বতী নাম্নীং দদাবুশনসে বিভুঃ।
> আসীত্তস্যাং দেবযানী কন্যা কাব্যস্য সম্মতা।

দেবী ভাগবত, অষ্টম স্কন্দ ৪র্থ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া পত্নীগর্ভজাতা কন্যা ক্ষত্রিয়ের গৃহিণী হইলে ইহা প্রতিলোম বিবাহ হয় না এবং সেই বিবাহে উৎপন্ন সন্ততিও পতিত হইবে না। সুতরাং যদুবংশ প্রভৃতির পাতিত্যের সম্ভাবনা নাই।

রাজা যযাতি শুক্রাচার্য্যের অসবর্ণবিবাহ বা কচের শাপরহস্য অবগত ছিলেন না, তাহাতেই এই প্রকার ন্যায্য ও ধর্ম্মানুমোদিত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। রাজা দেখিলেন—দৈবাধীন দেবযানীর পাণিস্পর্শ করিয়াছেন, আর এই নিমিত্তই দেবযানী তাঁহাকে গ্রহণ করিতে কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছেন।

দেবযানীর কথায় রাজার বিশ্বাস হইল না, শুক্রের কাছেও গেলেন, শুক্রাচার্য্যও অনুরোধ-করিলেন, তথাপি এই ধর্ম্মহানিকর কার্য্য করিতে যযাতির হৃদয় অগ্রসর হইল না। শুক্রাচার্য্য পরম তপস্বী লোকাতীত সামর্থ্যশালী, তাঁহার আদেশ উল্লঙ্ঘন করাও যযাতির কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ তিনি যখন অঙ্গীকার করিতেছেন "আমি তোমার পাপের প্রতীকার করিব, সমাজেও তোমার নিন্দা হইবে না বরং প্রশংসাই হইবে, তুমি নিঃসন্দেহে ইহাকে বিবাহ কর" তখন অগত্যা স্বীকার না করিয়া রাজার গত্যন্তর কি? "জ্ঞানে তপসো বীর্য্যং," তপস্যার প্রভাব সকলেরই জানা, এ অবস্থায় ভয়েই যযাতিকে দেবযানীকে বিবাহ স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তথাপি ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের বিবাহের ফলও কিছু ফলিয়া ছিল।

অতএব দেবযানী বিবাহবৃত্তান্তের আলোচনায় প্রাচীন হিন্দুসমাজে জাতিভেদের দৃঢ়তাই কি প্রমাণিত হয় নাই?

শিথিলতা থাকিলে সমাজে অপ্রতিম ক্ষমতাশালী ঋষিসপিণ্ড যযাতি রাজাকে এইরূপ অলোকসামান্য রূপবতী কন্যার পাণিগ্রহণে অনিচ্ছা বা ইতস্ততঃ করিতে হইত না।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

পুরোহিতের কর্ত্তব্যপরায়ণতা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সিংহপুরের ক্ষুদ্র জমিদারের নাম নীরদকান্ত রায়। ঢাল, সড়কীওয়ালা, পাঁচটা দ্বারবানও নাই, লাখ দু'লাখ টাকার আয়ও নাই। সামান্য পাড়াগেঁয়ে পাচ ছ'হাজারে জমিদার। পাঁচটা বাধ্য প্রজা আছে, দুটো চারটে খোসামুদে আছে। জমিদারের লক্ষণ আর কিছু নাই। তবে, অভিমান, হঠকারিতা, ক্ষণে রোষ ক্ষণে তোষ প্রভৃতি অপূর্ণ শিক্ষিত জমিদারোচিত গুণগুলির কোনটার ছাড় পড়ে নাই।

এ হেন নীরদকান্ত বৈঠকখানায় বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন, আর বহিঃপ্রকৃতির দিকে বেশ উৎফুল্লভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছেন। তখন আকাশে বর্ষণোন্মুখ মেঘগুলোকে শীতলপবন বলপূর্ব্বক ঠেলিয়া ঠেলিয়া আকাশের একটা কোণে জমা করিতেছিল। তামাকু সেবন বেশ আরামদায়ক হইতেছে বলিয়াই বোধ করি এত আনন্দ। পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে অন্যান্য অনেক লোক বসিয়া গল্প করিতেছে, তামাকুর গন্ধে তাদের প্রাণে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জাগিতেছিল।

রামলাল চক্রবর্ত্তী নামক একজন প্রৌঢ় নীরদকান্তের সম্মুখে বসিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর কেউ কি তাঁর সাম্‌নে বসিতে পারে? কারণ রামবাবু ধনশালী, নীরদের পৃষ্ঠপোষক, আর সহরে ব্যবসা চালাইয়া রামলাল অনেক অর্থের অধিকারী হইয়াছেন। উভয়ে বেশ বন্ধুত্ব আছে, তাই রামলাল নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য এখানে আজ আসিয়াছেন, তিনি বলিলেন,—দাদা, এবার মনে ক'রছি—দুর্গাপূজাটা ক'রলে হয়না? কিন্তু বরাবরই তুমি বল পূজা ক'রব এ পর্য্যন্ত ত' আরম্ভ ক'রলে না! তুমি আরম্ভ না ক'রলে আমার পূজা ক'রতেও ইচ্ছা হয় না। কেননা তোমার জন্যই আমার যা' কিছু।

নীরদ বলিলেন—তা'তে কি ভাই আমি এবার না পারি, নাই পারলাম, আসছে বছর থেকে দু'ভায়ে না হয় লাগান যাবে। এবার তোমার যখন সাধু ইচ্ছা হ'য়েছে, তখন বিলম্বে দরকার কি? কি বলে ঐ যে—"শুভস্য শীঘ্রম্"।

রামলাল—আমারও এবার পূজা ক'র্ত্তে গেলে কিন্তু অনেক বেগ পেতে হবে। জায়গা কম, বাড়ীঘর ছোট।

নীরদ—জায়গার ভাবনা কি? তোমার বাড়ীর লাগা আমার দু'টা জমি আছে। একটা বাগান, একটা প'ড়ো জমি, দরকার মত যে টা হয় নিতে পার, তোমাকে আমার অদেয় কি আছে?

অন্যান্য যাঁহারা উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল, তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল—আজ্ঞে, আপনার অদেয় রামবাবু কে? বলে হরি কভু হর থেকে ভিন্ন হ'তে পারে কিন্তু রাম-নীরদ একেবারে তেল-সর্ষে। সর্ষেরথেকে যাঁহাতক তেল বারকরবার চেষ্টা ক'রেছ—আর সর্ষে, সর্ষে থাকবে না—একেবারে গোরুর খাদ্য খোল।

এই কথা বলিয়া হরিদাস আরও দু'একজনের দিকে চাহিয়া বলিল—কি বল হে?

তাহারা তৎক্ষণাৎ বলিল—তা ত' ঠিক, হাঁ—সদ্ভাবের চূড়ান্ত, আত্মীয়তার দৃষ্টান্ত, বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠা।

রামলাল বলিলেন—দাদা—যদি এবার পূজা করি, তা' হ'লে হরিদাসকে দিয়ে তোমায় ব'লে পাঠাব, না হয় নিজেই আসব। তবে পুরোহিত কাকে করি?

নীরদ বলিলেন—কেন? এবার যখন আমার পূজা নাই, তখন আমার পুরোহিত বিশ্বম্ভর ঠাকুরকে ব্রতী করাওগে। লোক ভাল—তাঁর অনেক গুণ আছে।

হরিদাস তাড়াতাড়ি বলিল—বিশ্বম্ভর। অমনটী দেখা যায় না। আমি অনেক পুরোহিত দেখেছি, অমনটী পাই নাই। আহা! যেন গড়া ঠাকুরটী। তারপর রামলাল চক্রবর্ত্তী মেঘের অবস্থা দেখিয়া নীরদের নিকট হইতে সত্বর বিদায় লইল॥

রামলাল চলিয়া গেলে—হরিদাস বলিল—বাবু ভাবটা বুঝ্‌লেন? রামবাবু যতটা বিনয় দেখালেন; ততটা বিশ্বাস করা যায় না। ভিতর থেকে যেন একটা দম্ভের ঝাঁজ বেরুতে লাগ্‌ল, পূজার কথাটা আপনাকে শুনিয়ে দিয়ে গেল—ভাবটা এই আর কি।

হরিদাস, রামলাল ও নীরদবাবুর মধ্যে বিবাদ বাঁধাইবার অনেক সুযোগ খুঁজিয়াছে। কিন্তু, এপর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হয় নাই। বিবাদের ফল হরিদাসের অর্থলাভ। নীরদের যাবতীয় খরচপত্র রামলাল মাসে একদিন করিয়া দেখিয়া দেয়। তাহার বুদ্ধিদীপ্ত বড় বড় চোখ দুটার কাছে কাহারও একপয়সা চুরি কর্‌বার ক্ষমতা নাই, তাই তাহাকে সরাইতে পারিলে, হরিদাস প্রমুখ খোসামুদে ও কর্ম্মচারিগণের উদ্দেশ্য ফলবান্ হইবে।

আরও দু'একজন বলিল—হাঁ ভাবটা সেই রকম আসে বটে। কথাটা যেন ভাল ঠেক্‌লোনা। একটা অভিসন্ধি আছে ব'লে মনে হ'ল। হরিদাস তখন দৃঢ় স্বরে বলিল—যখন সন্দেহ হ'য়েছে তখন হরিদাস শর্ম্মা এর একটা হেস্তনেস্ত কর্‌বেই। বিনয় কি দম্ভ, দাদার কাছে হুকুম চাওয়া কি দাদার উপর টেক্কা দেওয়া দেখা যাবে। ওর পেটের কথা বের ক'রবই। বাবু, মনে কিছু কর্‌বেন না। লোকটাকে বুঝা যা'ক্ না কেন?

ইহার কথা শেষ হইতে না হইতে—একভীষণ বজ্রধ্বনি হইল। যেন মেঘ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলেই এই ভয়ঙ্কর শব্দে চমকিত হইল। অচিরেই বৃষ্টি নামিল ও পূর্ব্বপ্রসঙ্গ একবারে সেদিনকার মত চাপা পড়িয়া গেল।

নীরদের আদেশে অবিলম্বে সঙ্গীত আরম্ভ হইল। প্রত্যহই নীরদের বৈঠকখানায় সঙ্গীত চর্চ্চা হয়। আজ মেঘের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের অল্পপূর্ব্বেই সঙ্গীত আরম্ভ হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নীরদকান্ত, একদিন মধ্যাহ্নে বৈঠকখানায় বসিয় তামাক টানিতে টানিতে ডাকিলেন— "হরিদাস"?

হরিদাস নীরদবাবুর কে? হরিদাস নীরদের সর্ব্বস্ব।

হরিদাস—সভাপণ্ডিত, ভৃত্য, শুভাকাঙ্ক্ষী পরমাত্মীয়, বিদূষক আর সকল কর্ম্মে সুদক্ষ (বিশেষ কলহ বাঁধাইতে)। এককথায় বলিতে গেলে—মোসাহেব।

সেই এক আহ্বানে হরিদাস শশব্যস্তে নীরদকান্তের সম্মুখে আসিয়া অতি মোলায়েম সুরে বলিল—"আপনি কি আমায় ডেকেছেন"? "হাঁ, একটা কথা আছে।"

হরিদাস একটু গম্ভীর চালে পার্শ্বে উপবেশন করিল।

নীরদ বলিল—আচ্ছা হরিদাস, রামলাল চক্রবর্ত্তীকে আজ সকালে যে জুতা মারিলাম, সে কি সত্যই তোকে ও কথাগুলা বলেছে।

হরিদাস ভ্রূযুগল ললাটে উন্নীত করিয়া পরম উৎসাহের সহিত বলিল আজ্ঞে হাঁ, তবু আপনাকে আমি সব কথা বলিনি। একটু আধটু সাম্‌লে সুম্‌লে বলেছি। শুন্‌বেন আরও কি কি ব'লেছিল?

এই বলিয়া হরিদাস সকাল হইতে মস্তিষ্কের সদ্ব্যবহার করিয়া যেটুকু রঞ্জিত করিতে

পারিয়াছিল তাহা বেশ গুছাইয়া বলিল। নীরদবাবু আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন- বটে? ওর বড় স্পর্দ্ধা হ'য়েছে না?

আজ্ঞে স্পর্দ্ধা ব'লে স্পর্দ্ধা। আপনাকে এঁ্যা—এঁ্যা—এইরকমটা কল্লে?

"বড় বাড় বাড়িয়েছে?

"অতিরিক্ত"।

"হরিদাস কি উপায় করি বল দেখি?

হরিদাস মজা পাইয়া বলিল দেখুন আমার এইটুকু বোধ হয় যে আপনার পুরোহিত বামুনটাকে ওর হাতছাড়া করা।

তার আর কঠিনটা কি?

হ্যাঁ আপনার কাছে তার আবার কঠিন কি? আপনিও বলুন না যে এবার আমিও পূজা ক'র্ব্বো। আপনার বাঁধা পুরোহিত। সেই শ্রাদ্ধ-শান্তি থেকে আর ষষ্ঠী মনসা পূজা পর্য্যন্ত সব ত' সেই বারমাস করে। তার উপর আপনার জমিদারীতে বাস। আপনার পূজা শুনলে আপনার বাটীতে আসবেই। তাহলেই ও বেটা জব্দ হ'বে। তারপর সহজে না হয় এই এর মাত্রাটা (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগদ্বারা তর্জ্জনীর অগ্রভাগ বার বার আঘাত করিয়া) কিছু বাড়াইয়া দিলেই একেবারে ঢ'লে প'ড়বে।

নীরদ বলিলেন—বা! বা! হরিদাস বেশ কথা ব'লেছ। ঐ ওর ওষুধ। আমার না হয় কিছু খরচ হ'বে। হোক্ না? আজই বিকালে বিশ্বম্ভর (পুরোহিত) ভট্টাচার্য্যের বাটী যাব। রামলালের দম্ভ ঘুচাব। রামু, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি?

সেই দিনই নীরদবাবু ঘোড়ার গাড়ী করিয়া এক মেটে বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া নামিলেন। সেই মেটে বাটীই বিশ্বম্ভর পুরোহিতের। গাড়ী হইতেই নামিয়া তিনি ডাকিলেন "সুবোধ সুবোধ?" সুবোধ পুরোহিতের একমাত্র সন্তান। সুবোধ বাহিরে আসিয়া বলিল—আসুন, বাবা ভিতরে আছেন, ডাকিয়া আনিতেছি।

এই বলিয়া মেটে দাবার উপর দুইখানি মৃগচর্ম্মের আসন পাতিয়া দিল। একখানিতে তাহাকে বসাইয়া পিতাকে ডাকিতে ভিতরে গেল। পুরোহিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্য আসিয়া বলিলেন—কি নীরদ বাবু, হঠাৎ এই দরিদ্রপল্লীতে যে আসিলেন। আর কোথায় কাজ ছিল বুঝি? জমিদারীর কাজ বড় ঝঞ্চাটের।

নীরদ বলিলেন—না, আমি আপনার নিকটেই এসেছি। আমি এবার আমার বাটীতে পূজা ক'র্ব্বো মনে ক'রেছি। সব আয়োজন করিবার বন্দোবস্ত ক'রেছি। শুধু আপনার অনুমতি পাইলেই হয়। আপনি পূজা ক'র্ব্বেন, আর আপনার সুবোধ তন্ত্রধারক হ'বেন। এই খোরাকীর জন্য দশটী টাকা লউন।" এই বলিয়া পকেট হইতে টাকা বাহির করিতে পকেটে হাত দিলেন।

বিশ্বম্ভর বলিলেন—টাকা রাখুন, টাকা রাখুন। কাল আপনাদের রামলাল চক্রবর্ত্তী

এমন সময়ে আসিয়া আমাকে তাঁর বাড়ীর পূজায় ব্রতী করিয়া গিয়াছেন। আপনার কোন সংবাদ পূর্ব্বে ত' পাই নাই কাজেই আমিও সেখানে স্বীকার ক'রেছি।

নীরদ। সেই বেল্লিক, পাজি বদমায়েসের বাড়ীতে আপনি কার্য্য করিবেন? বেটা আগে কেমন গরীব ছিল জানেন ত'? এখন হঠাৎ আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হ'য়েছে তাই অত দম্ভ। কলিকাতায় ব্যবসা ক'রে বড়মানুষ হ'য়েছে, একথাও লোকে বলে। ছিঃ ছিঃ—বেটা চুরি জুচ্চুরি, বাটপাড়ি ডাকাতি করে টাকা লুটে এনেছে। তার অবার পূজা, না মুণ্ডুপাত? টাকা নেন, টাকা নেন।

বিশ্বম্ভর। আমি বড়ই বিস্মিত হ'লাম। আপনার সহিত তাহার বড় হৃদ্যতা ছিল দেখেছি। হঠাৎ এরূপভাব দেখিয়া অবাক্ হইলাম। কারণ কি শুনিতে পাই না?

নীরদ। এর আর শুনাশুনি কি আছে? যা'হয় তাই হয়েছে। আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ব্যবসা ক'ল্লে। দু'একপয়সা আন্‌তে শিখ্‌লে, এখন আমাকে অপমান না ক'রে জল খায় না। কৃতঘ্ন! পাজি! গাধা আস্ত গাধা!

বিশ্বম্ভর। ম'শায়, কিছুই বুঝিলাম না!

নীরদ। তার কথাগুলা ব'লতে আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্ব'লে উঠ্‌ছে। সে আর কি ব'লব। তার কথা কইতে ঘৃণা বোধ হয়।

বিশ্বম্ভর। তবে আর আপনাকে কষ্ট দিব না।

নীরদ। না, না, আমি ব'লছি। বেটার আক্কেলের কথা ব'লতে হবে কি?

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বাগানে ব'সে আছি। হরিদাস এসে বল্লে—কর্ত্তা ম'শায় এবার রাম-চক্রবর্ত্তী দুর্গাপূজা ক'রবে ঠিক্ হ'য়ে গেল। আমি বল্লাম—বেশ ত'রে। তোরই মজা, খুব খাবি।

হরিদাস ব'ললে—আজ্ঞে খাওয়া বার ক'রে দিয়েছে। রামলাল ব'লেছে—'হরিদাস, আজ তোমাদের কর্ত্তাম'হাশয়দের ষষ্ঠী মনসা পূজা করা পুরুতকে এবার আমাদের বাড়ীতে দুর্গোচ্ছব করবার ঠিক্‌ঠাক্ ক'রে এলাম।

বিশ্বম্ভর। হ্যাঁ, রামবাবু আমার বাড়ী কাল এসেছিলেন।

নীরদ। তারপর আপনার গুণগান ক'ল্লে। কেমন জানেন? সে হরিদাসকে ব'ল্লে—হরিদাস, বিশ্বম্ভর ভট্‌চাজ্ লোক মন্দ নয়। তবে একটু লোভী ব'লে বোধ হ'ল, কেননা দক্ষিণের কথা কিছুই ঠিক্ ক'রে ব'ল্লে না।

বিশ্বম্ভর। হাঁ আমি দক্ষিণার সম্বন্ধে আবার বল্‌ব কি? তার ইচ্ছা ও শক্তি অনুসারে দিবে।

নীরদ। তাইতে সে ঠিক্ করেছে যে, আপনি তার কাছে একটা দাঁও মারবার আশায় আছেন। তারপর অনেক কথার পর সে হরিদাসকে ব'ল্লে—যে দেখ হরিদাস, আমার এই আনন্দ যে, আমি তোদের কর্ত্তাম'শায়দের ষষ্ঠীমনসাপূজাকরা পুরুত দিয়ে দুর্গোচ্ছবটা করাচ্ছে

পার্‌লাম। আর মনে করেছি নীরদবাবুর কাছে কাল গিয়ে তাঁর কল্‌মি বাগান"টা কিনে নেব। তার গাছপালা কেটে লোকজন খাওয়াইবার জয়গা সেখানে কর্ব্বো।

হরিদাস। পাশের প'ড়ো জমিটাতে ত লোক খাওয়াতে পারেন। ঐ ভাল ভাল আমগাছগুলা কেটে জায়গা করার চেয়ে সেটা সুবিধা নয়? তার উত্তরে পাজিটা ব'ল্লে কি—যে—পড়ো জমিটা দালানের পাশে পড়ে আর বাগান টা সুমুখে। ঐ টাই সকলের চেয়ে ভাল। (নীরদ এবার খুব উত্তেজিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলিল)—আর শেষে কি বলিল, শুনবেন বল্লে যে, আম বাগান থেকে তোদের বাবুর বাড়ীটা ঠিক্ সামনে আছে। তোদের বাবুর বাড়ীর লোকরা আমার পূজার ঘটাটা দেখ্‌বে না? তাদের বুক্‌টা এবার ফাট্‌বে না?

শুনলেন? আর যে সব গালাগালি দিয়েছে, সে সব বল্‌তে পার্‌ব না।

বিশ্বম্ভর। আপনি কি কর্‌বেন, মনে করেছেন?

নীরদ। কি? কি করব? আজ সকাল বেলা পাজি বেটা এসে বল্লে—নীরদ দাদা তোমার 'কল্‌মী বাগান'টা দিবে? আমার লোকজন খাওয়ান'র অসুবিধা হয়। পাশের পড়ো জমিতে রান্নার স্থান ক'রেছি, আর ঐটা পেলে খাওয়ান দাওয়ানর সুবিধা হয়। হরিদাসের কথা শুনে অবধি আমি সমস্ত রাত্রি ঘুমুতে পারি নাই—ওর কথাগুলা শুনে গা আরও জ্বলে উঠ্‌ল। পায়ের জুতা খুলে, "তবে রে পাজি। আমাদের বুক ফাটাবি? আগে তোর মুখ ফোটাই" বলে জুতা মারিলাম। তখন সে বেটা বল্লে দেখ নীরদ দাদা, তুমি আমাকে শুধু শুধু জুতা মার্‌লে? এর প্রতিফল তোমায় দিবই। অনেক উপকার করেছ, তাই এখন কিছু কর্‌লাম না। বলেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

হরিদাসের সঙ্গে পরামর্শ করে আমিও পূজার ব্যবস্থা করে, আপনার নিকট এসেছি। আপনাকে যদি পাই ও বেটা অনেকটা জব্দ হবে। ওর ক্ষমতাটা কত একবার দেখি!

বিশ্বম্ভর—তাই ত' আপনাদের বিবাদে বড়ই দুঃখিত হ'লাম। তুচ্ছ বিষয় লইয়া বিবাদ। এই জন্যই ত অধিক অর্থ চাই না। অর্থের বড় উষ্ণতা।

আমার ত ম'শায় ওদের ওখান হ'তে ছাড়্‌বার উপায় নাই। আমি যে কথা দিয়াছি।

নীরদ—আচ্ছা বলুন ত' সে দেবে কত?

বিশ্বম্ভর সেই জানে সে কত দিবে। পূজা ত দরদস্তর করিবার জিনিস নয়।

নীরদ—দেখুন, যতই দিক, পঞ্চাশের বেশী ত দিবেই না, বরং কম। আমি আপনাকে একশত দিব।

বিশ্বম্ভর। অর্থলোভ দেখাবেন না। আপনি ধার্ম্মিক, কথার পরিবর্ত্তন করতে বলেন?

নীরদ। বলেন কি? সে আপনার নিন্দা কর্‌লে। আমার অপমান ক'রলে, আর তার বাড়ী আপনি যাবেন?

বিশ্বম্ভর। আমার নিন্দা করলে ত ক্ষতি নাই, আপনার জন্য না যাওয়া উচিত বটে,

কিন্তু কথা দিয়া ফেলেছি, কি করি বলুন। আগামী বৎসর হ'তে আপনাকে জিজ্ঞাসা না করে কোথায়ও কথা দিব না।

নীরদ। দেখুন, আপনি এটা ভাল ক'র্‌ছেন না। আমি আপনার যজমান এবং জমিদার, আবার আপনার বাটীতে এসেছি একথা রেমো জেনেছে, তার উপর অর্থ যথেষ্ট দিব। আমাকে প্রত্যাখ্যান কর্‌বেন না। ভাল হ'বে না

বিশ্বম্ভর। নীরদবাবু, আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন? লোভ দেখাচ্ছেন। বিশ্বম্ভরশর্ম্মা তা'তে টলে না। কাহারও ভয়ে বা লোভের বশে কথার পরিবর্ত্তন করে না। এটা ঠিক্ জান্‌বেন।

নীরদ। আপনিও এটা ঠিক্ জানবেন—যার জমির উপর বাস, তাকে এতটা রূঢ় কথা ব'লে আপনি নিষ্কৃতি পাবেন না এখনও বিবেচনা করুন;—দুই দিন সময় দিলাম।

বিশ্বম্ভর বলিলেন—আজও যে কথা—দু'দিনপরেও হয় ত সেই কথাই থাক্‌বে। সুতরাং সময় দেওয়া বৃথা।

নীরদ ক্রোধভরে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণ ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া পুত্রকে নিকটে ডাকিলেন এবং বলিলেন—বাবা, একটা বিপদ্ হ'তে পারে। এক দিকে জমিদারের রাগ—আর একদিকে নিজের কর্ত্তব্য। এ অবস্থায় আমার কর্ত্তব্যই বড় ব'লে মনে ক'রেছি। বিপদ্ হয় হউক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হরিদাসের স্ত্রী নীরদকান্তের বাটীতে থাকিত এবং নীরদকান্তের পুত্রকে সেই পালন করিত। নীরদকান্তের পুত্রের বয়স মাত্র ১ বৎসর। হরিদাসের পুত্র ছিল না। নীরদের স্ত্রী নিজের কতকগুলি কন্যা লইয়া বিব্রত; পাছে একমাত্র সন্তানের ক্লেশ হয়, তাই হরিদাসের স্ত্রীরকাছে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

হরিদাস যেমন নীরদবাবুর বহিশ্চারী সর্ব্বস্ব, তেমন হরিদাসের স্ত্রী যোগমায়াও অন্তঃপুর-চারিণী কর্ত্রী। হরিদাস—তোষামুদে, অকর্ম্মণ্য, অনিষ্টকারী জীব। যোগমায়া—বিবেকবুদ্ধি-সম্পন্না, কর্ম্মিষ্ঠা, হিতকারিণী রমণী।

হরিদাস—যার খায়, তার সর্ব্বনাশে সচেষ্ট। যোগমায়া—যার খায়, যার খায় না, সকলেরই হিতসাধনে যত্নশীলা, অনিষ্টবুদ্ধি তাহার নাই। হরিদাস তাহার 'মনোবৃত্ত্যনুসারিণী' ভার্য্যা পাইয়াছিল কিনা জানিনা, তবে সাধারণতঃ মানবমাত্রে যেমন মনোরমা পত্নীর প্রার্থনা করে, হরিদাসের স্ত্রী তেমনই গুণবতী ছিল।

নীরদবাবুর সংসারে প্রায় ৫।৬ বৎসর হরিদাস সপরিবারে বাস করিতেছে। হরিদাসের ত্রুটি হরিদাসের দোষ—তাহার স্ত্রী যোগমায়ার গুণাধিক্যে প্রায়ই ঢাকিয়া যাইত। নীরদবাবু ও তাঁহার পত্নী হরিদাস অপেক্ষা যোগমায়াকে অধিকতর স্নেহ করিতেন। নিজের পুত্রকে

যোগমায়ার হস্তে অর্পণ করিয়াও তাঁহাদের কোন শঙ্কা ছিল না। সংসারের যাবতীয় পরিশ্রম তাহার উপর দিয়া যাইত সেও তাহা অক্লান্তভাবে সহিয়া লইত; কোনপ্রকার দ্বিধা নাই, দ্বিরুক্তি নাই।

হরিদাস স্ত্রীকে অনেক বুঝাইয়াছিল—সে পরের সংসারে এত করিবার প্রয়োজন কি? নীরদ-বাবুর স্ত্রীর মত তুমিও অসুখের ছলক'রে কাজথেকে ছাড়ান পেতে পার না? সত্যি, তোমার শরীর রোগা হ'য়ে যাচ্ছে। তার উপর পরের একটী একবছরের কচি ছেলে, নিজের রোগা শরীর, তার উপর এই খাটুনি, আর ক'দিন বাঁচবে?

যোগমায়া উত্তরে বলিত—আপনি অমন কথা ব'লবেন না। যাঁরা আমাদের সন্তানের মত পালন ক'রছেন, তাদের সঙ্গে বঞ্চনা ক'রতে কি পারা যায়? আমার যতক্ষণ সামর্থ্য আছে, ততক্ষণ ফাঁকীদিবার বুদ্ধি যেন ভগবান্ না দেন। আপনিও সেই আশীর্ব্বাদ করুন।

হরিদাস নিজের স্ত্রীকে অতিশয় নির্ব্বোধ বলিয়া জানিত। কারণ, সরলতা ও প্রবঞ্চনা বুদ্ধি-হীনতা সূক্ষ্মবুদ্ধিকে আশ্রয় করে না। 'মোটাবুদে'রা সরল হয়। ইহাই তাহার ধারণা। যোগমায়াকে বলিল তুমি ভাবছ—বাবুর দয়ায় আহার জুটছে তা নয়, সে শুধু আমার বুদ্ধিরবলে ও কৌশলে। তাইবলি, বাবুদের অত্তকাজ করার চেয়ে, আমার কথাগুলা মেনে চ'ল্লে অনেক কর্ত্তব্য বেশী করা হয়।

যোগমায়া উত্তর করিতে পারিত না, নিঃস্তব্ধ হইয়া থাকিত, বেশী বাড়াবাড়ি দেখিলে পায়ে ধরিয়া কাজ করিবার অনুমতি লইত। হরিদাস আর কিছু বলিতে পারিত না।

রামচক্রবর্ত্তী ও নীরদের বিবাদ বাঁধা অবধি হরিদাস বড় প্রফুল্ল, এই সুযোগে উভয়ের নিকট হইতেই অর্থপ্রাপ্তির আশা তাহার হৃদয়ে অহরহঃ জাগিতেছিল।

একদা নিশীথকাল, হরিদাসের তথাপি নিদ্রা নাই, মনের আনন্দ ও কল্পনা চাপিতে পারিতেছে না। আর একজনকে নিজের বুদ্ধির কেরামতী না শুনাইতে পারিলে প্রাণ কিছুতেই ঠাণ্ডা হয় না।

স্ত্রী যোগমায়া, নীরদের সংসারের সব কাজ শেষ করিয়া যেমন ঘরে আসিল, অমনই হরিদাস বলিল—তোমার যে আর কাজ শেষ হয় না, দু'টা কথা কহিবারও সময় নাই। যে ব্যাপার আজকাল ক'রছি—সে আর তোমার মত নির্ব্বোধ স্ত্রীলোককে কি ব'ল্ব?

যোগমায়া বলিল—বলুন না, আমি কি এতই বোকা যে আপনার কথাও বুঝ্তে পার্ব না?

হরিদাসের নিজের কথা বলিতেই হইবে, চাপিবার শক্তি নাই, বোধ হয় পেট ফুলিতেছিল, স্ত্রী না আসিলে হয় ত শয্যা বা দেওয়ালকেই বলিত।

অধিক আর কিছু না বলিয়া একেবারে ধীরে ধীরে নীরদকান্ত ও রামচক্রবর্ত্তীর বিবাদ-বার্ত্তা বলিতে লাগিল। এই মনোবিচ্ছেদ যে তাহারই বুদ্ধির বলে, তাহারই বাক্পটুতায়—তাহারই কৌশলে ঘটিয়াছিল, তাহাও বেশ করিয়া বুঝাইল ও অনেকক্ষণ গর্ব্বস্ফীতনেত্রে অন্যমনস্ক

ভাবে চাহিয়া থাকিয়া যোগমায়ার নিকট হইতে প্রশংসা লাভের অপেক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু যোগমায়া নীরব। সে প্রাণে বেদনা অনুভব করিতেছিল। এই বিবাদের ফল বিলক্ষণ অর্থলাভ—এই কথাটা বুঝাইবার সময়ে বলিল—এখন উভয়ে এমন বিবাদ যে, পরস্পর কাটাকাটি ক'র্‌তে চায়। আমি কিন্তু দু'জনের কাছেই ব'লেছি যে, "আমার উপর ঐ ভারটা দিন, আমি অনায়াসে আপনার শত্রুকে বিনাশ ক'র্‌তে পারব। অনেক কৌশলে কর্‌তে হ'বে, ব্যয় কিছু বেশী আছে বটে, কিন্তু, তেমন আপনাদের কোন ক্লেশ পেতে হ'বে না"। এখন উভয়েই টাকা দিতে রাজি। আমার মতলব এই যে, একথা শুধু তোমায় বল্‌ছি—আমি মাত্র একটা টাকার বিষ কিনে নীরোদ ও রামলাল দু'বেটাকেই সাবাড় ক'র্‌ব এখানেই কত টাকা লাভ।

যোগমায়ার হৃদয়টা কাঁপিয়া উঠিল। বজ্রাহতের মত নিস্পন্দভাবে শয়ন করিয়া রহিল।

হরিদাস বলিল ঘুমালে না কি ?

যোগমায়া চম্‌কাইয়া উঠিয়া বলিল—'না'।

হরিদাস আবেগের সহিত বলিল—দেখ, তার পর মোটা লাভের কথা শুনঃ—

এ বাড়ীর কর্ত্তাকে মার্‌তে পার্‌লে আমিই একরকম কর্ত্তা বা অভিভাবক হ'ব, তুমি অন্তঃপুরের সর্ব্বেসর্ব্বা, উভয়েই দু'দিক্ থেকে লুটব। রামচক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে আমার খুব যাতায়াত আছে, সেখানেও তার মৃত্যুর পর আমি অন্ততঃ আটআনা রকমের কর্ত্তা হ'ব সেদিকেও যথেষ্ট লাভ। সেখানেও আমার আর এক বন্ধু আছে, তার নাম তারাদাস সে কিছু লইতে পারে। সেও আমার প্রবল সহায়। সব জায়গায় চারফেলেছি।

যোগমায়া বিভীষিকা দেখিতে লাগিল। নিদ্রা দূরে পলাইল। স্বামীর বুদ্ধি পরিবর্ত্তনের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিল। শেষে স্ত্রীলোকের একমাত্র বল ক্রন্দন তাহাই আরম্ভ করিল।

আর হরিদাস সুখময় কল্পনাপরীর রাজ্যে উঠিয়া গাঢ়নিদ্রাসুখ ভোগ করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মণ বিশ্বম্ভর বড় চিন্তাকুল, কেননা অনর্থক কলহ সৃষ্টি করিতে মন একেবারেই চাহিতেছে না। নীরদকান্তকে নিজের অবস্থা বুঝাইলেও তথাপি সে বুঝিল না, ইহাও আক্ষেপের বিষয়। অথচ অন্য উপায়ও নাই। আত্মমর্য্যাদারজন্য কর্ত্তব্যেরজন্য বিবাদ, এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ মনকে প্রবোধ দিতেছেন। অস্ফুটস্বরে তিনি বলিয়া ফেলিলেন—নিজের ধর্ম্মরক্ষার জন্য যদি বিশ্ববাসীর সহিত কলহ করিতে হয়, তাহাও করিব, কিসের চিন্তা—কিসের উদ্বেগ, এই বলিয়াই বাহিরের চতুষ্পাঠীতে আসিয়া বেশ স্ফূর্ত্তির সহিত ছাত্রগণকে পড়াইতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই দীনে বাগ্‌দী আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল—ঠাকুর, প্রাতঃপ্রেণাম।

ব্রাহ্মণ হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন দীন যে, এখন কোথা হোতে আস্‌ছিস ? আজ এখানে পেসাদ পেয়ে যাবি।

দীন বলিল—আজ্ঞে, আপনাদেরই খাচ্চি। আজ আম চক্রবর্ত্তীর ঘর গেছলাম। পূজোর উদ্যোগ দেখে আলাম। আর অমনি অমনি জমীদারবাবুদের হরিদাসবাবুর কাজটা সেরে আলাম।

ব্রাহ্মণ—কেমন উদ্যোগ দেখ্‌লি ?

দীন—আজ্ঞে, সকলি দেখ্‌লাম বটে, পূজোয় ঐ অত পাঁঠাখাসী লাগে ?

বিশ্বম্ভর—বলিস্ কিরে ? পূজোয় খাসী ?

দীন—আজ্ঞে তা কি মোরা ঝানব, আপনারা ভশ্চাজ্জি, আপনারা বিধানটিধান জানেন, সেকথা আপনারাই কইতে পারেন। তার ঐ অত বড়বাড়ীটা পাঁঠা খাসীর চ্যাঁ ভ্যাঁ শব্দোয় মেতে উঠেছে, আজ্ঞে ঠিক যেন হামিদ মোল্লার খোঁয়াড় হ'য়েছে।

বিশ্বম্ভর—বটে,—হরিদাসের কাছে কেন গিয়েছিলি ?

দীন—আজ্ঞে, এক টাকার বিষ আনবার জন্তে ক'য়েছিলেন, তাই দিতে গিছলাম।

বিশ্বম্ভর—সাপের বিষ ! সাপের বিষ !

দীন—আজ্ঞে, হাঁ। ফেরবার সময়ে একটা গোখ্‌রা সাপ ওপাড়া হ'তে ধ'রে আনলাম। এই বলিয়া তাহার কক্ষমধ্য হইতে একটা হাঁড়ী দেখাইল।

বিশ্বম্ভর বলিলেন—তুই পেসাদ পেয়ে যাস্। ওখানে ব'স্। ব্রাহ্মণের মনে হরিদাসের উপর একটা সন্দেহ-বীজ রোপিত হইল। বিষ কিনিবার প্রয়োজন বুঝিতে পারিলেন না। সকলের আহারাদি সমাপ্ত হইলে এবং দীন প্রসাদ পাইয়া পরিতুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলে বিশ্বম্ভর পুত্র ও ছাত্রগণকে বলিলেন—তাই ত আমি বড় বিপদে পড়লাম। যারা মা'য়ের পূজার নাম ক'রে উদর পরিতৃপ্তির চেষ্টা করে—যারা দম্ভের জন্য, জাঁকের জন্য পূজা করিতে চায়—যারা শাস্ত্রনিষিদ্ধ অমেধ্য বস্তু পূজার ছলে আনিয়া, সকলের মনে শাস্ত্রের উপর ধর্ম্মের উপর অশ্রদ্ধার বীজ রোপণ করে, তা'রা প্রকৃতপক্ষে শ্রদ্ধাহীন। তার বাড়ী পূজা করিলে পাপ হইবে, অধর্ম্ম হইবে। কি করি, কথা দিয়াছি, তার হ'য়ে আবার অপরের সঙ্গে বিবাদের সূত্রপাত ক'রেছি ! উপায় কি ? পাঁঠা বলি হবে ব'লে সঙ্গে সঙ্গে খাসী এল—এ কি ?

একটী অতিশয় দরিদ্র ছাত্র অবসর বুঝিয়া বলিল—ভট্টাচার্য্যম'শায়, আপনি যদি পূজা না করেন ত আমাকে না হয় পূজা করিবার আদেশ দিন। রামচক্রবর্ত্তীর বাড়ী আমি পূজা ক'র্‌তে পারি কি ?

বিশ্বম্ভরঠাকুর ছাত্রটীর অবস্থা জানিতেন, তিনি বলিলেন—আপদ্ধর্ম্মরূপে তুমি তাহার যাজনা করিতে পার বটে, কিন্তু আমি তা আদেশ করি না। তোমার অবস্থা ও বিবেচনার উপর নির্ভর করে।

পরদিন ভোরবেলা ব্রাহ্মণ উঠিয়াই স্ত্রী পুত্রকে জাগরিত করিলেন। রাত্রির মধ্যে যেন একটা নূতন উদ্যম আসিয়াছে। উৎসাহের সহিত ছাত্রগণকে ডাকিলেন, এবং সেই দরিদ্র ছাত্রটীকে বলিলেন—তুমিই চক্রবর্ত্তীর বাড়ী পূজা ক'রো। আমি করিব না, করিবার সম্ভাবনাও নাই। আমার নিজের বাটীতে এবার পূজা করিব।

হঠাৎ এরূপ একটা কল্পনার কারণ কেহ বুঝিল না। সকলেই বিস্মিত হইল।

গত রাত্রিতে ব্রাহ্মণ এক স্বপ্নাদেশ পাইয়া এই নবীন পথে চলিলেন। মায়ের স্বপ্নাদেশ—মা দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটিরে আসিবেন, ইহা অপেক্ষা আনন্দের উৎসাহের বস্তু আর কি আছে? স্বপ্নের কথা কেহ জানিল না। ব্রাহ্মণ, অপূর্ব্ব উৎসাহে পূজার আয়োজনে নিযুক্ত হইলেন। রামচক্রবর্ত্তীকে ছাত্র দ্বারা একখানি পত্র পাঠাইলেন।

আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপনম্—

রামবাবু, এবার আপনার নিকট কথা দিয়াও পূজায় ব্রতী থাকিতে পারিলাম না। আমার নিজের গৃহে মাকে আনিবার ইচ্ছা করিয়াছি। আরও ধর্ম্মব্যাঘাত হইবার আশঙ্কায় পূজা করিতে পারিলাম না। এই পত্র বাহক ছাত্রের মুখে ধর্ম্মহানির কারণ অবগত হইবেন। ইনি এবং আর একটী ছাত্র উভয়ে আপনার পূজা নির্ব্বাহ করিবেন।

শুনিলাম হরিদাস এক টাকার বিব কিনিয়াছে, লোকটী সন্দেহ যোগ্য কি না বিবেচনা করিবেন। আশীর্ব্বাদ করিলাম। ইতি –

আঃ শ্রী বিশ্বম্ভর শর্ম্মণঃ।

ব্রাহ্মণ এবার পূজা করিবেন, এ সংবাদ রাষ্ট্র হইতে অধিকক্ষণ লাগিল না। চতুর্দ্দিক হইতে লোক আসিতে লাগিল আর বলিতে লাগিল ঠাকুর আপনার বাটীতে পূজা? বড় আনন্দের কথা।

জমিদারের বড় বাড়ীর পূজায় লোকে যত আনন্দিত না হইল তাহা অপেক্ষা অধিক আনন্দিত হইল, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটীরের পূজায়, সকলেই ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের পূজার আয়োজনে সহায়তা করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণের দয়া—পবিত্রতা, সরলতা এবং সকলের প্রতি আদর যত্নে ইতর, ভদ্র সকলেই বিশ্বম্ভর ঠাকুরকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিত। বিশ্বম্ভরঠাকুরের পূজা যেন তাহাদের নিজের পূজা।

ক্রমশঃ।

পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধীয় আলোচনা।

বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজের শীর্ষস্থলাভিষিক্ত পূজনীয় ব্রাহ্মণ-সভা হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মে প্রযোজ্য পঞ্জিকা-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এবং থাকিলে কি প্রণালীতে সংস্কার করিতে হইবে, ইহার তথ্যানুসন্ধানের ভার গ্রহণকরতঃ স্বভাবতঃই প্রথমে পণ্ডিতমণ্ডলীর মত সংগ্রহ করিতেছেন। ইহা বড়ই আনন্দের বিষয় এবং আমাদের আশা আছে এই শুভানুষ্ঠান ফলে সমগ্র ভারতবর্ষের পণ্ডিতমণ্ডলীর ও সমাজের নেতৃবর্গের অভিমত সত্বরেই সংগৃহীত হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই কেহ কেহ এই মতসংগ্রহব্যাপারে কাহার নিকট হইতে মত গ্রহণ করিতে হইবে, কাহাকে বর্জ্জন করিতে হইবে, তাহা দেখাইতে গিয়া সঙ্কীর্ণতার আশ্রয় লওয়ার উপদেশ দিতেছেন। ইহা সৎসমাজ কখনই অনুমোদন করিতে পারেন না; যেহেতু ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল একদেশদর্শিতা এবং বিচারের পূর্ব্বেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। বর্ত্তমানক্ষেত্রে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে ও জ্যোতিষের ধর্ম্মকর্ম্মাদিতে প্রয়োগ বিষয়ে যাঁহারা আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই এই বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার অধিকারী। অভিমতদাতা নিজমতের সমর্থনে যে সকল যুক্তি, তর্ক ও প্রমাণাদির অবতারণা করিবেন, উহাই তাঁহার যোগ্যতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় দিবে। তৎপূর্ব্বে কাল্পনিক অভিধা দ্বারা ব্যক্তি কি সম্প্রদায়বিশেষকে ভূষিত করাই পক্ষপাতীত্বের প্রশ্রয় দেওয়া। তবে যাঁহারা হিন্দুদিগের আচার-ব্যবহার ক্ষণিক, শাস্ত্রানুশাসন স্বার্থপ্রণোদিত ও হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মাদি অজ্ঞতা-প্রসূত মনে করেন, তাঁহাদের মন্তব্য বিশেষ সতর্কতার সহিত লইতে হইবে। অপরদিকে যাঁহারা প্রতিষ্ঠাদি ক্ষুদ্র স্বার্থ জ্ঞানযজ্ঞে আহুতি দিয়াছেন, যাঁহারা যোগাদি সাধনে প্রকৃত সিদ্ধিলাভোন্মুখ হইয়াছেন এবং বিশেষতঃ যাঁহারা ভগবৎ-প্রেরণায় এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপদেশ বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইবে। কেবলমাত্র প্রাচ্য-প্রতীচ্য জ্যোতিষের পল্লবগ্রাহী অনুসন্ধানে যাঁহারা জড়ীয় চমৎকারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া আত্মনিবেদন করিয়াছেন, অথবা যাঁহারা সংস্কারকের যশ ও আধিপত্য লাভের উৎকট আকাঙ্ক্ষায় হৃদয় বিক্রয় করতঃ পূর্ব্বমহাজন পথ ও চিরাগত ব্যবহার লোপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাঁহাদের প্রার্থনা নির্ভরযোগ্য হইবে কিনা, উহা বিচারকালে বিবেচনার বিষয় হইবে। প্রগল্ভতা ও দাম্ভিকতাই যাহাদের মূলমন্ত্র, ধর্ম্মধ্বজিতা ও কপটতাই যাহাদের নিত্য আরাধনা এবং জিগীষা ও পরশ্রীকাতরতাই যাহাদের একমাত্র সাধনা, মন্তব্য সমালোচনা সময়েই, তাহাদের অন্তঃসারহীনতা আপনা হইতেই ভাসিয়া উঠিবে। এই কারণেই আমরা লোক নির্ব্বাচন-পূর্ব্বক মতগ্রহণের পক্ষপাতী নহি। ইহাতে নিরপেক্ষতার প্রতিবন্ধকতা ঘটে এবং স্বাধীন সমালোচনায় ব্যাঘাত হয়, ফলে শেষ সিদ্ধান্তটী সার্ব্বজনীন মীমাংসা না হইয়া সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি হইয়া পড়ে।

ব্রাহ্মণ-সমাজ পত্রের বিগত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় জ্যোতিঃশাস্ত্র-পঞ্চানন শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র এম্ এ মহাশয় বোম্বে পঞ্চাঙ্গ সংশোধন সভার নির্দ্ধারণসমূহ গ্রহণ করার জন্য আগ্রহাতিশয় দেখাইয়াছেন। উক্ত সভার সম্পূর্ণ কার্য্য বিবরণী এপর্য্যন্ত মুদ্রিত না হওয়ায়, হিন্দু জনসাধারণ তাঁহাদের মিমাংসা সম্বন্ধে সম্যক অবস্থা পরীক্ষা করার সুবিধা পান নাই। তবে সভাকর্ত্তৃক যে মুদ্রিত সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, উহা অবলম্বনে কতকটা অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। আদৌ তিথি পত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানপত্র প্রচারিত হইয়া মহাম্বাপুরীতে (বোম্বাই) শ্রীমাধব বাগে গত ১৯৬০ সংবৎ জ্যৈষ্ঠ বং ২২ তারিখে শনিবার দিবসে 'প্রকৃত তিথি পত্র সংশোধন প্রয়োজনেতিকর্ত্তব্যতা' নিরূপণের জন্য নাগরীক বৃন্দের একটী সম্মিলনী হইয়াছিল। গোস্বামী শ্রীপাদ দৈবকীনন্দনাচার্য্য মহোদয়ের অধ্যক্ষতায় ঐ সম্মিলনীতে পঞ্চাঙ্গ-সংশোধন-সভা স্থাপিত হয় এবং ভারতভূষণ সার ভালচন্দ্র কৃষ্ণ নাইট মহাশয়ের নেতৃত্বে একটী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

ঐ সমিতি সমস্ত ভারতীয় জ্যোতিঃসিদ্ধান্তবিদ্‌গণকে আমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ পূর্ব্বক একটী মহতি সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। কথিত হইয়াছে ঐ সভায় কাশী প্রভৃতি ক্ষেত্র হইতে জ্যোতিঃ-শাস্ত্রপয়োধিপারগামী ও ধর্ম্মশাস্ত্র পারাবার অবগাহন কুশল বহু পণ্ডিতের সমাগম হইয়াছিল এবং ইহাতে সমস্ত ভূপতিবর্গের ও সমস্ত ভারতবর্ষের প্রতিনিধিগণ এব ইংলণ্ডীয় বিবিধবিদ্যাবিসারদ সুধীবৃন্দ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা বিবাদের বিষয়ীভূত আটটী প্রশ্ন উদ্ভাবন করিয়া তদবলম্বনে আটদিবস পর্য্যন্ত পূর্ব্বোত্তর পক্ষ প্রণালীতে পরস্পর সংবাদ বিসংবাদ জানিয়া স্থূণানি খনন ন্যায়ের দ্বারা পুনঃ পুনঃ পরামর্শ করিয়া যাহা নির্ণয় করিয়াছিলেন, উহা প্রশ্ন প্রতিবচনরূপে পত্রে সন্নিবেস করতঃ গত ১৮২৬ শকে মার্গশীর্ষের ১১ই তারিখে রবিবারে সাক্ষর করেন।

বিগত ১৯০৫ সনের ১লা জানুয়ারী তারিখে ইহা ঐ সভার মধ্যস্থরূপে যে একাদশজন পণ্ডিত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা দ্বারকামঠাধিপতি শ্রীমদ্ জগদ্‌গুরু মহোদয় সদনে সমর্পণ করেন।

উপরি লিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পঞ্চাঙ্গশোধন করাই বোম্বাই সভার গঠনের কাল হইতে একমাত্র স্থির উদ্দেশ্য থাকায় পঞ্জিকা সংস্কারের আবশ্যকতা আছে কিনা, তৎসম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ ছিলনা। কাজেই সংস্কার প্রিয় ব্যক্তিগণই ঐ সভায় আগ্রহ সহকারে যোগদান করিয়াছিলেন। যাঁহারা ঐ মতের সহিত ঐক্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা, অনেকেই নিমন্ত্রিত হইলেও, সভায় উপস্থিত হওয়া বিড়ম্বনা বিবেচনায় বিরত ছিলেন। যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও নানা কারণে প্রতিবাদ করার অবসর ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনেও উপযুক্ত আয়াস ও প্রণালী অবলম্বনে কার্য্য হয় নাই। উপস্থিত পণ্ডিত গণের তালিকা দৃষ্টি করিলেই বুঝা যায় যে, ভারতের সকল স্থান হইতে কিম্বা সমস্ত হিন্দু সামন্ত নৃপতি প্রতিনিধি প্রেরণ করেন নাই।

অতএব আমরা বোম্বাই পঞ্চাঙ্গ-সংশোধন-সভাকে সমগ্র ভারতীয় হিন্দু-সমাজের প্রতিনিধি সম্মিলনী বলা নিরাপদ মনে করিতে পারি না। ইহা পঞ্চাঙ্গ-শোধনপ্রয়াসী ব্যক্তিগণ-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া পূর্ব্ব নির্ব্বাচন নীতিমূলে প্রধানতঃ সংস্কারপ্রিয়গণের পরিষদ্রূপে কেবল সম্প্রদায়বিশেষে পরিনত। পবিত্র বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ-সভার পদবী তাঁহাদের অপেক্ষা অতি উচ্চ। ইঁহারা পঞ্জিকা সম্পর্কীয় আমূল প্রশ্নটী তাঁহাদের বিবেচনাধীনে আনিয়া মৌলিকত্ব ও স্বাতন্ত্রতা দেখাইয়াছেন। এই সভার পূজনীয় সদস্যগণ এখনও কোন পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই—অথবা পঞ্জিকা-ব্যাপারে কোন পূর্ব্বসংস্কার লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন প্রকাশ পায় নাই। অপর দিকেবর্ণাশ্রমের শীর্ষস্থানীয়রূপে সনাতন ধর্ম্মসংরক্ষণের একমাত্র সাধু সঙ্কল্প লইয়া ব্রাহ্মণমণ্ডলী এই সভা স্থায়িরূপে সংস্থাপন করিয়াছেন। হিন্দু সমাজের অন্যান্য শত প্রশ্নের মধ্যে পঞ্জিকা সংক্রান্ত তর্কটী তাঁহাদের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে মাত্র। ক্ষণিক বোম্বাই পঞ্চাঙ্গ সংশোধন-সভার ন্যায় তাঁহারা পক্ষাশ্রয় করেন নাই—তাঁহারা নিরপেক্ষ বিচারকের পবিত্র ও উচ্চাসনেসমারূঢ়—বিচারকের গুরুতর দায়িত্বে ও কঠোর কর্ত্তব্যে বৃত। ব্যবহারিক সুলভ কথায় তাঁহারা লক্ষ্যচ্যুত হন না কিম্বা পূর্ব্ব পক্ষের নিকট বুদ্ধি চালনা ও জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া ঋণজালে জড়িত হইতে চাহেন না। . কাহারও ভীতি প্রদর্শক অথবা সকরুণ অনুরোধ তাঁহাদিগকে সত্যপথ হইতে রেখা মাত্র বিচলিত করিতে সমর্থ হইবে না। তাঁহারা ন্যায় শাস্ত্রের লীলাভূমি বঙ্গদেশের অগ্রনী, পক্ষাপক্ষের স্বার্থজড়িত প্রসংসা কি নিন্দাবাদ উপেক্ষা করিয়া প্রকৃত বস্তু ও কার্য্য বিকাশ পরীক্ষা করিতে চিররাভ্যস্ত। তাঁহারা অবশ্যই উপস্থিত প্রমাণ, যুক্তি ও ব্যবহার তন্ন তন্ন করিয়া নিরপেক্ষভাবে নির্ভীকতার সহিত সমালোচনা করিয়া প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন।

আশুবাবু সদ্‌যুক্তিসম্পন্ন শাস্ত্রীয় মত সংগঠনে ব্রাহ্মণ সভাকে সাহায্য করিবার মানসে বোম্বাই পঞ্চাঙ্গ সংশোধন সভায় তাঁহাদের অনুকূল নির্ণয় সমূহ ব্যাখ্যা করতঃ সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সপ্তবর্ষ পূর্ব্বে ঐ সভার সংস্কার পক্ষীয় সিদ্ধান্ত সমূহ বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তন এবং বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত ও সরল ফলিত পঞ্জিকা প্রচলনে মতামত সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় সভাসমিতি হইয়াছিল। ঐ সময়ে আমরা সাহিত্য-সংহিতা পত্রিকায় ১৩১৬সালের আষাঢ় ও ভাদ্র সংখ্যায় উহার সমালোচনা করিয়াছিলাম। তৎকালে মৃত পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় বোম্বাই সভার নির্ণয়গুলীর সংস্কার পক্ষীয় ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন "বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকার গণক শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র এম, এ মহাশয় সংস্কৃত জ্যোতিষশাস্ত্রের কিছুই দেখেন না। ন্যাটিক্যাল বুঝেন * * তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র দেখেন না। ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা হউক বা না হউক তাহাতে তাহার কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমরা ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধে এরূপ সাধারণ ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করার সম্পূর্ণ বিরোধী এবং মনে করি যে, সাহিত্যাচার্য্যের অন্যান্য ভ্রান্ত ধারণার উহা অন্যতম। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে দেখাইব যে, বোম্বাই পঞ্চাঙ্গ শোধন সভার নির্ণয় সমূহের সকলগুলিই অতর্কিত

নহে এবং আশুবাবু যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা যে কএকটী বিষয় সমর্থনও করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা যথেষ্ট ও প্রযোজ্য নহে। অধিকন্তু ইহাও দৃষ্ট হইবে যে, বোম্বাই সভায় সংস্কারপ্রয়াসীগণের আধিপত্য থাকিলেও প্রচলিত শাস্ত্রীয় গণনা-প্রণালী একেবারে বর্জ্জন করিতে সাহসী হন নাই। প্রথমে ও প্রকাশ্যে সংস্কারের পোষকতা করিলেও প্রকারান্তরেও ভাবতঃশাস্ত্রীয় গণনা অনুমোদন করিয়াছেন। সভাকর্ত্তৃক প্রকাশিত লিপি হইতে দৃষ্ট হয় যে, দৃক্‌প্রত্যয় ও সিদ্ধান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের অবিরোধে শ্রৌত স্মার্ত্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান সিদ্ধির জন্য কি প্রকারে পঞ্চাঙ্গ শোধন করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে মোহময়ী নগরীতে (বোম্বাইতে) সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী প্রশ্নসমূহ উদ্ভাবন করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হন। সভার বিষদ্‌বিবরণী প্রকাশ না হওয়ায়, কি কি যুক্তি, তর্ক ও প্রমাণ কিরূপভাবে পরীক্ষা হইয়া প্রশ্নগুলি মীমাংসিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার সুবিধা নাই; কিন্তু সিদ্ধান্ত সমূহে বিভিন্ন ভাবাত্মক ও শিথিল ভাষা প্রয়োগে এবং অসম্পূর্ণ ও বিকল্প নির্দ্ধারণে প্রতীয়মান হয় যে, সভা ঐক্যমত হইতে পারেন নাই। ফলে উপস্থিত পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রীয় গণনার পক্ষপাতী ছিলেন তাঁহারাও বিশেষ প্রতিবাদ করেন নাই; অথচ সংস্কারপ্রার্থীগণ তাঁহাদের মতের সংস্কারও সভার অভিপ্রেত জানিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এরূপ স্থলে হিন্দু-সমাজ উহা সম্যক্ গ্রহণ করিতে যে ইতস্ততঃ করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? এই জন্যই দাক্ষিণাত্যে শৃঙ্গেরী মঠাধিপতি শ্রীমদ্ জগদ্‌গুরু মহোদয়কর্ত্তৃক আহূত জ্যোতির্ব্বিদ্ মহাসম্মিলনীতে কথিত হইয়াছিল।

"The solution thus obtained at Bombay Astronomical Conference had been differently interpreted by the learned astronomers and new issues are being framed by others. The large number of signatories in the documents have expressed different views.

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জ্যোতির্ব্বিদ্-সভা স্থির করিলেন—

"সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্তং সৌরবর্ষমানং গ্রাহ্যং।
তদিতরগ্রহগতিমানং সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্তং
বেধোপলব্ধ বীজ সংস্কৃতং গ্রাহ্যং।"

শ্রীমদ্ জগদ্‌গুরু ইহার ব্যাখ্যা করিলেন,—"বেধোপলব্ধমিত্যত্র মূলসিদ্ধান্ত গ্রন্থোক্ত স্থিরচর যন্ত্রোপলব্ধবেধ এব গ্রাহ্যকোটিপ্রবিষ্টঃ, যথোক্ত সাধনালাভশ্চেদ্ ধর্ম্মানুষ্ঠানোপযোগি সূক্ষ্মকালনির্ণয়ায়া-গতিকৃগতিজ্ঞানেন সাধনান্তরোপলব্ধ বেধোপি তাৎকালিক কার্য্যনির্ব্বাহায় ন দোষাবহঃ।"

হিন্দু-সমাজ শাস্ত্রীয় জ্যোতিষকে আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং বোম্বাইসভা সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত বর্ষমানটীকে স্বীকার করিয়া তাহাই সমর্থন করিতেছেন। ইহাতে শাস্ত্রীয় তর্ক নাই। আশুবাবু যে ইহাকে বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, তাহাও নূতন নহে; যেহেতু হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন যে, আপ্তবাক্য কখনই বিজ্ঞানবিরুদ্ধ হইতে পারে না। কেবলমাত্র সংযোজক ব্যাখ্যায়

অভাব বিদ্যমান দেখায়। এই সংযোগকারী ব্যাখ্যা আশুবাবুর মতে "ভ্রমের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট থাকলে, ভ্রান্ত হইলেও উহাকে বিজ্ঞান সম্মত বলা যাইতে পারে।" তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা কিঞ্চিৎ প্রসারণ করিলেই সূর্য্য-সিদ্ধান্তের যাবতীয়গণনাই যে বিজ্ঞানসম্মত, তাহা দেখান দুরূহ নহে। একটী অন্তটীয় অবশ্যম্ভাবী যুক্তি প্রসারণ জনিত নিত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। বর্ষমানের স্থলে ভ্রমের পরিমাণ সাধারণ অনুপাত প্রসূত কিন্তু গ্রহাদির সংস্থান নির্ণয় কিম্বা সংযোগ নির্দ্ধারণ পক্ষে এই ভ্রম কতকটা জটীল অঙ্কোৎপন্ন। এতদুভয়ের মধ্যে বিষয়গত কোন পার্থক্য নাই, কেবল প্রক্রিয়াগত সামান্য প্রভেদ আছে মাত্র। উভয় ভ্রমই সময়ের ক্রিয়া বিকাশ (motion) সূচক; সময় জানা থাকিলে উহা সহজেই নির্ণয় যোগ্য। অতএব বর্ষমানটীকে বিজ্ঞানসিদ্ধ বলিয়া অন্যগুলি বিজ্ঞান বিরুদ্ধ বলা উচ্চ অঙ্ক বিজ্ঞান উপেক্ষা করা মাত্র। সংস্কার-বিরুদ্ধ-বাদিগণ ইহা অপেক্ষা আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, অদৃষ্ট ফল সিদ্ধির জন্য শাস্ত্রানুগত গণনা গ্রহণ করাই সঙ্গত; যেহেতু উহা সময়ের বিকাশ জনিত মাত্র এবং সময় নির্ণয়ের জন্যই গণনার প্রয়োজন। যদি কল্পিত বর্ষমানোচিত সময়ে ঘটোৎসর্গ করা চলে, তাহা হইলে তদনুরূপ কল্পিত গ্রহসংস্থানের উপর এইরূপ ধর্ম্ম কর্ম্ম করার অন্তরায় কি? ইহা প্রকৃত হইলে হিন্দুর পঞ্জিকা সংস্কারের জন্য এইরূপ বিরাট আয়োজন ও বিকট আস্ফালনের সার্থকতা থাকে না। ইহার জন্য জগৎ কবি বলিয়াছেন "তোমাদের দর্শনে যাহা স্বপ্নেও ভাবে না, তাহা অপেক্ষা অনেক দ্রব্যই স্বর্গে ও মর্ত্তে আছে।"

আশুবাবু অনুরোধে ধর্ম্মকর্ম্মের কাল নির্ণায়কত্ব বলিয়া বৈজ্ঞানিক বলা গেলেও, সূর্য্যসিদ্ধান্তের অঙ্কপ্রসূত বর্ষমানটী প্রকৃত প্রস্তাবে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত কিনা ইহাই দেখিতে হইবে। আশুবাবু ইহা সমর্থন করিতে গিয়া বলিয়াছেন, প্রথমতঃ লোকাপেক্ষায় উহা স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ এবং দ্বিতীয়তঃ ই। ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন বলিয়া প্রকৃত। ইহার প্রমাণস্বরূপ নিউকাম্পের একটী উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন "ক্যালেণ্ডার পরিবর্ত্তন সাধারণের অনেক আপত্তিজনক হইয়াছিল এবং ইহার পরে বলা যাইতে পারিবে যে, এক্ষেত্রে লোকের সাধারণ বুদ্ধি বিজ্ঞজনের জ্ঞানাপেক্ষা বেশী ঠিক ছিল।" তাঁহার মন্তব্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, বীজবপন ও শস্য সংগ্রহের কালনিরূপণে যে তারিখ গণনা-প্রণালী ব্যবহৃত হয়, উহাতে অধিকতর সূক্ষ্মতার প্রয়োজন নাই এবং দিনবৃন্দ নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করা হইলেও, ঐরূপ পরিবর্ত্তনের নিতান্ত আবশ্যকতা উপলব্ধি হয় না। কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্তের বর্ষমান পাশ্চাত্য বর্ষমানের ন্যায় দিনগণনার জন্য বিশুদ্ধ কল্পনা নহে। বিজ্ঞানের চক্ষে ইহার বাস্তবতা আছে। সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রণয়েই কথিত হইয়াছে, সূর্য্যের দ্বাদশ রাশি সংক্রমণ অর্থাৎ ভগণভ্রমণ করিতে যে সময় লাগে, উহাই সৌরবর্ষমান। 'পরিবর্ত্তেন পৌষ্ণান্তে ভগণঃস্মৃতঃ।' ইহার ইংরাজী অনুবাদে 'কাশীর কুইন্‌সকলেজের সংস্কৃত বিভাগের গণিতাধ্যাপক মৃত বাপুদেব শাস্ত্রী C. I. E লিখিয়াছিলেন, "Bhagan means that revolution through the signs(of the Zodiac,

which a planet makes by passing rownd) up to the end of the true place of the Revati (Zita piscium from which end they set out.) অতএব বর্ষমান বলিতে সূর্য্য যেক্ষণে একবার রেবতীনক্ষত্র ভেদ করিয়া ভগণ পরিভ্রমণের পর পুনরায় ঐরূপ ভেদ করিবেন, ইহার অন্তরকালকে বুঝাইবে। তজ্জন্যই মৃত বাপুদেব আবার বলিয়াছিলেন "It is to be observed here that the signs aries, Tanres, etc., are reckoned from the Star Revati (Zita Piscium) and a solar year corresponds to a sidireal year" সূর্য্যসিদ্ধান্তে কোথাও যুগগত সাবন দিন সংখ্যার অনুরোধে আদিবিন্দু পরিবর্ত্তনের আভাষমাত্রও পাওয়া যায় না। আদি বিন্দু গতিশীল হইলে যোগতারা সমূহের গতি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে, উহা সূর্য্যসিদ্ধান্তের ও ভাস্করের বিপরীত। অতএব মৃত সাহিত্যাচার্য্যের ষ্টেশন কল্পনা কি আশুবাবুর কেন্দ্র পরিবর্ত্তন (change of co-ordinate) প্রভৃতি মূলে ভিত্তিহীন, কেবল লোকাপেক্ষার জন্য উদ্ভাবিত। আশুবাবুর সমর্থিত বর্ষমানটী নিম্নলিখিতমতে গণিত। সূর্য্য-সিদ্ধান্তে লিখিত আছে, এক মহাযুগে সূর্য্যের ভগ সংখ্যা ৪৩২০০০০ ও সাবনদিন সংখ্যা ১৫৭৭৯১৭৮২৮। কাজেই একভগণ পরিভ্রমণ করিতে সূর্য্যের সাবন দিনাদি ৩৬৫।১৫।৩১।৩১ ২৪ লাগে উহাই সৌরবর্ষমান। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি ভগণের পরিমাণ চাক্ষুষ নক্ষত্র দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বলিয়া বাস্তব বা দৃক প্রত্যয়সিদ্ধ এবং সাবন দিনও সূর্য্যের এক উদয় হইতে পরবর্ত্তী উদয় পর্য্যন্ত বলিয়া প্রত্যক্ষ। এই দুইটীর কোনটীই কল্পনার প্রসারণে পরিবর্ত্তন করার সুযোগ নাই হস্তক্ষেপ করিলে সংজ্ঞা পরিবর্ত্তিত হইয়া অলীক হইবে। সুতরাং পূর্ব্বকথিত সাবন দিন সংখ্যায় কথিত সংখ্যক ভগণভ্রমণ না হইলে, বিজ্ঞান উহাকে সত্য বলিবে না। সূর্য্যসিদ্ধান্তের সংজ্ঞাগত সৌরবর্ষই পাশ্চাত্য জ্যোতিষের নাক্ষত্রিক সৌরবর্ষ (sidireal year)। অধ্যাপক নিউকোম্ব স্বীয় সৌরসারিণীতে উহার পরিমাণ বর্ত্তমানে ৩৬৫'২৫৬৩৬০৪৪ দিন স্থির করিয়াছেন। ইহারই পরিমাণ বোম্বাই পঞ্চাঙ্গ-শোধন সভা প্রকারান্তরে ৩৬৫'২৫৮৭৫৬৪৮ দিন বলিতে চাহেন এবং আশুবাবু শেষোক্ত অঙ্কটী নিউকোম্বের মতে বৈজ্ঞানিক বলিবেন। ইহার পোষকে আশুবাবু একটী অদ্ভুত নবীন কিম্বদন্তীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি বলেন "সূর্য্যগ্রহে বীজ সংস্কার করিলে নির্ব্বংশ হয় অর্থাৎ করিতে নাই।" আর্য্যসিদ্ধান্তকারের ও ভাস্করাচার্য্যের বর্ষমান সূর্য্যসিদ্ধান্তের বর্ষমানের সহিত ঐক্য না থাকায় এই কিম্বদন্তী প্রশ্নের বিষয় হইয়া পড়ে। ধর্ম্মকর্ম্মে অচিন্ত্য স্বাতন্ত্রতা আছে বলিয়া ভারতবাসীর চিরপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানানুরাগের পবিত্র স্মৃতিতে এইরূপ একটী কাপুরুষোচিত কুৎসিত কিম্বদন্তী সংযোগ করা আমরা গর্হিত বলিয়া বিবেচনা করি। আমরা জানি জলমগ্নোন্মুখ ব্যক্তি আপনার জীবনের জন্য অনন্যোপায় হইয়া অপরকে জড়াইয়া জলমগ্ন করিয়া থাকে; কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এইরূপ নিন্দনীয় আরোপ করায় কি স্বার্থোদ্ধার হইবে, আমরা বুঝিতে পারি না। নিউকোম্ব তারিখ গণনা সম্পর্কে প্রচলিত বর্ষ (Civil year) গণনায় জুলিয়ান বর্ষ পরিবর্ত্তনে সন্দিহান হইলেও, নাক্ষত্রিক (Sidieral) কি সায়ন (tropical) বর্ষমানে কাল্পনিকতা জড়িত করায়

কি অনুরোধে কেন্দ্র পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করেন নাই। রুষির সাম্রাজ্যে পুরাতন দিনগণনার প্রণালী প্রচলিত থাকিলেও, পেট্রোগ্রাডের মান মন্দিরের অধ্যক্ষগণ প্রকৃত সায়ন বর্ষমান বলিতে জুলিয়ান বর্ষমান গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন অথবা আশুবাবুর ন্যায় উদয়ুরোধে আরম্ভ বিন্দুর কেন্দ্র পরিবর্ত্তনে (Change of co-ordinate) প্রবৃত্ত হন নাই!

আশুবাবু জুলিয়াস সিজারের সময় হইতে পুঞ্জীকৃত ভ্রমের মধ্যে সংশোধনাবশিষ্ট তিন দিনের জন্য প্রশ্ন করিয়াছেন। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, নিশিয়ার কাউন্সিলে ৩২৫খৃ ইষ্টার পালনের বিধান স্থিরীকৃত হওয়ায় ঐ সময়ের সায়ন মেষ সংক্রমণের তারিখ (২১শে মার্চ্চ) ঐক্য রাখার জন্যই এইরূপ হইয়াছিল। ইহাতে অশুদ্ধ সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিকতা নাই। সায়ন বর্ষমানের ভ্রম পাশ্চাত্যদেশে দৃঢ়তার সহিত সংশোধিত হইয়াছিল। হাইপার্কাশ ৩৬৫ দি, ৫ঘ, ৫৫মি ১২ সে স্থির করিলেও, কোপারনিকাশ কমাইয়া ৪৯ মি, ৬ সে করেন। ইহার পর টাইকেব্রাহে ৪৮ মি ৪৫$\frac{১}{৪}$ সে করিলেও, কেপলার ৪৮ মি ৫৭ ৬ সে স্থির করেন। লাপ্লাস ৪৮ মি, ৪৯.৭ সে নির্ণয় করিলে পর লিভেরিয়ে ৪৮মি ৪৬.০৫ স্থির করিয়াছিলেন। হিন্দু জ্যোতিষেও সূর্য্যগ্রহে বীজসংস্কার বিরল নহে। সূর্য্যসিদ্ধান্তের নিরয়ণ বর্ষমানের ৩৬৫ দি ৬ ঘ ১২ মি ৩৬.৫৬ সে স্থলে পৌলিশসিদ্ধান্তে ৩৬ সেকেণ্ড; পরাশর-সিদ্ধান্তে ৩১.৫ সে; আর্য্য-সিদ্ধান্তে ৩০.৮৪ সে; লঘুআর্য্যসিদ্ধান্তে ৩০ সে; এবং সিদ্ধান্ত-শিরোমণিতে ৯ সেকেণ্ড ধৃত হইয়াছে। আশুবাবু সূর্য্যে বীজসংস্কার না দেওয়াই বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিয়াও, তদীয় বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকার বৎসরের প্রথম দিবসের ব্যতীত অপর সকল দিনেরই সূর্য্যে দৃক্‌প্রত্যয়ের জন্য বোম্বাই সভার পঞ্চম উত্তরের নব্য সংস্কারসমূহ বীজরূপে দিয়া, তাঁহার কথিত ধ্রুবসত্য কিম্বদন্তীর অলীকত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া, তিনি বলিয়াছেন "পরে বিধেয় বিবেচিত হইলে উহা পরিবর্ত্তন করা যাইবে, ইহাই সভার গূঢ় মন্তব্য ছিল।" মুদ্রিত বিবরণীতে উহার ইঙ্গিত না থাকায়, উহা আশুবাবুর ব্যক্তিগত অনুভূতি মনে হয়। পরে মীমাংসার কথা থাকিলে, সভার সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তনীয় হইয়া পড়ে এবং সভার নির্ণয়ের বর্ত্তমান মূল্য থাকে না। যাহাই হউক, আমরা পরে দেখাইব, মুদ্রিত উত্তরেই বৈজ্ঞানিক সৌরবর্ষমান গ্রহণ করার উদ্দেশ্য পরিস্ফুট আছে। তবে উহা বিকল্পে এবং কিঞ্চিৎ আবরণের মধ্যে।

সূর্য্যের গতি সম্বন্ধে এইরূপ সূর্য্যসিদ্ধান্তের অঙ্ক স্থিরতর রাখিয়া, অন্যান্য গ্রহের গতি সিদ্ধান্তোক্ত যন্ত্রদ্বারা বেধোপলব্ধ গ্রহণ করাই সভার মত। পরবর্ত্তী গ্রহলাঘবাদিকরণগ্রন্থনিচয়ে মধ্যাদিতে বীজ সংস্কার প্রচলিত থাকায় উহা স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ জগদ্‌গুরু মহোদয় ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানের যোগ্যকাল নির্ণয়ে সমর্থ এরূপ অন্য যন্ত্রদ্বারা সম্প্রতি কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে বলিয়া সভা সিদ্ধান্তোক্ত যন্ত্র হওয়া প্রয়োজন স্থির করিয়াছেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তে শঙ্কু ব্যতীত জ্যোতিষোপনিষদ্ অধ্যায়ে গোল যন্ত্র, তাম্রপাত্র, যষ্টি প্রভৃতি কএকটী যন্ত্রের উল্লেখ আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই শ্রেণীর যন্ত্রদ্বারা সূক্ষ্মফল পাওয়ার আশা নাই। বিংশ শতাব্দীতে সূক্ষ্মবেধোপযোগী

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া, প্রাচীন স্থূল যন্ত্র সমূহের সাহায্য গ্রহণ করিতে বলিলে সময় আভ্যন্তরীণ অবস্থার কতক পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, উত্তরের ভাষায় কেবল সিদ্ধান্তোক্ত যন্ত্রকে লক্ষ্য করে না, যে কোন প্রকারে বেধোপলব্ধ হইলেই হইবে। স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও গ্রহগতিমান যে প্রকারে সংস্কার করিতে হইবে লিখিত হইয়াছে, ঐ প্রণালীতেই গ্রহের উচ্চ পাতাদির সংস্থান স্থির করিতে হইবে, ইহাই উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে। বেধজাত গ্রহ হইতে মধ্যাদি আনয়নপূর্ব্বক গতিমান সংশোধন করিতে হইলে, পরিধি ও স্ফুট গণনার প্রণালীর যে সংস্কার করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে সভার মন্তব্য স্পষ্ট নহে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে সভা বলিয়াছেন—"নূতন করণ গ্রন্থারম্ভ কালে সৌরবর্ষমানানুগুণং সাবয়বাষ্ট পঞ্চাশার্দ্ধকলামিতং গ্রাহ্যং। তত্রবেধেন বৈগুণ্যোপলব্ধৌ বেধোপলব্ধবীজ সংস্কৃতং গ্রাহ্যং।" এতৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ জগদ্‌গুরু বলেন "নূতন করণগ্রন্থ নির্ম্মাণমিত্যত্র প্রথম প্রশ্নোত্তরানুগুণ্যেন গ্রহলাঘবাখ্য গ্রন্থ এব সংস্কর্ত্তব্যঃ প্রচুর প্রচারাৰ্হত্বাদল্পায়াস সাধ্যত্বাচ্চ" কি কারণে অয়নগতি উদ্ভূত হয়, তদ্বিষয়ে এক্ষণে আলোচনার প্রয়োজন নাই; কিন্তু অয়নগতি যে কাল্পনিক অঙ্ক নহে, তাহা প্রদর্শিত হইতে পারে। রবিমার্গ বিষুবদ্ রেখায় প্রতিবর্ষে যে পরিমাণে অপসৃত হয়, তাহাই বার্ষিক অয়নগতি। অধ্যাপক নিউকোম্ব ও সমগ্র রুশিয়া সমূহের জ্যোতির্ব্বিদগণ সায়ন বর্ষমান ৩৬৫·২৪২১৯৮ স্থলে জুলিয়ান বর্ষমান ৩৬৫,২৫ তারিখ গণনার জন্য অনুমোদন করিলেও তজ্জন্য অয়নগতির পরিবর্ত্তন করেন নাই। নিউকোম্ব উহা বার্ষিক ৫০·২৫৬৪ + ·০০০২২২ (খৃষ্টাব্দ—১৯০০) বিকলা নির্ণয় করিয়াছেন। ইহা নিত্য, প্রাকৃত ও বাস্তব অর্থাৎ কল্পনাপ্রসূত নহে। ইহা রবিবর্ত্মস্থিত সূর্য্যের বিষুবদ্‌ভেদের বিন্দু হইতে পরবর্ত্তী ঐরূপের ভেদ বিন্দুর অন্তর দ্বারা স্থিরীকৃত। স্বভাবতঃই ইহার সহিত কল্পিত বর্ষমানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকার হেতু নাই। অন্য কোন অঙ্ক ইহার সহিত যোগ হইলে ইহাকে আর বিশুদ্ধ দৃক্‌প্রত্যয়সিদ্ধ বেধোপলব্ধ অয়নগতি বলা যাইতে পারে না। অতএব সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত বর্ষমানের ভ্রম ইহার সহিত যোগ করিলে ইহাকে বিশুদ্ধ অয়নগতি না বলিয়া কল্পিত বর্ষমানভ্রমযুক্ত অয়নগতি বলিতে হইবে। প্রকৃতবেধের সহিত উহার বৈগুণ্য অবশ্যম্ভাবী এবং প্রথম বর্ষেই দেখা যাইবে যে সাবয়ব ৫৮ বিকলার পরিবর্ত্তে সাবয়ব ৫০ বিকলার অতিরিক্ত স্খলিত হয় নাই। টলেমী এই অয়নগতি বার্ষিক ৩৬ বিকলা অথবা সূর্য্যসিদ্ধান্তকার ৫৪ বিকলা বলিলে কিম্বা গ্রহলাঘবাদিতে এককলা কল্পিয়া ভ্রমে স্বীকৃত হইয়া থাকিলেও, উহাকে বিজ্ঞান ভ্রমপূর্ণ ও অশুদ্ধ বলিবে। বিকলা ৫০·২৫ ব্যতীত অন্য কোন অঙ্ককে দৃক্‌প্রত্যয়সিদ্ধ অয়নগতি বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। এই কারণেই জয়পুরী পঞ্চাঙ্গকারী জ্যোতির্ব্বিদ্ লালশর্ম্মা সম্মতি জ্ঞাপন সময়ে তাঁহার অয়নগতি বিকলাদি ৫০।১৪ বলিয়াছিলেন। অপর একজন এম,এ, উপাধিধারী সদস্য লিখিয়াছিলেন যে, তিনি বোম্বাই সভার পারিতোষিক লালসায় পুস্তক লিখিতেছেন না বলিয়া তাঁহার অয়নগতি

৫০'২৫ বিকলা। শ্রীবিনায়ক শাস্ত্রী খানপুরকার প্রভৃতি সাতজনও রেবতীনক্ষত্র আদিবিন্দু স্বরূপ গ্রহণ করায় ৫৮ বিকলার প্রতিকূল। তবে সভার পক্ষ হইতে এইমাত্র বলা যায় যে, প্রকৃত বেধসিদ্ধ অয়নগতি গ্রহণ করিতে বলায়, ইহা উপেক্ষিত হইয়াছে। অয়নগতির স্থায় উত্তরে সৌরবর্ষমানের কোন অঙ্ক না দেওয়ায় সংজ্ঞানুসারে নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্র ভেদ ধরিয়া বর্ষমান অর্থাৎ পাশ্চাত্য সাইডিরিয়েল বর্ষমানই সভার অন্যতম লক্ষ্যের বিষয় ছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। এই কারণেই সূর্য্যের গতিতে বেধোপলব্ধ সংস্কারের উল্লেখ নাই। ইহা প্রকৃত হইলে, হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত না হইলেও ক ল্লত কি বিশেষ অবৈজ্ঞানিক হইবে না এবং আশুবাবু সভার বর্ষমান পরিবর্ত্তনে যে গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল বলিয়াছেন, উহা পরিস্ফুট দৃষ্ট হইবে। ইহা হইলে সিদ্ধান্তশিরোমণির গোলাধ্যায় ধৃত কল্পে সৌরোক্ত ৩০০০০ ক্রান্তিপাত এবং তত্তুল্য মুঞ্জলোক্ত ১৯৯৬৬৯ ভগণ সংখ্যা হইতে যথাক্রমে বার্ষিক ৭, ৮ ও ৫৯, ৯ বিকলা প্রাপ্ত হইয়া প্রথমটীকে নাক্ষত্রিক বর্ষ ভ্রম ৮,৫ ও শোবোক্তটীকে তৎসহ অয়ন গতি ৫৮, ৭ বিকলার সহিত তুলনা করার প্রয়োজন হইবে না।

বিষয়টী পরিত্যাগের পূর্ব্বে একটী কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। শ্রীমদ্‌জগদ্‌গুরু বলিয়াছেন যে, গ্রহলাঘব সারিণী সংস্কার করাই সঙ্গত, যেহেতু উহা প্রচুর প্রচলিত এবং উহার গণনা প্রণালী অনায়াস সাধ্য। জ্যোতিষ শাস্ত্র মন্থনশীল পণ্ডিতাগ্রগণ্য সাইমন নিউকাম্ব প্রমুখ আধুনিক সারিণী প্রণেতাগণ উন্নত অঙ্কশাস্ত্রের চরমপ্রণালী সমূহ প্রকৃত সূক্ষ্মতার প্রতি সতত দৃষ্টি রাখিয়া সম্পূর্ণ ও উপযুক্তরূপে প্রয়োগ করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা গণেশ দৈবজ্ঞের স্থূল ও প্রাথমিক গণনাপ্রণালী অধিকতর সহজ সাধ্য হইবে বলিয়া আমরা বিবেচনা করিতে পারি না। সংক্ষেপে করিতে হইলে সূক্ষ্মতার ব্যাঘাত ঘটিবে এবং সংস্কারের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। এস্থলে স্বভাবতই প্রশ্ন হয়, এই শ্রেণীর গ্রন্থ নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা কি? পাশ্চাত্য সারিণী সমূহ অজস্র অর্থব্যয়ে অসাধারণ গণিতজ্ঞ মণিষীবৃন্দের সমবেত চেষ্টায় প্রস্তুত হইয়াছে এবং চন্দ্রসারিণী ব্যতীত অন্যান্য সারিণী আমাদের রাজভাষায় লিখিত হওয়ায় ভারতবাসীর সহজ পাঠ্য হইয়াছে। চন্দ্রসারিণীও অতি সহজ ফরাসীভাষায় লিখিত এবং চন্দ্রের গণনাপ্রণালীর জটীলতা ও অসামঞ্জস্য বিদূরিত হইলে সত্বরেই রাজভাষায় রচিত হইবে। এরূপ স্থলে ২৫০০৲ টাকা পারিতোষিক দিয়া কিয়ৎকালের জন্য ভুল অয়ন ও ভ্রান্ত সৌর বর্ষমানযুক্ত অপেক্ষাকৃত স্থূল গ্রন্থ প্রণয়নের চেষ্টার সার্থকতা কি? যদি পঞ্চাঙ্গ গণনা করার জন্যই এই শ্রেণীর গ্রন্থের আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে ইহারই বা প্রয়োজন কি? পরম সৌভাগ্যবশে ভারতবর্ষ ভূমণ্ডলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃটীশ মহাসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত। তাঁহাদের সর্ব্ববিজয়ী বিশাল রণতরী বাহিনীর এবং অসংখ্য বানিজ্য মহাপোত সমূহের ব্যবহারের জন্য রাজকর্ম্মচারী গণের তত্ত্বাবধানে প্রতি বর্ষেই বহুব্যয়ে নির্ভুল ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে গ্রহ সংস্থান সমূহ ও ঘটনাবলীগণিত ও পরীক্ষিত হইয়া কএক বর্ষপূর্ব্বেই সাধারণে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহার সাহায্যে সহজেই পাশ্চাত্য দৃক্‌তুল্য প্রণালীর পঞ্জিকা গণিত হইতে পারে। এই মহেন্দ্রসুযোগ বিদ্যমান থাকিতে সারিণী সমূহ হইতে

পুনরায় বিরাট আয়োজনে পঞ্চাঙ্গ গণনা করিলে কি অযথা পরিশ্রম ও বৃথা অর্থব্যয় হইবে না? অতএব নূতনকরণ গ্রন্থ নির্ম্মাণের জন্য ব্যগ্র না হইয়া, সমগ্রশক্তি পন্থা নির্ণয়ে প্রয়োগ করা আমরা অধিকতর প্রয়োজন মনে করি। চিরসন্দিগ্ধ সর্ব্ববাদী সম্মত কর্ত্তব্যতা নির্ণয়ের পূর্ব্বে 'এতাদৃশ করণ গ্রন্থ নির্ম্মাণে বিদ্বাংস ইদানীমেব নিয়োক্তব্যাস্তদপেক্ষিতোপকরণসম্পাদা চ তে সংযোজনীয়া, যেনা বিলম্বেন পঞ্চাঙ্গশোধনং বিদ্ধ্যেৎ' প্রস্তাবের প্রয়োজন হয় না। একবার কর্ত্তব্যতা স্থির হইলেই 'এতৎকার্য্যে ফলোদয়ং যাবৎ' ব্যতীতই যথাযথ মুপলব্ধ তত্তদ্দেশীয় পঞ্চাঙ্গানুসারেণ সর্ব্বে ভারতবর্ষীয়া স্ব স্ব ধর্ম্মানুষ্ঠানংকুর্য্যু, আদেশ প্রতিপালিত হইতে পারে।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বোম্বাই সভা বলিয়াছেন "গ্রন্থারম্ভকাল (১৮২৬ শকে) দ্বাবিংশাধিকা স্ত্রয়োবিংশত্যংশতো ন্যূনাগ্রাহ্যা।" আশুবাবু বলিয়াছেন সূর্য্যসিদ্ধান্তের বর্ষমান লইলে চাক্ষুষ অয়নাংশ ১৩২৩ সালে ২২।৩৩ না হইয়া পারে না, যেহেতু উহা 'প্রাক্‌চক্রং চলিতং হীনে ছায়ার্কাৎ করণা গতে অন্তরাংশৈঃ" সম্ভূত এবং ভাস্করাচার্য্য দ্বারা সমর্থিত। আশুবাবু দত্তের সহিত সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রণেতা ও ভাস্করাচার্য্যের দৃক্‌সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা দেখাইয়া উহার অঙ্কাবলী সংশোধনের অভিপ্রায় ছিল সিদ্ধান্ত কয়ায়, এক্ষণে করণাগত রবিস্ফুট বলিতে ভ্রমাঙ্কপ্রসূত দৃক্‌বিরুদ্ধ রবিস্ফুট প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিবার অধিকার তাঁহার তিরোহিত হইয়াছে। করণাগত স্ফুট বলিতে প্রকৃত নাক্ষত্রিক সংস্থান গ্রহণ করিতে তিনি বাধ্য। আশুবাবু বলেন মৃত বাপুদেবের মতে অয়নাংশ ২২।৩৩, কিন্তু এই বাপুদেবই জিটাপিসিয়ামকেই রেবতী বলিয়াছেন এবং এক্ষণে উহার সংস্থান সায়নাংশ ১৮।৪৯। অয়নগতি ব্যতীত এই নক্ষত্রেরও একটী মন্দগতি আছে। মৃত বাপুদেব ইহার অতিরিক্ত অয়নাংশ বলিলে, কোনটী তাঁহার প্রকৃত মত স্থির করা দুর্ঘট। যোগেশবাবু প্রত্যক্ষায়নাংশ বলিলেও, এইরূপ অয়নাংশ নির্ণয় করার অসুবিধা অন্যত্র স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন। প্রকৃত দৃক্‌প্রত্যয়-সিদ্ধ অয়নাংশের পরিবর্ত্তে কাল্পনিক অয়নাংশ গ্রহণ করার তিনটী হেতু দৃষ্ট হয়; প্রথমতঃ প্রচলিত তারিখ গণনা-প্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে হয় না; দ্বিতীয়তঃ ভাস্করের অয়নাংশের নিকটবর্ত্তী হয়; তৃতীয়তঃ সূর্য্যসিদ্ধান্তের চিত্রা সংস্থান হইতে গণনা করিলে উহা সমর্থন হইতে পারে। এই শ্রেণীর মুখাপেক্ষায় ফল নাই—আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে, বিশেষতঃ বিষয়কর্ম্মে ও রাজদ্বারে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ইংরাজি তারিখের একমাত্র প্রচলনে, কাল্পনিক সৌর তারিখের বিশেষত্ব ক্ষীণপ্রভ। সায়নানুরোধে প্রাচীন নক্ষত্র পরিবর্ত্তনবশতঃ স্বাতন্ত্রতা বর্ত্তমানে নাক্ষত্রিক প্রণালীতে সীমাবদ্ধ হওয়ায়, ভাস্করের অয়নাংশের মূল্য প্রভূত হ্রাস হইয়াছে। সূর্য্যসিদ্ধান্তের চিত্রা সংস্থানের সহিত রেবতী সংস্থানের মিল না থাকায় ও আর্য্যভট্ট ভাস্কর প্রভৃতি উহা স্বীকার না করায় প্রশ্নের বিষয় হইয়াছে। অপর দিকে সূর্য্যসিদ্ধান্তে পরিষ্কার লিখিত আছে যে অয়নারম্ভের সময় ৪২১ শক; ঐ গ্রন্থের নক্ষত্র সংস্থানের হারাহারিতে উহারই নিকটবর্ত্তী সময় পাওয়া যায়, যেহেতু ৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে যোগতারা সমূহের প্রকৃত সংস্থানের সহিত সূর্য্যসিদ্ধান্তের লিখিত সংস্থানের তুলনা করিলে ৫৬ কলা

অধিক হয়। ইহা হইতে অয়নারম্ভ সময় কতকটা নির্ণয় হইতে পারে। ঐ সময় হইতে অথবা ৪৪২ বা ৪৪৪ শক হইতে (অন্যান্য গ্রন্থানুসারে) কিম্বা ভাস্করের মতের ৪৪৯ শক হইতে অয়নারম্ভ ধরা যাইতে পারে। ইহা হিন্দুধর্ম্মকর্ম্মে ব্যবহার না হইলেও, অধিকতর বিজ্ঞানসিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। তারিখ গণনার জন্য কাল্পনিক বর্ষমান স্থির রাখিয়াও প্রকৃত নাক্ষত্রিক বর্ষারম্ভ নির্দ্ধারণের জন্য দৃক্‌সিদ্ধ অয়নাংশ গ্রহণ করায় অন্তরায় নাই। পাশ্চাত্য ভূমিতে নক্ষত্রপুঞ্জ-খচিত রাশি হইতে বর্ত্তমান সায়নরাশির ২৮ অংশের পার্থক্য হওয়ায়, উহাই তাঁহাদের সঞ্চিত অয়নাংশ বলা যাইতে পারে। অতএব বম্বে-সভার এই উপদেশের ফলে গগণস্থিত যোগতারাগণের সংস্থান ইতিমধ্যেই ৩,২৬ অংশ পরিমাণে পার্থক্যতা লাভ করিয়াছে। ইহাকে দৃক্‌সিদ্ধ বলিলে সত্যের অপলাপ হয়, যেহেতু সংজ্ঞা পরিবর্ত্তন হইয়া যায়।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে বোম্বাই-সভা বলিয়াছেন—"ক্রান্তি বৃত্তস্থং নিরয়ণারম্ভস্থলময়নাংশানুগুণং নিশ্চলং চ স্বীকার্য্যং; তিথিপত্রে সায়ন নিরয়ণ সংক্রান্তি দ্বয়মপি প্রদর্শনীয়ং। অয়নারম্ভোতু প্রতাক্ষায়েব।" এতৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ জগদ্‌গুরু লিখিয়াছেন—ক্রান্তি বৃত্তস্থং নিরয়ণারম্ভস্থলময়নাংশানুগুণং নিশ্চলং চ স্বীকার্য্যমিত্যত্র রেবতীযোগতারামারম্ভ স্থানং প্রকল্প্য শোধনং কর্ত্তব্যমিতি সপ্তবিদুষাং মতং স্বহস্তাক্ষরবিন্যাস পংক্তি নিবেশিতং প্রতিভাতি, অবশিষ্টান্যেকত্রিংশত্যধিক শতবিদ্বন্মতান্যেকমত্যেন প্রকৃত প্রশ্নানুকূলানীতি বহুমতমেব প্রকৃতানুগুণ্যাগণ্যমাদরণীয়ন্তরমতঃ তদেবানুমন্যামহে অন্যসর্ব্বং যথাস্থিত মনাকুল মেতৎ।" আশুবাবু বলিয়াছেন—ক্রান্তিবৃত্তে আরম্ভস্থান অয়নাংশানুসারে সচল ও নিশ্চল দুইই স্বীকার করিতে হইবে ইহাই সভার মত। উভয়টী যুগপৎ স্বীকৃত হইলে গ্রহাদির রাশিনক্ষত্র সংক্রমণের কাল যে বিভিন্ন হইবে তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য এবং কোনটী অবলম্বনে হিন্দুগণ ধর্ম্মকর্ম্মাদি অনুষ্ঠান করিবেন ইহাই আদিম সমস্যা হইয়া পড়িবে। শ্রীমদ্‌ জগদ্‌গুরু প্রকৃত প্রস্তাবে নিশ্চল আদ্যবিন্দু সম্বন্ধে যুক্তির সারবত্তা আলোচনা না করিয়া, কেবল পণ্ডিতসংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া, প্রত্যাহার করায়, ইহা তাঁহার গবেষণাপ্রসূত মত বলা যাইতে পারে না। সভার মতে স্বাক্ষরকারীগণের মধ্যে "জ্যোতির্ব্বিদ্‌ বেনজী কল্যাণজীর 'প্রাচীন সিদ্ধান্তমতে সম্মতিঃ" 'আর্য্যাবর্ত্তীয় চিরন্তন সিদ্ধান্তানুসৃত পঞ্চাঙ্গানুরূপ' নির্ণয়ে সম্মতি মুধোলকরো পহব কট্টাপাভিধ শ্রীনিবাস শর্ম্মণঃ', 'সম্মতি সূর্য্যসিদ্ধান্তানুসারেণ শাস্ত্ররীত্যা নারায়ণাচার্য্য ঐলাপুরে বৃষ্টয়'। পক্ষান্তরে 'আংগ্ররীত্যমিশ্রপঞ্চাঙ্গ করণে সম্মতি বাপুদেবাচার্য্য বালাচার্য্য ঐলাপুরে, ইত্যস্তু;' 'বর্ত্তীনমতা প্রমাণে সায়ন পঞ্চাঙ্গকত্তকবুল এবং 'মাহেঁ' মত সায়ন পঞ্চাঙ্গ হেঁ চ সশাস্ত্র আহে অসেঁ আহে'ও দেখা যায়। অতএব বোম্বাই-সভা প্রাথমিক বিষয়েই পরস্পর বিরুদ্ধ মত দুইটী প্রকারান্তরে স্বীকার করায় নিঃসন্দেহ মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই বলিয়া নির্ভর যোগ্য নহে এবং এই নির্ণয় দ্বারা হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম শাসিত হইতে পারে না।

'দৃক্ প্রত্যয়ার্থং বেধোপলব্ধ নব্যসংস্কারা গ্রাহ্যা নবা" ৫ম প্রশ্নের উত্তরে বোম্বাইসভা বলিয়াছেন—'দৃক্‌প্রত্যয়ার্থং যাবন্তো বেধোপলব্ধ সংস্কারা যদাযদাবগুকা স্তাবন্তো বীজরূপেন গ্রাহ্যাঃ' প্রশ্নের ভাষায়, হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মোপলক্ষে এইসকল সংস্কার গ্রহণ করিতে সভা বলিয়াছিলেন নিশ্চয়রূপে স্থির করা যাইতে পারে না। বরং সভা উহা কেবল দৃক্ প্রত্যয়ের জন্যই ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়। হিন্দুসমাজ বিজ্ঞানের যাবতীয় আবিষ্কার ও উদ্ভাবনা গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মেতর কার্য্যে প্রয়োগ করেন, কিন্তু যখনই উহা ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যবহারের প্রস্তাব হয়, তখনই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং বোম্বাই সভা নূতন সংস্কারগুলি হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিলে পরীক্ষার বিষয় হইয়া পড়ে। তখনই প্রশ্ন হয় হিন্দুশাস্ত্রাদি প্রণয়ন সময়ে এই সকল সংস্কার গৃহীত হয় নাই কেন? ইহার উত্তরে সংস্কারপ্রয়াসীগণ বলিয়া থাকেন যে, তাৎকালিক শাস্ত্রকারগণ এই সকল সংস্কার অজ্ঞতাপ্রযুক্ত নির্ণয় করিতে পারেন নাই—অর্থাৎ তাঁহাদের বুদ্ধিতে কি বুদ্ধিপ্রসূত যন্ত্রাদিতে উহা ধৃত করিতে পারেন নাই বলিয়া অনুভূতি হয় নাই। হিন্দুর নিকট ইহা বাচালতা, যেহেতু উহা ধর্ম্মের মূলসূত্রের প্রতিকূল, কারণ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতাগণের সর্ব্বজ্ঞতাই মূল ভিত্তি। ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতা ব্যতীত তাঁহারা ভগবদ্‌প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতার এবং অলৌকিক যোগসিদ্ধ দৃষ্টির সহায়তায় ধর্ম্মকর্ম্মের কর্ত্তব্যতা স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নবাবিষ্কৃত যন্ত্রের প্রয়োজন ছিল বলিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয় এবং তাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ ভাবে জ্যোতিষ লিখেন নাই বলিলে কপটাচারী বলিয়া পাপার্জ্জন করিতে হয়। অতএব এই শ্রেণীর যুক্তিদ্বারা অভিনব সংস্কারগুলি ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যবহারের উপযোগী স্বীকার করা যাইতে পারে না। ধর্ম্মকর্ম্মের সহিত গ্রহসংস্থানের প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া নব্য সংস্কারগুলির একান্ত প্রয়োজনীয়তা দেখাইতে না পারিলে হিন্দুসমাজ চিরন্তন সাধুব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন কেন? বর্ত্তমান সময়ে বোম্বাই সভা উহা দেখাইতে অসমর্থ হওয়ায় নূতনসংস্কারগুলি গ্রহণ করিতে পারেন না।

ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তরে বোম্বাই সভা বলিয়াছেন 'তিথিমানং স্ফুটচন্দ্রার্কাভ্যাং সাধনীয়ং, তচ্চ স্থূলরীত্যা সূক্ষ্মরীত্যাচ করণগ্রন্থে প্রদর্শনীয়ং।' তিথির এই স্থূল ও সূক্ষ্মরীতির কোন সংজ্ঞা-প্রদত্ত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন স্থূল তিথি শব্দে ভাস্করের মধ্য তিথিই লক্ষ্য করিয়াছেন। মধ্য তিথি নিয়তই ৫৯ দ ৩,৭ পল বলিয়া, পঞ্জিকায় দেখাইয়া লাভ কি? অধিকন্তু স্ফুট-চন্দ্রার্ক হইতে তিথি সাধনের কথা থাকায়, মধ্য সূর্য্যচন্দ্র হইতে সাধিত তিথি কখনই লক্ষিত হইতে পারে না। অতএব স্থূলতিথি বলিতে কেবল মান্দ্যফল সংস্কৃত স্ফুটচন্দ্রার্ক হইতেই গণিত তিথিই বুঝিতে হইবে। ইহা ধর্ম্মকর্ম্মে হেমাদ্রি প্রভৃতির সমর্থিত বলিয়াই অধিকতর আদৃত। সূক্ষ্মতিথি বলিতে নব্যসংস্কার সঙ্কিত চন্দ্রসূর্য্যাবস্থান হইতে গণিত তিথি—দৃক্‌প্রত্যয়ের জন্য। কিন্তু ইহাপেক্ষাও সূর্য্যসিদ্ধান্তের স্ফুটতিথি আরও সূক্ষ্ম, যেহেতু চন্দ্রের মধ্যগ্রহণ স্ফুট পূর্ণিমার অন্তে হইবে লেখা আছে।

বোম্বাইসভার শেষ প্রশ্নের উত্তরে তর্ক নাই, যেহেতু 'উজ্জয়িনী গত রেখাকে' মধ্যরেখা বলিতে কাহারও আপত্তি নাই। আভিজিৎ ও নিরভিজিৎ এই দুই প্রকারে নক্ষত্র দেখাইতে কোন দোষ নাই, তবে উহাতে কার্য্য বাড়িয়া যায় মাত্র।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে দৃষ্ট হয় যে বোম্বাই-সভা একমাত্র পাশ্চাত্য সায়ন বর্ষমানের সহিত ঐক্য রাখার উদ্দেশ্যে অয়ন গণনায় সংস্কার ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে প্রকারান্তরে ও বিকল্পে সকলশ্রেণীর গণনাই স্বীকার করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই আশুবাবু সভার প্রথম তিনটী প্রশ্নোত্তর ব্যতীত অন্যগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। কিন্তু সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও অভিমতি নির্ণয় করিতে হইলে, ইহাই প্রধানতঃ দ্রষ্টব্য।

প্রথমতঃ আমরা দেখিয়াছি যে সূর্য্যসিদ্ধান্তের আক্ষিক বর্ষমানের সহিত দৃক্ প্রত্যয়ার্থে বেধোপলব্ধ যাবতীয় নব্যসংস্কার, সূক্ষ্মরীতিতে তিথিগণনা, অচল আদিবিন্দু ও বার্ষিক ৫৮ বিকলা অয়নগতি স্বীকার করিয়া প্রকাশ্যভাবে বাপুদেবীর পন্থা অনুসরণ করায় প্রাচীন সংস্কারপ্রিয় সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বোম্বাই সভার মত আদৃত হইয়াছে। আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, এই মতের গণনাকে প্রকৃত বিজ্ঞানসিদ্ধ অথবা হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত জ্ঞান করার অন্তরায় আছে। ইহাতে ভ্রমবৃদ্ধির আশঙ্কার সহিত বৃথা কল্পনার আধিক্য বিদ্যমান। সংস্কার এই পথে অগ্রসর হইতে পারে না এবং ইতিমধ্যেই আশুবাবু প্রভৃতি গূঢ় মন্তব্যের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়াছেন। অচিরেই ইহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখাইয়াছি যে সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত সংজ্ঞানুবর্ত্তী বর্ষমান অর্থাৎ পাশ্চাত্য সাই-বিরিয়াণ সৌরবর্ষমানের সহিত, দৃক্প্রত্যয়ার্থে বেধোপলব্ধ নব্য সংস্কার সমূহ, সূক্ষ্মরীতিতে তিথি গণনা, নিশ্চল আদিবিন্দু ও প্রকৃত বেধোপলব্ধ অয়নগতি স্বীকার করায় প্রকারান্তরে (চিত্রাপ্রারম্ভসহ) বেঙ্কটেশ কেতকার প্রভৃতির প্রস্তাব আবৃতভাবে বোম্বাই সভায় গৃহীত হওয়ায় নবীন সংস্কারকারীগণের অনুকূল হইয়াছে। প্রকৃত আদি বিন্দু নিঃসন্দেহরূপে নির্ণীত হওয়ায় কারণাভাবে ও নব্য সংস্কার বিদ্যমান থাকায়, হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যবহারের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। তবে বৈজ্ঞানিক হিসাবে ইহা বর্দ্ধনশীল ও সংজ্ঞাবিরুদ্ধ ভ্রমে কলুষিত নহে।

তৃতীয়তঃ আমরা দেখিতে পাই যে সূর্য্যসিদ্ধান্তের আক্ষিক বর্ষমানের সহিত, সিদ্ধান্তোক্ত বেধের অনুরোধ রাখিয়া দৃক্প্রত্যয়ার্থ ব্যতীত অন্যত্র নব্যসংস্কার গ্রহণের পরিষ্কার উক্তি না করায় এবং পরিশেষে স্থূলরীতিতে তিথিগণনা করিতে উপদেশ দেওয়ায় প্রচলিতানুরূপ গণনাই গূঢ়ভাবে বোম্বাই সভা বিকল্পে অনুমোদন করায় সংস্কার প্রতিকূলপক্ষের বিশেষ আপত্তির কারণ হয় নাই। অন্যান্য গ্রহগতিমান সিদ্ধান্তোক্ত মতের বেধদ্বারা সংস্কৃত হইতে বিলম্ব থাকায় এবং অয়ন সম্বন্ধে ভিন্নমত হইলেও হিন্দুগণনা অধিকাংশই নিরয়ণ হওয়ায় এখনও সমূহ প্রতি-বন্ধকতা উপনীত হয় নাই। কাজেই বোম্বাই সভার বিকল্প সমর্থনে প্রচলিত গণনা পরিত্যক্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে না।

উপরিলিখিত বিশ্লেষণ হইতে দৃষ্ট হইবে যে বোম্বাই সভার অভিমতিতে বিকল্প ও অনির্দ্দিষ্টভাব থাকায়, প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। এই কারণেই সম্মতিপত্রে সকল সম্প্রদায়েরই স্বাক্ষর সংযোজিত দৃষ্ট হইয়াছে। সূর্য্যসিদ্ধান্তের সংজ্ঞানুসারে বর্ত্তমানের বিকল্প উদ্দেশ্য না থাকিলে অয়নগতি ৫৮ বিকলা লিখার ন্যায় বর্ত্তমানের পর সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে কি বাধা ছিল। এবং নিশ্চল আরম্ভ বিন্দু স্বীকারেরই বা উদ্দেশ্য কি? প্রচলিত গণনা যদি প্রকারান্তরে অভিপ্রেত না হইত, তাহা হইলে সিদ্ধান্তোক্ত বোধের ও বিশেষ ভাবে দৃক্ প্রত্যয় জন্য নব্য সংস্কারের কথা এবং স্থূল রীতিতে তিথি গণনার বিষয় থাকিত না এবং পরিধি ও স্ফুট গণনায় প্রক্রিয়া সংস্কারের বিষয় উল্লেখ দৃষ্ট হইত। যে অয়নাংশ আজ (১৩২৩ সালে) আশুবাবু স্পর্দ্ধার সহিত সূক্ষ্মরূপে ২২।২৩ বলিয়া নির্ণয় করিলেন তাহা সভা ২২ হইতে ২৩ মধ্যে অনির্দ্দিষ্টভাবে রাখায় প্রকারান্তরে ভাস্করের অথবা চিত্রামূলক অয়নগ্রহণ করার উদ্দেশ্য কি গ্রহণ করা যায় না? আধুনিক দৃগগণিতৈক্যই যে হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মে গ্রহণ করিতে হইবে, তৎপক্ষে স্পষ্ট নির্দ্দেশই বা কোথায়? দৃকপ্রত্যয়ই যে সকলক্ষেত্রে বাধ্যকর তাহাই বা কোথায়? কমলাকরত বলিয়াছেন "গণিতং তদ্ধি দৃষ্টার্থং তথা প্রত্যক্ষতং কুরু। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে, বোম্বাই সভার নিগূঢ় উদ্দেশ্য বাপুদেবীয় লক্ষের সহিত ঐক্য বলিয়াই বোধ হয়, অর্থাৎ উভয়েই বশিষ্ঠের ন্যায় সায়ন মত প্রচলনের জন্য নিরয়ণমার্গের উপর প্রাথমিক আক্রমণ করিতেছেন মাত্র। ইহা নিরপেক্ষ সমালোচকের নিকট দিগ্‌দর্শন স্বরূপ হইতে পারে না। অতএব বোম্বাই-সভার মত বলিতে কোন একটী বিশেষ পন্থা অনন্যরূপে নির্দ্দিষ্ট না হওয়ায়, দিক্‌চিহ্নরূপে গ্রহণ করিলে "গন্ধর্ব্বপুরীর" দিকেই অগ্রসর হইতে হইবে।

শ্রীসাতকড়ি সিদ্ধান্ত জ্যোতির্ভূষণ।

অকিঞ্চনে।

(১)

সংসার-সাগর-কূলে
শুধু আপনার ভুলে
বসি বসি কেটে গেল—কি হবে উপায়?
কেহ নাই আপনার
হেরি বিশ্ব অন্ধকার
করুণায় অশরণে রাখ রাঙা পায়।

কি ব্যথা হৃদয়ে মোর
কেন ঝরে আঁখি-লোর
কে জানিবে—কে বুঝিবে নশ্বর ধরায়!
তাই ওহে রাজরাজ
জানাতে এসেছি আজ
তব শ্রীচরণতলে অনেক আশায় ;—
তুমি বিনে কে বুঝিবে—সুধাব কাহায়?

(২)

ব্যথা পেয়ে ব্যথাহারী
মুছিয়া নয়ন-বারি
শরণ লইনু পদে—আজি অবেলায়!
পূর্ণ কর মনোরথ
বলে দাও সোজা পথ
ব্যাকুল হয়েছি বড় মর্ম্মবেদনায়!
আঁধার ঘনায়ে আসে,
পরাণ কাঁপিছে ত্রাসে
এস এস কৃপাময়—তার করুণায়!
তুমি ত অন্তরযামী
কি কব অধিক আমি
সকলি ত জান প্রভু জ্বলি কি জ্বালায়।
অকিঞ্চনে পদছায়া দাও করুণায়।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ব্রহ্মচর্য্য।

স্থবিমল কররাজো রাজতে যস্য তেজো
দিনপতি বলয়স্থ শ্বেতচন্দ্রে মৃদুত্বং।
অনিল সলিলরাশি র্ভাতে যৎ প্রসাদাৎ
জয়তু জয়তু বিষ্ণুঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্ববেত্তা ॥

পবিত্র ভারত ভূমি চিরদিনই রত্নপ্রসূ। ইহার দিগন্তবিসারিণী রত্নপ্রভা অদ্যাপি সমস্ত জগৎকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে! এই স্থানই আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্র, ত্রিকালদর্শী ঋষিগণের বিচরণস্থল, সভ্যতা, নৈতিকতা, জ্ঞান, শিল্পকলা, বিলাসিতার প্রধান ক্ষেত্র। এই স্থানের মানবগণই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ভারত-সন্তানই একদিন কুশাস্ত্রনির্জ্জিতা বুদ্ধির বলে আধিব্যাধিপীড়িত মানবগণকে নবজীবন প্রদানের নিমিত্ত এক উপবেদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, জল স্থল বিমানসংযুক্ত চরাচর জগৎ ইঁহাদেরই বুদ্ধিবলে বশীভূত হইয়া আজ্ঞাবহের ন্যায় কার্য্য করিত। এখন সেই দিন স্মরণ করিতেও কষ্ট বোধ হয়। সেই সুখের দিন অতীত হইয়াছে, সেই বিস্ময়কর কার্য্য সকল পশ্চিমাচল গত দিনকর করের ন্যায় অদৃশ্য হইয়াছে।

"কেন এইরূপ হইল" এই প্রশ্নে আমরা তাহার একটী কারণ নির্দ্দেশ করি, শ্রবণ নয়নাদি ইন্দ্রিয়, কর চরণ প্রভৃতি অঙ্গ, বল বিনয় বাদন্যতা প্রমুখ গুণাবলী বর্ত্তমান থাকিলেও যাহা মানবের একমাত্র মানবত্ব প্রতিপাদক, যাহা সর্ব্বরোগরিপুর দণ্ডদাতা, সকল পাপতরুর কুঠার, নিখিল পুণ্যসরোবরের কমল, অনেক সাধুজন চকোরের পৌর্ণমাসী শশধর। অধিক কি বিবেকবান মনুষ্যগণ যাহার বলে চতুর্ব্বর্গকেও অনায়াসলভ্য মনে করেন। তাহা ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে, ব্রহ্মচর্য্যের এতাদৃশী শক্তি যে, জনগণ অপার-সংসার পরপারে অনায়াসে বিচরণ করিতে পারেন, উপনয়নের পর গুরুর নিকট অবস্থান করতঃ নিয়মাচার প্রতিপালন পূর্ব্বক সাঙ্গ বেদাধ্যয়নের নাম ব্রহ্মচর্য্য। মহাত্মা মনু বলেন সেবেতেমাংস্ত নিয়মান ব্রহ্মচারী গুরৌবসন্। সংনিয়ম্যেন্দ্রিয় গ্রামং তপোবৃদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ ॥" অর্থাৎ ব্রহ্মচারী স্বকীয় তপোবৃদ্ধির নিমিত্ত গুরুসমীপে বাস করিয়া ইন্দ্রিয় নিচয় সংযত করতঃ নিয়ম প্রতিপালন করিবে। (মনু নিয়ম গুলির উল্লেখ করিয়াছেন' বিস্তৃত ভাবে এখানে উল্লেখ করা হইল না,) বিষ্ণু পুরাণীয় নবমাধ্যায়ের তৃতীয়াংশেও ইহাই উক্ত হইয়াছে, বালঃ কৃতোপ-নয়নো বেদাহরণতৎপরঃ, গুরুগেহে বসেদ্ভূপ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ॥" এই ব্রহ্মচর্য্য দ্বিবিধ, গৃহস্থাশ্রম প্রবেশ পর্য্যন্ত এক প্রকার, মরণ পর্য্যন্ত অন্য প্রকার। কূর্ম্ম পুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে, "ব্রহ্মচার্য্যুপকুর্ব্বাণো নৈষ্ঠিকো ব্রহ্ম তৎপরঃ। যোঽধীত্য বিধিবদ্বেদং গৃহস্থাশ্রম-মাব্রজেৎ। উপকুর্ব্বাণকো জ্ঞেয়ো নৈষ্ঠিকো মরণান্তিকঃ ॥" এই বচন অনুসারে আদ্য অর্থাৎ

উপকুর্ব্বাণক ব্রহ্মচারী গৃহস্থাশ্রম প্রবেশ পর্য্যন্ত যথোক্ত মনুবিহিত নিয়ম প্রতিপালন করিয়া সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিবে এবং শেষোক্ত অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিবে।

বাল্যকালই শিক্ষার অত্যুৎকৃষ্ট সময়। জলতরলকৃত ভূমিখণ্ডে উপ্ত বীজের ন্যায়, বালকহৃদয়ে নিহিত শিক্ষাবীজ কালান্তরে শাখাপ্রশাখা সমন্বিত, ফলপত্র সমাযুক্ত বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। সুধীজন সেই বৃক্ষসকলের অমৃতময় ফলাস্বাদনপূর্ব্বক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সম্মোহলাভ করেন। ব্রহ্মচর্য্যও যথাকালে অভ্যস্ত হইলে সুফলপ্রদ হইয়া থাকে।

আমাদের এই দেহ পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চমহাভূতে সৃষ্ট। ব্রহ্মচর্য্য ইহার প্রধান সামগ্রী, ইহা সকল রোগনাশ করিয়া শরীরের সুখোৎপাদন করে। আরোগ্যই জ্ঞানবিজ্ঞানার্জ্জনের সুগম পথ, ধনধান্য ধরালাভের মূল কারণ, কীর্ত্তিলাভের প্রধান উপায়, জনগণ মনোরথের কল্পতরু, অমরালয় গমনের সোপান, ধর্ম্মকর্ম্মের মর্ম্মস্থান, জরামরণাদির অর্গল-স্বরূপ। এইজন্যই পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্"। দেহ অনুপযুক্ত হইলে কষ্টসাধ্য ধর্ম্মার্থ কাম কিরূপে লব্ধ হইবে। বাণীবরপুত্র মহাকবি কালিদাসও বলিয়াছেন—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"। শরীরাধানের প্রধান হেতুই "শুক্র" এবং ব্রহ্মচর্য্যই শুক্রের মূল। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটী ধাতুর মধ্যে শুক্রই শ্রেষ্ঠ। কারণ শুক্রই সর্ব্বাপেক্ষা সারবান এবং জীবজনক। জীবগণ ভোজন করিলে, তাহাদের ভুক্তপদার্থ হইতে প্রথমে রস উৎপন্ন হয়, ঐ রস ক্রমে ক্রমে রক্ত মাংসাদিতে পরিণত হইয়া সর্ব্বশেষে প্রায় একমাস পরে শুক্রের আকার ধারণ করে। সুতরাং প্রতিদিনের ভুক্তপদার্থের সারাংশ প্রায় ৩০ দিন পরে প্রকৃত কার্য্যকারক হয়। মহর্ষি চরক তদীয় সংহিতায় চিকিৎসা স্থানে এই কথাই বলিয়াছেন।

"সপ্তভির্দেহ ধাতারো ধাতবো দ্বিবিধং পুনঃ।
যথাস্বমগ্নিভিঃ পাকং যান্তি কিট্টপ্রসাদতঃ॥
রসাৎ রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদস্ততোঽস্থি চ।
অস্থ্নো মজ্জা ততঃ শুক্রং শুক্রাদগর্ভঃ প্রসাদজঃ॥

এই পদার্থ মনুষ্যগণের সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া অবস্থান করে, ইহার বিন্দুমাত্রেরও ক্ষয় হইলে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধাতু যতক্ষণ না পরিপুষ্ট হয় ততক্ষণ ইহার পূরণ হইতে পারে না। যে সকল অজিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচর্য্যভ্রষ্ট হইয়া পরম সারসার শুক্রকে নষ্ট করে, তাহারা চিররুগ্ন হইয়া ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ সুখ শান্তির মূলে কুঠারাঘাত করে। "ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ" এই সূত্রের অর্থ এই যে, কেবল সাঙ্গবেদ পাঠই ব্রহ্মচর্য্য নহে, প্রত্যুত: স্মরণ কীর্ত্তনাদি অষ্টাঙ্গ মৈথুন হইতেও একেবারে নিবৃত্ত হইতে হইবে। "শুক্রাদগর্ভঃ প্রসাদজঃ" এই পূর্ব্বোক্ত চরক-বচনানুসারে এবং "সৌম্যং শুক্রমার্ত্তবমাগ্নেয় মিতরেক্ষমপ্যত্র ভূতানাং অন্যাগুনা বিশেষণ

পরস্পরোপকারাৎ পরস্পরানুগ্রহাৎ পরস্পরানুপ্রবেশাচ্চ" ইত্যাদি সুশ্রুত বচনানুসারেও সোমগুণ বহুল শুক্রই গর্ভমূল বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, আবার শুক্র ব্রহ্মচর্যামূল। ইহার উৎকর্ষাপকর্ষ হেতু গর্ভস্থ সন্তানও উৎকৃষ্ট অথবা অপকৃষ্ট হইয়া থাকে। চিররোগপীড়িত জনক-জননীর সন্তানকে প্রায়ই উৎকট ব্যাধিপীড়িত হইতে দেখা যায়, পিতামাতার যে রোগ থাকে, সন্তানেও তাহাই সংক্রামিত হয়। অর্শ মেহাদি রোগযুক্ত দম্পতীর তনয়গণ ঐ সব অসাধ্য কুলজ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সর্ব্বদা অতি দুঃখে কালযাপন করে। মহামতি মাধবকর বলিয়াছেন—"যে চাপি কেচিৎ কুলজা বিকারা ভবন্তি তাংশ্চ প্রবদন্ত্যসাধ্যান্" এইহেতু পুরুষগণ শুক্রের উৎকর্ষার্থ গর্ভাধানকালের পূর্ব্বেই সংযতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বী হইবেন। "শুক্রবাহুল্যাৎ পুমান্ আর্ত্তব বাহুল্যাৎ স্ত্রী সাম্যাদুভয়োর্ণপুংসকম" মহর্ষি সুশ্রুতের এই বচনানুসারে শুক্রের ন্যূনতা, আধিক্য এবং সাম্য দ্বারা যথাক্রমে স্ত্রী, পুরুষ এবং ক্লীব সন্তানের উৎপত্তি হয়। এই হেতু উৎকৃষ্ট পুত্র লাভেচ্ছু পুরুষগণ পত্নী অপেক্ষা স্ব শুক্রের আধি.ক্যর নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন করিবেন। বলিষ্ঠ এবং রোগশূন্য পুত্রলাভ করিতে হইলে কেবল যে পুরুষকেই সংযত হইতে হইবে তাহা নহে, অঙ্গনাগণের ও সংযম করা কর্ত্তব্য। অবিশোধিতার্ত্ত বা নারীতে বলবত্তর নিষিক্ত শুক্র ও অল্পায়ু ও ব্যাধিপীড়িত সন্তানের উৎপাদন করে। এজন্য তাহারাও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে। মহর্ষি সুশ্রুত শারীর স্থানে বলিয়াছেন—"দর্ভসংস্তরশায়িনীং করতল শরাব পর্ণান্যতম ভোজিনীংহবিষ্যং ত্র্যহঞ্চ ভর্ত্তুঃ সংরক্ষেৎ," এই বচনানুসারে নারীগণ গর্ভাধান কালের পূর্ব্বে কুশাসন শয়ন, হবিষ্যান্ন ভোজনাদি ব্রহ্মচর্যের অবিরোধী সমস্ত কার্য্য করিবে। এমন কি নিজ স্বামীমুখ দর্শনও পরিত্যাগ করিবে। এইরূপে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠিত হইলে জীবগণের মঙ্গল এবং তাহাতে জগতের মঙ্গল হইবে।

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মচারিগণ নিম্নলিখিতরূপে নিয়ম প্রতিপালন করিতেন, কিন্তু অধুনা ঐ নিয়মগুলি সম্যক্ প্রতিপালন করা সম্ভবপর নহে, অতএব সমাজ, সময় এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর যথাসম্ভব লক্ষ্য করিয়া সংযত হওয়া উচিত, ত্রিকালদর্শী ভগবান মনু বলিয়াছেন।

ব্রহ্মচারী প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে স্নান করিয়া অমল ধবলবাস যুগল পরিধান করিবে, তৎপরে স্ব স্ব উপাস্যদেবতা এবং পিতৃপুরুষগণের অর্চ্চনা করিবে, মধুমাংস গন্ধ প্রভৃতি উত্তেজক দ্রব্য সকল পরিত্যাগ করিবে। স্বাদু অম্ল লবণাদি রস সমস্ত গ্রহণ করিবে না। কামাগ্নির উদ্দীপন পবনীভূত বিকসিত কমলপুঞ্জের ন্যায় কামিনী মুখবৃন্দ দর্শন করিবে না। তৈলাভ্যঙ্গ অঞ্জনধারণ, নয়ন রঞ্জন এবং ছত্রগ্রহণাদি বিলাসকার্য্য পরিত্যাগ করিবে। কামক্রোধাদি রিপুগণকে বশীভূত করা কর্ত্তব্য। কাম বা অকাল প্রযুক্ত রেতঃ স্খলনে ব্রতভঙ্গ হয়। অনাত্মীয়গণের নিকট হইতে উপলব্ধ ভিক্ষান্নদ্বারা একবারমাত্র ভোজন করিবে। গুরু অনুমতি করুন অথবা না করুন সর্ব্বথা তাঁহার মঙ্গলের নিমিত্ত যত্নবান হইবে। গুরুকে দর্শন করিলেই কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে। তিনি অনুমতি করিলে উপবেশন করিবে। রমনীগণই পুরুষদোষ জননী, এইজন্য সুধীগণ তদ্বিষয়ে সাবধান হইবেন। বিদ্বানই

হউন অথবা অবিদ্বানই হউন, দেহধর্ম্ম বশতঃ সকলে অনায়াসেই স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক বশীভূত হন, সুতরাং ব্রহ্মচারী সর্ব্বদা স্ত্রীলোক হইতে পৃথক অবস্থান করিবে; (প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে বিস্তৃতভাবে লিখিত হইল না।)

ব্যাস বাল্মিকী প্রভৃতি ঋষিগণ ব্রহ্মচর্য্যের আচরণ করিয়া তাহারই বলে সর্ব্বশাস্ত্র পারগামিত্ব এবং সর্ব্বদর্শিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, অতি কঠোর তপস্বী বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া রম্ভা স্তম্ভনাদি অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন, বীরকেশরী অর্জ্জুন ব্রহ্মচার্য্য বলেই অভিসারণের নিমিত্ত স্বয়ং আগতা অনিন্দরূপ লাবণ্য পরিভূষিতা উর্ব্বশীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন এবং দুর্য্যোধন পক্ষীয় বীরপুঙ্গবগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া ধরাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিদেহাধিপতি জনক ধন ধান্যাদি অতুল বিভবের বিভু হইয়াও ব্রহ্মচর্য্য পালন করতঃ মুনিজন সম্মতঃ রাজর্ষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অধিক কি মানবগণ পূর্ব্বে যে অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য করিয়াগিয়াছেন ব্রহ্মচর্য্যই তাহাদের সকলের মূল, অগস্ত্যের সমুদ্র শোষণ, জহ্নুর গণ্ডুষে গঙ্গাপান, কপিলের দৃকপাতমাত্রে ষষ্টিসহস্র সগর তনয় নাশ ইত্যাদি কার্য্য সমুদয় আমাদের চিত্তে বিস্ময় উৎপাদন করে, এখন সেই সকল অতি দূরগত হইয়াছে, সেই যুগের সহিত বর্ত্তমান যুগের সুমহৎ পার্থক্য ঘটিয়াছে।

এখন ঐ ব্রহ্মচর্য্য হীন দেশে সকলেই অধঃপতীত হইয়াছে, নানাকারণে আমাদের সৎপ্রকৃতি অত্যন্ত কৃশতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ধর্ম্মহীন শিক্ষাদোষে অস্মদ্দেশীয় উচ্ছৃঙ্খল বালকগণ বৈদেশিক জাতির শিক্ষা, দীক্ষা, রীতি নীতি সদসৎ বিচার না করিয়াই অনুকরণ করে। সামান্য শিক্ষালাভ করিয়াই আপনাদিগকে উচ্চ শিক্ষিত বলিয়া মনে করে, গুরুজনের উপদেশকে অবজ্ঞা করতঃ ইচ্ছানুসারে বিচরণ করে, কোথায় ইহাদের অধ্যয়ন তপস্যা, কোথায় সেই অদম্যোৎসাহ আর কোথায় বা ব্রহ্মচর্য্য। অপরিণাম দর্শিতা হেতু কোন দুষ্ক্রিয়াকেই দুক্রিয়া বলিয়া মনে করেনা, ইহাতেই অধুনাতন সমাজের এতাদৃশ অধঃপতন উপস্থিত হইয়াছে। কিছুদিন এইরূপভাবে চলিলে সনাতন ধর্ম্মের সহিত আর্য্যবংশ নির্ম্মূল হইবে।

কবে আমাদের সেই দিন পুনরায় আগমন করিবে, যখন এই ভারত পূর্ব্ববৎ নিরন্তরোচ্চারিত বেদধ্বনি দ্বারা পূর্ণ হইয়া নিখিল জগতে অমরতা প্রাপ্ত হইবে। কবে ভারতীয় যুবকগণ ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করতঃ আয়ুর্ব্বল বিনয়াদি লাভ করিয়া পূর্ব্বতেজ প্রাপ্ত হইবে। ভগবান্! আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা ঐহিক কর্ত্তব্য কার্য্য যথানিয়মে সম্পন্ন করিয়া ভববন্ধন হইতে পরিত্রাণলাভ করতঃ পরিণামে আপনার চরণার বিন্দ লাভ করিতে পারি।

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গার্হস্থ্যাশ্রম।

আশ্রমান্তর কেন ? তুলনায় সমালোচনা।

শাস্ত্রালোচনায় বুঝিতে পারি, ভগবানের প্রিয়কার্য্য সাধন করাই পরম ধর্ম্ম। আর গার্হস্থ্যাশ্রমই এই পরমধর্ম্মের ভিত্তি। গার্হস্থ্যাশ্রমই জগৎকে রক্ষা করেন, পোষণ করেন। বিশেষতঃ গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ জগতের সৃষ্টি সংরক্ষণ, সংবর্দ্ধন, সমাজের শৃঙ্খলা ও চরমোৎকর্ষ সাধন করিয়া আত্মোন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ। এই গার্হস্থ্যাশ্রম হইতেই ব্রাহ্মণগণের নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করা সুদুর্ল্লভ নহে।

গৃহস্থই বেদময়ী ধেনুরূপে সকলের আধারভূত হইয়া রহিয়াছে। অখিলব্রহ্মাণ্ড এই ধেনুতেই প্রতিষ্ঠিত এবং এই ধেনুই ব্রহ্মাণ্ডের কারণ। ঋগ্বেদ ঐ ধেনুর পৃষ্ঠ, যজুর্ব্বেদ মধ্য, সামবেদ মুখ ও গ্রীবা। ইষ্টাপূর্ত্ত উহার শৃঙ্গ, সাধু সূক্ত, রোম, শান্তি ও পুষ্টিকর্ম্ম উহার মলমূত্র, এবং বর্ণ ও আশ্রমই ঐ ধেনুর প্রতিষ্ঠা, এই ধেনুর ক্ষয় নাই। সমস্ত বিশ্ব উহাকে অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন ধারণ করিলেও উহার অপচয় হইবার আশঙ্কা নাই।

গৃহিগণ অখিল জীবকুলের পোষণ করেন এবং সেই পুণ্যফলে বাঞ্ছিত লোকসকল লাভ করেন। পিতৃগণ, ঋষিগণ, সুরগণ, ভূতগণ, নরগণ, কৃমি, কীট, পতঙ্গগণ, পশু পক্ষী ও অসুরগণ সকলেই গৃহস্থাশ্রমীকে অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে এবং তৎসহকারে ইহাদের তৃপ্তি বিধান হয়।

লোকা বিশোকা বিরজা।
যান্ন কেবলিনো বিদুঃ॥

গার্হস্থ্যধর্ম্ম সর্ব্ব সুখের আকর। এই আশ্রমে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, পুত্র, সুখ, যশঃ, মুক্তি এবং বিশোক ও নির্ম্মল লোক দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

পিতৃ দেবর্ষি মর্ত্ত্যানাং ভূতানামাত্মনশ্চহ।
ক্ষেমং বদন্তি শরণং ভবেঽস্মিন্ যদ্‌গৃহাশ্রমঃ॥

পিতৃ, ঋষি, দেব, মানব, ভূত এবং নিজেরও, পরমকল্যাণ কর স্থান একমাত্র গৃহস্থাশ্রম। ইহ-সংসারে জীবগণের এমন পবিত্র কল্যাণকর স্থান আর নাই।

বেদ ও স্মৃতির বিধান ক্রমে মন্বাদি গৃহস্থাশ্রমীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি যাবদীয় নদ-নদী যেরূপ সাগরে যাইয়া অবস্থান করে, তদ্রূপ অন্যান্য আশ্রমবাসিগণ গৃহস্থাশ্রমের সাহায্যে অবস্থিতি করেন। গৃহস্থগণ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতি ইহাদিগকে ভিক্ষাদানাদি দ্বারা পোষণ করিয়া থাকেন। গৃহস্থগণ বিশেষতঃ গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি করিয়া যথাবিধানে ধর্ম্ম লক্ষণ সর্ব্বতোভাবে পরিজ্ঞাত থাকিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্মাদিতে রত থাকিতে পান। ধৃতি, সন্তোষ, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, সত্য এবং অক্রোধ,

এই দশবিধ ধর্ম্মে অভিজ্ঞান লাভ করিয়া যথাবিধানে পালন করিতে পান। সুতরাং তাঁহারা ব্রহ্ম-জ্ঞানের উৎকর্ষ জন্য মোক্ষরূপ পরমগতি লাভ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ সংযত মনে আত্মজ্ঞান সহকারে এই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া বেদান্তশাস্ত্র অবগত হইবেন এবং পিতৃঋণ, দেবঋণ এবং ঋষিঋণ হইতে মুক্তি জন্য অনুষ্ঠানিক কার্য্যাদির পালন করিবেন।

জ্ঞানের সহকারী কারণ বলিয়াই হউক অথবা গৃহস্থাশ্রমীর করণীয় বলিয়াই হউক বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণের পক্ষে শ্রুতি স্মৃতির সাধারণ নির্দ্দেশ। গর্ভাধান হইতে পঞ্চত্বগমন পর্য্যন্ত বৈদিক-সংস্কারে সংস্কৃত হইতে পারিলে ফলোৎপত্তি হয়। সংস্কার বলে অনুষ্ঠাতার চিত্ত মনঃ নির্ম্মল ও পরিমার্জ্জিত হইয়া বিশুদ্ধ সত্ব হয়। গৃহীদিগের সংস্কার মহাযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ। সোমযজ্ঞ, হবির্যজ্ঞ, পাকযজ্ঞ, বেদ-সংহিতাধ্যয়ন, প্রায়ণকর্ম্ম, জপ, উৎক্রমণ, দৈহিককর্ম্ম, ভস্মসমূহন, অস্থিসঞ্চয়ন ও শ্রাদ্ধ। গৃহী, ব্রাহ্মণ এই সকল সংস্কারে সংস্কৃত হইলে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। সুতরাং পাপাচরণ জনিত দুর্ব্বিসহ অনুতাপ বৃশ্চিকের তীব্র দংশনের যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইবার জন্য সুস্থ শরীরে সময় বিভাগে বৈদিক ধর্ম্মাচরণ করা সমীচীন।

ভোগ-ভূমিঃ স্মৃতঃ স্বর্গঃ কর্ম্মভূমিরিয়ং মতা।
ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম স্বর্গে তদুপভুজ্যতে।
যাবৎ সুস্থশরীরস্তং তাবদ্ধর্ম্মং সমাচর॥

(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরঃ)

গৃহীদিগের অতিথি-সেবার এবং সত্যের সেবার পূর্ণ অধিকার। এই সেবাদ্বারা পরম তপস্যা লাভ হয়।

যথা ভর্ত্তা প্রভুঃ স্ত্রীণাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণোযথা।
অতিথিস্তদ্বদেবাস্য গৃহস্থস্য প্রভুঃস্মৃতঃ॥

স্ত্রীর যেমন স্বামী প্রভু, বর্ণের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ প্রভু, গৃহস্থের সম্বন্ধে অতিথি তদনুরূপ প্রভু।

অতিথিঃ পূজিতো যেন পূজিতাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
অতিথির্যস্য সন্তুষ্টঃ তস্য তুষ্টঃ স্বয়ং হরিঃ॥

পরন্তু—

স্নানেন সর্ব্বতীর্থানাং সর্ব্বদানেন যৎফলং।
সর্ব্বব্রতোপবাসাভ্যাং সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষয়া॥
সর্ব্বতপোভির্ব্বিবিধৈঃ নিত্যৈর্নৈমিত্তিকাদিভিঃ।
তদেবাতিথি-সেবায়াঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥

এতদব্যতীত গৃহিগণের সত্যের সেবার পর আর ধর্ম্ম নাই। "সত্যাৎ পরতরো নহি" এই মহাবাক্য সস্নেহে সাদরে পালন করিবার গৃহিগণেরই পূর্ণ অধিকার ও সুযোগ।

নহি সত্যাৎ পরোধর্ম্মো ন পাপ মনৃতাৎ পরং ।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ ॥

সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, মিথ্যা হইতে প্রবল পাপ আর নাই ।

সত্যনিষ্ঠ গৃহী সর্ব্বজয়ী হইয়া অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন এবং অসাধ্য সাধন করিতে পারেন । সত্যই তপ সত্যই ব্রহ্ম ।

সত্য-রূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ ।
সত্য মূলা ক্রিয়া-সর্ব্বা সত্যাৎ পরতরো নহি ॥

দুর্দ্দমনীয় সংসার ভিত্তির একমাত্র ব্রহ্ম অস্ত্র—সত্য । সত্যেই বেদ সত্যের সেবা বেদের সেবা ।

বেদাভ্যাসস্তপোজ্ঞান মিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযমঃ ।
অহিংসা গুরুসেবা চ নিঃশ্রেয়সকরং পরং ।

(মনু ১২।৮৩)

উপনিষদ্ প্রভৃতি বেদাভ্যাস এবং প্রাজাপত্যাদি তপস্যা এবং ব্রহ্মজ্ঞান, ইন্দ্রিয় সংযম, হিংসা ত্যাগ, ও গুরুবর্গের শুশ্রূষা এই সকল কর্ম্মে মোক্ষ সাধন হয় । বিশেষতঃ উপনিষদে যে আত্মজ্ঞান উক্ত হইয়াছে, ইহা লাভ করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম । উহা হইতে সাক্ষাৎ মোক্ষলাভ হয় । পরমাত্মজ্ঞান দ্বারা ইহলোকে এবং পরলোকে অতিশয় শ্রেয়ঃসাধন হয় এবং পরমাত্মজ্ঞান উপাসনাতেই বেদাভ্যাসাদি তাবৎ কর্ম্ম অন্তর্ভূত ; কারণ বেদাভ্যাসাদি আত্মজ্ঞানের অঙ্গ । বৈদিককর্ম্ম জ্যোতিষ্টোমাদি এবং প্রতীকোপাসনা ইহা নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে সূর্য্যাদি সুখপ্রাপ্তির কারক সংসারপ্রবৃত্তির হেতু, এইজন্য ঐ কর্ম্ম প্রবৃত্তি-কর্ম্ম । এবং উক্ত কর্ম্ম ভগবদর্থে অনুষ্ঠিত হইলে তাহা এবং মোক্ষনিমিত্ত যে কার্য্যাদি সংসার নিবৃত্তির হেতু উহাও নিবৃত্তিকর্ম্ম । ইহাই বৈদিক দ্বিবিধ কর্ম্ম । ইহলোকে কাম্যফল সাধন এবং পরলোকে স্বর্গাদির সাধন প্রবৃত্তি কর্ম্ম এবং দৃষ্টাদৃষ্ট কামনা রহিত ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাস পূর্ব্বক যে কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, তাহা সংসার-নিবৃত্তির হেতু, এইজন্য ইহাই নিবৃত্তিকর্ম্ম । বৈদিক প্রবৃত্তিকর্ম্মের অভ্যাসে গৃহীব্রাহ্মণগণের দেবতা সদৃশ গতিলাভ হয় এবং নিবৃত্তি কর্ম্মাভ্যাসে শরীরাত্মক পঞ্চভূতকে অতিক্রম করে অর্থাৎ মোক্ষ হয় । উপনিষদের অভিজ্ঞানে স্থাবর জঙ্গমাদি সর্ব্বভূতে পরমাত্মা স্বরূপে আমিই আছি এবং আমিই পরমাত্মা, আমাতে সর্ব্বভূতের অবস্থিতি, এইরূপ জ্ঞানে যিনি জ্ঞানী, তিনিই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন । এই আত্মজ্ঞান গৃহী ব্রাহ্মণগণের জন্মের সাফল্য সম্পাদক । গৃহী ব্রাহ্মণ ইহা পাইয়া কৃতকার্য্য হন । তাঁহাদের আর অন্য কার্য্যের আবশ্যকতা থাকে না । এই জ্ঞানের প্রদাতাই বেদ । বেদ ব্যতীত অন্যোপায়ে এই জ্ঞানলাভের উপায় নাই । অগ্নিকার্য্য, অতিথিসেবা পিতামাতা ও আচার্য্য প্রভৃতি গুরুসেবা, দান, সত্যপালন, বৈদিক কার্য্য, যজ্ঞ ও দেবার্চ্চনা গৃহস্থের ধর্ম্ম । গৃহস্থ দ্বিবিধ—উদাসীন এবং সাধক । যে গৃহী কুটুম্বগণের ভরণপোষণ করেন—তিনিই

সাধক। আর যিনি পিতৃঋণ, ঋষিঋণ এবং দেবঋণ হইতে মুক্ত হইয়া যথাকালে পত্নী ও ধনাদি ও সংসার পরিত্যাগে নির্জ্জনবাসে ধর্ম্মাচরণ করেন—তিনিই উদাসীন গৃহী।

গৃহস্থানাং স্মৃতোধর্ম্ম উত্তমানাং বিচক্ষণৈঃ।
ইষ্টাপূর্ত্তে স্বশক্ত্যা হি কুর্ব্বতাং নাস্তি পাতকম্॥

গৃহস্থগণ কলিকালে স্মৃতিকথিত ধর্ম্মের অনুসরণ করিবে এবং স্বীয় শক্তি অনুসারে ইষ্টা-পূর্ত্তাদি মনে করিবে। এমন যে সর্ব্বমঙ্গলের আকর—ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের নিকেতন—সর্ব্বসুখ শান্তির আলয় গার্হস্থ্যাশ্রম, যে আশ্রমে অবিস্থিতি করিলে ভগবানের তুষ্টিসাধন হয়—ভগবানের অভিপ্রায় পালন করা হয়, তবে কেন আর্য্য-শাস্ত্রসম্মত গার্হস্থ্যাশ্রম উপেক্ষা করিয়া আশ্রমান্তর গ্রহণের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং কেনই বা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ও সংসার বৈরাগ্যাদিতে তাহার বিরোধ দৃষ্ট হয় এবং ইহার তাৎপর্য্যই বা কি?

ভগবান কোন্ সময় হইতে এই বিশ্ব রচনা কার্য্যে প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিলেন, তাহার নির্ণয় অদ্যাপি হয় নাই। শাস্ত্রকর্ত্তা এতদ্বিষয়ে বহুতর্ক, বহু সমালোচনা, বাদানুবাদ করিয়া এই বিশ্বের অনাদিত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড রচনা-প্রবাহ যে কতকাল ব্যাপিয়া থাকিবে, সমষ্টিতে মহাপ্রলয় যে কোনকালে উপস্থিত হইবে, তাহার মীমাংসাও হয় নাই। শাস্ত্রকর্ত্তা অবশেষে বিভু দেখিয়া, "মহাপ্রলয় এব মনোভাবাৎ" মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ফলতঃ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াত্মক সংসার প্রবাহের যে আদি নাই এবং অন্ত নাই, এই সিদ্ধান্তই চরমসিদ্ধান্ত হইয়া রহিয়াছে। আমরা সেই অনাদিকালের জীব; নিশ্চেষ্ট থাকিলে, সেই অনন্তকাল পর্য্যন্তই আমাদিগকে থাকিতে হইবে, এবং সংসারচক্রের সঙ্গে সঙ্গে সেই অনন্তকাল পর্য্যন্ত সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অনুবর্ত্তনে ঘূর্ণায়মান হইয়া মুহুর্মুহুঃ ক্লেশানুভব করিতে হইবে। সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান কৌতূহলছলে আমাদের সংসারখেলা দেখিবার অভিপ্রায়ে এই বিশ্বরচনা করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। কিন্তু আমাদিগকে বারম্বার যাতায়াত জন্য দুর্ব্বিসহ যাতনায় প্রপীড়িত হইয়া ও পথশ্রান্ত হইয়া অবসন্ন হইতে হয়। আমাদিগের এই বারম্বার যাতায়াতের এবং এই ভবরোগের তথ্যানুসন্ধান এবং প্রতিকারের প্রতিবিধানের অবশ্য কর্ত্তব্য। সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বর যখন আমাদিগকে ক্রীড়ামৃগের ন্যায় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়-পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া কৌতুক দর্শনে সুখী হইতেছেন, তখন আমাদেরও সেই পিঞ্জর হইতে বিমুক্ত হইয়া তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূল কার্য্য, তাঁহার কৌতুকভঙ্গ করিবার কার্য্য বা চেষ্টা করা সমীচীন নহে। এইরূপ এইকার্য্য অসমীচীন হইলে, মুক্তি কামনা দোষের হয়—মুক্তি কামনা ছাড়িতে হয় ইহা ভ্রান্তি। নিত্য শুদ্ধ পরমেশ্বরের সামান্য পুরুষের ন্যায় কোন ক্রীড়া করিবার ইচ্ছা নাই এবং জন্ম, জরা, মৃত্যু জনিত ক্লেশানুভবে সামান্য বৈষয়িক সুখে ব্যাসক্ত থাকিয়া ক্ষণকালের নিমিত্তও আমরা ব্রহ্মানন্দ হইতে বঞ্চিত থাকি, এরূপ তাঁহার ইচ্ছা নহে। আমাদের প্রাক্তন কর্ম্ম জনিত অদৃষ্টানুসারেই পরমেশ্বরের অলঙ্ঘ্য নিয়মানুযায়ী সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্য হইতেছে

কাহার গর্ভবাস, কাহার জন্মজরা কাহার ক্লেশ মৃত্যু হউক, ভগবানের এরূপ ইচ্ছা কদাচ হয় না। জীবগণ স্বীয় স্বীয় অদৃষ্টানুসারেই জন্ম জরা ক্লেশ মরণাদি ভোগ করিয়া থাকে, তবে ঐ অদৃষ্টানুশাসন বিষয়ে ভগবানের অলঙ্ঘ্য নিয়ম আছে, এইমাত্র বিশেষ। সমস্ত প্রাণীই ভয়ঙ্কর সংসার-সাগর-তরঙ্গ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া উপাদেয় ব্রহ্মানন্দতীরে অবস্থান করিয়া চিরদিনের নিমিত্ত শান্তি সুখ অনুভব করে; তুচ্ছবিষয়ানন্দোপভোগে প্রতারিত হইয়া নিত্য ব্রহ্মানন্দোপভোগ হইতে ক্ষণকালের নিমিত্ত ও বঞ্চিত না হয়, দয়াময় পরম পিতা পরমেশ্বরের এই ইচ্ছাই নিত্য ইচ্ছা। "ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য, গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ" এবং "জায়মানোহবৈ ব্রহ্মণ স্ত্রিভি র্ঋণৈ র্ঋণবান্ জায়তে যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ সাধ্যায়েন ঋষিভ্যঃ এষবা অনৃনীয়ঃ পুত্রীয়শ্চাব্রহ্মচারীচ। অপিচ ঋণানি ত্রীণ্যাপাকৃত্য মনোমোক্ষে নিবেশয়েৎ। অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ। ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতিতে যে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক এই আশ্রম চতুষ্টয়ের ক্রমিকানুষ্ঠান করার বিধান আছে, তাহা উৎকট রাগবৎ পুরুষগণের চিত্ত ব্রহ্মেতে ক্রমশঃ অবনত করিবার নিমিত্ত মাত্র। নরগণ অদৃষ্টবশতঃ দেহবদ্ধ হইলে, যদি জন্মান্তরীণ যোগাভ্যাস এবং বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম্মজনিত ব্রহ্মবিষয়ক দৃঢ় সংস্কার না থাকে, তাহা হইলে দেহস্বভাববশতঃ তাহাদের চিত্ত বিষয়সুখে নিতান্ত আকৃষ্ট হইয়া পশুবৎ হয়। ঐ সকল নরগণকে একবারেই বৈষয়িক সমুদয় সুখ পরিহারে বৈরাগ্য গ্রহণের উপদেশ প্রদত্ত হইলে তাহাতে সুফল না হইয়া বিপরীত ফলই হয়। শাস্ত্রকর্ত্তা তাহা বুঝিয়াই একবারে সংসার পরিত্যাগে উপদেশ না দিয়া ক্রমিক পরিত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন। শাস্ত্রকর্ত্তা বুঝিতেন যে ব্রাহ্মণ-বালকের শৈশবে ইন্দ্রিয় বাসনাদির অনুৎপাদন অবস্থায় উহাদের চিত্ত স্বচ্ছ এবং কোমল থাকে, ঐ সময়ে ঐ অবস্থায় ঐ নির্ম্মলচিত্তে ব্রহ্মজ্ঞানবীজরোপণের এবং ইন্দ্রিয়বিকারানুৎপাদনের নিমিত্ত উপনয়ন (ব্রহ্মদীক্ষা) গ্রহণ করিয়া গুরুগৃহে অধিবাস করিলে বিষয়তৃষ্ণা জন্মিবে না। এরূপ কঠোরতর ব্রত (বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুশুশ্রূষা) প্রভৃতির অনুষ্ঠানোপদেশ দিলে অবশ্যই ক্রমশঃ ব্রহ্মনিষ্ঠা ভগবদ্ভক্তি জন্মিবে। শৈশবে উৎকট রাগহেতু যাহার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যাতে নিষ্ঠা না জন্মে, তাহাকে অবশ্যই দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারী হইতে হইবে। এ ব্যবস্থাতে এবং এ বিধানে সংসারিগণ যদি গুরু সমীপাভ্যস্ত তত্ত্বজ্ঞান সহকারে সংসারস্থ হইয়া অনিন্দিতরূপে ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয় উপভোগ করে, তাহা হইলেও তাহার বিষয়ভোগ জন্য বিষয় বিতৃষ্ণা জন্মিয়া ঐকান্তিক নিষ্ঠা জন্মিতে পারে। আশ্রমান্তর গ্রহণের তাৎপর্য্য এইরূপ। সকল আশ্রমেই ব্রহ্মানুষ্ঠান করিবার শাস্ত্রের মুখ্য অভিপ্রায়। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে গুরুসমীপে গমন অবধি সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত, গার্হস্থ্যাশ্রমে নিষেকাদি শ্মশানান্ত পর্য্যন্ত যাবতীয় বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্রহ্মপ্রাপ্তি। ব্রহ্মধ্যানই যে সর্ব্বাশ্রমের এবং সর্ব্বধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য, জীবনের সার, একমাত্র লক্ষ্য, ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মধ্যানের নিমিত্ত সুবিধাজনক আশ্রমান্তর গ্রহণ করিলে অর্থাৎ ব্রহ্মধ্যানের জন্য যাহাই সুবিধাজনক, তাহারই অনুষ্ঠান

করিলে মুক্তিভঙ্গ কেন হইবে? আহার ও নিদ্রা না করিলে জীবনধারণ হয় না। তদ্ধেতু নিয়মিত আহার ও নিদ্রায় প্রয়োজন। এইরূপ উৎকটরাগিগণেরও বিষয়ভোগ না করিলে ভোগতৃষ্ণা নিবর্ত্তিত হয় না, এবং তাহা না হইলেও তত্ত্বজ্ঞানে নিষ্ঠা জন্মে না। এই হেতুই নিয়মিতরূপে বিষয়োপভোগ করিয়া বিষয় বিতৃষ্ণ হইবার জন্য সংসারাশ্রম শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। আহার নিদ্রা না করিয়া যদি কেহ শরীর ধারণ করিয়া ভগবৎ-ধ্যান ধারণা যোগানুষ্ঠান করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে আহার নিদ্রা একবারেই নিষ্প্রয়োজন আর যদি কেহ বিষয়োপভোগ না করিয়াই বিষয় বিতৃষ্ণ হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে পারেন, তাঁহার পক্ষে সংসারাদি আশ্রমানুষ্ঠান কবাও নিষ্প্রয়োজন। আপাততঃ মধুর সংসারসুখে ব্যাসক্ত হইয়া জন্মের মত সংসার-সাগরে নিমগ্ন হয়, এই আশঙ্কায় এক মুখে সংসারধর্ম্ম পরিগ্রহের বিধি দিয়া আবার সহস্র মুখে তাহা পরিত্যাগ করিবার বিধি দিয়াছেন। ব্রহ্মনিষ্ঠার আগ্রহই আশ্রমান্তর গ্রহণের মুখ্য কারণ। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের বিধাতা ভগবান মায়াবদ্ধ হইয়াছেন। ভগবান মায়াময় হিরণ্যগর্ভ তিনি মায়াবদ্ধ হইয়াছেন বলিয়াই, অদৃষ্টরূপ মায়াপাশে জীবগণও বদ্ধ। আশ্রমান্তর পরিগ্রহণই সেই মায়াপাশের বন্ধন মুক্তির একমাত্র সদুপায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাতি বা বর্ণ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

যেমন স্থূলের ধর্ম্ম বা ভাব লইয়া চেতন ও জড় মনুষ্য ও পশুর জাতি বিভাগ করা হইয়াছে সেইরূপ মানবের অনুষ্ঠানীয় ধর্ম্মকে লইয়া আর্য্য ও অনার্য্য জাতিরও বিভাগ করা হইয়াছে। সেইরূপ আবার মানবের ধর্ম্ম বা স্বভাব লইয়া ও আর্য্য সমাজের জাতি বিভাগ করা হইয়াছে। ভগবান ব্যাস পাতঞ্জলের প্রথম পাদের ২য় সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন?

"চিত্তং হি প্রখ্যা প্রবৃত্তি স্থিতিশীলত্বাৎ ত্রিগুণং প্রখ্যারূপং হি চিত্তসত্বং রজস্তমোভ্যাং সংসৃষ্টং ঐশ্বর্য্য বিষয় প্রিয়ংভবতি তদেব তমসানুবিদ্ধং অধর্ম্মাজ্ঞানবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যোপগং ভবতি তদেব প্রক্ষীণমোহাবরণং সর্ব্বতঃ প্রদ্যোতমানং অনুবিদ্ধং রজোমাত্রয়া ধর্ম্মজ্ঞান-বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যোপগং ভবতি। তদেবরজোলেশ মালোপেতং স্বরূপপ্রতিষ্ঠং সত্ত্ব পুরুষান্যতাখ্যাতি-মাত্রং ইত্যাদি।

অপ্রকাশ প্রবৃত্তি এবং স্থিতিশীলতা হেতু চিত্ত ত্রিগুণাত্মক চিত্তসত্ব, রজোগুণ বহুলতমো-গুণের সংশ্রবে ঐশ্বর্য্য ও বিষয়ে অনুরাগী হয়, তমোগুণবহুলরজগুণ সংশ্রবে অধর্ম্ম অজ্ঞান ও

অবৈরাগ্যাদিতে আসক্ত হয়, ক্ষীণতমঃ অর্থাৎ তামসবৃত্তি স্ফুরণশূন্য এবং রজলেশযুক্ত হইলে ধর্ম্মজ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্যের অনুরাগী হয় আর ঐ রজোগুণলেশেরস্ফুরণশূন্য হইলে কেবল বিশুদ্ধ সত্বের স্ফূর্ত্তিতে চিত্ত এবং পুরুষের পার্থক্য জ্ঞান হইয়া স্বরূপে অবস্থিত হয়। আমরা এই ব্যাসভাষ্য দ্বারা বুঝিলাম রজঃ সাত্তিক * এবং রজ তামসিক চিত্ত ঐশ্বর্য্য ও বিষয় সুখে অনুরাগী হয়, তামসিক চিত্ত অজ্ঞানান্ধ, সত্তরাজসিক চিত্ত ধর্ম্মজ্ঞানে বৈরাগ্যের অনুরাগী হয়। এই চারি প্রকার চিত্তের উপরিভাগে যে কেবল বিশুদ্ধ সত্ব বৃত্তিস্ফুরিত চিত্তের উল্লেখ দেখাবায় উহা বর্ণাশ্রমের উর্দ্ধে অবস্থিত তাদৃশ চিত্তের মানব, বর্ণাশ্রম ভাবের অতীত।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে সূক্ষ্ম সৃষ্টির যুগে ও কাল শক্তি প্রভাবে ক্রমশঃ ব্রহ্মার মানস পুত্রগণের চিত্তেও রজঃ ও তমোগুণের বৃত্তিস্ফুরণ হইলে গুণত্রয়ের বৃত্তির তারতম্য সংঘটিত হইয়া পড়ে বলিয়াই কাহারও চিত্ত সত্ব রাজসিক কাহারও চিত্ত রজঃসাত্তিক কাহার চিত্ত, রজ তামসিক কাহার চিত্ত তমোরাজসিক স্বভাব সম্পন্ন হয়। এবং প্রবৃত্তিমার্গের ক্রিয়ারম্ভে তাদৃশ স্বভাবের কর্ম্ম সাধারণোপযোগিস্থূলদেহে ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করিলে ভগবান স্বভাবানুকুল কর্ম্ম বিভাগ করিয়া বর্ণ বিভাগ সম্পাদন করেন। তাদৃশ স্বভাব একজন্মের অনুশীলনে লাভ করা অতীব দুরূহ। কাহার কাহারও অত্যুৎকট অনুশীলনের ফলে এক জন্মেই স্বভাবান্তরের আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। বিশ্বামিত্রপ্রভৃতিই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। জন্ম জন্মান্তরেই অধিক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যেমন যেমন স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে সেই সেইরূপ স্থূল দেহ লাভ ঘটিয়া থাকে। স্থূলদেহ কেবল লিঙ্গদেহের কার্য্যের সাধক সুতরাং লিঙ্গ দেহেই বর্ণের বিভাগ, স্থূলদেহে তাহার বিকাশমাত্র সুসম্পন্ন হয়—বলিয়া স্থূলদেহী লইয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় আমাদের অনুভূতির বিষয়ী ভূত হইয়া থাকে।

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ" এই শ্লোকের শঙ্কর ভাষ্যও আমাদের এই মীমাংসার সমর্থক।

"শঙ্কর-ভাষ্য"

"গুণকর্ম্মবিভাগশঃ গুণবিভাগশঃ কর্ম্মবিভাগশশ্চ। গুণাঃ সত্বরজস্তমাংসি তত্র সাত্বিকস্য সত্বপ্রধানস্য ব্রাহ্মণস্য শম দম তপ ইত্যাদীনি কর্ম্মাণি, সত্বোপসর্জ্জন রজঃ প্রধানস্য ক্ষত্রিয়স্য সৌর্য্যতেজঃপ্রভৃতীনি কর্ম্মাণি, তম-উপসর্জ্জন-রজঃ-প্রধানস্য বৈশ্যস্য কৃষ্যাদীনি কর্ম্মাণি, রজউপসর্জ্জন তমঃ প্রধানস্য শূদ্রস্য শুশ্রূষৈব কর্ম্মেত্যেবং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ চাত্তবর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং ইত্যর্থঃ।

* রজোগুণ প্রধান সত্বাংশস্ফুরিত চিত্তকে রজঃ সাত্বিকচিত্ত, এবং তমোগুণ প্রধান রজোস্ফুরিত চিত্তকে তমো রাজসিক এবং রজোলেশ মাত্র স্ফুরিত সত্বাংশ স্ফুরণ শূন্য তমো প্রধান-চিত্তকেই তামসিক চিত্ত বলা হইয়া থাকে এবং রজোলেশ স্ফুরণ যুক্ত ও তমোলেশ স্ফুরণ-শূন্য সত্বগুণ প্রধান চিত্তকে সত্ব রাজসিক চিত্ত বলিয়া অভিহিত করা হয়।

সত্বগুণ প্রধান ব্রাহ্মণের গুণানুরূপ কর্ম্ম শম দম ও তপস্যা ইত্যাদি, রজোগুণ প্রধান ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম শৌর্য্য তেজ ইত্যাদি, বেশীরভাগ রজো ও তদপেক্ষা অল্পতম গুণ স্ফুরিত। রজস্তামসিক বৈশ্যের গুণানুরূপ বা স্বভাবানুরূপ কর্ম্ম, কৃষি বানিজ্যাদি তমোগুণ বহুল স্ফুরিত। রজোহংশযুক্ত তমোরাজসিক শূদ্রের গুণানুরূপ বা স্বভাবানুরূপ কর্ম্ম সেবাদি। এই সকল আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারি ত্রিগুণের বিসদৃশ পরিণামবশতঃ মানুষ চিত্তের বৈচিত্র্য। কালপ্রভাবে বা কল্পান্তরীয় অদৃষ্ট বশতঃ প্রথমতঃ অর্থাৎ আদি সৃষ্টিতে পরে অনুশীলনের ফলে প্রতিচিত্তে এক এক গুণের আধিক্য হয়, ও পূর্ব্বজন্মে যে চিত্তের যে সকল বৃত্তির অতিরিক্ত অনুশীলন হয়, এবং সেই অনুশীলন জন্য যে যে সংস্কার উৎপন্ন হয় সেই সই সংস্কার বা স্বভাব মানুষকে কার্য্য করায় সুতরাং স্বভাবোৎপন্নগুণাধিক্যই জাতিভেদের পরিমাপক আর ভগবানই তথাকথিত গুণানুসারে জাতিভেদের নির্দ্দেশক সুতরাং জাতিভেদ বা বর্ণভেদ স্বাভাবিক বা ভগবৎসৃষ্ট, কোনও মানব বুদ্ধিরদ্বারা সম্পাদিত নহে। জগৎপিতা তাঁহার এই চতুর্ব্বিধ সন্তানের মঙ্গলকামনায় এই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কল্পনা করিয়াছিলেন। আর মানব-হিতাকাঙ্ক্ষী ঋষিকুল ধ্যানযোগে বর্ণাশ্রমভেদের রহস্য অবগত হইয়া প্রত্যেকেই নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণ ও আশ্রম ভেদ এবং প্রত্যেক বর্ণেরও আশ্রমের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকলের যথোচিত ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে ঐসকল বর্ণাশ্রমোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম-সমূহের যথারীতি অনুষ্ঠান হইত বলিয়াই ভারতবর্ষ ভূস্বর্গ নামে অভিহিত হইয়াছিল। তদানীন্তন রাজগণ তাই স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক বলিতে পারিতেন "নমোস্তেয়ো জনপদে ন কদর্য্যো নমদ্যপঃ না নাহি-তাগ্নির্ণাবিজ্ঞঃ নস্বৈরী নচ স্বৈরিণী" আমার রাজ্যে চৌর্য্য নাই, প্রতারক বিশ্বাসঘাতক প্রভৃতি কদর্য্য লোক নাই, মদ্যপায়ী নাই, নিরগ্নি এবং যজ্ঞকর্ম্ম বিহীন ব্রাহ্মণ নাই, ব্যভিচারিণী স্ত্রী নাই, ব্যভিচারী পুরুষ নাই। আর তথাকথিত অনুষ্ঠানের ফলেই এই শ্মশানসদৃশ বর্ণাশ্রম-সমাজ সে সময়ে নন্দনকাননরূপে পরিণত ছিল। ধনবল জনবল জ্ঞানবলে বর্ণাশ্রম-সমাজ এই পৃথিবীতে অতুলনীয় ছিল বলিয়াই বৈদেশিক কবিকুলও ভারতবর্ষকে বিশ্বম্ভরা ভরণ বলিয়া নিজ নিজ গ্রন্থে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। আর আজ সেই সকল কর্ত্তব্যকর্ম্মের পরিত্যাগ করিয়া আমরা সকলপ্রকারে এই পৃথিবীর জনগণের ধীক্কার স্থানীয় হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের সেই ভূস্বর্গ ভারত ভূমি এখন প্রায় প্রেতলোকের আবাস ভূমিতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে রোগ শোক দারিদ্র্য প্রভৃতি প্রচণ্ড রাক্ষসকুল আমা-দিগকে নির্ম্মূল করিয়া তুলিতেছে। স্থায়ি দুর্ভিক্ষদাবদাহে সোনার ভারত পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইতেছে আমরা সকলেই তাহার ভীষণ জ্বালায় প্রতিনিয়ত জ্বলিতেছি কিন্তু বিদেশীয় ভাব মদিরার নেশার ঝোঁকে তথোক্ত দৈত্য কুলের করাল কবল হইতে এবং উক্ত জ্বালামালার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় খুজিয়া পাইতেছি না বর্ণও আশ্রমোচিত আচার প্রতিপাল-নই যে আমাদের এই জ্বালামালার পরিত্রাণের একমাত্র উপায় তাহা আমরা কিছু মাত্র বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু দিব্য চক্ষুঃ সূক্ষ্মদর্শী ঋষিকুল, সে উপায় দর্শন করিয়া বর্ণাশ্রম সমাজকে

ঐ সকল আলামালার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য এবং চারি জাতীয় মানবকেই প্রকৃত পথে পরিচালিত করিবার জন্য, ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তিকে যদৃচ্ছা চলিতে না দিয়া বিবেক বিধান নিমগ্ন করিবার জন্য, সমাজবন্ধের চারিটী তার একসূত্রে বাঁধিবার জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, নৈসর্গিক বর্ণবিভাগকে অবলম্বন করিয়া ভগবৎকৃত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রচার দ্বারা সকল বর্ণাশ্রমিকেই শনৈঃ শনৈঃ অসদ্বৃত্তি হইতে নিবৃত্তি করিয়া নিবৃত্তির পথে, প্রকৃত সুখের পথে পরিচালন করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ যেমন রোগ এক হইলেও ধাতুভেদে ঔষধ ও পথ্যের পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা করিয়া সকল রোগীকেই যথাসম্ভব শীঘ্রই নিরাময় করিয়া তোলেন; ঋষিকুল সেইরূপ ভগবন্নির্দ্দিষ্ট এই বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম-রূপ ঔষধ বর্ণ ও আশ্রমভেদে ব্যবস্থা করিয়া সকল বর্ণেরই দুঃখরোগ দূর করিতে প্রয়াস পাইয়া গিয়াছেন। আমরা তাহাদের ব্যবস্থাপিত ঔষধ ব্যবহার না করিয়া প্রত্যেকবর্ণই ঘোরতর বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি, প্রত্যেক জাতির এই বিকারনাশক স্ব স্ব বর্ণোচিত আশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান, ধারাবাহিকরূপে রক্ষাকরার নামই জাতিগত পবিত্রতারক্ষা, আর উহার রক্ষণেই সর্ব্ববিধ কল্যাণ এখনও লাভ করা যাইতে পারে। শাস্ত্রে মুক্তকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে।

বেদো বা হরিভক্তির্বা ভক্তির্বাপি মহেশ্বরে আচারাৎ পতিতং মূঢ়ং ন পুনাতি দ্বিজোত্তম!

এই জন্যই মানব ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়াছেন —

"আচারাল্লভতেহ্যায়ুঃ আচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ
আচারাদ্ ধন মক্ষয্যং আচারোহন্ত্যলক্ষণং।"

এই জন্যই বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে "হরিভক্তিপরোবাপি সাঙ্গবেদান্তগোহপিবা তক্তোয়ঃ স্বাশ্রমাচারঃ পতিতঃ সোহভিধীয়তে"।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি।

সামাজিক প্রসঙ্গ।

বাসন্তী।

বসন্তকালীন দুর্গোৎসবকেই বাসন্তী বলা হইয়া থাকে।*

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এই বসন্তকালীন দুর্গাপূজারই প্রচলন ছিল, এই বসন্তকালীন দুর্গাপূজাই কালের পূজা। হরিশয়ন হইতে উত্থান একাদশী পর্য্যন্ত অর্থাৎ আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী হইতে কাত্তিকী শুক্লা দ্বাদশী পর্য্যন্ত হরিশয়ন, এই সময় দেবতাদিগের নিদ্রাকাল সুতরাং এই সময় সাধারণতঃ দেবপূজার অকাল, যেমন নিদ্রিত পার্থিব জীবের অনুগ্রহ ... প্রাকৃতার্থে কোন কার্য্য করা নিদ্রাকালে বিফল বলিয়া তাহাকে জাগাইয়া তাহার অনুগ্রহ সম্পাদক অনুষ্ঠান করিতে হয়, দেবতাদের সম্বন্ধেও সেইরূপ, তাই শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে রাবণবধে আদ্যাশক্তির সাহায্যতা লাভার্থে বোধন করিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন, সেই হইতে পৃথিবীতে শরৎকালীন দুর্গোৎসবের প্রচার, ইহার পূর্ব্বে বসন্তকালীন দুর্গোৎসবের (বাসন্তীপূজার) প্রচার ছিল।

এই বাসন্তীপূজার প্রথম অনুষ্ঠাতা স্বয়ং গোলোকবিহারী পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি প্রথমতঃ চৈত্রমাসে স্বীয় নিত্যধাম গোলোকের রাসমণ্ডলে এই মহাশক্তির অর্চনা করেন। দ্বিতীয় অনুষ্ঠান শেষ শায়ী ভগবান বিষ্ণু ও ব্রহ্মা, একার্ণবকালে মধুকৈটভ ভয়ে ভীত হইয়া আত্মরক্ষার্থ লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই দুর্গাদেবীর অর্চনা করেন এবং অনন্তশয্যা পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু স্বকর্ণ মলজাত ঐ দৈত্যদ্বয়ের সহিত সহস্র বৎসর যুদ্ধে তাহাদের বিনাশে অসমর্থ হইয়া এই মহাশক্তির আরাধনা করেন এই দুইবার দেবকার্য্যে দেবভূমিতে ভগবানকর্ত্তৃক দুর্গাদেবীর পূজার অনুষ্ঠান হয়, * তৃতীয়বার সুরথরাজ-কর্ত্তৃক পৃথিবীতে এই বাসন্তী দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান হয়, সেই হইতে এযাবৎকাল এই বসন্তকালীন দুর্গোৎসব বাসন্তী নামে ভারতে প্রচারিত ও অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

আর্য্য ইতিহাস আলোচনা করিলে বাসন্তী পূজার ইতিবৃত্ত এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়, এই পূজার পদ্ধতি বোধন ব্যতীত সকলেই শারদীয় দুর্গা পূজার ন্যায়। নিদ্রিত মহাশক্তিকে

* মীনরাশিস্থিতে সূর্য্যে শুক্লপক্ষে নরাধিপ।
সপ্তমীং দশমীং যাবৎ পূজয়েদম্বিকাং সদা॥
পুরাস্তুতা সা গোলকে কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
সা পূজা মধুমাসেন প্রীতেন রাসমণ্ডলে॥
মধুকৈটভয়োর্যুদ্ধে দ্বিতীয়ে বিষ্ণুনাপুরা
তত্রৈব কালে সা দুর্গা ব্রহ্মণা প্রাণ সঙ্কটে।

ভবিষ্যপুরাণ

জাগ্রত করার নাম বোধন সুতরাং জাগ্রত শক্তির বোধন আবশ্যক হয় না, শরৎকালে যে মহাশক্তি নিদ্রিত এবং বসন্ত কালে যে স্বতঃই জাগরিত ইহার চিহ্ন আমরা এই জগতেও দেখিতে পাই, গুণময়ী বিশ্ব জননী মহাশক্তির প্রফুল্লতাই জাগরণ, বসন্ত কালেই বিশেষতঃ মধু মাসেই সধারণতঃ বৃক্ষলতা হইতে জীবের অন্তঃকরণ পর্য্যন্ত প্রফুল্লিত হয়। সমগ্র বিশ্বের উপাদানভূত গুণময়ী বিশ্ব জননী মহাশক্তির প্রফুল্লতা ব্যতীত কোনরূপ সার্ব্বজনীন প্রফুল্লতার আবির্ভাব সম্ভব হইতে পারে না, ইহা মনীষীমাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকারকরিয়া থাকেন, সুতরাং মধু মাসই যে মহাশক্তির পূর্ণ জাগরণকাল তাহাতে আর সন্দেহ নাই, তাই দেবীর অর্চ্চনায় আর বোধনের প্রয়োজন হয় না, শরৎকালে যে প্রফুল্লতা আমরা দেখিতে পাই উহা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মহাশক্তি বোধনের ফল তিনি জীবের মঙ্গল কামনায় রাবণ বধ ব্যপদেশে অকালে মহাশক্তির উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন তাহারই ফলে আমরা এই মর জগতে দুইবার মহাশক্তির জাগরণ অনুভব করিয়া দুই বার আমরা মহাশক্তির মহাপূজায় আত্মনিয়োগে কৃতার্থ হইয়া থাকি।

বসন্তকালে মহাশক্তির মহাপূজা কেবল পৌরাণিক পূজা নহে তন্ত্রশাস্ত্রেও এই বাসন্তী-পূজার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। * মায়াতন্ত্রের সপ্তম পটলে দেখিতে পাই চৈত্রশুক্ল সপ্তম্যাদি দিনত্রয়ে ভক্তিভাবে দুর্গাদেবীর অর্চ্চনা করিতে হয়, এই সকল শাস্ত্র আলোচনা করিলে স্বতঃই উপলব্ধি হয় যে চৈত্র মাসই মহাশক্তির মহাপূজার স্বাভাবিক কাল।

অন্নপূর্ণা পূজা।

তন্ত্রশাস্ত্রের মতে এই বাসন্তী পূজার কালেও মহাশক্তির পূজার একটু বিশেষত্ব দেখা যায়। সেই বিশেষত্বই অন্নপূর্ণা পূজা নামে অভিহিত। শাম্ভবীতন্ত্রের চতুর্দ্দশ পটলে মহাশক্তি নিজেই বলিতেছেন, চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে যে আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে সে

* চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে
সপ্তম্যাদি দিনত্রয়ে।
প্রাতঃ প্রাতর্ম্মহাদেবীং
দুর্গাং ভক্ত্যা প্রপূজয়েৎ।
(মায়াতন্ত্র সপ্তম পটল)

বিশেষাচ্চৈত্রমাসস্ত
যাতিথিঃ স্যাৎ সিতাষ্টমী।
তস্যাং যঃ পূজয়েৎ ভক্ত্যা
প্রসাদয়তি মাং ধ্রুবং॥
(শাম্ভবীতন্ত্র, ১৪শ পটল)

নিশ্চয়ই আমাকে প্রসন্না করিতে সমর্থ হইবে, এমন কথা মহাশক্তি নিজে বাসন্তীপূজায় ও পূজায় বলেন নাই, মহাদেবীর এই নিজবাক্য স্মরণ করিয়া ভক্তগণ বাসন্তীপূজা না করিয়াও তান্ত্রিক-পদ্ধতি অনুসারে চৈত্র শুক্লাষ্টমীতে মহাদেবীর অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তির পূজা করেন মহাশক্তির এই বাক্য ও চৈত্রমাস যে মহাশক্তির পূর্ণ প্রফুল্লতার কাল "ইহাই সূচিত করিয়াছে।"

ব্রহ্মপুত্র যোগস্নান।

চৈত্রমাস আর্য্য সন্তানের যত গৌরব যত অতীতের স্মৃতি বহন করিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, সেইরূপ গৌরব স্মৃতিকে বহন করিয়া আর কোন মাসকেই আসিতে দেখা যায় না। চৈত্র শুক্লাষ্টমী, ব্রহ্মপুত্র স্নানের যোগ এই স্নান যোগই ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তির ও অভূতপূর্ব্ব ব্রাহ্মণ বীর্য্যের স্মারক সে সকল অতীত কাহিনী স্মরণ করিলেও হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে প্রাণ মন মাতোয়ারা হয়, তাদৃশ শক্তি যে ব্রাহ্মণ জাতির করতলগত ছিল ইহা এখন বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ সন্তানগণের স্মৃতিপথে উদিত হইলেও অনেকের উপন্যাস বলিয়াই মনে হয় যাহাদের এইরূপ ধারণা তাহাদিগকে কলিকাপুরাণের ৮৪। ৮৫ অধ্যায় পাঠের জন্য আমরা অনুরোধ করি। ইতিহাসই অতীত কীর্ত্তির সাক্ষী ইহা সকল দেশে সকলসমাজেরই সুধীজন-সম্মত, ইতিহাস বিশ্বাস না করিলে কোন অতীত ঘটনাকেই বিশ্বাস করা যায় না। মুসলমান্-রাজত্বকালের অসংযত মুসলমান লেখকগণের লিখিত মুসলমানরাজত্বের ইতিহাস বর্ণে বর্ণে বিশ্বাস করিব, আর সংযতাত্মা সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় আর্য্যমহাপুরুষগণের লিখিত জাতীয় ইতিহাসে আস্থা স্থাপন করিব না। এই যাহাদের মত, তাহাদিগকে আমাদের বলিবার কিছুই নাই, যাহারা ঋষিবাক্যে শ্রদ্ধাবান তাঁহাদিগেরই অবগতির জন্য উক্ত কালীকাপুরাণের ক একটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

কৈলাশস্যোত্তরে পার্শ্বে, দক্ষিণে, গন্ধমাদনঃ,
জারুধিঃ পশ্চিমে শৈলঃ, পূর্ব্বে সম্বর্ত্তকাহ্বয়ঃ,
তেষাং মধ্যে, স্বয়ং কুণ্ডং পর্ব্বতানাং বিধেঃ স্মৃতঃ,
কৃত্বাভি ববৃধে নিত্যং শরদিব নিশাকরঃ,
তস্মিন্নবসরে রামো জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্,
চক্রে মাতৃবধং ঘোর মত্ত্বাগ্রং পিতুরাজ্ঞয়া,
তস্য পাপস্য মোক্ষায় স্ব পিতুশ্চোপদেশতঃ,
স জগাম মহাকুণ্ডং ব্রহ্মাখ্যং স্নাতু মিচ্ছয়া,
তত্রস্নাত্বাচ পীত্বাচ মাতৃ হত্যাং ব্যপানয়ৎ,
বীথিং পরশুনাকৃত্বা তক্ষ ক্ষামবতারয়ৎ।
ব্রহ্মকুণ্ডাৎস্মৃতঃ সোহথ, কাসারে লোহিত্যে হ্রদে।
কৈলাসে [illegible] ব্রজঃ স্মৃতঃ।

তস্যাপি সরসন্তীরং সমুত্থায় মহাবলঃ
কুঠারেণ দিশং পূর্ব্বামনয়ৎ ব্রহ্মণঃ সুতং
ততোহপরস্যাপিগিরিং হেমশৃঙ্গং বিভিদ্যচ
কামরূপান্তরং পীঠমবাহয়দমুং হরিঃ।

*　　*　　*

সকামরূপমখিলং পীঠমাপ্লাব্যবারিণা
গোপয়ন্‌সর্ব্ব তীর্থানি দক্ষিণং যাতি সাগরঃ।

ঋষিপত্নী অমোঘার গর্ভে ব্রহ্মার বীর্য্যে উৎপন্ন জলময়ী দেবতা ব্রহ্মপুত্র কৈলাসাদি চতুঃপার্শ্বস্থ পর্ব্বত প্রাচীর মধ্যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ঐ পর্ব্বত চতুষ্টয় মধ্যেস্থিত পঞ্চযোজন স্থানে প্রসারিত ব্রহ্মকুণ্ড নামক প্রকাণ্ড হ্রদে পরিণত হইলেন, কিছুকাল পরে পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞায় মাতৃহত্যা করিয়া মাতৃহত্যা পাপ বিনাশের জন্য পিতার উপদেশে এই ব্রহ্মকুণ্ডে আসিয়া স্নান ও এই সুনির্ম্মল পরিপ্লুত জলপান করিয়া মাতৃহত্যা পাপ হইতে উদ্ধার লাভ করেন। পরে সাধারণ জনগণের মঙ্গল কামনায় তীর্থরাজ এই ব্রহ্মপুত্রকে একমাত্র কুঠারের সহায়তায় অসীম ভুজবীর্য্য প্রভাবে সেই সুদূর কৈলাশ উপত্যকা হইতে হেমগিরি পর্য্যন্ত পর্ব্বত সমূহ বিদীর্ণ করিয়া মহাপীঠ কামরূপ প্লাবিত করাইয়া প্রবাহিত করেন কালিকাপুরাণে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। (অন্য পুরাণ ও মহাভারতেও এইরূপই প্রায় দেখা যায়) একমাত্র কুঠারের সহায়তায় এতগুলি পর্ব্বত কাটীয়া ব্রহ্মকুণ্ড হইতে তীর্থরাজ ব্রহ্মপুত্রকে কামরূপের পথে প্রবাহিত করাণ একমাত্র ব্রাহ্মণ ভুজ বীর্য্যেই সম্ভব হইয়াছিল। আর একদিন প্রবল প্রতাপ অনন্যবিজিত সম্রাট গাধিরাজের ভুজ বীর্য্যও জটা বল্কলধারী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ভুজবীর্য্যের নিকট পরাজিত হইয়াছিল কিন্তু তাহার সাক্ষী কেবল ইতিহাস, অন্য কোনও সাক্ষী নাই, আর এই কুঠারী ব্রাহ্মণের ভুজ বীর্য্যের সাক্ষী কেবল ইতিহাস নয়—সাধারণের প্রত্যক্ষ যোগ্য প্রকাণ্ড নদ এখনও বিদ্যমান এই চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীতেই তাহার স্নান যোগ, ইচ্ছা করিলে সকলই ব্রাহ্মণবীর্য্যের অদ্ভুত পূর্ব্ব চিহ্ন দর্শন করিয়া এবং যোগ স্নান করিয়া চক্ষুঃ, শরীরে, এবং আত্মার পবিত্রলাভ করিয়া ব্রাহ্মণ গৌরব অনুভব করিতে পারেন।

(শ্রীরাম নবমী)

চৈত্রমাসের আর একটী নাম মধু, আর্য্যজাতির পক্ষে প্রকৃতই এই মাসটী মধু, এইমাসেই একদিন আর্য্যের গৌরব মধুর সৃষ্টি করিয়াছিল, ইতিহাসজ্ঞ প্রত্যেক আর্য্যসন্তানের হৃদয়েই সেই সুদূর অতীতের গৌরবমধুর স্মৃতি এই মাসেই আনিয়া দেয়, এইমাসের পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত শুক্লানবমী তিথিতেই ভগবান্ হরি দুষ্ট দলনের জন্য চারিঅংশে মহারাজ চক্রবর্ত্তী দশরথের পুত্র দশরথাত্মজরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যাঁহার নামবহ্নি কোটী কোটী মহাপাপকে তুলারাশির

ক্ষায় নিমিষে ভস্মীভূত করিয়া দেয়, মহাযোগীশ্বর মহাদেব যাঁহার নামগানে মত্ত, যাঁহার নাম বিকৃত ভাবে উচ্চারণ করিয়াও পরম দস্যু মহাপাপী রত্নাকর মহামুনি হইয়াছিলেন, যাঁহার কীর্ত্তিগাথা রামায়ণনামে প্রকাশিত হইয়া এই ঘোর কলিকালেও আমাদিগের পাপ তাপ বিনাশ করিয়া জাতীয় গৌরবের জলন্ত সাক্ষরূপে পৃথিবী সমীপে সগৌরবে দণ্ডায়মান, সেই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরাম-চন্দ্রের আবির্ভাব এই মাসেই হইয়াছিল, তাই চৈত্র শুক্লানবমীর নাম শ্রীরামনবমী।

এই শ্রীরামনবমী স্মৃতিই চৈত্রমাসকে মধুময় করিয়াছে। সেই হইতেই চৈত্রমাসের মধু নাম স্বার্থক, আর তাহাই আর্য্যসন্তানের অনুভূতির জন্য শাস্ত্রকার ঐদিনটীকে শ্রীরামনবমী নাম দিয়া শ্রীরামনবমী ব্রতানুষ্ঠানের বিধান করিয়া গিয়াছেন, অগস্ত্যসংহিতায় কথিত হইয়াছে—

চৈত্রমাসি নবম্যান্তু
জাতোরামঃ স্বয়ং হরিঃ,
পুনর্ব্বস্বৃক্ষ সংযুক্তা
সাতিথিঃ সর্ব্বকামদা
শ্রীরামনবমীপ্রোক্তা
কোটীসূর্য্যগ্রহাধিকা
তস্মিন্ দিনে মহাপুণ্যে
রামমুদ্দিশ্য ভক্তিতঃ
যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম
তদ্ভবক্ষয়কারকং

শাস্ত্রের এই বিধান আমাদিগকে কি যে অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় মধুর অনুভূতি প্রদান করিতেছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার সামর্থ্য নাই তাইবলি মধুমাস প্রকৃতই মধু, যাঁহারা এ কথার বর্ণে বর্ণে সত্যতা অনুভব করিতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের প্রার্থনা শ্রীরামনবমী সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধানটীর একবার অনুষ্ঠান করুন, আর্য্যসন্তানের গৃহে গৃহে যে সময় এই শ্রীরামনবমী ব্রতের অনুষ্ঠান হইত, তখন দেশের এ অধঃপতন হয় নাই।

ভগবান্ কেবল দুষ্টের দলনের জন্যই সকল সময় অবতীর্ণ হয়েন না। দুষ্টের দলন করিয়া শিষ্টের পালন করিয়া সনাতনধর্ম্ম স্থাপনের জন্যই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাকে অনেক সময় আদর্শ-মানবরূপে মানব সমাজে অবতীর্ণ হইয়া নিজ আচরণের দ্বারাও লোকশিক্ষাবিধান করিয়া ধর্ম্মস্থাপন করিতে হয়। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় ভগবান নিজ মুখেই একথা বলিয়াছেন,—

(২)

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"

(৪র্থ অঃ ৮)

(১)

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে

(১ক)

নমে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ। ২৪ গীতা ৩য় অঃ।

ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন এই ত্রিলোকমধ্যে আমার কোন কর্ত্তব্য নাই কিন্তু আমি কর্ম্ম না করিলে এই লোক সকল উৎসন্ন যায়, কারণ সকলেই আমার অনুবর্ত্তন করে, কেননা শ্রেষ্ঠ যাহা আচরণ করেন অপর সকলেই তাহার অনুকরণ করে শ্রেষ্ঠ যাহা প্রমাণিত করেন লোক সকল তাহারই অনুবর্ত্তন করে।

ভগবানের এই অবতার রহস্যের পূর্ণবিকাশ শ্রীরামরূপে। শ্রীরামরূপে তাঁহার আবির্ভাব কেবল দুষ্টের দলনের জন্য নয়, আদর্শ মানব হইয়া রাজশক্তি গ্রহণ করিয়া কি করিয়া নিজ আচরণে লোক শিক্ষাদ্বারা ধর্ম্মরক্ষা করিতে হয় তাহারই জলন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা আর্য্য সমাজকে উন্নতির উচ্চতম সোপানে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তিনি এই উদ্দেশ্য কি কি সুন্দর প্রণালীতে করিয়া গিয়াছেন, তাহা রামায়ণ পড়িলেই সম্যক উপলব্ধি হয়, শ্রীভগবানের এই ভাবে লোকশিক্ষা ও ধর্ম্ম স্থাপনের সুফল আমরা বহুদিন ভোগ করিয়া উন্নতির চরম সোপানে সমাসীন ছিলাম। সেই ত্রেতাযুগ হইতে দ্বাপরের শেষ পর্য্যন্ত তাহারই আদর্শে হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইয়া সর্ব্ববিধ উন্নতিলাভে সক্ষম হইয়াছিল, সেই সময় হইতে দ্বাপরের শেষ পর্য্যন্ত গৃহে গৃহে শ্রীরামনবমীব্রত সমাচরিত হইত, সকলেই শ্রীরামচন্দ্রকে আদর্শ করিয়া স্বীয় স্বীয় চরিত্র অল্পাধিক গঠন করিতে চেষ্টা করিত, ক্রমে কালশক্তিপ্রভাবে শ্রীরাম চরিত আর্য্য সন্তান ভুলিতে আরম্ভ করিলে, আবার ভারতে অশান্তির আবির্ভাবে দ্বাপরশেষে শ্রীভগবান ঐশীশক্তির পূর্ণবিকাশ দেখাইয়া আবার ধর্ম্ম স্থাপনে প্রযত্নপরায়ণ হইয়া বসুদেবসুতরূপে আবির্ভূত হয়েন, তাই শ্রীকৃষ্ণরূপে ঐশীশক্তির বিকাশ বেশী, তিনি কৃষ্ণরূপে আদর্শ মানবত্বের বিকাশ করেন নাই কিন্তু শ্রীরাম অবতারে মানবত্বের পূর্ণ বিকাশ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাই শ্রীরাম অবতারের পর সমাজ বহুদিন সেই আদর্শে সুশৃঙ্খলায় ছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণরূপে ধর্ম্মরক্ষার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমাজ-শৃঙ্খলা হ্রাস হইয়া এই অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের জন্মেই যে আর্য্যসমাজের ধর্ম্মের পূর্ণ অভ্যুদয় আর সেই অভ্যুদয়ের উদয় এই চৈত্রমাসেই হইয়াছিল তাহা অনুভব করিয়াই আমরা চৈত্রের মধু নাম সার্থক মনে করি। আবার পূর্ব্বের ন্যায় গৃহে গৃহে এই শ্রীরামনবমী ব্রতের অনুষ্ঠান শ্রীরামলীলা শ্রবণে অনুরক্তি যদি সম্ভব হয় তবে নিশ্চয়ই আবার আমাদের অভ্যুদয়েরও অবাধ [illegible] হইবে এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে শত শত বারও বলিতে পারি।

সংবাদ।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বৃত্তি।

ময়মনসিংহ গৌরীপুরের জমিদার মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের স্বর্গীয়া মাতৃদেবী ৺বিশ্বেশ্বরী দেবীচৌধুরাণী মহাশয়ার পারলৌকিক মঙ্গলার্থ প্রতিষ্ঠাপিত বিশ্বেশ্বরী স্মৃতি ভাণ্ডারের অধ্যাপক বৃত্তি যে সকল অধ্যাপক ১৩২২ সালের অগ্রহায়ণ হইতে ১৩২৩ সালের কার্ত্তিক পর্য্যন্ত পাইয়াছেন তাঁহাদের নামের তালিকা ও বার্ষিক-বৃত্তির পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ন্যায়, স্মৃতি ও বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যাপকগণের বার্ষিক বৃত্তি ৫০৲ টাকা, অন্য অধ্যাপকগণের বার্ষিক বৃত্তি ৪০৲ টাকা। বৃত্তিপ্রার্থিগণ আগামী ১৫ই বৈশাখ মধ্যে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর নামে ৬৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণসভা কলিকাতা এই ঠিকানায় আবেদন পত্র প্রেরণে অনুগৃহীত করিবেন।

১। শ্রীযুক্ত আনন্দকিশোর ন্যায়ালঙ্কার পোঃ, গ্রাম কাটটাইল (ময়মনসিংহ) ৫০৲। শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ স্মৃতিতীর্থ পোঃ গ্রাম মসুয়া (ঐ) ৫০৲। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনারায়ণ বিদ্যাভূষণ পোঃ বোলাই যশোদল (ঐ) ৫০৲ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র স্মৃতিরত্ন পোঃ কালীকাচ্ছ গ্রাম ধুমাইল (ঐ) ৫০৲। শ্রীযুক্ত গুরুচরণ স্মৃতিরত্ন পোঃ কাইটাইল কৃষ্ণপুর (ঐ) ৫০৲। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ তর্কতীর্থ ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ সারস্বতচতুষ্পাঠী বাংলাবাজার (ঐ) ৫০৲। শ্রীযুক্ত গুরুনাথ তর্কবাগীশ পোঃ ইছাপুর (ঢাকা) ৫০৲। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু স্মৃতি-বাচস্পতি পোঃ টোল বাইশাইল (ঢাকা) ৫০৲। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বিদ্যাবিনোদ পোঃ বৈদ্যের বাজার কৃষ্ণপুর (ঢাকা) ৪০৲। শ্রীযুক্ত শশীমোহন স্মৃতিভূষণ পোঃ ইছাপুরা (ঢাকা) ৫০৲। শ্রীযুক্ত জানকীনাথ তর্করত্ন কোরকদী (ফরিদপুর) ৫০৲। শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সিদ্ধান্তবাগীশ পোঃ সিংহলমুড়ি (ঐ) ৫০৲। শ্রীযুক্ত কালীকিশোর স্মৃতিরত্ন পোঃ কার্ত্তিকপুর ঐ (ফরিদপুর ৫০৲। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র তর্কতীর্থ পোঃ আবদুল্লাবাদ গ্রাম ভুয়াইর (ঐ) ৫০৲। শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র তর্কালঙ্কার পোঃ পালং কাঁটালবাড়ী (ঐ) ৫০৲। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সাংখ্যতীর্থ পোঃ বিনোদপুর বারুইখালী (যশোহর) ৫০৲। শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ পোঃ লক্ষ্মীপাশা, জয়পুর (ঐ) ৫০৲। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ তর্কবাচস্পতি পোঃ বকুলতলা উজীরপুর (ঐ) ৫০৲। শ্রীযুক্ত আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ পোঃ সোণাকোলা সিয়া (খুলনা) ৫০৲। শ্রীযুক্ত রাসলাল স্মৃতিতীর্থ পোঃ শ্রীপুর পলগ্রাম (খুলনা) ৫০৲। শ্রীযুক্ত শশধর স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ পোঃ পিলজঙ্গ (ঐ) ৫০। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ন্যায়রত্ন নবদ্বীপ (নদীয়া) ৫০৲। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ পোঃ বিরপুকুরিয়া (নদীয়া) ৫০৲। শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর তর্করত্ন পোঃ চুমারখালি, তেরাখিরা (ঐ) ৪০৲। শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন পোঃ [illegible]লা চেঙ্গেরপাড়া (বরিশাল) ৫০৲। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতিব্যাকরণতীর্থ পোঃ রাজগঞ্জ

বাবুপুর (নোয়াখালী) ৫০৲। শ্রীযুক্ত অন্নদানাথ বেদান্তশাস্ত্রী পোঃ দত্তপাড়া চৌপল্লী ৫০৲। শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ সিদ্ধান্তবাচস্পতি পোঃ সোনাইমুড়ী ঘোষকামতা (নোয়াখালী) ৪০৲। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর ন্যায়রত্ন পোঃ কমলাসাগর সাহাপুর, (ত্রিপুরা) ৫০৲। শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব শিরোমণি পোঃ গ্রাম বোয়ালিয়া (ঐ) ৪০৲। শ্রীযুক্ত শারদাচরণ তর্কতীর্থ পোঃ হরিমঙ্গল কৃষ্ণপুর (ঐ) ৫০৲। শ্রীযুক্ত কালীকান্ত স্মৃতিরত্ন পোঃ ভাটিখাইল (চট্টগ্রাম) ৫০৲। শ্রীযুক্ত দয়ালকৃষ্ণ তর্কতীর্থ পোঃ বালাগঞ্জ কাদিপুর (শ্রীহট্ট) ৫০৲। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্য-তীর্থ পোঃ রাজনগর মহাসহস্র (ঐ) ৪০৲। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র বিদ্যানিধি পোঃ রায়কালী (বগুড়া) ৪০৲। শ্রীযুক্ত অভিলাষচন্দ্র সার্ব্বভৌম পোঃ ঘোড়ামারা (রাজসাহী) ৪০৲। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ দর্শনটোল (পাবনা) ৫০৲। শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ তর্কপঞ্চানন পোঃ দুর্গানগর (পাবনা) ৫০৲। শ্রীযুক্ত সতীনাথ স্মৃতিতীর্থ পোঃ দৌলতপুর (পাবনা) ৫০৲। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ন্যায়-তর্কতীর্থ পোঃ ভাটপাড়া (২৪ পরগণা) ৫০৲। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ (ঐ) ৫০৲। শ্রীযুক্ত অমরনাথ স্মৃতিরত্ন (ঐ) ৫০৲। শ্রীযুক্ত কালীচরণ স্মৃতিতীর্থ পোঃ কামারহাটী আগড়পাড়া (ঐ) ৪০৲। শ্রীযুক্ত রামাক্ষয় বিদ্যাভূষণ পোঃ বিষ্ণুপুর, কাদাকুলী (বাঁকুড়া) ৪০৲। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ তর্কভূষণ পোঃ তমোলুক যোগীখোপ, পূর্ব্বপাড়া (মেদিনীপুর) ৫০৲। শ্রীযুক্ত প্রসন্ননাথ স্মৃতিতীর্থ বালী (হুগলী) ৫০৲। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল স্মৃতিতীর্থ পোঃ পূর্ব্বস্থলী (বর্দ্ধমান) ১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ৬ মাসের ২৫৲। শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ তর্করত্ন পোঃ গ্রাম পাইকর (বীরভূম) ৪০৲। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু স্মৃতিতীর্থ ৫৩ নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট, (কলিকাতা) ৫০৲। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ বেলেঘাটা কলিকাতা ৫০৲। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার তর্কনিধি (কলিকাতা) ৪০৲।

গৌরীপুর জমিদারীর অন্তর্গত গ্রামবাসী অধ্যাপক মহাশয়গণের জন্য বিশ্বেশ্বরী স্মৃতিভাণ্ডারের বিশেষ বৃত্তি।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ন্যায়পঞ্চানন পোঃ সুখহারী নীলকণ্ঠপুর (ময়মনসিংহ) ৬০৲। শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ন্যায়রত্ন (ঐ) ৬০৲। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ (ঐ) ৬০৲। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার আগুজিয়া (ময়মনসিংহ) ৬০৲। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিরত্ন (ঐ) ৬০৲। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ (নেত্রকোণা) বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী (ঐ) ৪০৲। শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ পোঃ রায়পুর পাঁচপাই (ঐ) ৫০৲। ময়মন সিংহ বিশ্বেশ্বরী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ৩৬০৲। জামালপুর বিশ্বেশ্বরী চতুষ্পাঠীর স্মৃতি-শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ ৩০০৲।

উক্ত ভাণ্ডারের কার্য্য পরিচালন নিমিত্ত ব্রজেন্দ্রবাবু একটী ট্রাষ্টপত্র করিয়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে ট্রাষ্টী নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি (বহরমপুর) শ্রীযুক্ত দুর্গাসুন্দর স্মৃতিরত্ন (ময়মনসিংহ) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন (ভাটপাড়া) শ্রীযুক্ত রাম

মোহন বিদ্যারত্ন (বিক্রমপুর) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ (কলিকাতা) কুমার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী (গোলোকপুর ময়মনসিংহ) ও ব্রজেন্দ্রবাবু স্বয়ং।

ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন।

ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমায় ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন গত ২৫ শে ও ২৬ শে চৈত্র সম্পন্ন হইয়াছে। মাদারীপুর ৺কালীবাড়ীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণ জনসমাগমে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, অনুমান প্রতিনিধি ও অন্যান্য ব্যক্তি লইয়া তিন সহস্রাধিক লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। মাদারীপুরের সবৃডিভিসনাল অফিসার সাহেব স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অভ্যাগতের অভ্যার্থনায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন। আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ের আলোচনায় রাজপুরুষের ঐরূপ সহানুভূতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও আশাপ্রদ। স্থানীয় বৈদ্য, কায়স্থ, এবং অন্যান্য জাতির কায়মনোবাক্যে আনুকূল্য মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল। তাঁহারা সকলে সভায় উপস্থিত থাকিয়া যাহাতে সভার শৃঙ্খলা রক্ষা হয়, তদ্‌বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন যে,—ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন কেবল ব্রাহ্মণ-জাতির কল্যাণের জন্য নহে, পরন্তু চাতুর্ব্বর্ণের কল্যাণই ইহার লক্ষ্য। তাঁহারা আরও বুঝিয়াছিলেন সঙ্কীর্ণতার কলঙ্কারোপ ইহাতে করা যায় না—রেষা-রেষী দ্বেষা-দ্বেষীর লেশমাত্র ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। যাঁহারা ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনকে ব্রাহ্মণেতর জাতির উন্নতির পরিপন্থী মনে করেন তাঁহারা যে বিষম ভ্রমে পতিত আছেন ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। আসুন, দেখুন, বুঝুন, পরে বলিতে ইচ্ছা হয় বলুন ব্রাহ্মণ-সভা একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। না জানিয়া শুনিয়া কোন মন্তব্য প্রকাশ আশা করি কেহ করিবেন না। ঋষিবাক্য শাস্ত্রাদেশ মানিয়া চলিতে কোন্ হিন্দুসন্তান পশ্চাৎপদ? ব্রাহ্মণ-সভা সেই ঋষিবাক্য শাস্ত্রাদেশকে আকস্মিক, আগন্তুক ও আপাতমধুর পরিণামবিষম আচার-ব্যবহার অপেক্ষা উচ্চে স্থান দিয়া থাকেন—এইটুকু বুঝিতে কেহ কেহ প্রাণে ব্যথা পাইয়া থাকেন। কিন্তু কেশাগ্রে বেদনা অনুভূতির আশঙ্কায়, সমগ্র সমাজশরীরকে নিরাময় করিতে দিব না এমন চেষ্টা ত শুভজনক নহে? ব্রাহ্মণসভা পরিণামে দৃষ্টি রাখিয়া বর্ণাশ্রম সমাজের যে মঙ্গলকামী একথা এবার সকলে বুঝিয়াছেন। আর তাহা বুঝিয়াছেন বলিয়া আশা—ব্রাহ্মণ-সভার সঙ্গে একযোগে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দূর করিতে এখন হইতে সকলে বদ্ধপরিকর হইবেন এবং প্রত্যেক হিন্দুকে বুঝাইবেন—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ"।

এই ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বারান্তরে প্রকাশিত হইবে।

REGISTERED No. C—675.

পঞ্চম বর্ষ। { ১৮৩৯ শক, ১৩২৪ সাল, জ্যৈষ্ঠ। } নবম সংখ্যা

ভ্রান্তি।

আমাতে রয়েছ দিবস যামিনী
কেন দূরে মরি খুঁজিয়া ;
ঘরেতে যাহার রতনের খনি
সে কেন ভিখারী সাজিয়া ?
তোমার বিশ্ব শস্তশ্যামল
ভাণ্ডার চিরপূরিত ;
তবে কেন আমি ফিরি দ্বারে দ্বারে
আহারবিহনে ক্ষুধিত ?
সপ্ত সমুদ্রে অগাধ সলিল
কি হেতু মরি বা পিয়াসে ?
পথ ভুলে আসি মরীচিকা মাঝে
ছুটিয়া বেড়াই তরাসে !
(তব) রূপের জ্যোতিতে আলোকিত হৃদি,
রূপ খুঁজে ফিরি ভুবনে ;
পূর্ণ সুধাকর রূপের আকর
তুমি যে মানস গগনে !

প্রেমের আশায় হতাশ হইয়া
বহি এ তৃষিত জীবনে ;
বুঝিনাই প্রাণে ফল্গু-প্রবাহ
তোমারই প্রেমের প্লাবনে !
তুমি দাও প্রভু ! তোমারে চিনায়ে
ঘুচুক অভাব দৈন্য।
সকল অভাব তোমাতে মিশাক
জীবন হউক ধন্য।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গোপালন।*

আমাদের উপাস্য দেবতাকে প্রণাম করার সময়ও আমরা বলিয়া থাকি—"গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ"। কিন্তু কাজে কতখানি যে হিত সাধিত হয় আজকাল তাহা বড় বোঝা যায় না। ব্রাহ্মণের সে দিন এখন শশ-শৃঙ্গের মত; আর গোমাতার কথা—তিনি ত সাধারণ পশু, [illegible] সুখ-দুঃখের অনুভবশক্তি এমন কি বেশী আছে? ছাগলও যেমন গাভীও [illegible] তবে পশু-আইন রক্ষার জন্য যেটুকু পারা যায় সেইটুকু দয়া দেখালেই যথেষ্ট হবে।

দিনকতক এমনই হইয়াছিল যে স্বপক্ষের যুক্তি অতি হেয়—স্বপক্ষের বক্তা অতি উপহাসাস্পদ। বিপক্ষ বিজয়ী—সে যেন যুক্তিতর্কের নবীন অবতার, তার যুক্তি তীক্ষ্ণধার তরবারির মত নির্ম্মল ঝক্‌ঝকে। তাঁর শক্তির সম্মুখে দাঁড়ান বড়ই কষ্টকর। কিন্তু এখন দেশের হাওয়া একটুকু ফিরিয়াছে। পূর্ব্বগগনে ব্রহ্মণ্যের অরুণ-রেখা আবার ফুটিয়া উঠিয়াছে। দিন আসিয়াছে—সময় হইয়াছে, তাই পূর্ব্বের লুপ্ত ব্যবহারগুলিকে সজাগ করার জন্য তার আলোচনার বড়ই প্রয়োজন।

বাল্যকালে নব্যভারতে পড়িয়াছিলাম—অন্ধ কবি বিজয় মজুমদার লিখিয়াছেন—

ধর্ম্মের হয়েছে লোপ ধর্ম্মশাস্ত্র শুধু 'তোপ,
ধর্ম্মশিক্ষাশালা—শুধু সৈন্যের মন্দির ;

---

* মাদারীপুর ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনে পঠিত।

কি লজ্জা তোমার দেশে　　　　বিদেশী শুনায় এসে
অনার্য্য অসভ্য এই ধর্ম্ম য়ীহুদীর।
বিজ্ঞানের দীপ্তানলে　　　　বাইবেল যাবে জ্বলে
রবে শুধু ভস্মছাই শতাব্দীর পরে ;
সেই ছার ধর্ম্মতত্ত্ব　　　　শুনাইছে খ্রীষ্টভক্ত,
এত কি কলঙ্ক ছিল ভারতের তরে !"

কিন্তু সে কলঙ্ক ক্ষালনের এই শুভ অবসর। হিন্দু আমরা, বর্ণাশ্রম আমাদের মজ্জাগত ধর্ম্ম। সেই বর্ণাশ্রমের আবার মাথার মণি হইলেন—ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের অবনতিতে বর্ণাশ্রমের অবনতি, বর্ণাশ্রমের পতনে হিন্দুর পতন। ব্রাহ্মণ ও বর্ণাশ্রমের উন্নতি ব্যতীত হিন্দুর উন্নতির আশা সুদূরপরাহত।

আবার ব্রহ্মণ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য গোরক্ষার বিশেষ প্রয়োজন।

কষাই ব্যতীত আর কেহই গো-জাতিকে অপ্রীতির চোক্ষে দেখে না এবং তাহারা যে উপকারী সে সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ নাই। তবুও হিন্দুর—ব্রাহ্মণের দৃষ্টি এ বিষয়ে বেশী সূক্ষ্ম। আমরা গোজাতির উপকারিতা যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছি, কোনও দেশের কোনও জাতি অত সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ করিতে পারেন নাই। প্রাচীন ঋগ্বেদে আছে

"পয়ো ন ধেনুঃ শুচির্বিভা বা"

যেমন ধেনু দুগ্ধের দ্বারা সকলের উপকার করেন, তেমনি অগ্নি দীপ্তপ্রভায় আমাদের উপকার সাধন করুন।

সে উপকার বড় অল্প নহে। যেমন আহার ব্যতীত প্রাণধারণ করা অসম্ভব, সেই রকম গোজাতির অভাবে আমাদের জীবনযাপন করা বড়ই সুকঠিন।

গাভী দুগ্ধ দান করে—বৃষ ভূমি কর্ষণ করে এবং গোময় ও গো-মূত্র—গোরোচনাও আমাদের অনেক উপকার সাধন করে।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উক্ত হইয়াছে—

"ইতঃ সিক্তং সূর্য্যগতং চন্দ্রমসে রসং কৃধি বারাদং জনয়াগ্নেঽগ্নিং"

অগ্নিতে হুত হব্যবস্তু আদিত্যকে পাইয়া জলরূপে পরিণত হয়। পরে দ্যুলোকে চন্দ্রের এবং ভূলোকে ধান্যাদি ঔষধির বৃদ্ধিসাধন করে। সেই ধান্যলব্ধ পদার্থে আমাদের শরীর পুষ্ট হয়। অতএব এ বর্ষণের কারণও অগ্নি। সুতরাং এরূপ শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ যজ্ঞাগ্নির সঞ্চয় কর।

শ্রুতি অন্য আর একস্থলে বলিয়াছেন—

"দ্রবাশ্চ স্কন্দ পৃথিবীমনু"

বৈশ্বানর-অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হবি জলবিন্দুরূপে পরিণত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়। "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে। এই প্রবাদ বাক্য ভারত ছাড়া কথা না

থাকার পক্ষে প্রকৃষ্ট সমর্থনকারী।" তেমনি বেদছাড়া যে তত্ত্ব নাই, বেদে যা অঙ্কুরিত তাহাই যে সংহিতাদিতে পল্লবিত, এই কথা প্রমাণিত করিতেই যেন মনু বেশ বিশদভাবে পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন—

"অগ্নৌ প্রস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।"

আমরা এমনই হইয়া পড়িয়াছি যে, যে হবি আমাদের এত উপকারক—সেই হবির অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা গাভীর আজ আর তেমন সম্মান করিনা—তাহাকে তত ভাল চোখে দেখি না—তার উপর অত্যাচার করিতেও কুণ্ঠিত হই না।

আজকাল আমাদের ক্রিয়াকাণ্ডের প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে না পাওয়ার পক্ষে বিকৃত হবিও কারণসমষ্টির মধ্যে অন্যতম একটী।

ব্যষ্টিগত চেষ্টা না হইলে, তাহা সমষ্টিতে পরিণত হইবে না। যদিও গো-পালন বৈশ্যের কাজ—তবুও দেশ-কাল-পাত্র ভাবিয়া এখন আমাদের গো-পালনের দিকে একটু বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যাহাতে বৃষ কলঙ্কিত না হয়, বৎস বিনষ্ট না হয়—গাভীও অত্যধিক পীড়নে ধ্বস্ত না হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করিতে হইবে। কএক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গবাসীতে পড়িয়াছিলাম—কোনও একস্থলে মনীষী পণ্ডিতবর্গের ব্যবস্থা অনুসারে মৃত্তিকার বৃষ উৎসর্গ করা হইয়াছিল। সেই জন্য আজ এখানে আমি সবিনয়ে প্রার্থনা করি আপনাদের সম্মিলিত চেষ্টা যেন এরূপ ব্যবস্থার বিরোধী হয়, এবং বৃষ বা পুংবৎস যদি কেহ গোমুণ্ডচ্ছেদনকারীর নিকট বিক্রয় করেন—তাহা হইলে তাঁহাকেও যেন পণ্ডিত-সমাজ হইতে অপাংক্তেয় করা হয়।

আরও একটী ব্যবস্থার সবিশেষ প্রয়োজন। প্রতিগ্রামে গোচারণের জন্য একটী স্থান যেন রক্ষিত হয়। শ্রুতি ও মনুস্মৃতি গোচারণের পৃথক্ স্থানের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সাক্ষী প্রদান করিতেছেন—

প্রিয়া পদানি পশ্বো নিপাহি
বিশ্বায়ুরগ্নে গুহা গুহং গাঃ"

ঋগ্বেদ ৩।১।৬ সূক্ত

হে অগ্নি তুমি বিশ্বের আয়ুঃ। অতএব গবাদি পশুর চরণস্থানে গমন করিও না। তাহারা গোচারণ স্থানে গমন করুক। তুমি গুহাগত হও।

শ্রুতির এই অর্থ স্মৃতিও অনুগমন করিয়াছেন :—

"ধনুঃশতং পরীহারোঃ গ্রামস্ত স্যাৎ সমন্ততঃ।

৮।২৩৭

ক্ষুদ্রগ্রামের চারিধারে চারিশত হাত জমি গোচারণের জন্য অনাবাদ রাখিবে।

এখন উপযুক্ত বৃষের অভাবে জীর্ণ শীর্ণ লাঙ্গল-যোজিত বৃষের দ্বারা গাভীর গর্ভাধান করান হয়। আমরা আত্মনির্ভরতাকে চিরদিনের মত বিসর্জ্জন দিয়াছি, কাজেই প্রতিকথায় প্রতিকার্য্যে গভর্ণমেণ্টের সহায়তার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতে হয়। রাজা দৃষ্টি না করিলে অবিলম্বে বৃষকুল নির্ম্মূল হয়; সেইজন্য এইরূপ একটী আইনের জন্য—সহৃদয় গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করা হউক উৎসৃষ্ট বৃষকে যেন কেহ বধ করিতে না পারে—এবং যেন সাধারণের অর্থে পুষ্ট ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ও মিউনিসিপালিটী হইতে গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে বৃষ রক্ষিত হওয়ার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়।

আর ব্রহ্মণ্যদেবের ভক্ত ব্রাহ্মণ জমিদারবর্গের নিকট সানুনয় নিবেদন যেন তাঁহারা ব্রহ্মণ্যের পূর্ণজ্যোতিতে জাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া উল্লিখিত প্রস্তাব কয়টী কার্য্যে পরিণত করেন। একথা খুবই ঠিক যে—ব্রহ্মণ্যের—

"পাইয়া পবিত্র স্পর্শ
জাগিবে ভারতবর্ষ
ঘুচে যাবে হিংসা দ্বেষ গ্লানি হাহাকার"।

এই মঙ্গলমুহূর্ত্তকে বিফলে অতিবাহিত করিলে আমাদের ভবিষ্য বংশধরগণ কবির সঙ্গে এক সুরে গাহিয়া নিজেদের মানসিক দৈন্য দূর করিতে চেষ্টা করিবে—

"আজিরে সজল নেত্রে
জিজ্ঞাসি এ পুণ্যক্ষেত্রে
আছ কি তোমরা যোগী লুকাইয়া কোথা—?
নির্ব্বাণমন্ত্রে কি হায়,
পরাণও নিবিয়া যায়,
কিছু নাই শেষ তার নিবেছে সকল?"

এখন আশা ব্রহ্মণ্যদেবকে—উদ্দেশে শত শত প্রণাম করিয়া—ব্রাহ্মণের পদরজঃ সহিত আপনাদের আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধরিয়া হৃদয়ে শান্তিলাভ করিব।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ।

সদাচার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ৺ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং গৌরীপুরাধিপতি ধর্ম্মপরায়ণ বান্ধবর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের ন্যায় উদারচরিত্র নিঃস্বার্থ দেশোপকারী মনস্বী যদি বহুলভাবে ভারত অলঙ্কৃত করেন, তবে এই দেশে শাস্ত্রচর্চ্চা ব্যাপকভাবে উপস্থিত হইয়া উদীয়মান সূর্য্যালোকের মত জ্ঞানালোক প্রতি গৃহে ছড়াইয়া অজ্ঞতারূপ তিমিররাশি অপসারিত করিতে পারে।

বৈদেশিক শিক্ষার আধিক্যে শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা দিন দিন বাড়িতেছে। সুতরাং সদাচার বিলুপ্তপ্রায়। এই সকল দুঃখে একজন কবি বলিয়া গিয়াছেন ঃ—

"বিদ্যাসাগরপারমারদচিরাদাচারিতা চোরিতা"

বৈদেশিক শিক্ষা অর্থকরী এবং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপরায়ণ শাস্ত্রসেবী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের অর্থ-কৃচ্ছ্রতা,—এই দুইটী দেখিয়া সাধারণের নিকট বৈদেশিক শিক্ষা ব্রতরূপে গৃহীত হইতেছে। এবং বাল্যকাল হইতে ঐ শিক্ষা অভ্যস্ত হওয়ায় স্ব স্ব জাত্যুচিত সংস্কার বিলুপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

বাল্যকাল হইতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মোচিত সদাচার যদি অভ্যস্ত না হয়, তবে তাহার অভ্যুদয় আশাতীত।

এইজন্য নীতিশাস্ত্রে কথিত আছে যে, যেরূপ নূতন পাত্রে লগ্ন চিহ্নাদিস্বরূপ সংস্কারের অন্যথা হয় না, সেইরূপ বাল্যকাল হইতে সদাচারাদির শিক্ষা না দিলে ঐ শিক্ষা দৃঢ় সংস্কারে পরিণত হয় না। ঐ ধর্ম্মস্থাপন করিতে গেলে ধর্ম্মমন্দিরও চতুষ্পাঠী স্থাপন বিশেষ প্রয়োজন। অন্য উপায়ে সদাচারাদির সুশিক্ষা হয় না।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবাসিগণ সহাধ্যায়ী বা সদা দৃশ্যমান বৈদেশিকগণের আচার-ব্যবহার, বেশভূষা প্রভৃতি নিরীক্ষণ করিয়া তদনুকারী হইয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মূলমন্ত্র সদাচার নিঃশেষভাবে হারাইতে বসিয়াছেন। কিন্তু যাহাদের অনুকরণ করিয়া আমরা অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিতেছি, সেই প্রতীচ্য জাতি স্বধর্ম্মসংরক্ষণবিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থল।

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"—ইহা তাঁহারাই বুঝিয়াছেন।

যাঁহারা মনে করেন প্রতীচ্য জাতির অপ্রতিহত আধিপত্যবিস্তারের কারণ কেবলমাত্র নীতিমূলক কৌশল, তাঁহারা ভ্রান্ত।

'প্রতীচ্য জাতি স্বজাত্যুচিত ধর্ম্ম (আচার)সর্ব্বদা অকুতোভয়ে রক্ষা করেন বলিয়া লক্ষ্মীদেবীর স্থায়ী কৃপার পাত্র হইতে পারিয়াছেন।' (আচার প্রবন্ধ) ইহাই আমার বিশ্বাস।

সদাচার রক্ষা করিলে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়; তাহাতে মন ও শরীর দৃঢ় হয়। মন এবং শরীর বলবান হইলে, সকল-কার্য্য অনায়াসে সম্পাদন করিতে পারা যায়।

প্রথম তিনটী দোষ নিবারণ করা বিশেষ দুঃসাধ্য নহে। কারণ, কোন বিশ্বাসী শাস্ত্রজ্ঞের কথায় বিশ্বাস করিয়া বিধি-নিষেধ জানিতে পার।

ইচ্ছা করিলে অনুষ্ঠায়ীদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা না দেখাইতে পার, এবং বৈদেশিকগণের অনুকরণ ত্যাগও করিতে পার। সুতরাং এই ৩টী দোষ প্রবলতম নহে। শেষোক্ত দুইটী দোষ, স্বেচ্ছাচারিতা ও আলস্য, নিরন্তর শাস্ত্রচর্চ্চাপূর্ব্বক সদনুষ্ঠান না করিলে নিবারিত হইতে পারে না। স্বেচ্ছাচারিতা এবং আলস্য মনুষ্যের স্বাভাবিক দোষ, ইহা আগন্তুক নহে, সুতরাং ইচ্ছা করিলেই ইহা ত্যাগ করা যায় না।

বেদ, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের চর্চ্চা নিয়তভাবে করিতে পারিলে এবং তৎসম্মত কার্য্য নিয়তভাবে করিলে উক্ত দোষ দুইটী পরিহার করিতে পারা যায়।

স্বেচ্ছাচারিতা পশু ধর্ম্ম। পশুরা ইচ্ছা হইলেই শয়ন করে, ইচ্ছা হইলেই ভোজন করে, খাদ্যাখাদ্যের বিচার তাহারা রাখেনা। ক্রোধের তাহারা দাস, ক্রোধ হইলেই তৎক্ষণাৎ তদনুরূপ কার্য্য করে। কাম নিয়তই তাহাদের অনুগামী। ভগবানের সৃষ্টরূপে সকল জীব সমান হইলেও অদৃষ্টের প্রবলতা নিবন্ধন জীবের মধ্যে মনুষ্যের বিচার শক্তি অধিক। ঐ শক্তিকে কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে বিধিনিষেধজ্ঞানসাধন শাস্ত্রকে আশ্রয় করিতে হইবে।

শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এবং সঙ্কীর্ণ জাতির পক্ষে যথাযথরূপে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ আছে।

ঐ শাস্ত্রকে আদেশকরূপে এবং নিজেকে আজ্ঞাবহরূপে গণ্য করিয়া চলিতে শিখিলে, স্বেচ্ছাচারিতার করাল কবলে পড়িতে হইবেনা এবং দুর্দ্দমনীয় আলস্য ও উপশমিত হইয়া যাইবে। কারণ যে সময়ের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা অনতিবিলম্বে করিতেই হইবে; যেহেতু শাস্ত্র প্রভু বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। শাস্ত্রের আদেশ মানিতে হইলে, ইচ্ছানুসারে শয়ন, ভোজন, পরিধান ও নিজের স্বাভাবিক রুচির সাফল্য কিছুই চলিবেনা। তাহাতে জীবনের অশান্তি হয় না, বরং শান্তি অধিক পরিমাণে বাড়ে।

আলস্যপরতন্ত্রলোক শীতকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে পারেন না; কিন্তু শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপ্রতিপালনের অভ্যাস থাকিলে, জড়তানাশক সত্ত্বগুণের সমধিক অভিব্যক্তিবশতঃ কর্ত্তব্যের অনুরোধে, ঐ সময় শয্যাত্যাগ করিতে অনায়াসে সমর্থ হন।

শরীরের যথাবিধি কর্ত্তব্যপ্রতিপালনরূপ ব্যায়ামদ্বারা সর্ব্বতোমুখী শারীরিক স্ফূর্ত্তি আবির্ভূত হয়।

সুতরাং, এইরূপে দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতারূপ মহাগুণ তাঁহাকে আশ্রয় করে। অতএব সর্ব্বসময়ে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম করিবার সামর্থ্যলাভ হয়।

শাস্ত্রে আছে "অসবঃ প্রকাণ্ডঃ" জীবন সদাচার বৃক্ষের কাণ্ড।

অর্থাৎ সদাচার প্রতিপালন করিলে মনুষ্যের আয়ু দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং দৃঢ় হয়!

দীর্ঘজীবনের পক্ষে অনেকগুলি কারণ আছে, তাহার মধ্যে মনের শান্তি, পিতামাতার সদাচার, বৈধ ভক্ষ্য ভক্ষণ, অভক্ষ্য ত্যাগ, শম, দম, দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা এবং চরিত্রশুদ্ধি এইগুলি প্রধানতম কারণ।

শাস্ত্রসম্মত পথে চলিলে এইগুলি তাহার পক্ষে করায়ত্ত হয়।

ফলাকাঙ্ক্ষা প্রতিনিয়ত হৃদয়ে পোষিত হইলে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফল না ফলিলে, হৃদয়ে তৃপ্তি থাকে না; এবং ক্রমশঃ কর্ম্মের প্রতি কর্ম্মীর অবিশ্বাস সংঘটিত হয়। সংসারী হইলে কর্ম্ম করিতেই হইবে, কিন্তু সর্ব্বদা অশান্তি হৃদয়ে জাগরূক হইলে কর্ম্মকরা কঠিন হয়।

কর্ম্মজীবনের ব্যাঘাত ঘটিলে দীর্ঘজীবন লাভ হয় না। শাস্ত্রবিশ্বাসী সদাচারী ফলাকাঙ্ক্ষার দুর্ভাবনায় পড়িয়া বিক্ষিপ্ত হন না।

পিতামাতার সদাচারিতা না থাকিলে জাতব্যক্তির জন্মশুদ্ধি না থাকায়, নীরোগতা হয় না। সুতরাং অকালমৃত্যু অনতিবিলম্বে গ্রাস করে। সন্তানের দীর্ঘজীবন এবং সাধুশীলতা যাহাতে হয়, প্রতিগৃহস্থেরই তাহা কর্ত্তব্য।

খাদ্যের সহিত মনের বিশেষ সম্বন্ধ, খাদ্যের দোষ থাকিলে মন মলিন হয়। মনে মালিন্য আসিলে, শারীরিক বৃত্তি অবসাদ প্রাপ্ত হয়।

ভক্ষ্যবস্তুর সহিত মনের যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহার পক্ষে শ্রুতিপ্রমাণ—

"দধ্নঃ সৌম্যমথ্যমানস্য যোঽণিমা স ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি তৎসর্পি র্ভবতি।

এবমেব খলু সৌম্যান্নস্যাশ্যমানস্য যোঽণিমা স ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি, তন্মনো ভবতি।"

হে সৌম্য! দধি মন্থনকালে তাহার যে সূক্ষ্ম অংশ, তাহা ঊর্দ্ধে উঠে; এবং তাহা যেমন ঘৃতরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ ভক্ষণকালে ভক্ষ্যমাণ দ্রব্যের যে সূক্ষ্ম অংশ তাহা ঊর্দ্ধে উঠে এবং তাহা মনরূপে পরিণত হয়।

ইহাতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে যে, মন ভক্ষ্য দ্রব্যের অনুযায়ী হয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাও ইহা স্থিরীকৃত হয়। ভোজনকালে বিঘ্ন ঘটিলে, মানসিক অশান্তি হয়। মনকে উন্নত না করিতে পারিলে, শরীর উন্নত করা যায় না। শরীর উন্নত না হইলে, কর্ম্মজীবন নষ্ট হয়। কর্ম্মজীবন নষ্ট হইলে, শ্রীবৃদ্ধি অসম্ভব হইয়া পড়ে।

মনকে উন্নত করিতে গেলে ভক্ষ্য ভক্ষণ এবং অভক্ষ্য ত্যাগ অবশ্যই করিতে হইবে।

মন উন্নত হইলে, অর্থাৎ সত্ত্বগুণ সমুদ্ভাসিত হইলে, তাহার আজ্ঞাবহ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও সত্ত্বগুণময় হইয়া দেবভাব প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়ের রাজসিকতা বা তামসিকতা আসুরভাব। এই আসুরভাব থাকিলে, মনের দেবভাব—অর্থাৎ সৎপথে থাকা—কঠিন হয়। অর্থাৎ মন স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিষয়ে ধাবমান হইয়া পড়ে।

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিষয়ে সর্ব্বদা আসক্ত ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়তার অভাবে দুঃসাধ্য রোগপীড়িত হইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। যে যে দ্রব্যের ভক্ষণে মনের চাঞ্চল্য প্রভৃতি দোষ উপস্থিত হয়। সেই সকল দ্রব্যের ভক্ষণ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে।

মনুও উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া গিয়াছেন যে,—

"অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ।
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যু র্বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥"

বেদ অভ্যাস না করিলে, সদাচার পরিত্যাগ করিলে, আলস্য এবং খাদ্যদোষ ঘটিলে মানুষ অল্পায়ু হয়।

সর্ব্বপ্রকার লক্ষণহীন হইলেও মানুষ যদি সদাচারযুক্ত হয়, সে শতবর্ষজীবী হয়। এই কথাও মনু চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়া গিয়াছেন।

সর্ব্বলক্ষণ হীনোঽপি যঃ সদাচারবান্ নরঃ।
শ্রদ্ধধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি॥
"বিত্তানি শাখাশ্ছদনানি কামাঃ॥"

সদাচার-বৃক্ষের ধন শাখা, এবং অভিলাষ পত্র।

সদাচার ধনবত্তার পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায়। অর্জ্জন, রক্ষণ, এবং বর্দ্ধন এই ত্রিবিধ উপায় সামান্যতঃ ধনবত্তা সিদ্ধ হয়।

সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তির মন সত্ত্বগুণময় হইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সক্ষম হয়। বিচারশক্তি রীতিমত ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শরীর শাস্ত্রসম্মত নিয়মের বাধ্য হইয়া দিন দিন উৎসাহসম্পন্ন হইয়া যথাবিহিত কার্য্য সম্পাদনে নিপুণতম হয়। এই সকল শক্তি যাহার, তাহার আবার অর্থ উপার্জ্জনের পক্ষে ভাবনা কি?

বিলাসিতার বিজয় পতকা উড়াইয়া যাঁহারা অর্থ ব্যয় করেন। যাঁহারা অস্থায়ী ভোগের উচ্চ আসনে বসিয়া কালযাপনে পরিণামে রুগ্ন শরীর হইয়া পড়েন। তাঁহাদের নিয়ত অসদ্ব্যয় দ্বারা অর্থনাশ বশতঃ ধনের বর্দ্ধন এবং রক্ষণ ঘটে না।

যাঁহারা সদাচারী, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ অন্তরায় উপস্থিত হয় না। সুতরাং ধনরক্ষণ ও ধনবর্দ্ধন তাঁহাদেরই একমাত্র অধীন, ইহাই আমার বিশ্বাস।

যে পুত্ররত্ন সংসার যাপনের পক্ষে অদ্বিতীয় সহায় বলিয়া বিশ্বপ্রচারিত, প্রতি সদাচারী পক্ষে সেইরূপ সু সন্তান উৎপন্ন হয়।

কোন কোন অসদাচারীর পক্ষে সু সন্তান দেখিতে পাওয়া যায় বটে, তাহা জন্মান্তরীন বলবৎ শুভাদৃষ্টের গুণে। ঐ শুভাদৃষ্টেরও বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে, মূলে সেই শুভাদৃষ্ট সম্পাদক জন্মান্তরীয় সদাচারই অনুমিত হয়।

আরও এককথা সদাচারপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেরই পক্ষে সুসন্তান হয়। কিন্তু প্রতি অসদাচারীর তাহা হয় না।

এইজন্যই মনু বলিয়াছেন—

"আচারাল্লভতে হ্যায়ু রাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধন মক্ষয্য মাচারোহন্ত্যলক্ষণম্॥"

সদাচার হইতে দীর্ঘজীবন, উৎকৃষ্ট সন্তান, ও অক্ষয় ধনলাভ হয়, এবং স্বাভাবিক কোন দুর্লক্ষণ থাকিলেও নষ্ট হয়।

সদাচারী ব্যক্তির সত্বগুণ বর্দ্ধিত হওয়ায় ধারণাশক্তি খুব প্রবল হয়। সর্ব্বদা শিক্ষিত বিষয় গুলি চিত্তে প্রতিভাত হয়।

যেহেতু দর্শনশাস্ত্রে কথিত আছে যে "সত্বং লঘুপ্রকাশকম্" অর্থাৎ সত্বগুণ জড়তা নষ্ট করে, এবং বস্তু প্রকাশ করে। উপনিষদেও এই সকল কথা সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে—যে,

"আচার শুদ্ধৌ সত্বশুদ্ধিঃ, সত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ, স্মৃতিশুদ্ধৌ চ সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।"

সদাচারের উৎকর্ষ হইলে সত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, সত্বগুণের বৃদ্ধি হইলে শিক্ষিত বিষয়গুলির স্মৃতি বিদ্যুতের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া সর্ব্বদা হৃদয়কে আলোকিত করে। স্মৃতির ঐ জাতীয় উৎকর্ষ হইলে সর্ব্বপ্রকার প্রতিবন্ধক নষ্ট হয়।

স্মৃতি এবং প্রতিভা এই দুইটী পাণ্ডিত্যলাভের পক্ষে একমাত্র উপায়। এই দুইটী উপায় হস্তগত হওয়ায় সদাচারীব্যক্তি বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া প্রচারিত হ'ন।

সত্বগুণময় সদাচারী যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা কখনও ব্যাহত দেখা যায় না। কারণ তাঁহার ইচ্ছা ধর্ম্মের সহিত অবিরুদ্ধ! এই জন্যই "ছন্দানি কামাঃ" এই কথা বলা হইয়াছে।

ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাম অতিশয় দূষ্য।

ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাম ফললাভেও উপশমিত হয় না। উহার দ্বারা কেবল দুঃখলাভই হয়।

"যশাংসি পুষ্পাণি"

সদাচার মহাবৃক্ষের পক্ষে যশপুষ্প।

সদাচারীব্যক্তি অনন্ত সাধারণ যশোলাভ করিয়া থাকেন। দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয়, সত্যবাদিতা, সংযম, পরোপকারিতা প্রভৃতি শিষ্টাচার যশলাভের প্রকৃষ্ট উপায়

এই সকল শিষ্টাচার সদাচারীর নিয়ত সহচর। সদাচারীগণ নিয়ত ধর্ম্মচর্চ্চাদ্বারা ভগবানের নিকট বিশিষ্ট পুরস্কার পাইয়া থাকেন।

সমাজের নিকটও চিরাদৃত শিষ্টাচারদ্বারা বিশিষ্ট শ্রদ্ধার পাত্র হ'ন। অর্থের দ্বারা সমাজ জয় হয় না।

যাহা প্রকৃত সমাজ বলিয়া গণ্য, তাহাকে নিয়তভাবে জয় করিতে গেলে প্রকৃত সদাচার আশ্রয় করিতেই হইবে। সমাজের প্রতি রাজার যেরূপ অধিকার, একজন দরিদ্রব্যক্তিরও সেইরূপ অধিকার। সমাজ অর্থের দাস নহে। বহু সমাজে বড় বড় ধনী স্বেচ্ছাচারীতাব অদম্য মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া বাস করিয়া থাকেন। সমাজ যদি অর্থের দাস হইত, তাহা হইলে

সেই সকল সমাজ, পলকে পলকে তাঁহাদের ইঙ্গিতে চলিত। কিন্তু তাহা ঘটে না। এখনও পদে পদে সমাজকে শিষ্টাচার পরায়ণ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে স্থিত দেখিতে পাওয়া যায়।

সমাজই হইতেছে যশঃ এবং তন্মূলক আধিপত্য পরীক্ষার স্থল। সুতরাং শিষ্টাচারী ব্যক্তির যশঃ সিংহাসন অধিকার করা সহজসাধ্য বলিয়া মনে হয়।

এই শিষ্টাচার কেবলমাত্র বাহিরে বা কেবলমাত্র অভ্যন্তরে রাখিলে চলিবে না। বাহিরে এবং অভ্যন্তরে এই দুই দিকেই দেখাইতে হইবে। দুইদিকের শুচিতাই শুচিতা।

এইজন্যই মনু—বেশশুদ্ধি, ভাষাশুদ্ধি সকলদিকেই দৃষ্টি করিয়াছেন।

"ফলঞ্চ পুণ্যম্"

এই সদাচার বৃক্ষের ফল পুণ্য।

সদাচারীব্যক্তির সাত্ত্বিকতার প্রাবল্যে মন অতিশয় শক্তিযুক্ত হইয়া ধ্যান-ধারণাদি ধর্ম্মময়-কার্য্যে নিয়ত তৎপর হইতে পারে।

সর্ব্বদা নিয়ম প্রতিপালন করায় শরীর নীরোগ হইয়া বিশেষরূপে কার্য্যক্ষম হয়।

সর্ব্বদা নিষ্ঠা করার অভ্যাস থাকায় শরীর কঠোর তপস্যাদি করিলেও পরিশ্রমে কাতর হয় না। অর্থাৎ কার্য্যকারিতা বাড়ে। এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সদাচারের গুণে দীর্ঘজীবন লাভ হয়। অতএব দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সেই সমস্ত জীবন ধরিয়া পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে একজীবনে সাধারণ বহুজীবন সংগ্রাহ্য বহুতর ধর্ম্ম সংগৃহীত হইতে পারে।

সুতরাং উপসংহারে বক্তব্য এই যে সদাচার পরায়ণ ব্যক্তি দীর্ঘজীবন, ধর্ম্মচর্চ্চা, দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা, পরিশ্রম শীলতা, মনের প্রতি আধিপত্য, নীরোগিতা, এবং সংযম প্রভৃতি গুণ-সমূহ ভূষিত হইয়া স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিষয় স্রকচন্দনবনিতাদির প্রতি অভিলাষ শূন্য হইয়া সারাজীবন ধরিয়া চিরসুখময় জীবনের একমাত্র উপায় ধর্ম্মময় কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে পারেন।

নচেৎ সংসার সংগ্রামে প্রবলপ্রতিপক্ষ মনরূপ গুপ্তস্থানে নিয়ত নিলীন পাপবাসনারূপ দুষ্ট পিশাচীর করাল ভ্রূকুটির বিভীষিকায় অবশ্যই পড়িতে হইবে। তাহা হইলে চিরদুঃখ বিকটাস্য হইয়া গ্রাস করিবে।

এইজন্য মনু বলিয়া গিয়াছেন যে—

"দুরাচারোহি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।
দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেবচ॥

সদাচার বর্জ্জিত মানুষ সংসারে সর্ব্বদা নিন্দিত হয়। এবং সর্ব্বদা দুঃখ ও রোগ ভোগ করে সুতরাং তাহার জীবন অল্পকাল স্থায়ী হয়।

এই সকল সদাচার প্রভৃতি যাবৎ ধর্ম্মকার্য্য চালাইবার ভার ব্রাহ্মণের উপর। বিশ্বসম্রাট জগদীশ্বর ব্রাহ্মণের উপর ধর্ম্মকোষের ভার দিয়া এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা মনু বলিয়াছেন।

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে।"

ব্রাহ্মণ ধর্ম্মকোষ রক্ষা করেন বলিয়া সকলপ্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

অতএব যাহাতে দেশে দেশে শাস্ত্রীয় নিয়ম প্রতিপালনাদির সুব্যবস্থা হয়, তাহা ব্রাহ্মণ-মাত্রেরই কর্ত্তব্য। এই কার্য্যে ব্রাহ্মণের শক্তি অধিক বলিয়াই ব্রাহ্মণের উপর সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বরের ভার নিপতিত। ইহা সর্ব্বদা ব্রাহ্মণমাত্রেরই মনে করা কর্ত্তব্য। ইহার অন্যথাচরণে ভগবানের নিকট হইতে দণ্ডিত হইতে হইবে। ইতি

শ্রীপঞ্চানন তর্কতীর্থ।

প্রাচীন ভারতে জড়-বিজ্ঞান।

যে ভারত একদিন জ্ঞানবিজ্ঞানের আদর্শ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। যে ভারতের আর্য্যজাতি শিল্পনৈপুণ্যের চরম উৎকর্ষ দেখাইয়াছিলেন। যে ভারতের আধ্যাত্মিকতা অদ্যাপি জগতে অতুলনীয়। যে ভারতের সঙ্গীতবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, পদার্থ-বিজ্ঞান, নাড়ীবিজ্ঞান, হোরাবিজ্ঞান প্রভৃতির আবিষ্কার-প্রণালী অদ্যাপি সুচতুর পাশ্চাত্য জগতেও চিন্তার অগোচরে রহিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না; সেই সর্ব্বসম্পৎপ্রসূ, অশেষ সুখের আস্পদ, পুণ্যভূমি ভারতের আর্য্য-সন্তান আমরা যখন আহার নিদ্রা প্রভৃতি লইয়াই ব্যস্ত। অগ্রপশ্চাতে দৃষ্টি প্রদানেরও অবসর নাই; আমরা যখন বিলাসবাসনা বিমুগ্ধ হইয়া অমূল্য সময়ের অসদ্ব্যবহার করিতে সুশিক্ষালাভ করিয়াছি; তখন আর আমাদের অধঃপতনের বাকি কি? কে বলিতে পারে আমরা চিরদিনই এইরূপ ছিলাম? তাই কবির ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—"চিরদিন কভু সমান না যায়"

আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা প্রাচীনকালের আর্য্যগণ, পার্থিব সুখসম্পদের নিদানভূত বিজ্ঞান চর্চ্চায় সবিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতেন না। অথবা জড়জগতের সহিত তাঁহাদের পরিচয় নিতান্ত অল্পই ছিল। তাঁহারা অন্তর্জগৎ লইয়াই সতত ব্যস্ত থাকিতেন। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জাতিই জড়বিজ্ঞান-বিস্তার চরম উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন। সত্য বটে পাশ্চাত্য-জাতি বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানালোকে সমগ্র পৃথিবী উদ্ভাসিত, বিস্মিত, স্তম্ভিত করিয়াছেন; কিন্তু প্রাচীন ভারতও যে জড়বিজ্ঞানে অন্ধ ছিলেন তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব? পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় প্রাচীনকালে ঋষিযুগেও জড়বিজ্ঞান চর্চ্চা ভারতে ছিল। বলা বাহুল্য—অতীতের আলোচনা করিতে হইলেই প্রধানতঃ আমাদিগকে ইতিহাসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমাদের রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থসমূহই বিশেষভাবে অবলম্বনীয় হইয়া পড়িবে সন্দেহ

নাই। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বেদ, পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাইব আর্য্যজাতির মধ্যে জড়বিজ্ঞানের কোনরূপ আলোচনা ছিল কিনা? অথবা তাৎকালিক সভ্যজগতে তাঁহাদের স্থান কোন উচ্চতম প্রদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল কিনা?

আর্য্যঋষি কবিগুরু বাল্মীকি, রামায়ণ-গ্রন্থে লঙ্কাকাণ্ডে রাবণাত্মজ ইন্দ্রজিতের যুদ্ধবর্ণনায় লিখিতেছেন,—

বলবান্ রাবণ-নন্দন কোথায় থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছেন; তাহা অবগত হইবারজন্য বানর-সৈন্যগণকে আদেশ করায় তাহারা উঁহার অনুসন্ধিৎসু হইয়া আকাশপথে বিচরণ করিতেছেন।

"আকাশং বিবিশুঃ সর্ব্বেমার্গমাণা দিশোদশঃ"

(রামায়ণ ৯৮৪ পৃঃ)

অর্থাৎ তাহারা সকলে দশদিক্ অন্বেষণ করিতে করিতে আকাশ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আবার ইন্দ্রজিৎ অন্তর্হিত থাকিয়াই রাম ও লক্ষ্মণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতেছেন।—

"যুধ্যমান মনালক্ষ্যং শক্রোপি ত্রিদশেশ্বরঃ।

দ্রষ্টুমাসাদিতুং বাপি ন শক্তঃ কিং পুনর্যুবাং" (১১ শ্লোক)

অর্থাৎ আমি যুদ্ধকালে যখন অলক্ষিত থাকি তখন ত্রিদশপতি ইন্দ্রও আমাকে দেখিতে পান না তোমরা কেমন করিয়া দেখিবে?

এখন আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারিনা কি? ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে "রাইট্" সাহেবের আবিষ্কৃত আকাশযান (arroplane) অপেক্ষা বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও ভারতে আকাশ-যান বা অন্তরীক্ষ গমনের উপায় সমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এরূপ ২।১ জন নহে—অনেক ব্যক্তির কথাই বলা যাইতে পারে যাঁহারা জড়বিজ্ঞানে অসাধারণ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন। রাবণের পুষ্পকরথ, দশরথের অকাশগামী রথ, নলরাজার অদ্ভুত দ্রুতগামী রথাদির কথা বিস্মৃত না হইলে "রাইট্সাহেবের" নবাবিষ্কার দেখিয়া, অথবা বর্ত্তমান পাশ্চাত্য যুদ্ধমান জাতির ব্যবহৃত আকাশগামীযান দেখিয়া অবাক হইবার কোন বিশেষ কারণ আমরা দেখিতে পাই কি?

সমুদ্র মধ্যগামী (Submarin) যান দেখিয়া যাঁহারা মনে করেন বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জাতির বিজ্ঞানশক্তি, জলচরকেও পরাজিত করিতেছে; জলের মধ্যে মানবের এবম্বিধ অব্যাহত গতি জগতে এইমাত্র নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এমন কি এরূপ বিজ্ঞান ভারতবাসীর স্বপ্নের অগোচর, ইহা কখনও আর্য্যজাতির কল্পনারাজ্যেও স্থান পায় নাই, তাঁহাদিগকে একবার মহাভারতে বর্ণিত দুর্য্যোধনের দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ কথাটা স্মরণ করিতে অনুরোধ করি।

"এবমুক্তা মহারাজ! প্রাবৃশত্তং হ্রদং নৃপঃ।

অস্তম্ভয়ত তোয়ঞ্চ মায়য়া মনুজাধিপঃ"॥

(মহাভারত হ্রদপ্রবেশ).

অগস্ত্য ঋষির সমুদ্র শোষণ যে বিজ্ঞানবলে সাধিত হইয়াছিল, সে বিজ্ঞান এই পতিত ভারতের পতিত আর্য্যজাতির পূর্ব্বপুরুষেরই আবিষ্কৃত। ইচ্ছানুরূপ যে কোনও স্থান হইতে জলোদগম করিতে দেখিয়া যে জড়বিজ্ঞানের পরিচয় আমরা পাইতেছি, শরশয্যাশায়িত স্বেচ্ছা-মৃত্যু কর্ম্মবীর ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা ভীষ্মদেবের তৃপ্তির জন্য বীরপ্রবর অর্জ্জুনের দ্বারা সাধিত জলোদগম তদপেক্ষা অধিকতর বৈজ্ঞানিকতার পরিচয় প্রদান করেনা কি?

বর্ত্তমান যুদ্ধে পাশ্চাত্য জাতি সুদূর প্রদেশ হইতে যন্ত্রসাহায্যে এক প্রকার বিষময় পদার্থ নিক্ষেপ করিয়া বিপক্ষদলের বলহরণ করতঃ অচেতন করিয়া ফেলিতেছেন দেখিয়া আমরা যে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রভূত প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। ইয়ুরোপের নব্যাবিষ্কৃত গুলিসমূহ যাহার সাহায্যে বৈরিদলকে বিনষ্ট না করিয়াও নিশ্চেষ্ট ও জ্ঞানশূন্য করা হইতেছে। যাহা দেখিয়া সমগ্র পাশ্চাত্যদেশ চমৎকৃত হইতেছেন। আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের লেখক মহাভারতের কবি মহর্ষি ব্যাসদেবের লিখিত বিরাটরাজের উত্তর গোগৃহে গোহরণ-কালে মহাবীর অর্জ্জুনের সম্মোহন বাণের প্রভাব যে তদপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে, একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন কি? একই রথে থাকিয়া একাকী সমুদ্রশৈকতবদসংখ্য কৌরবসেনা যিনি জয় করিয়াছিলেন, অথচ একটিমাত্রও প্রাণিহত্যা যাঁহার করিতে হয় নাই, তাঁহার কৃত সেই যুদ্ধ, বিজ্ঞানবলেই সাধিত হইয়াছিল।

ভোজপ্রবন্ধে দেখিতে পাই—

"ঘট্টৈকয়া ক্রোশ দশৈকমশ্বঃ।
সুকৃতিমো গচ্ছতি চারুগত্যা॥
বায়ুং দদাতি ব্যজনং সুপুষ্কলং।
বিণা মনুষ্যেণ চলত্যজস্রম্॥"

অর্থাৎ ভোজরাজার দেশে এবং তাহার নিকটস্থ জনপদ-সমূহে এতাদৃশ শিল্পবিদ্যানিপুণ লোক ছিলেন, যাহারা অশ্বের ন্যায় আকার বিশিষ্ট শোভনদৃশ্য একপ্রকার বাহন নির্ম্মাণ করিতেন, যাহা একঘন্টায় ১১শ ক্রোশ গমন করিতে পারিত। পরন্তু উক্ত বাহন ভূমিমার্গে যেরূপ গতায়াত করিত আকাশমার্গেও সেইপ্রকার যাতায়াত করিতে পারিত। এবং এতদ্ব্যতীত একপ্রকার পাখা প্রস্তুত হইত যাহা বর্ত্তমান ইলেক্‌ট্রিপাখারন্যায় মনুষ্য সাহায্য ব্যতীত কলাযন্ত্রের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে বাতাস প্রদান করিতে সমর্থ হইত। সুতরাং ইহাদ্বারা সহজেই বুঝিতে পারাযায় অধুনাতন আবিষ্কৃত ইলেকট্রিকান পূর্ব্বকালেও ছিল।

ত্রিকত্তিশেষ এবং জটাধরের "সৌভংকামচারিপুরং" দেখিলে মনে হয় এই কামচারিপুর জেপলিন ভিন্ন আর কিছুই নহে, শ্রীমদ্ভাগবতেও এতাদৃশ কামচারিপুরাদির অনেক বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

রসায়ন বিদ্যায় প্রাচীনকালের হিন্দুর কৃতিত্ব আজও জগতে অজেয়। বর্ত্তমান জ্ঞান বিজ্ঞানপূর্ণ দেশেও কুতব মিনারের অকলঙ্ক লৌহ স্তম্ভ, সদম্ভে পূর্ব্বগৌরব বিকাশ করিতেছে

নাকি? অক্‌সিজন নামক বায়ু লোহের উপর কার্য্য করিতে না পারিলেই লৌহে কলঙ্ক পড়ে না। কিন্তু উহা কোন্ প্রণালীর মিশ্রণের গুণে হইতে পারে তাহা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। এবং বিবিধ মন্দিরের উচ্চ চূড়া হইতে তলদেশপর্য্যন্ত তির্য্যক্‌ভা.ব নিপাতিত লৌহপাত দেখিলে পূর্ব্বকালের লৌহ গলাইবার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় নাকি? এইরূপ পারা শোধন ও তাহার উর্দ্ধপাতন ক্রিয়া প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন যুগেরই আবিষ্কৃত। নালিক যন্ত্র, সোরা, গন্ধক প্রভৃতি, বিবিধ ধাতুর সংমিশ্রণ; বারুদ প্রভৃতির প্রস্তুত-করণ ইত্যাদি পূর্ব্ব পূর্ব্বকালেও হইত, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ ও পরিচয় প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়।

বৃক্ষ লতা, পাতারদ্বারা নির্ম্মিত ঔষধ প্রণালী যে দেশের আবিষ্কার সেদেশের রসায়ন বিদ্যা, বস্তুবিজ্ঞান, ধাতুনির্ম্মাণ প্রভৃতি যে কতদূর বিস্ময়কর তাহা একবার ভাবিলে স্বতঃই মনে হয় কবি যথার্থ ই বলিয়াছেন—

"ধন্যাস্ত যে ভারত ভূমিভাগে"

ভারতের চিকিৎসা শাস্ত্রে যে অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিবার শক্তিও এখন আমাদের নাই। ডাক্তারেরা যন্ত্রসাহায্যে যে সমস্ত নাড়ী অথবা দেহের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি দর্শন করিয়া থাকেন, উহা একমাত্র হাতের নাড়ী টিপিয়া ধরিয়া যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিতেন, তাঁহাদের আবিষ্কার যে কতদূর বিস্ময়কর তাহা বলাই বাহুল্য। এই নাড়ীতত্ত্ব সম্বন্ধে শিবসংহিতায় লিখিত আছে—

"সার্দ্ধ লক্ষ ত্রয়ং নাড্যঃসন্তি দেহান্তরে নৃণাং।
প্রধান ভূতানাড্যস্ত তাসু মুখ্যাশ্চতুর্দ্দশ॥"

অর্থাৎ শরীরের মধ্যে প্রধানভূত সাড়ে তিনলক্ষ নাড়ী, তন্মধ্যে চতুর্দ্দশটি নাড়ীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। অস্ত্রবিদ্যাসম্বন্ধেও অনেক কথা চিকিৎসাশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্য ভয়ে সংক্ষেপে ২।১টী কথা লিখিত হইলমাত্র। যন্ত্র কতপ্রকার হইবে, এই কথার উত্তরে বলা হইয়াছে "যন্ত্রং শতমেকোত্তরং" অর্থাৎ একশত একটি যন্ত্র চিকিৎসকের প্রয়োজন সিদ্ধি বিষয়ে আবশ্যক এবং উক্ত অস্ত্রসমূহের আকৃতি এবং প্রস্তুতপ্রণালী, অস্ত্রসমূহের প্রয়োগান্তে ধৌত-করণ প্রকার প্রভৃতি উক্তগ্রন্থে বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে।

(সুশ্রুতঃ সূত্রস্থান ৭ম অঃ)

সমাহিতানি যন্ত্রানি খরশ্লক্ষ্ণ মুখানিচ।
সুদৃঢ়াণি সুরূপাণি সুগ্রহাণিচ কারয়েৎ॥

এবং উক্তগ্রন্থে অষ্টম অধ্যায়ে শস্ত্রসম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে "বিংশতিঃশস্ত্রাণি"

যদাসুনিশিতং শস্ত্রং লোমচ্ছেদিসুসংস্থিতং।
সুগৃহীতং প্রমাণেন তদা কর্ম্মসুযোজয়েৎ॥ ইত্যাদি।

সুতরাং ইহা হইতে জানিতে পারাযায় বর্ত্তমান পাশ্চাত্য চিকিৎসাপদ্ধতি প্রচারের বহুবৎসর

পূর্ব্বে কাশীরাজ দিবোদাস বা ধন্বন্তরীর সময়ে প্রকাশিত শুশ্রুত নামক গ্রন্থে যে অস্ত্র চিকিৎসা-প্রণালী এবং শস্ত্র ব্যবহার রীতি বিবৃত হইয়াছিল, তাৎকালিক চিকিৎসকেরা উহা অবগত ছিলেন। কাজেই আমরা দেখিতে পাই হিন্দুগণ জড়বিজ্ঞান-সম্বন্ধে বর্ত্তমানকালের ন্যায় চিরদিনই অন্ধ ছিলেন না।

রামের মস্তক শ্যামের স্কন্ধে বসাইয়া দেওয়া যায়, পশুমস্তক মনুষ্যদেহে সংযোজিত করিতে পারা যায়, ইহা এই ভারতের আর্য্যসন্তান ব্যতীত আর কেহই অদ্যাপি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। আশা আছে ভবিষ্যতে কোনদিন হয় ত পাশ্চাত্য সভ্যজগতে তাহাও প্রমাণিত হইবে। তখন দক্ষের ছাগমুণ্ডে ও গণেশঠাকুরের গজমুণ্ডে আর কাহারই অবিশ্বাসের কারণ থাকিবে না।

পুরুষ নিরপেক্ষ কেবলমাত্র দুইটি স্ত্রীলোকের সংসর্গেও যে, সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে তাহাও উক্ত শুশ্রুত গ্রন্থেই কথিত হইয়াছে। যথা—

"যদা নার্য্যাবুপেয়াতাম্ বৃষস্যন্ত্যৌ কথঞ্চন।
মুঞ্চন্ত্যৌ শুক্রমন্যোন্য মনস্থি স্তত্র জায়তে॥"

(শারীর স্থান ২য় অঃ)

অর্থাৎ রমণীদ্বয় কামার্ত্তা হইয়া সঙ্গতা হইলে, তাহার ফলে অস্থিবিহীন সন্তান উৎপন্ন হয়। তাই ভগীরথের জন্ম এইদেশেই হইয়াছিল এবং তাদৃশ অস্থিশূন্য জীবদেহে অস্থিদান কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহারও পরিচয় এই ভারতের ঋষি অষ্টাবক্র প্রদান করিয়াছিলেন। এরূপ বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব ভারতের হিন্দু ভিন্ন আর কোন দেশের কেহ এপর্য্যন্ত অবগত হইতে পারিয়াছেন বলিয়াও আমরা জানিতে পারি নাই।

আমরা হিন্দুর কাব্য, দর্শন, পুরাণ, আয়ুর্ব্বেদ, সংহিতা প্রভৃতি যে কোন গ্রন্থই অধ্যয়ন করিতে যাইনা কেন, তাহাতেই যে কাঁচ বা স্ফটিকের উল্লেখ দেখিতে পাই, উহাও যে বৈদেশিক পাশ্চাত্য কৃতির নবাবিষ্কৃত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করিনা ইহা আমাদের অসাধারণ ভ্রম নহে কি ?

ভোজরাজকৃত "যুক্তিকল্পতরু" নামক গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য নির্ব্বিরোধে স্বীকার করিবেন যে পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের আর্য্যজাতিরা বহুবিধ সমুদ্রযান নির্ম্মাণ করিতেন। এবং সমুদ্রগমনোপযোগী কম্পাস্ অর্থাৎ দিক্‌নির্ণায়ক যন্ত্রাদিও তাঁহাদিগের ছিল। পরন্তু চুম্বকাকর্ষণ ভয়ে যেভাবে পূর্ব্বকথিত যানসমূহ নির্ম্মিত হইত তাহাও উক্ত পুস্তকে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এবং বিভিন্ন ধাতুসকলের সংমিশ্রণ কৌশলাদি বিষয়েও যে তাঁহাদিগের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তাহারও পরিচয় পাইতে পারেন। আমি এস্থানে সংক্ষেপে ২।১টি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম মাত্র।

"বিভিন্ন জাতিদ্বয় কাষ্ঠজাতা, নশ্রেয়সেনাপি সুখায় নৌকা।
নৈষা চিরং তিষ্ঠতি পচ্যতেচ, বিভিদ্যতে বারিনিমজ্জতে চ॥"

অর্থাৎ বিভিন্ন জাতীয় কাষ্ঠদ্বয় বিনির্ম্মিত নৌকা স্থায়ী হয় না, উহা শীঘ্রই পচিয়া যাইতে পারে, এবং জলমগ্ন হইতে পারে। আবার চুম্বকের খবরও তাঁহারা দিতেছেন।

"ন সিন্ধু গাগ্যার্হতি লৌহবন্ধং তল্লৌহকান্তৈ র্হিয়তে হি লৌহং"।

অর্থাৎ সমুদ্র গমনোপযোগী যান নির্ম্মাণ করিতে হইলে তাহাতে লৌহবন্ধন [illegible] কর্ত্তব্য নহে, কেননা অয়স্কান্ত অর্থাৎ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হইলে উ[illegible] [illegible] সুতরাং তৎপরিবর্ত্তে অন্যান্য ধাতুর দ্বারা উক্ত বন্ধনকার্য্য সমাধা করিতে হইবে। যথা—

ধাত্বাদীনামতোবক্ষ্যে নির্ণয়ং তরিসংশ্রয়ং।
কনকং রজতং তাম্রং ত্রিতয়ম্বা যথাক্রমং॥

অর্থাৎ সুবর্ণ, রৌপ্য অথবা তাম্র কিম্বা উক্ত ধাতু সমূহ বিমিশ্রিত করিয়া তাহার দ্বারায় তথাকথিত যান সমস্ত নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

এখন বোধ হয় আর কাহারই অবিশ্বাস করিবার কারণ থাকিবে না যে পূর্ব্বকালের হিন্দু-জাতি চুম্বকের সংবাদ রাখিতেন। জলযান নির্ম্মাণ, ধাতুসংমিশ্রণ-প্রণালীও তাঁহাদের অবিদিত ছিল না। অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে জলযুদ্ধপোত কিরূপভাবে নির্ম্মিত হইত তাহারও পরিচয় যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে এইরূপ পাওয়া যায়। যথা—

"লঘুতা দৃঢ়তাচৈব গামিতা ছিদ্রতা তথা।
সমতেতি গুণোদ্দেশে নৌকানাং সংপ্রকাশিতং॥
এবং বিচিন্ত্য যোরাজা নৌকাযানং করোতি চ।
স চিরং সুখমাপ্নোতি বিজয়ং সমরেশ্রিয়ং॥"

এখন যে জলতত্ত্ব বুঝিতে হইলে আমাদিগকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ঋগ্বেদের প্রমাণিত মিত্র ও বরুণকেই বা কেন "অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন" নামে অভিহিত করিতে পারা যাইবে না? এবং তাহাই যে তাঁহারা করেন নাই তাহাইবা কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? যদি তাহাই সত্য তথ্যরূপে সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা হইলে প্রাচীন ভারতে জল প্রস্তুত-প্রণালী লোকলোচনের অগোচরে ছিল একথা কখনই স্বীকা[illegible] করা যাইতে পারে না। হিন্দুর দর্শনশাস্ত্রকারগণ জলের গুণ, আস্বাদ প্রভৃতি কিছুই তাঁহাদের গ্রন্থে বিবৃত করিতে ত্রুটী করেন নাই। পঞ্চভূততত্ত্ব যাঁহারা আলোচনা করিবেন তাঁহারাই এ বিষয়ের প্রকৃষ্টপ্রমাণ পাইবেন সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে সূর্য্যালোকে বা চন্দ্রলোকে যাইবার পথান্বেষী হইয়াছেন; ভারতের হিন্দু-বিজ্ঞান সে পথ বহু পূর্ব্বেই দেখাইয়া গিয়াছেন একথা বলাই বাহুল্য মাত্র।

সঙ্গীত-বিদ্যার যিনি আবিষ্কারক তাঁহার বিজ্ঞতার তুলনা আছে কি? শব্দের শক্তি জড়-বিজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে; এই শক্তির বিকাশ-প্রণালী তাঁহারা কেমন করিয়া [illegible] সম্যগ্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমানযুগে চিন্তার অগোচরে রহিয়াছে না—কি?

যে পরিণামবাদ শুনাইয়া "ডারউইন সাহেব" বাহবা লইয়াছেন তাহাও হিন্দু দার্শনিকগণ বাদ দেন নাই। হিন্দুর সাংখ্যশাস্ত্রকার কপিলদেবের শ্রীমুখ-কমল হইতে যে বাদ শুনিয়া ভারতবাসী শ্রবণ পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, তাহার তুলনা হইতে পারে এমন কোন নূতন বাদ আছে কিনা তাহা আমরা জানি না। কণাদ ও বৈশেষিকের পরমাণুবাদ আজ এইমাত্র পাশ্চাত্য জগতে নূতন প্রচারিত হইতে বসিয়াছে। ক্রমবিকাশ বা সৃষ্টিরহস্ত আর্য্যজাতির কোনদিনই অবিদিত ছিল না।

এখন আমাদের উপসংহারে বক্তব্য এই যে পূর্ব্বকালে আর্য্যজাতি যে কেবলমাত্র অন্তর্ব্বিজ্ঞানের আলোচনাই করিতেন তাহা সত্য নহে। জড়বিজ্ঞানেও তাঁহারা অসামান্ত শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদিগের অকৃতি সন্তান তাই প্রাচীনকালের শক্তির অবতার জ্ঞান-গুরু মহাত্মাগণের শক্তি ও জ্ঞানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিনা কাজেই মনে হয়—

"তেহি নো দিবসা গতাঃ"

একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় জড়-বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞান পরস্পর বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত। জড়ের সূক্ষ্মতত্ত্ব জ্ঞান না হইলে অন্ত তত্ত্ব বুঝিবার শক্তি কেমন করিয়া হইবে? ফলতঃ ভারতীয় মুক্তিপ্রিয় ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু জানিতেন, অধ্যাত্মিক উন্নতিব্যতীত কেবলমাত্র জড় লইয়া সময় ক্ষেপ করা জ্ঞানবানের পক্ষে অজ্ঞতারই পরিচায়ক, তাই তাঁহারা পরমার্থ চিন্তাকেই শেষ কর্ত্তব্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাজেই ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্র ও ইতিহাসগ্রন্থে প্রধানরূপে আধ্যাত্মিকতা বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারতাদি গ্রন্থই তাহার প্রমাণ।

যাঁহারা তথোক্ত গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করিতে একান্ত অসম্মত, তাঁহাদিগকে আর কি বলিব? তবে তাঁহাদের বিশ্বাসের পক্ষপাতকে ধন্তবাদ। কেননা তাঁহারা নেপোলিয়নের অদ্ভুত কীর্ত্তিগাথা অসঙ্কোচে বিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু অর্জ্জুন বা ইন্দ্রজিতের বীরত্বকাহিনী বিশ্বাস করিতে অসম্মত। তাঁহারা পাশ্চাত্যজাতির নবাবিষ্কৃত কৃত্রিম মনুষ্য বিশ্বাস করিতে পারিবেন, কিন্তু রাবণের মায়াসীতার কথা শুনিলেই ভ্রূকুটী কুটিল কটাক্ষে উপহাসের বীভৎস হাসিতে দিগ্বলয় মুখরিত করিয়া তুলিবেন। তাঁহারা বলিতে পারেন কি? নেপোলিয়নের অদ্ভুত বীরত্বে আস্থা স্থাপন করিবার ইতিহাস ভিন্ন আর কোন কিছু প্রমাণ আছে কি? তাঁহারা বলিতে পারেন কি? পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের বাক্যই আমাদের নিকট ইষ্টমন্ত্র হইতে পা[illegible]; স[illegible]র্শী সর্ব্বজ্ঞ মুক্তাত্ম ঋষিগণের কথা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না কেন? প্রক্ষিপ্ত-বাদের অবলবন্যায় সমস্তই ভাসাইয়া দিলে চলিবে কেন? পরন্তু যাহা যাহা এতদিন অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইত; বর্ত্তমান কর্ম্মবীর শক্তিসম্পৎ পাশ্চাত্যজাতির জ্ঞানগবেষণার ফলে সেই সমস্তই এখন সুসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। আমাদের সর্ব্বথা মনে রাখা উচিত এই সুবিপুল বিশ্বে অসম্ভব কথাটাই একান্ত অসম্ভব। এই চিরপ্রসিদ্ধ কর্ম্মভূমি-ভারতে অনন্তকাল হইতে কত কৃতকর্ম্মা মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে এবং কত কত অদ্ভুত কর্ম্ম তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন, তাহার পরিমাণ স্থির করিতে কেহই সমর্থ হইতেছেন না। স্থানে স্থানে

দর্শন দেখিয়া এবং অতীতের ইতিহাসকে অবলম্বনমাত্র করিয়া যথাসম্ভব স্থির
। বর্ত্তমান কর্ম্মবীর সাহিত্যিকগণের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে আমরা যে তাহার
কথাঙ্ক ঃ পাইতেছি না তাহাও বলা যাইতে পারে না।

ফলকথ নিজের সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র জ্ঞানের মাপকাটি লইয়াই যদি সকলকে সম্ভব অসম্ভবের সীমা বুঝিতে হয়, তাহা হইলে এই বৈজ্ঞানিক-যুগের অনেক জড়বিজ্ঞানকেও জড়ের ন্যায় উপেক্ষা করিতে হয় এবং বঙ্গের উজ্জলরত্ন জগদীশচন্দ্রের নবাবিষ্কৃত জড়বিজ্ঞানকেও উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে হয়। অবিশ্বাসের তীব্রঝঞ্ঝায় উড়াইয়া দিবার দিন এখন আর নাই। বর্ত্তমান পাশ্চাত্যবিজ্ঞানই ভারতের ইতিহাসের পূর্ণরূপে সমর্থন করিয়া তাহার সত্যতা প্রকটিত করিয়া তুলিতেছে নাকি?

অজ্ঞান আমারা সুগাঢ়-নৈশ-অন্ধকারাবৃত সংকীর্ণতার নির্জ্জন গিরি-গহ্বরে নিস্পন্দ-শরীরে অবস্থিত থাকিয়া, প্রাচীন আর্য্যযুগে সমুদিত বিজ্ঞান-জ্ঞান-প্রদীপ্ত ভারতের নির্ম্মলতা, কার্য্য-কুশলতা প্রভৃতির উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব তাই কবির কথা মনে হয়।

"সহিকুলেমে জনমহামারা বাঁদীয়া খেঁচেড়ি।"

সত্যবতী-বিবাহ।

সত্যবতী ধীবর কন্যা পিতার কর্ম্মসাহায্যার্থ যমুনার ঘাটে লোকপারাপারে নাবিকের কার্য্য করিতেন। তাঁহার গাত্রে মৎস্যের গন্ধ ছিল; পরাশর ঋষির কৃপায় তাঁহার দেহের দুর্গন্ধ দূরীভূত হইয়াছে। এখন তিনি যোজনগন্ধা, তিনি যে স্থানে থাকেন তাহার চতুর্দ্দিকে যোজন-ব্যাম পারিজাতের পরিমলের ন্যায় সদ্গন্ধে আমোদিত হয়।

মৃগয়াবিহারী শান্তনু রাজার নাসিকায় সেই গন্ধ পহুছিল, তিনি গন্ধ আঘ্রাণ করিতে করিতে এদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কোথা হইতে এমন প্রাণোন্মাদকর সৌরভ ছুটিয়াছে, এযে স্বর্গীয় পরিমল? পৃথিবীরাজ্যে ইহার সম্ভাবনা কোথায়? একি কুবেরভবনের সৌগন্ধিকা? না নন্দনবনের পারিজাত?

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, যমুনার জলে নৌকার উপর যেন একটা সৌদামিনী স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, এই অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যশালিনী রমণীরত্ন অবলোকন করিয়াই রাজা বুঝিতে পারিলেন ইনিই এ সদ্গন্ধের একমাত্র আকর। রাজবুদ্ধি তখন আরও সূক্ষ্মতত্ত্বে প্রবেশ করিল; তিনি ভাবিলেন এরমণী মানবী নহেন; কোন দেবী আমাকে ছলনা করিবার জন্য যমুনার ঘাটে নৌকার উপর রহিয়াছেন।

তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বিনয়নম্রভাবে মধুর বচনে অগ্রে নিজ পরিচয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ভামিনি! আমি চন্দ্রবংশসম্ভূত আমার নাম শান্তনু, আমি হস্তিনার রাজা আপনার দেহ হইতে প্রসৃত দিব্য গন্ধ আঘ্রাণে আকুল হইয়া এস্থানে আসিয়াছি। আপনার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করুন, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আপনি সামান্যা রমণী নহেন। আপনি কাহার কন্যা? কেনইবা নৌকার উপর বসিয়া আছেন?

সত্যবতী বলিলেন,—আমি দাশরাজের দুহিতা, পিতার আদেশে যমুনার ঘাটে নাবিকের কার্য্য করিতেছি, আমার নাম সত্যবতী।

রাজা শান্তনু মনে মনে চিন্তা করিলেন, "ইহা ছলনা" দাশকুলে কখনই এমন রমণীর উদ্ভব হয় নাই। কোন দেবী আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ জন্য ভূমণ্ডলে আবির্ভূতা হইয়াছেন। আমি পূর্ব্বে যেরূপ জন্মান্তরীয় সুকৃতিবলে দেবী জাহ্নবীর অনুগ্রহলাভ করিয়াছিলাম, এখনও বুঝি তাহাই হইবে। যাহাই হউক দাশরাজের নিকট প্রার্থনা করিয়া কন্যারত্নটী গ্রহণ করিব।

রাজা শান্তনু, দাশরাজকে নিজের কামনা জানাইলেন দাশরাজ, অতি বিনীতভাবে করযোড়ে বলিলেন, মহারাজ! এইরূপ বর পাইলে কি আর কন্যা সম্প্রদানে অপেক্ষা করা যায়। একটী কথা আছে, যাহার জন্য অসিত নামক দেবর্ষির প্রার্থনাও প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। আপনি একটী অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলেই, আমি কন্যা সম্প্রদানে সম্মত হইব।

শান্তনু বলিলেন,—কিরূপ প্রতিজ্ঞা? পূর্ব্বে শুনা যাক্, পরে সম্ভব হইলে পালনে স্বীকৃত হইব। দাশরাজ বলিলেন,—এই কন্যার গর্ভজাত পুত্রকে হস্তিনার রাজসিংহাসনের অধিকারী করিতে হইবে।

শান্তনু, কামানলে দগ্ধ হইলেও, দেবব্রতের ন্যায় সর্ব্বগুণ সম্পন্ন পুত্ররত্ন বিদ্যমানে, সত্যবতী-পুত্রকে রাজ্যদানে সম্মত হইলেন না। সত্যবতীর অলৌকিক রূপের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে হস্তিনায় চলিয়া গেলেন।

হস্তিনার রাজপ্রাসাদেও শান্তনুর শান্তি নাই, তাঁহার হৃদয় যেন শূন্য বোধ হইতেছে, কয়েক দিন যাইতেছে তিনি রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করেন না। দেবব্রত, পিতার ঈদৃশ অবস্থা অবগত হইয়া তাঁহাকে মানসিক ব্যাধির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজা বলিলেন,—পুত্র! তুমি একপুত্র হইলেও তোমাকে শতপুত্রেরও অধিক বলিয়া মনে করি। তোমার বীর্য্য অপ্রতিম, আমি নিশ্চয়ই জানি যুদ্ধব্যতীত তোমার মৃত্যু নাই, এই নিমিত্তই আমি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে পরাঙ্মুখ।

কিন্তু শাস্ত্রে দেখিলাম, ঋষিগণ, একপুত্রতা ও অনপত্যতা সমান বলিয়া বর্ণনা করেন, তন্নিমিত্তই নানারূপ দুর্ভাবনা আমার হৃদয়ে স্থান পাইতেছে। অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্ম-কর্ম্ম অপত্যের ষোলকলার এক কলাও নহে। এই হেতুই আমি ভাবিতেছি, ভগবান্ নাকরুন নিতান্ত দুর্দৈবাধীন তোমার অভাব ঘটিলে ভরতবংশের সন্তান বিচ্ছেদ হইবে।

দেবব্রত, পিতার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, বৃদ্ধ অমাত্যের সহিত মন্ত্রণা করিলেন, অমাত্যগণ হইতে সত্যবতী বৃত্তান্ত আদ্যন্ত অবগত হইয়া, বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ সমভিব্যাহারে দাশরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। দাশরাজ দেবব্রতের যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিলেন। দেবব্রত, পিতার নিমিত্ত কন্যা প্রার্থনা করিলে, দাশরাজ বলিলেন, এতাদৃশ সম্বন্ধ সর্ব্বদাই প্রার্থনীয়, এইরূপ শ্লাঘ্য সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া কেনা অনুতাপ করিবে? ইহাতে একটী দোষ আছে, – তোমার পিতার নিকটও বলিয়াছি, তাহা আর কিছুই নহে, সপত্নীপুত্রের বিদ্যমানতা, এই কন্যার গর্ভজাত পুত্র রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলে কন্যা সম্প্রদানে আমার বিন্দুমাত্রও অসম্মতি নাই। তখন দেবব্রত, সকলের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিলেন;—আমি রাজ্য লইব না, ইহার পুত্রই আমাদের রাজা হইবে। পুনর্ব্বার দাসরাজ বলিলেন, আপনার অভিপ্রায় সাধু, আপনি রাজ্য না লইতে পারেন, কিন্তু আপনার বলবিক্রমশালী পুত্রগণ, কি কখনও রাজ্যের ন্যায্য অধিকার পরিত্যাগ করিবে? দেবব্রত, পুনর্ব্বার প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি পিতার মনোবাসনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, অদ্য হইতে চির ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলাম, আমি দার পরিগ্রহ করিব না, এই সাধু ব্রতের ফলেই পুত্রবাণের গতি লাভ করিব।

দেবব্রতের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া দাশরাজ আনন্দিত হইলেন। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, দেবদুন্দুভি নিনাদিত হইল, সিদ্ধ মহর্ষিগণ সাধু সধু বলিতে লাগিলেন, এবং এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য তাঁহাকে ভীষ্মনামে অভিহিত করিলেন।

তখন দেবব্রত ভীষ্ম, সত্যবতীকে বলিলেন, মা! আপনি রথে আরোহণ করুন, হস্তিনার রাজপ্রাসাদে চলুন। এই বলিয়া সত্যবতীকে লইয়া হস্তিনায় গমন করিলেন। শান্তনু হৃষ্ট হইয়া ভীষ্মকে স্বেচ্ছামৃত্যুতার বর প্রদান করিলেন। তাহার পর রাজা, যথাবিধি বিবাহক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক সেই রূপশালিনী কন্যাকে স্বগৃহে প্রবেশ করাইলেন। সেই কন্যার গর্ভেই কুরুবংশের রাজা বিচিত্রবীর্য্যের জন্ম হয়। ইহাই সত্যবতী বিবাহের মহাভারত বর্ণিত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

দেবযানীর বিবাহের ন্যায় সত্যবতীর বিবাহের দৃষ্টান্ত দ্বারাও কেহ কেহ প্রাচীন সমাজে জাতিভেদের শিথিলতা, সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পান। কেহ কেহবা বলেন, সত্যবতী কি শান্তনুরাজার রন্ধনগৃহে প্রবেশ করেন নাই? পূর্ব্বকালে জাতিভেদ দৃঢ় থাকিলে, মন্বাদি মহর্ষিগণের বিধানসমূহ সমাজে সমাদৃত হইলে, ভারতের সুপ্রসিদ্ধ রাজরাজেশ্বর শান্তনু, নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ্যভাবে ধীবর কন্যাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিতেন না, আর সেই কন্যা হইতে যে কৌরব ও পাণ্ডুবংশের বিবৃদ্ধি, সমাজে তাঁহাদেরও এতটুকু সম্মান হইত না। এই সকল কথা আলোচনা করিয়াই বাঙ্গালার কোনও সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, তৎকালে মনুর মত প্রচলিত থাকিলে, মহাভারতের নায়কগণ, সর্ব্বজাতীয়ের অপাঙ্‌ক্তেয় হইতেন।

আমরা আলোচনা করিয়া দেখাইব, দেবযানী বিবাহের ন্যায় সত্যবতী বিবাহও ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিতও নির্দ্দোষ কি না,

মহাভারতের আদিপর্ব্বে ৬৩ অধ্যায়ে বর্ণিত রহিয়াছে,—চেদিদেশের রাজা উপরিচরবসু মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। বসন্তকালে চিত্তচাঞ্চল্যবশতঃ তাঁহার রেতঃস্খলন হয়, ঘটনাক্রমে ঐ শুক্র যমুনার জলে পতিত হয়,—তথায় শাপগ্রস্তা মৎস্যরূপিণী অদ্রিকানাম্নী এক অপ্সরা বাস করিত, মনুষ্য প্রসব করাই তাহার শাপের অবধি ছিল। দৈবাধীন সেই মৎস্যী রাজার বীর্য্য ভক্ষণ করিল, ইহাতেই তাহার গর্ভের সঞ্চার হইল। কিছুদিন পর ধীবরেরা জালে আবদ্ধ করিয়া সেই প্রৌঢ়গর্ভা মৎস্যীটাকে তীরে উঠাইল। উদর পাঠিত করিয়া দেখিল, দুইটী যমজ-সন্তান জীবিত রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটী স্ত্রী ও একটী পুরুষ, এই মৎস্যী গর্ভজাত অদ্ভুত শিশুযুগল লইয়া ধীবরেরা রাজসভায় চলিয়া গেল। রাজা পুত্রটী স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, তাহার নাম হইল মৎস্যরাজ, আর কন্যাটী ধীবরকে প্রদান করিয়া বলিলেন এইটী তোমার পুত্রী হউক। কন্যার গাত্রে মৎস্যের ন্যায় গন্ধ ছিল বলিয়া তাহাকে সকলে মৎস্যগন্ধা বলিত, ফলতঃ তাহার প্রকৃত নাম সত্যবতী।"

ইহাতেই জানা যায় সত্যবতী দাশরাজের পালিতাকন্যামাত্র। সেই সময়েও সত্যবতীকে সকলে বসুকন্যা বলিয়া জানিত। অপ্সরা হয় ত শাপবিমুক্তির কালে সমস্ত প্রকৃত ঘটনা বলিয়া গিয়াছিলেন,—এই নিমিত্তই দেবব্রত, যখন পিতার সহিত সত্যবতীর বিবাহের প্রস্তাব করেন, তখন দাশরাজ সত্যবতী-পুত্রকে রাজ্য দানের কথা বলিবার পূর্ব্বেই সত্যবতীকে ধীবরকন্যা বলিয়া যাহাতে তাঁহার শঙ্কা না হইতে পারে তন্নিমিত্তই বলিলেন,—

অপত্য মেতদার্য্যস্য যো যুষ্মাকং সমোগুণৈঃ।
যস্য শুক্রাৎ সত্যবতী, সম্ভূতা বরবর্ণিনী ॥ ৭৯ ॥

১০১ অঃ আদিপর্ব্ব।

ভাবার্থ আপনারা সত্যবতীকে ধীবরকন্যা বলিয়া ভাবিবেন না, এবং ধীবর দৌহিত্রকে কিরূপে হস্তিনার পবিত্র রাজসিংহাসনে আরোহণ করাইবেন এই ভাবনাও ভাবিতে হইবে না। যে হেতু ইনি আর্য্যেরই অপত্য, অনার্য্য ধীবর হইতে ইহার উৎপত্তি নহে। যাহার শুক্র হইতে এই বরবর্ণিনী সত্যবতী-সম্ভূতা হইয়াছেন, তিনি কুল, শীল, গুণ প্রভৃতি বিষয়ে সর্ব্বতোভাবেই আপনাদের সমতুল্য। অতএব সত্যবতী-পুত্রকে রাজ্যদানের প্রস্তাব এক্ষেত্রে অন্যায্য বা অযোগ্য হইবে না।

বিশেষতঃ যেকালে পরাশরমুনি, সত্যবতীর রূপে মোহিত হইয়া তাহার সঙ্গম কামনা করেন, তখনও লোকে তাঁহাকে বসুকন্যা বলিয়া জানিত। মহাভারতে বর্ণিত আছে,—

দৃষ্টৈব স চ তাং ধীমান্ চকমে চারুহাসিনীম্।
দিব্যাং তাং বাসবীং কন্যাং রম্ভোরুং মুনিপুঙ্গবঃ॥

(৬৩ অঃ)

সেই মুনিশ্রেষ্ঠ পরাশর, চারুহাসিনী দিব্য বসুকন্যাকে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গম কামনা করিলেন। ইহাদ্বারা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি, ধীবর-কন্যার সঙ্গত হইবার ইচ্ছা পরাশরের হয় নাই।

শান্তনুরাজাও দর্শনমাত্রেই সত্যবতীকে দেবকন্যা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; পরে সম্ভবতঃ লোকমুখে সর্ব্বজনবিদিত সত্যবতীর অদ্ভুত জন্ম-বিবরণ অবগত হইয়াই দাশগৃহে কন্যা প্রার্থনা করেন। শান্তনু যখন ধীবরমুখে শুনিলেন, এই কন্যার পাণিগ্রহণ জন্য অসিত নামক দেবর্ষিরও আগ্রহ ছিল, তখনই তাহার সংশয় একেবারে বিদূরিত হইয়াছিল। হয় ত সেই নিমিত্তই অজিত বিক্রমশালী প্রভূত বল ও ঐশ্বর্য্যের অধিপতি রাজরাজেশ্বর শান্তনু ক্ষত্রোচিত রাক্ষসবিধানে সত্যবতীকে বলপূর্ব্বক হরণের আয়োজন না করিয়া এই তুচ্ছ নগণ্য ধীবররাজগৃহে কন্যার্থী হইয়াছিলেন, এবং প্রত্যাখ্যাত হইয়াও মনের বেদনা মনেই আবদ্ধ রাখিয়া নিঃশব্দে নিজভবনে প্রত্যাবৃত্ত হন।

দেবব্রতও যে অবিচারিতভাবে বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণের সহিত কন্যা প্রার্থনার নিমিত্ত ধীবরভবনে উপস্থিত হন,—তাহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, পিতার পবিত্র অন্তঃকরণ যাহাতে আসক্ত, তিনি কখনই ক্ষত্রিয়-জাতির বিবাহের অনর্হা নহেন।

সতাং হি সন্দেহ পদেষু বস্তুষু,
প্রমাণ মন্তঃকরণ প্রবৃত্তয়ঃ ॥

অথবা লোকপরম্পরায় সত্যবতীর জন্মবিবরণ সকলেই অবগত ছিলেন, সেই কারণেই ধীবরগৃহে কন্যাপ্রার্থনায় ভারতের শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়রাজকুমারের আগমন।

ইহার উপরেও কেহ কেহ বলেন যে, সত্যবতী বসু কন্যা হইলেও আজন্ম ধীবর গৃহে পালিতা ও বর্দ্ধিতা, দীর্ঘকাল কৈবর্ত্তের সংশ্রব ও তদীয় অন্নাদি আহার করায় তাহার পাতিত্য ঘটিয়াছে। শান্তনু রাজা, জানিয়া শুনিয়া এমন পতিত কন্যাকে বিবাহ করিলেন কেন? নিশ্চয়ই তৎকালে অন্ন বিচার প্রথা ছিলনা বা শিথিল ছিল, নচেৎ ঈদৃশ অশাস্ত্রীয় ঘটনা ঘটিতনা।

বাস্তবিক চেদি রাজ উপরিচর বসুর বীর্য্যপ্রসঙ্গে অপ্সর গর্ভ সম্ভূতা সত্যবতী ধীবর গৃহে পালিতা হইলেও—

"অমেধ্যাদপি কাঞ্চনং" বা "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি"

ইত্যাদি নীতি স্মরণ করিয়াই শান্তনু রাজা সেই অলৌকিক গুণশালি কন্যারত্নকে গ্রহণ করিতে যত্নপর হইয়াছিলেন। ইহাতে শাস্ত্রীয় দোষও ঘটে নাই।

দীর্ঘকাল পতিতের অন্নাদি ভক্ষণে পাতিত্য হয়, এই কথা সত্য, কিন্তু কন্যা সম্পর্কে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। অন্নাদি ভক্ষণে দূষিতা কন্যার কথা দূরে থাকুক, পতিত স্ত্রী পুরুষ হইতে উৎপন্না কন্যারও বিশুদ্ধ পুরুষের সহিত বিবাহ হইতে পারে, ঋষিদের এইরূপ আদেশ আছে।

পতিতোৎপন্নঃ পতিতো ভবত্যাহুঃ অন্যত্র স্ত্রিয়াঃ,
সাহি পরগামিনী, তা মনৃক্থা মুপেয়াৎ"

প্রায়শ্চিত্ত বিবেক ধৃত বশিষ্ট বচন।

অর্থ পতিতোৎপন্ন পুরুষ পতিতই হয়, কিন্তু কন্যা পতিত হয় না, কেননা সেই কন্যা পরগামিনী তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে কিন্তু পিতৃ দত্ত কোনও দ্রব্যাদি লইবেনা।

পতিতের প্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,

"কন্যাং সমুদ্বহে দেষাং সোপবাসা মকিঞ্চনাং"

পতিতের কন্যাকে উপবাস করাইয়া গ্রহণ করিবে, কিন্তু অন্য দ্রব্য কিছুই গ্রহণ করিবেনা।

হারীত ঋষি বলেন ;—

পতিতস্য কুমারীং বিবস্ত্রা মাপ্লাব্যা মহো রাত্রোপোষিতাং প্রাতঃ শুক্লেন বাসসাচ্ছাদ্য নাহ মেতেষাং মমৈবৈতে ইতি ত্রিরুচ্চৈরভিধানাং তীর্থেষু গৃহেষু বা উদ্বহেরন।

পতিতের কুমারী পিতৃদত্ত পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া বিবস্ত্রা অবস্থায় জলে অবগাহন করিয়া এক দিবারাত্র সম্পূর্ণ উপবাস থাকিবে এবং পর দিন প্রাতঃকালে শুক্লবস্ত্রে সমস্ত দেহ আচ্ছাদন করিয়া, "আমি ইহাদের নহে ইহারা আমারই" এই বাক্য উচ্চৈঃস্বরে তিনবার বলিলে পর কোনও তীর্থ স্থানে অগত্যা গৃহে এই কন্যাকে বিবাহ করিবে। বৌধায়ন ঋষি ইহার পরও আর একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা লিখিয়াছেন। (অবশ্য কোনও বিশুদ্ধ স্ত্রীপুরুষ ঘটনাক্রমে পতিত হইলে তাহার কন্যা সম্বন্ধেই এই ব্যবস্থা, বংশানুক্রমিক পতিতের সম্বন্ধে নহে) টিকা।

সত্যবতী পতিতোৎপন্না নহেন,—বালিকাবস্থায় পতিতের দ্বারা পালিতামাত্র, কিন্তু এই বিবাহেও যে ধর্ম্মজ্ঞ শান্তনুরাজা বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য, হারীত ও বৌধায়ন প্রভৃতি মহর্ষিগণের আদেশ মান্য করিয়া চলেন নাই, একথা কে বলিতে পারেন ?

মহাভারত পাঠে জানা যায়, সত্যবতীর বিবাহে দাশরাজ, যৌতুকাদি কিছুই প্রদান করেন নাই, সুতরাং "অনুকৃথা মুপেয়াৎ" এস্থলে বশিষ্ঠের এই উক্তি পালিত হইয়াছে।

কন্যাসম্প্রদানের জন্য জামাতা শান্তনুকেও স্বগৃহে আহ্বান করেন নাই বা স্বয়ং হস্তিনার রাজবাড়ীতে যাইয়া দানবাক্য করিয়া দেন নাই, ফলকথা দাশরাজের সহিত সত্যবতীর আর কোনও সম্বন্ধ নাই।

এই সকল কারণে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে ঋষিদের ব্যবস্থামত প্রায়শ্চিত্তের পরই সত্যবতীকে শান্তনুরাজা নিজগৃহে উঠাইয়াছেন, তাহার পূর্ব্বে নহে। মহাভারতেও এ কথার কিঞ্চিৎ আভাস আছে,—

ততো বিবাহে সম্পন্নে স রাজা শান্তনু নৃপ !
তাং কন্যাং রূপসম্পন্নাং স্বগৃহে সংন্যবেশয়ৎ।

১।১০২ অধ্যায় আদিকাঃ।

তাহার পর প্রায়শ্চিত্তাদির পর বিবাহ সম্পন্ন হইলে শান্তনুরাজা সেই রূপশালিনী কন্যাকে স্বগৃহে প্রবেশ করাইলেন। এইরূপ হইলে শান্তনুরাজা, মন্বাদি মহর্ষিগণের ব্যবস্থা লঙ্ঘন

করেন নাই, পতিতকন্যার প্রায়শ্চিত্তান্তে বিবাহের ব্যবস্থা বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ লিখিয়াছেন—শান্তনু তদনুসায়ী হইয়া কার্য্য করিয়াছেন।

অথবা সত্যবতী ধীবর-গৃহে অসংস্কৃতাবস্থায় পালিতা হইলেও পাতিত্যের সম্ভাবনা ছিল না, কেননা ইহা দ্বাপরযুগের ঘটনা। দ্বাপরযুগে ধীবরজাতি পতিত ছিল না।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে,—

"কলৌ তীবর সংসর্গাদ্ ধীবরঃ পতিতো ভুবি।"

কলিযুগে তীবর জাতির সংসর্গে ধীবর পতিত হইয়াছে—

এস্থানে আরএকটা কথা প্রণিধানযোগ্য আছে, ধীবররাজ এমন সুশীলা রূপযৌবনযুক্তা দেবকন্যা সদৃশী প্রাণাধিকা সত্যবতীকে যমুনার গোদারী ঘাটে নৌকা চালনের কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন কেন?

আমার বোধ হয় এই কন্যারত্ন ধীবরগৃহে আবদ্ধ থাকিলে উপযুক্ত বর তাহার সন্ধান পাইবে না এবং কথঞ্চিৎ পাইলেও, ধীবরগৃহে উপস্থিত হওয়া অসম্মানের বিষয় বিবেচনা করিবে, তন্নিমিত্তই সুচতুর দাশরাজ, রাজপথের খেওয়া ঘাটে কন্যাটীকে নাবিকের কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন।

সত্যবতী সম্বন্ধে অপর কথা এই যে, –বিবাহ-সংস্কার কন্যাতেই সুসিদ্ধ হয়, কিন্তু সত্যবতী পরাশরমুনির সংসর্গে সন্তান প্রসব করিয়াছেন, তাহার কন্যাত্ব দূরীভূত হইয়াছে, অতএব শান্তনুর সহিত তাহার বিবাহ যথাবিধি সম্পন্ন হয় নাই, কাজেই তদীয় গর্ভজাতপুত্র বিশুদ্ধ সন্তান নহে, এই নিমিত্ত পরবর্ত্তী ভারত-সন্তানগণের বিশুদ্ধতায় সন্দেহ।

এইরূপ সন্দেহের কারণ নাই, কেননা সত্যবতী পরাশর মুনির সঙ্গমপ্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া তাহার কন্যাত্বের ব্যাঘাতের কথা উত্থাপন করেন, তখন মুনি বলিলেন,—

"মৎপ্রিয়ং কৃত্বা কন্যৈব ত্বং ভবিষ্যসি"

(আদিপর্ব্ব ৬৩ অঃ ৭৮)

আমার প্রিয়কার্য্য করিয়া তুমি কন্যাই থাকিবে। এই ঋষিবাক্যেও যোনিসম্বন্ধে সত্যবতী কানন পুত্র-প্রসব করিয়াও ভ্রষ্টা বা অকন্যা হন নাই। অতএব সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে—সত্যবতী বিবাহে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ব্যাঘাতকর কোনও ঘটনাই ঘটে নাই, যাহাতে তদ্দৃষ্টান্তে পূর্ব্বকালে মন্বাদি ঋষির ব্যবস্থা অনাদৃত বা জাতিভেদ, অন্নবিচার শিথিল ছিল, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

অজ্ঞদিগকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিবার মানসে যাহারা সর্ব্বদা লেখনী সঞ্চালন করেন, তাহাদের উক্তির অসারতা প্রদর্শনপূর্ব্বক শাস্ত্রবিশ্বাসী ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইতেছে, তাহারা যেন এতাদৃশ কূটতার্কিকগণের মায় জালে আত্মহারা না হন।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্যসাঙ্খ্যতীর্থ।

সন্ধ্যাসম্বন্ধীয় আলোচনা।*

(প্রথম পত্রোত্তর)

বিজয়ার নমস্কারান্তে সবিনয় নিবেদন—

আপনার অনুগ্রহ লিপি পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়া আপনার আদেশ অনুসারে উত্তর লিখিতেছি।

১। "গায়ত্রী শিরসঃ" ইত্যাদি বাক্যের মধ্যে কোনও কোনও পুঁথিতে 'গায়ত্রীছন্দ' এবং কোনও কোনও পুঁথিতে (যজুষ্ট্বাৎ ছন্দো নাস্তি) পাঠ আছে। আমি শেষোক্ত পাঠই সঙ্গত গ্রহণ করিয়াছি। তাহার কারণ "আপোজ্যোতিঃ" ইত্যাদি শিরোমন্ত্রে আদ্যন্তে ওঁকার ধরিলে ষোল অক্ষর এবং উহা ছাড়িয়া দিলে ১৪ অক্ষর হয়। পিঙ্গলছন্দঃ সূত্রে, হলায়ুধ কৃত তদনুবাদে, এবং বঙ্গদেশের অদ্বিতীয় বৈদিক সত্যব্রত সামাশ্রমী মহাশয়ের সম্পাদিত 'সামবেদের উপক্রমণিকায়' বৈদিকছন্দের যে বিবরণ আছে, তাহাতে গায়ত্রীর নানাপ্রকার ভেদের মধ্যে কোন প্রকারেই ১৪ অক্ষর বা ১৬ অক্ষর নাই। পরন্তু রঘুনন্দন আহ্নিকতত্ত্বে ওঁকারাদির ঋষ্যাদি সম্বন্ধে সংবর্ত্ত ও যাজ্ঞবল্ক্যের কয়েকটী বচন তুলিয়াছেন। যথা 'ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষি র্দেবোঽগ্নিস্তস্য কথ্যতে। গায়ত্রীচ ভবেচ্ছন্দো নিয়োগঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥ * * গায়ত্র্যা ঋষ্যাদিকমাহ—বিশ্বামিত্রঋষি শ্ছন্দো গায়ত্রী সবিতেষ্যতে। দেবতা, বিনিয়োগশ্চ গায়ত্র্যা জপ উচ্যতে॥ প্রকৃতে চ প্রাণায়ামে বিনিয়োগো বোধ্যঃ॥ শিরসশ্চাহ—প্রজাপতি ঋষি শ্চৈবশিরসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ব্রহ্মা বায়ুশ্চ অগ্নিশ্চ সূর্য্যশ্চ দেবতাঃ স্মৃতাঃ। প্রাণস্যায়মনে চৈব বিনিয়োগ উদাহৃতঃ॥" উক্ত বচনে গায়ত্রী শিরের কোনও ছন্দঃই নাই। উহার টীকায় সংক্ষেপে একটু বিচার তুলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি—লিখিয়াছেন, সমস্ত বিচার তুলিতে গেলে বাড়িয়া যায় সেই জন্য এবং অনাবশ্যক বোধে তুলি নাই। আপনার যখন কৌতূহল হইয়াছে তখন নিম্নে তাহা লিখিলাম।

---

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয়ের আহ্নিককৃত্য নামক পুস্তকে প্রকাশিত সামবেদীয় সন্ধ্যার মন্ত্র ও অনুষ্ঠানবিধি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া উক্ত কবিরত্ন মহাশয়কে মুর্শিদাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছিলেন, গত ফাল্গুন সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে, বর্ত্তমান জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় কবিরত্ন মহাশয় প্রদত্ত প্রত্যুত্তরও প্রকাশ করা হইল, ব্রাহ্মণমাত্রের প্রধান উপাস্য সন্ধ্যার মন্ত্রাদিতে প্রকাশিত পুস্তক সকলে এবং হস্ত লিখিত পুস্তকেও অনেক বৈপরীত্য দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার যথোচিত সংস্কার হওয়া অত্যাবশ্যক। যদিও সাধারণের পাঠ্য পত্রিকাদিতে এইরূপ আলোচনা শাস্ত্রীয় হিসাবে সঙ্গত নয়, তথাপি ব্রাহ্মণ সামাজিক সাধারণের বুঝিবার অন্যবিধ উপায় বর্ত্তমানসময়ে সম্ভবপর বলিয়া মনে করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণ-সমাজ-পত্রিকাতেই ইহার আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম; অনধিকারী পাঠকগণ অবশ্যই এ অংশবাদদিয়া পাঠ করিবেন। বলা বাহুল্য—এই পত্রই চরম সিদ্ধান্ত নহে।

ব্রাঃ সঃ সঃ।

সারদাতিলকে আছে—"শিরসোহস্যা মুনিব্রর্হ্মা, ছন্দো বিদ্যাদিকা স্মৃতা। গায়ত্রী পরমা-আত্মাদ্ দেবতা কথিতাবুধৈঃ॥" এই বচন অনুসারে বাচস্পতি মিশ্র "গায়ত্রীশিরসঃ দ্বিপদা গায়ত্রীছন্দ লিখিয়াছেন এবং দ্বিপদা গায়ত্রীতে ৬+৬=১২ অক্ষর থাকা উচিত বলিয়া "ব্রহ্ম"পদটী তিনি বাদ দিয়াছেন। আদ্যন্তের ওঁকার ও ব্রহ্মপদ ত্যাগ করিলে ১২ অক্ষর হয়। রঘুনন্দন বাচস্পতি মিশ্রের সেই মতে দোষ দিয়া আহ্নিকতত্ত্বেই লিখিয়াছেন "ছন্দো-বৃদ্ধের্ব্রহ্মপদনেচ্ছন্তি। তন্ন। ষোড়শাক্ষরঃ কং দেব্যাগায়ত্র্যাস্ত শিরঃ স্মৃতম্। ইতি যোগি-যাজ্ঞবল্ক্য বিরোধাৎ। আদ্যন্তয়োরোঙ্কারমাদায় ষোড়শসংখ্যা পূরণম্। ছন্দোবৃদ্ধিরার্ষত্বেন সুঘটা।" অর্থাৎ বাচস্পতি মিশ্র ছন্দোনুরোধে যে ব্রহ্মপদ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা ঠিক নহে। যেহেতু যাজ্ঞবল্ক্যবচনে গায়ত্রীশিরঃ ষোড়শাক্ষর উল্লিখিত হইয়াছে। আদ্যন্তে ওঁকার ধরিয়া ১৬ অক্ষর পূর্ণ হয়। উহার দ্বিপদাগায়ত্রীছন্দ হইলে যে যে অক্ষর বাড়ে তাহা ঋষি বচন হেতু (অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য বচনে ১৬ অক্ষর থাকায় উপপন্ন হয়) দোষ হয় না।) পরন্তু যে যাজ্ঞবল্ক্য ১৬ অক্ষরের কথা বলিয়াছেন, সেই যাজ্ঞবল্ক্যেরই পূর্ব্বোক্ত বচনে ছন্দেরউল্লেখ নাই। বাচস্পতি মিশ্র যে শারদা তিলকের অনুসরণ করিয়াছেন, উহা তান্ত্রিকমত, বৈদিকে উহার অবসর নাই। বিশেষতঃ দেখাও যাইতেছে—শারদাতিলকের মতে—"গায়ত্রী শিরসঃ ব্রহ্মঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ পরমাত্মা দেবতা" এই পাঠ দাঁড়ায়, এবং বাচস্পতি মিশ্রের মতে মন্ত্রের পাঠ "আপোজ্যোতী রসোহমৃতং ভূর্ভুবঃ স্বঃ হয়। কিন্তু কোনও পদ্ধতিতেই সেরূপ পাঠ নাই। সকল পদ্ধতিকারই যখন পূর্ব্বোক্ত যাজ্ঞবল্ক্য বচন অনুসারে "প্রজাপতি ঋষি ব্র্হ্মবায়ুগ্নি সূর্য্যাশ্চতস্রোদেবতাঃ এবং মন্ত্রে ব্রহ্ম লিখিয়াছেন, তখন সেই বচন অনুসারে "গায়ত্রীছন্দঃ" হইতে পারে না। একবচন অনুসারে ঋষি ও দেবতা বসাইয়া, অন্য (তান্ত্রিক) বচন অনুসারে ছন্দঃ বসান সঙ্গত মনে হয় না।

"যজুষ্ট্বাৎ ছন্দো নাস্তি" যজুঃ (গদ্য) বলিয়া ছন্দঃ নাই। একথা মুখে বলা নিষ্প্রয়োজন বুঝিয়া এবং ভবদেবাদির পদ্ধতিতেও যজুর্মন্ত্রের স্থলে কুত্রাপি ঐরূপ পাঠ নাই দেখিয়া ওকথাটী মূলে বসাই নাই। ইহা মনে করাও বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে, তান্ত্রিক গায়ত্রীর অন্যবিধ শিরোমন্ত্র আছে, শারদাতিলক তাহারই গায়ত্রীছন্দঃ বলিয়াছেন, বাচস্পতি মিশ্র যাজ্ঞবল্ক্য-বচনে ছন্দঃ না পাইয়া শারদাতিলক অনুসারে বৈদিক গায়ত্রী শিরের ছন্দঃ ধরিয়াছেন শেষে ছন্দোরক্ষার জন্য দুইটা অক্ষর (ব্রহ্ম) ছাড়িয়া দিয়াছেন। এতাবতা বাচস্পতি মিশ্রের মত সর্ব্বথা হেয় হইতেছে।

(২।৩) আচমনের তিনটী মন্ত্র তৈত্তিরীয় আরণ্যকেই আছে (আর কোথাও নাই)। তাহাতে যেরূপ পাঠ আছে আহ্নিক-কৃত্যে ঠিক সেইরূপ পাঠই দিয়াছি। ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য ঐ গ্রন্থে প্রাতরাচমনের ব্যাখ্যায় প্রমাণস্বরূপ একটী শ্রুতি তুলিয়া লিখিয়াছেন—যদহ্নাৎ কুরুতে পাপং তদহ্নাৎ প্রতিমুচ্যতে। যদ্রাত্রিয়াৎ কুরুতে পাপং তদ্রাত্রিয়াৎ প্রতিমুচ্যতে॥ ইতি শ্রুতেঃ রাত্রি কৃতং পাপং রাত্রিরেব অবলুম্পতু।" আবার ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন গৃহ্য

পরিশিষ্টকার প্রাতরাচমন মন্ত্রটী ঐরূপেই তুলিয়া পরে লিখিয়াছেন—"সায়ং; বিশেষশ্চ সূর্য্যশ্চেতি মন্ত্রে সূর্য্যস্থানের অগ্নিপদ—মাবপেৎ, রাত্র্যহ্না, রাত্রিরহঃ, সত্যে জ্যোতিষী ত্যন্তে ক্রয়াৎ।" অর্থাৎ সায়মাচমনের মন্ত্র সূর্য্যশ্চেত্যাদি প্রাতরাচমনেরই ন্যায়; কেবল বিশেষ এই যে, সূর্য্য স্থানে অগ্নিঃ রাত্র্যা স্থানে অহ্না, রাত্রি স্থানে অহঃ এবং অন্তে (অর্থাৎ সূর্য্যো জ্যোতিষি স্থানে) সত্যে জ্যোতিষি বলিবে। এতাবতা মূলবেদ, সায়নভাষ্য তদুদ্ধৃত শ্রুতি, ও গৃহ্য পরিশিষ্টকার, সকলের মতেই, রাত্রিয়া (রাত্র্যা)............রাত্রি" এবং অহ্না........ অহঃ" প্রতিপন্ন হইতেছে।

গুণ বিষ্ণুর ব্যাখ্যানুসারে "রাত্র্যা .....অহঃ ও অহ্না.........রাত্রিঃ" দাঁড়ায় বটে, কিন্তু গুণ বিষ্ণুর টীকার পরবর্ত্তীকালে যে অনেক কারিকুরি ঘটিয়াছে—প্রচলিত বিকৃত পাঠকেই প্রকৃত মনে করিয়া কোনও পণ্ডিত যে ঐরূপ করিয়াছেন, অভিনব প্রকাশিত ভবদেব পদ্ধতির উপক্রমণিকায় তাহার অনেক উদাহরণ দেখাইয়াছি, এবং আহ্নিক-কৃত্যের ১৭১ পৃঃ (১১শ খঃ) তেও অনেক লিখিয়াছি গুণবিষ্ণুটীকার ঐরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় সামবেদের উপক্রমণিকায় উহার প্রতি অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন।

এস্থলে শাখাভেদে পাঠভেদ বলাও খাটেনা। যেহেতু তৈত্তিরীয় আরণ্যক যজুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ। সুতরাং যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যায় ঐরূপ মন্ত্র ত থাকিবেই। গৃহ্যপরিশিষ্টকার ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যাতে যখন ঐরূপ পাঠই ধরিয়াছেন (পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি) তখন ঋগ্বেদে উহার পৃথক পাঠ বা ঐ মন্ত্র নাই-ই। গোভিল ও সন্ধ্যাসূত্রে যখন মন্ত্র ধরেণ নাই, কেবল "সপ্ত বা ষোড়শ বা আয়মেৎ" বলিয়াছেন তখন সামবেদেও ঐ মন্ত্র নাই বুঝা যাইতেছে। নামকরণ, উপনয়নাদিস্থলে যে যে মন্ত্র সামবেদে নাই। গোভিলস্বীয় গৃহ্যসূত্রে সে সকল মন্ত্র আদৌ ধরেণ নাই। অন্নপ্রাশনের কোনও মন্ত্রই সামবেদে নাই বলিয়া তিনি অন্নপ্রাশনের সংস্কারও ধরেণ নাই। কিন্তু ভবদেব স্বীয় পদ্ধতিতে শাখান্তর হইতে সেই সেই স্থলে মন্ত্র ধরিয়াছেন। এবং রঘুনন্দনও তত্তৎস্থলে "মন্ত্রস্তু শাখান্তরাৎ উপাদেয়ঃ" লিখিয়াছেন। তাহার প্রমাণ দিয়াছেন—(যন্নাম্নাতং স্বশা খায়াং পারক্যমবিরোধিচ। বিদ্বদ্ভিস্তদনুষ্ঠেয়-মগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মবৎ ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টে কাত্যায়নঃ।" (সংস্কারতত্ত্ব)।

(৪) পুনর্মার্জ্জন সম্বন্ধে গোভিলের সন্ধ্যাসূত্রে আছে—"ততো মার্জ্জনম্ প্রণবেন, মহাব্যাহৃতিভিস্তিসৃভিঃ, গায়ত্র্যা, আপোহিষ্ঠাভিস্তিসৃভিঃ।" ছন্দোগপরিশিষ্টে আছে—"শিরসো-মার্জ্জনং কুর্য্যাৎ কুশৈঃ সোদক বিন্দুভিঃ। প্রণবো, ভূর্ভুবঃস্বশ্চ, সাবিত্রী চ তৃতীয়িকা। অব্দৈবত্যং ত্র্যচং চৈব চতুর্থমিতি মার্জ্জনম্।" রঘুনন্দন আহ্নিকতত্ত্বে উক্ত দুইটী বচনই তুলিয়া শেষোক্ত বচনের অর্থ লিখিয়াছেন—"ওঁকারঃ ভূরাদি ব্যাহৃতিত্রয়ং তৃতীয়া চ গায়ত্রী, চতুর্থম্ আপোহিষ্ঠেতি ঋকত্রয়মিতি, ইদং মার্জ্জনং মার্জ্জনক্রিয়াকরণমিত্যর্থঃ; ইঁহাদের সকলের মতেই প্রণবাদি দ্বারা মস্তকে জল দেওয়াই বুঝাইতেছে। জলে গায়ত্রীজপ করিয়া কেবল আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্রত্রয়ে জল দেওয়া বুঝায় না।

"ইতি স্মৃতিঃ" বলিয়া যে বচন তুলিয়াছি তাহাতে কেবল আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্রে কোন কোন থানে জলপ্রোক্ষণ করিতে হয়, তাহারই কয়প্রকার বিশেষ বিধি আছে। প্রণবাদি উল্লেখ নাই এবং সেই প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী যে জলে জপ করিতে হয়, তাহার কথাও নাই। আহ্নিকতত্ত্বের কোনও কোনও পুস্তকে ঐ স্থলে (ইতি রামায়ণম্) আছে। রঘুনন্দন প্রভৃতি নিবন্ধকারেরা অনেক স্থলে গ্রন্থ বিশেষের নাম নির্দ্দেশ না করিয়া কেবল স্মৃতি বলিয়া ধরিয়াছেন। আমি রামায়ণ অনেক দিন একবার সমস্ত পড়িয়াছিলাম। ঐ বচনের অনুসন্ধানের জন্য আর ঘাঁটি নাই। কোনও স্মৃতিতে জলে গায়ত্রী জপের কথা থাকিতেই পারে না; যেহেতু তাহা হইলে গোভিলেরও ছন্দোগ-পরিশিষ্টের উক্তি ব্যর্থ হয়। আর থাকিলেও তাহা সামবেদীর কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু গোভিলসূত্র ও ছন্দোগ পরিশিষ্টই সামবেদীর সমস্ত পদ্ধতির মূল। ইহা অধ্যাপকমাত্রেই অবগত আছেন।

(৫) ওঁ নমো ব্রহ্মণে ইত্যাদি বলিয়া যাঁহারা জলদেন, তাঁহারা উহার শেষে "ওঁ উপজায় নমঃ" বলিয়াও জল দিয়া থাকেন। উহাবংশ ব্রাহ্মণের প্রথম মন্ত্র। তাহাতে "উপজায়ত" পাঠ আছে। সায়ণাচার্য্যও উহাকে ক্রিয়াপদ (উপপূর্ব্বজন ধাতু লঙন্ত) করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং অর্থ লিখিয়াছেন "সামবেদম্ অধ্যেষ্ট" বংশ ব্রাহ্মণে উহার যেরূপ পাঠ আছে, হস্ত লিখিত ও মুদ্রিত সমস্ত সন্ধ্যাপদ্ধতিতেই ঠিক সেইরূপ পাঠই দেখা যায়। কেবল 'উপজায়ত' স্থলে "উপজায়চ" আছে এইমাত্র ভেদ। উহা অন্য মন্ত্র হইলে পদ্ধতিতে ঐরূপ পাঠ না থাকিয়া ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ' * ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ… ……ওঁ বায়বে নমঃ ওঁ মৃত্যবে নমঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ওঁ বৈশ্রবণায় নমঃ ওঁ উপজায় নমঃ" এইরূপ পাঠই থাকিত। কিন্তু সকল পদ্ধতিতেই আছে—

"ওঁ নমো ব্রহ্মণে, নমো ব্রাহ্মণেভ্যঃ………নমঃ বায়বে চ মৃত্যবে চ বিষ্ণবে চ নমো বৈশ্রবণায় চোপজায় চ।"

গোভিলের স্নান সূত্রে আছে—

"সবিতুরুপস্থানং নমো ব্রহ্মণ ইত্যুপজায়তেত্যেবমন্তেন।"

কর্ম্মপ্রদীপে আছে—

"উচ্চিত্র মিত্যৃগ্দ্বয়েন † চোপতিষ্ঠেদনন্তরম্ মধ্যে সূর্য্যোদয়ে চৈব বিভ্রাড়াদীযুয়াজপেৎ"

ছন্দোগপরিশিষ্টকার ঐ বচন উদ্ধৃত করিয়া বিভ্রাড়াদির আদিপদে বংশ ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। রঘুনন্দনও আহ্নিকতত্ত্বে লিখিয়াছেন "নমো ব্রহ্মণে ইত্যাদ্যুপজায়তে ত্যন্ত মন্ত্রেণ উপস্থানম্

---

* প্রণবাদি চতুর্থ্যন্তং নমস্কারান্তকীর্ত্তিতং স্বনাম সর্ব্বসত্ত্বানাম্ মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে। অর্থাৎ নিবেদন মন্ত্রের আদিতে ওঁ অন্তে নমঃ এবং মধ্যে চতুর্থ্যন্ত নাম বলিতে হয়।

† উদু উদুত্যং জাতবেদসম্ ইত্যাদি। চিত্রম—চিত্রং দেবানাম ইত্যাদি।

উক্তা গোভিলেন, অগ্নিস্তৃপাতু ইত্যাদিনা তর্পণম্ অভিধায়, 'ততঃ প্রত্যুপস্থানম্ গায়ত্র্যষ্ট শতাদীনি জপেতি সূত্রান্তারণ—গায়ত্রী জপরূপোপস্থানম্ উক্তম। ততশ্চ ছন্দোগানাম উপজায়তেত্যন্ত মুপস্থানম্। ততস্তর্পণাধিকারে তর্পণং বিধায়, গায়ত্রী জপং কুর্য্যাৎ।"

এখন গোভিলের মতে, কর্ম্মপ্রদীপের মতে, ছন্দোগপরিশিষ্টকারের মতে ও রঘুনন্দনের মতে উপজায়ন্ত পর্য্যন্ত উপস্থানই বুঝাইতেছে। কাহারও মতে জল দিবার কথা নাই। কোন বচনের বলে এতগুলি প্রমাণের খণ্ডন করা যাইতে পারে।

৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে গৌরবর্ণ একটী প্রাচীন অধ্যাপক কলিকাতায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন দুর্ভাগ্য ক্রমে তাঁহার নাম ধাম ভুলিয়া গিয়াছি। এই মাত্র তাঁহার পরিচয় মনে আছে যে, পাবনা দর্শনটোলের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহার স্মৃতির ছাত্র। তিনি বলিয়াছিলেন "পঠদ্দশায় আমাদের অধ্যাপকের পরিচিত একজন প্রাচীন অধ্যাপক আমাদের টোলে আসিয়া ৫।৭ দিন ছিলেন। আমরা তাঁহার সাক্ষাতেই সন্ধ্যা করিতাম। তিনি বলিয়াছিলেন—ওহে নমো ব্রহ্মণে বলিয়া জল দিতে হয় না, উহা পাঠ করিতে হয়—কিন্তু তিনি তাহার কোনও প্রমাণ বলিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার কথা আমরা গ্রহণ করি নাই। এক্ষণে আপনার আহ্নিককৃত্যে প্রমাণসমূহ দেখিয়া বহুকালের তাঁহার সেই কথা মনে পড়িয়াছে এবং বিশ্বাসও হইয়াছে।"

(৬) ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রের মধ্যে যে যে পুঁথিতে ওঁ অদ্ভ্যো নমঃ আছে সেই সমস্ত পুঁথিতে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ আছে; কিন্তু রুদ্রায় নমঃ ইঁহাদের একটা নাই—মোটে ৪টী আছে। আহ্নিক-তত্ত্বের যত ঋষি দেখিয়াছি, সর্ব্বত্রই "ব্রহ্মবিষ্ণু রুদ্রববরুণেভ্য" আছে। 'রুদ্রাববরুণেভ্য' পাঠই যদি প্রকৃত (কাহারও কল্পিত নহে) বলিয়া আপনার দৃঢ়বিশ্বাস হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা বসান উচিত বলিয়াই মনে করি।

আর এককথা (অর্থাৎ ৫ নং প্রশ্নের শেষে যাহা লিখিয়াছেন তদ্বিষয়ে বক্তব্য) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় এই কাশীধামেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

"আপনি নিজে আহ্নিককৃত্য মতে সন্ধ্যা করেন, না প্রচলিত প্রথানুসারে করিয়া থাকেন?

"আমি বলিয়াছিলাম—

---

* জপের অর্থ পাঠ।

† আহ্নিকতত্ত্বের সকল পুস্তকেই "উপজায়চেত্যন্ত" পাঠ দেখা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি উহা বংশ ব্রাহ্মণেরই মন্ত্র। তাহা হইলে ওরূপ পাঠ লিপিকার প্রমাদকৃতই লিখিত। আর কোথাও থাকিলে—কোথায় আছে? উপজশব্দের অর্থকে পদ্ধতিকারেরা নমঃ (?) লিখিয়া "চ" লিখিয়াছেন কেন? এসব তথ্য জানা আবশ্যক।

"যতদিন বেদাদি ঘাঁটি নাই, ততদিন প্রচলিত প্রথানুসারেই করিতাম এবং আহ্নিক-কৃত্যেও সেইরূপ ছাপাইতাম। বেদাদি ঘাঁটিবার পর আহ্নিক-কৃত্যেও যেরূপ ছাপাইয়াছি, নিজেও সেইরূপ করিয়া থাকি। তবে প্রথম মন্ত্রটির অর্থাৎ "শন্নআপো" ইত্যাদি মন্ত্রটির পাঠের উপর সন্দেহ ছিল, গুণবিষ্ণুর অনেক স্থানে কারিকুরি দেখিয়া "শমনঃ" ও "নূপ্যাঃ" পদের তত্রত্য ব্যাখ্যায় আমার বিশ্বাস হয় নাই। ওরূপ পদ ও ওরূপ ব্যাখ্যা ব্যাকরণ সঙ্গত (বৈদিক ব্যাকরণ সঙ্গতও) নহে। কয়েক বৎসর উহার প্রকৃত পাঠ হৃদয়ঙ্গম হওয়ায় আমি সেইরূপ পাঠই করি; কিন্তু এ পর্য্যন্ত মন্ত্রটী কোথাও (প্রচলিত কোন বেদে) না পাওয়ায় আহ্নিককৃত্যে সে পাঠ দিতে সাহসী হই নাই। ১২শ সংস্করণে পাঠান্তর বলিয়া দিবার ইচ্ছা আছে।" এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় গোভিল-গৃহ্যের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে পদে পদে রঘুনন্দনের ব্যবস্থায় দোষ দিয়াছেন। আপনিও তাহা ভালই জানেন। উপনয়নস্থলে তাঁহার ভাষ্যের উপর অনেক প্রতিবাদ করিয়াছেন দেখিয়াছি। তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "আপনি নিজে কোন্ মতে কার্য্য করেন?" তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—"রঘুনন্দনের গ্রন্থ পড়িয়াই যখন স্মার্ত্ত হইয়াছি তখন তাঁহাকে গুরু বলিয়া মানি, সুতরাং আমি তাঁহার মতেই কার্য্য করিয়া থাকি। সেইরূপ যাহারা আমাকে গুরু বলিয়া মানিবে তাহারা আমার মতে কার্য্য করিবে।" আপনার মুখেও সেইরূপ উত্তর শুনিব মনে করিয়াই একথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। এখন শুনিলাম তা নয়।"

১২শ সংস্করণে কিছুই পরিবর্ত্তন করি নাই কেবল এই পত্রের চিহ্নিত মন্ত্রের পাঠান্তরমাত্র দিয়াছি এবং যাঁহার যাহাতে শ্রদ্ধা হয়, সেইরূপে পাঠ করিতে লিখিয়াছি। আর নমো ব্রহ্মণ শব্দের অনুবাদে গুরু শব্দ কাটিয়া দিয়াছি। এই ত আমার সকল কথা সরল হৃদয়ে আপনাকে জানাইলাম।

পরিশেষে জানাইতেছি—আমার আহ্নিককৃত্য প্রচারের পূর্ব্বে সন্ধ্যার হস্তলিখিত ও মুদ্রিত নানা পুস্তকে নানা পাঠ থাকিলেও কোনও কথা উঠে নাই। আহ্নিক-কৃত্য প্রচারের ও উহার বাহুল্যের পর হইতেই তদ্বিষয়ে নানা জল্পনা কল্পনা ও তর্কবিতর্ক চলিতেছে। অথচ এতাবৎকাল কেহই তদ্বিষয়ে সুমীমাংসায় প্রবৃত্ত হন নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় অধুনা ভবাদৃশ ভূয়োদর্শী সুবিজ্ঞ মহাত্মা যখন ধর্ম্মবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া সুমীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন সবিনয়ে প্রার্থনা করি, এবিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন না করিয়া সমাজের কল্যাণার্থে—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের রক্ষার্থে অনুগ্রহপূর্ব্বক অপক্ষপাতী বিশিষ্ট অধ্যাপক মহাশয়দিগকে এবং আহ্নিক-কৃত্যের বিপক্ষবাদী ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়গণকে ও যুবকমহোদয়দিগকে অচিরে একটী সভার অধিবেশন করিয়া আমার এই পত্রখানি উপস্থাপিত করিবেন। [এবং আবশ্যক হইলে মূলগ্রন্থ সমূহ অর্থাৎ আহ্নিক-তত্ত্ব, গোভিল গৃহ্যসূত্র, ছন্দোগ পরিশিষ্ট, তৈত্তিরীয় আরণ্যক (সভাষ্য) বংশ ব্রাহ্মণ (সভাষ্য) ও পিতৃদয়িতাও উপস্থাপিত করিবেন] এবং সমস্ত আলোচনা

পূর্ব্বক তাঁহাদের সুবিচারে যাহা মীমাংসিত হইবে, তাহাও আমাকে জানাইবেন। তদনুসারে আবশ্যক হইলে আমি বিনা আপত্তিতে আহ্নিককৃত্যে সন্ধ্যা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করিব অথবা (প্রচলিত পাঠই রাখিতে হইলে) অনাবশ্যক বোধে আহ্নিক-কৃত্যের প্রচারই বন্ধ করিব। ইহা আমি সরল হৃদয়েই বলিতেছি।

আহ্নিককৃত্যে পুনশ্চ এই পত্রে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি ও করিলাম, তৎখণ্ডনার্থে প্রতিপক্ষ মহাশয়গণের বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ করা আবশ্যক, "চিরপ্রথা" বলিয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণের খণ্ডন হইতে পারে না, একথা ভবাদৃশ বিজ্ঞব্যক্তিকে বলাই বাহুল্য।

শ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্মা।

(ক্রমশঃ)

সুখের মূল।

(সন্তোষ ও সংযম)।

যে এক অনন্তশক্তির প্রেরণায় জীবজগতের আবর্ত্তন ক্রমে এই অনন্ত বিস্তৃত সংসার সমুদ্রের অতল জলরাশি ভেদ করিয়া মনুষ্যত্বের স্বর্ণকলসহস্তে যেদিন মানবমণ্ডলী ধীরে ধীরে ধরাধামে আবির্ভূত হইয়াছিল, সেই দিন হইতেই একটী অখণ্ড পরিপূর্ণ আদর্শ,—একটী সকলের চেয়েও শ্রেষ্ঠ পুঞ্জীভূত অনন্ত চিন্তার সারভূত সত্যরহস্য জীবন্ত জগতের উপর দিয়া আবহমানকাল খেলিয়া বেড়াইতেছে। সেই আদর্শ বা রহস্য কেবল জগৎকে এই শিক্ষাই দিয়া আসিতেছে,—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্যবরান্নিবোধত" উঠ, জাগ, বর গ্রহণ করিয়া প্রবুদ্ধ হও। এই সান্দ্র শব্দলহরী জগতের বিরাট হৃদয়পটে গুরুকম্পিত বিশাল প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করিয়া চারিদিকে কেবলই বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে।

ঐ শব্দলহরীর অর্থ লইয়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার আদর্শ সৃষ্টি, বিভিন্ন প্রকার মনুষ্যত্বের উদ্ভব হইলেও সর্ব্বত্র একটা একতার, অখণ্ড জাতীয়-সত্তার বীজ নিহিত আছে। এই আদর্শ বা মনুষ্যত্বের ভিতর ধর্ম্ম, জ্ঞান, সভ্যতা; এবং উহার অবান্তরভেদক্রমে দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা, পরোপকারিতা, সন্তোষ, সংযম প্রভৃতি গুণগুলি জীবের হৃদয়তন্ত্রীর দ্বারে অতন্ত্র—মূর্চ্ছার অভিব্যঞ্জনা নিয়তই করিতেছে। আর মানব কেবল ঐ মর্ম্মমোহী শব্দে বা গুণে আকৃষ্ট হইয়া চিরকাল ছুটিয়া আসিতেছে এবং চিরকাল ছুটিবে। কেন ছুটিতে হয়? কেন জগতের অণুপরমাণুর জন্ত সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া, কেন সর্ব্বস্ব ত্যাগের আদর্শে নিজের ক্ষুদ্র জীবনপট প্রতিফলিত করিয়া কেবল ঐ নিরাকার শব্দমূর্ত্তির দিকে কেবল ঐ শূন্যশান্তি আহ্বানের দিকে মানবকে দৌড়াইতে হয়?

মানব সুখ চায়। জীবনের উষাকালে মানবের প্রথম প্রাণসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে জগতের বায়ুর ভিতর মিশিয়া যে সুখময় ভাবপদার্থের আস্বাদন পাইয়াছিল, তাহার স্বরূপ তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকিলেও কত কত মণীষী এই সুখের তত্ত্বনির্ণয় করিতে গিয়া ইহাই বলিয়াছেন—ধনে সুখ নাই, বিষয়ে সুখ নাই,—ঐশ্বর্য্যে সুখ নাই—জগতের এই বিনশ্বর স্বার্থকলুষ সুন্দর সজ্জিত ভোগায়তন দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতেও সুখ নাই। সুখ ত্যাগে, সুখ ইন্দ্রিয় দমনে, সুখ ধর্ম্মার্জ্জনে, সুখ সংযমে, সুখ সন্তোষে। অথচ সৃষ্টির পরকাল হইতে ঐ দার্শনিক সিদ্ধান্ত বা সত্যসিদ্ধান্তের দিকে ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করিয়া বা সভয়দৃষ্টি স্থাপন করিয়া মানব একটা না একটা পথে ছুটিয়াছে। উদ্দেশ্য—চাই সুখ, চাই শান্তি।

এই সুখ বা শান্তির অন্বেষণ করিতে যাইয়া মানব যখন অন্যান্য বৃত্তি বা গুণের কথা আংশিকরূপে ছাড়িয়া দিয়া সংযম সন্তোষকেই প্রধানভাবে বরণ করিয়া লয়, তখন তাহার মধ্যে ত্যাগের একটী উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পায়; সেই আলোকের সাহায্যে সে তাহার অন্তরের স্বার্থকলুষ অবসাদ-অন্ধকার দূর করিয়া আপনার প্রকৃত স্বরূপ—আপনার সত্তা আদর্শ অনুভব করিতে পায়, তখনই তাহার মনে একটী স্থায়ী সুখের আবির্ভাব হয়। একজন মণীষী বলিয়াছেন—

সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎসুখং শান্তচেতসাং।
কুতস্তদ্ ধনলুব্ধানাং ইতশ্চেতশ্চ ধাবতাং॥

যাহারা সন্তোষামৃততৃপ্ত, যাহারা শান্তচিত্ত, তাহাদের যে সুখ; ধনলুব্ধ, ইন্দ্রিয়ার্থান্বেষী মানবদিগের সেই সুখ কিরূপে সম্ভব? একদিকে সন্তোষ বা সংযমের সহচর শান্তচিত্ততা, অপর দিকে ইন্দ্রিয় সেবার উপকরণ; একদিকে সংসারের বাহ্যভোগ, অপর দিকে, সংসারের আসক্তির মধ্যে আত্মসংযম ও আত্মত্যাগ; একদিকে সমস্ত ক্ষুধা, সমস্ত দৈন্য, সমস্ত অভাব-নাশকারী স্বর্গীয় সুধার অফুরন্ত ভাণ্ডার; অপর দিকে মৃগতৃষ্ণিকামোহী ইন্দ্রিয়ের দারুণ কষাঘাত। মানব তোমার পথ বাছিয়া লও। সংসারের জ্বালাময় বিলাসভোগের মধ্য দিয়া ঘোর অতৃপ্তি চাই, কি নিরবচ্ছিন্ন সন্তোষের মধ্য দিয়া অবিরাম অশ্রান্ত সুখ চাই?

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ছয়টী রিপু মানবের নিত্য সহচর। সংসারের আপাতমনোরম পদার্থ ভোগ যখন চক্ষের সমীপে ভাসিয়া বেড়ায়, তখন সেই দ্রব্যের আকর্ষণে মনটা সেই দিকে ছুটিয়া যাইতে চায়, কামাদি রিপুকে আর রিপু বলিয়া জ্ঞান থাকে না তখন মানবও সেই ভোগে জড়িত হইয়া আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তিসাধনের চেষ্টা করে; কাম কিন্তু কামের সেই পদার্থভোগে আবার দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আবার, ভোগ আবার আকাঙ্ক্ষা, (কাম) পর্য্যায়ক্রমে ঘৃতাহুত অগ্নির ন্যায় সেই আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়াই চলে। তৃপ্তির পর আবার তৃপ্তির আশা, তাহার পর আবার আশা—এইরূপে মানব মরীচিকার আকর্ষণে সংসার-মরুভূমে হাহাকার করিয়া বেড়ায়। তখন মানবের মনে দার্শনিকের এই কথাটাই জাগে—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

এই অবস্থায় মানব অহর্নিশ এই কথাটাই বলে—

"আকাঙ্ক্ষার তরে সকলি সঁপিনু
ব্যস্ত করিয়া প্রাণ,
হাহাকার ধ্বনি তৃষিত পরাণে,—
নষ্ট করেছে মান।
ভোগবৃদ্ধ কামনার দল,
(যেন) ঘৃতসিক্ত দীপ্ত অনল—
সমানে বাড়িছে সহস্র শিখায়,
ভস্ম করিয়া জ্ঞান।
শান্তির তরে একটু করুণা—
চাহি গো আজিকে দান॥"

এই যে শান্তির জন্য সংসারের কাছে একটুখানি করুণা ভিক্ষা করা,—ইহা তাহাকে করিতে হইত না; কারণ পূর্ব্বাবধি যদি আকাঙ্ক্ষার দিকে না গিয়া সংযম সন্তোষসহকারে একটু একটু করিয়া কামের কুটিল মস্তকে পদাঘাত করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই যদি তৃপ্ত হইতে পারিত—তবে তাহাকে এ হাহাকার করিতে হইত না; সংযম ও সন্তোষ তাহাকে ক্ষুদ্রবৃহৎ ভালমন্দ প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে সুখের অমৃত আনিয়া দিত। অন্য যে বস্তুটী চোখের সম্মুখে পাইলাম—তাহাতেই সন্তোষ, যে খাদ্য পাইলাম, যে পরিচ্ছদ, যে সুরম্য বা অরম্য বাসভবন পাইলাম, তাহাতেই তৃপ্তি; এইরূপে সন্তোষের পর সন্তোষ, তৃপ্তির পর তৃপ্তি; সুখের পর শান্তস্নিগ্ধ কামনাহীন সুখ; এইরূপ সুখের বোঝা মস্তকে লইয়া মানব পরম সম্পদের অধীশ্বর হয়। কারণ এ সুখে কামনা নাই, এ সুখে আশা নাই, এ সুখে স্বার্থ নাই, এ সুখে ইন্দ্রিয়ের অশান্ত নর্ত্তনকুর্দ্দন নাই। কেবল অপ্রার্থিত অনাকাঙ্ক্ষিতপূর্ব্ব স্তূপাকার সুখ; কোন জায়গায় ইহার বিচ্ছেদ নাই, কোন স্থানেই ইহার গতিরুদ্ধ নহে, কোথাও ইহা ছোট বা বড়ও নহে। একদিন কুরুক্ষেত্রের বিরাট-সমরপ্রাঙ্গণে ভগবান বলিয়াছিলেন,—

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥

যাঁহার মন দুঃখেতে অনুদ্বিগ্ন, যিনি সুখেতেও বিগতস্পৃহ, যিনি মায়া-মমতাহীন অহঙ্কারশূন্য তিনিই জগতে শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। এই সমস্তের মূল সংযম ও সন্তোষ। কারণ দুঃখেতে অনুদ্বিগ্ন হইতে হইলে সংযমের প্রয়োজন। মানব যখন সুখ অনুভব করে, তখন তাহার যদি মনে হয় যে, এই সুখ ক্ষণ পরেই লুপ্ত হইবে, তাহা হইলে সেই সুখের অবস্থাতেও

সে শান্তি হারায়। উৎকণ্ঠা, উদ্বিগ্নতা, ভয়, ক্রোধ, প্রভৃতি অসুখের মূলীভূত কারণগুলি একমাত্র সংযম ও সন্তোষের অভাবেই অন্তঃকরণে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ মমতা, স্পৃহা, অহঙ্কার প্রভৃতি রিপুগুলিও সুখের সময় বর্ত্তমান থাকিলে মানব সুখ পায় না। "আহা আমি বড় সুখ অনুভব করিতেছি, আহা এই সুখ কি মধুর!" আমার মতই বা জগতে সুখী কে?" এইরূপ মায়া, কামনা ও অহঙ্কারের ভাবগুলি দূর করিতে হইলে ঐ বৃত্তিগুলি নিরোধ করা আবশ্যক। সমস্ত অসৎ বৃত্তির নিরোধ করিবার মূল কে? সেই সন্তোষ ও সংযম; সংযম বা সন্তোষেরই বা প্রয়োজন কি? আমি যে নিরবচ্ছিন্ন সুখের অভিলাসী!

সংযম ও সন্তোষের অভাবে মনে কামনা জাগে, একথা পরিস্কৃত। এই কামনার ফলে অতৃপ্তি, ইহাও পুর্ব্বে বলা হইয়াছে। অতৃপ্তির ফলে মনে ক্রোধের উদ্ভব হয়। তৃপ্তি না হইলে, কিজন্য সেই তৃপ্তির প্রসার ক্ষুণ্ণ হইতেছে, ইহা অনুসন্ধান করিয়া মানব প্রতিরোধকারী বস্তু ও ব্যক্তির প্রতি ক্রুদ্ধ হয়। সংসারে এ ঘটনার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তার পর ক্রোধের পর অবস্থা সম্মোহ। সম্যক্‌রূপ মোহ তখন মানবের হৃদয় অধিকার করে,—হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হয়, ধৈর্য্য চ্যুত হয়। এই অবস্থার পর স্মৃতিভ্রংশ উপস্থিত হয়। অর্থাৎ আমি কে? আমার কর্ত্তব্য কি? আমি কোন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি? এই কার্য্যের পরিণাম কি? ইত্যাকার সমস্ত স্মৃতি লুপ্ত হইয়া যায়। ইহার পর বুদ্ধিনাশ। অর্থাৎ আত্মরক্ষার উপায় সম্বন্ধেও জ্ঞানহীনতা, তারপর মৃত্যু। তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যায়—একমাত্র সংযমের অভাবে মানব মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রাপ্ত করে *। এইরূপ মৃত্যুই কি সুখ? মৃত্যুর পরের অবস্থায়ও যদি স্বর্গ নরক থাকে, এবং সেখানেও যদি সুখ দুঃখের অস্তিত্ব থাকে, তবে সে যে সেখানেও সুখের অধিকারী হইবে না, ইহা নিশ্চয়। কারণ তাহার সেই কামনা জড়িত আত্মা—তাহার সেই পাপকলুষ অদৃষ্ট—তাহার সেই ভোগস্পৃহার ফলে সঞ্জাত একটী অসুখের অদৃশ্য শক্তি তাহাকে স্বর্গেই হউক, নরকেই হউক একটী পরিপূর্ণ অশান্তি দান করিবেই। আবার যদি জন্মান্তর থাকে, তবে সেই আত্মা, অদৃষ্ট ও শক্তির বলে চালিত হইয়া সে পরজন্মেও সেইরূপ অসন্তোষের দাস হইয়া শান্তি বা সুখ হারাইবে। এই হইল—অসন্তোষের ধারাবাহিক পরিণতি।

সংযমের পরিণতি সম্বন্ধে পূর্ব্বে একবার স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, এক্ষণে আর একভাবে ইহার আলোচনা করা যাউক।

"সন্তুষ্ট হও সংযত হও" ইহা অতি সামান্য জিনিষ। মনে হয় যেন তুচ্ছ একটী বিষয়ের জন্য পীড়াপীড়ি না করিয়া তাহার ত্যাগ করাই ভাল—ইহাতে আমার কতটুকুই বা ক্ষতি? আমি সন্তুষ্ট হই সংযত হই। কিন্তু এই ক্ষুদ্রভাব যদি অনুশীলনের বলে ক্রমেই বৃদ্ধি করা যায়, ক্রমেই যদি পাত্র হইতে পাত্রান্তরে, দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তরে, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ইহাকে প্রসৃত করা যায়—তবে তখন সংসারের উপর একটী অখণ্ড প্রভুত্ব স্থাপন করা

* কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ইত্যাদি গীতার শ্লোক দ্রষ্টব্য।

যায়। এ প্রভুত্ব অবশ্য কামনাবশে আগত নহে, স্বেচ্ছায় জগৎ তাহার মস্তকে এই প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া তাহার দাস হইয়া পড়ে। একদিন মহাত্মা রামকৃষ্ণদেব গঙ্গার তীরে বসিয়া একহস্তে মৃত্তিকা ও অপর হস্তে টাকা লইয়া কল্পনা করিয়াছিলেন—মাটী টাকা, টাকা মাটী! মাটী টাকা, টাকা মাটী!" এই কল্পনার পরক্ষণেই তিনি সেই টাকা ও মাটি যুগপদ গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই যে তাঁহার সাধনা—তাহা সর্ব্ব বস্তুতে সন্তোষ ও সংযম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার ফলেই তাহার সুখ ত হইয়াছিলই, পরন্তু তিনি একটী সম্প্রদায়ের কর্ত্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার এই প্রভুত্বের জন্য তাঁহাকে কেহ পূজা করে না, তাঁহার সেই সংযম মূল তপস্যার জন্যই সকলে তাঁহাকে পূজা করে। অল্পদিনের কথা ছাড়িয়া দিয়া অতীতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর—কর্ত্তব্যের অনুরোধে একদিন নর অবতার পরশুরাম সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া তাঁহার গুরুদেবকে দান করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে নিজের থাকিবার স্থান পর্য্যন্ত রাখেন নাই। ইহারও মূল সেই সংযম ও সন্তোষ মূল তপস্যা।

বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যদেব প্রভৃতি পূর্ব্ব মহাত্মগণের চরিত্রে আমরা আপাতদৃষ্টিতে প্রধান-ভাবে যে ভাবই অবলোকন করি না কেন,—এই সমস্ত বড় বড় ভাবগুলির মূলে অতি ক্ষুদ্র সেই সংযমের আরাধনার বীজ নিহিত আছে। তাহা ইহ জন্মেরই হউক আর পূর্ব্ব জন্মেরই হউক।

সংযমের ফলে সুখ, ও প্রভুত্বের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিস্তৃতভাবে বলিতে গেলে দীর্ঘজীবন, স্বাস্থ্য, অপরিমেয় বল, ধর্ম্ম প্রভৃতি সাধারণ ফলগুলিও ইহার দ্বারা লাভ করা যায়। আবার যোগশাস্ত্রের দিক দিয়া দেখিলে অনেক কথাই বলা চলে। এক্ষণে তাহার প্রয়োজন নাই।

এই ভারতের ধর্ম্মারণ্যে একদিন চার্ব্বাক বলিয়াছিলেন—

"যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥"

সংসারে যতদিন বাঁচিবে, ততদিন সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত। কারণ দেহ ভস্ম হইয়া গেলে ইহার পুনরাগমন সম্ভাবনা কোথায়?

ইনি এই যে সংসারসুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের কথা বলিয়াছিলেন—তাহা দ্বারা আমরা সংযম ও সন্তোষমূল সুখের কথা বুঝি না, কারণ ঋণ করিয়া ঘৃত ভক্ষণের উপদেশটা সংযম ও সন্তোষে সম্ভবে না। তথাপি ভারতের ঋষিগণ চার্ব্বাকের এই মত অবজ্ঞার ভ্রূকুটী নিক্ষেপে উড়াইয়া দেন নাই, যুক্তি, তর্ক, বিচার, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি যত রকম উপায় আছে—সেই সমস্ত উপায়েই এই মত খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। "সুখং জীবেৎ" এই সুখের মূল নির্ণয় করিতে যাইয়া আমাদের ঋষিগণ সন্ন্যাসকেই সুখের একমাত্র কারণ বলিয়াছেন। এইজন্য জীবের বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে সেই সর্ব্বত্যাগের আদর্শ সন্ন্যাস আশ্রমে অনুপ্রবেশের জন্য মানব-

মণ্ডলীকে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। এই সন্ন্যাস-আশ্রমের মূল সেই আবাল্যসঞ্চিত সংযম বা সন্তোষমূল তপস্যা।

একটা অতি বৃহত্তম আদর্শ, একটা অকল্পনীয়—অলীক হৃদয়ের বিস্তার—যদি আকাঙ্ক্ষণীয় হয়, যদি পৃথিবীর মধ্যে উজ্জ্বল বৃহৎ জ্যোতিষ্কের মত যদি অপারগাম্ভীর্য্যদৃপ্ত সমুদ্রের মত আপনার মহিমা বিস্তারের কামনা জাগে—তবে এই আকাঙ্ক্ষা বা কামনা বড় ভাল। এই কামনায় কাম নাই, এই কামনায় জ্বালা নাই, অতৃপ্তি নাই। একদিন ভারতের বৈষ্ণবকবি রাধার মুখ দিয়া বলিয়াছিলেন,—

"কৃষ্ণ কালো তমাল কালো

তাইতে তমাল ভালবাসি।"

রাধার একটা মস্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল—কৃষ্ণ। কিন্তু তিনি কৃষ্ণ না পাইয়াও সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ পাইয়াছিলেন—তাই কাল তমাল বৃক্ষও তাঁহার নিকট কৃষ্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই কাল শুষ্ক একটা তমাল বৃক্ষেও তাঁহার কৃষ্ণ-প্রীতির সন্তোষ জন্মিয়াছিল। তাই তিনি সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তির আপাতপ্রতীয়মান অরুন্তুদ আকাঙ্ক্ষা সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করাইয়া সংসার অপেক্ষা যাহা শ্রেষ্ঠ—যাহা শ্রেয়স্তম সেই বড় আকাঙ্ক্ষা-সমুদ্রে তাহাকে লইয়া গিয়াছিল, ইহার পর আর আকাঙ্ক্ষা নাই। এইখানেই শেষ। যে আকাঙ্ক্ষার শেষে আসিয়াছে—সে যে বড় সুখ পাইয়াছে—তাহাতে কি সন্দেহ আছে। এমন করিয়া ভারতছাড়া ভিন্ন জগতে কি কেহ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কালো ভালবাসিতে পারিয়াছে, কেহ কি কুরূপ, কদাকার, প্রেমের আধার বলিয়া একখণ্ড কাষ্ঠ বা বৃক্ষকে ভালবাসিতে পারিয়াছে। কত বড় সন্তোষ তাহার মনকে অধিকার করিয়াছে বল দেখি? তাই আমাদের দেশে কালো-সুন্দরের ভালবাসা লইয়া মারামারী করিবার উপদেশ ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই। এইজন্য ভালবাসার প্রধান আশ্রয় যে বিবাহ, সেই বিবাহের পূর্ব্বকৃত্যে কোর্টসিপের ব্যবস্থা নাই। হিন্দুগৃহস্থের ছেলেমেয়েকে এইজন্য সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে একবার সংযম ও সন্তোষের দ্বারে উপস্থিত হইতে হয়।

আমি সৎ হইব, ভাল হইব, বিদ্যাশিক্ষা করিব, এই আকাঙ্ক্ষা যত দিন তাহা না হইতে পারিতেছি—ততদিন যে মনের অসন্তোষ ইহাও বড় ভাল। এই যে আকাঙ্ক্ষা এই যে ছোট অসন্তোষ—ইহার পূর্ব্বে একটা বড় সন্তোষ লুক্কায়িত আছে। সৎ হইতে হইলে অনেক ত্যাগের অনেক সন্তোষের প্রয়োজন। ভাল হইতে হইলে বা ভাল হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতে হইলে—মন্দ হইবার বিরাট আকাঙ্ক্ষা ও আকাঙ্ক্ষণীয় দ্রব্যসমুদয়কে ত্যাগ করিতে হয়। অর্থাৎ এককথায় সমস্ত বস্তুতে সন্তোষ আশ্রয় করাই সৎ ও শ্রেষ্ঠ হইবার নিদান। বিদ্বান্ হইবার বেলাও তাহাই। লেখাপড়া শিক্ষা যে কত সংযম—কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু হইতে আরম্ভ করিয়া বিরাট বস্তুরাশিতে সংযম প্রকাশ করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। এইজন্যই বলা হয়—"বালানামধ্যয়নং তপঃ।" এই জন্যই সাধারণ কথায়

লোকে বলে—"বড় যদি হ'তে চাও ছোট হও তবে।" এই ছোট হওয়াতেই ত সন্তোষ বর্ত্তমান।

মানব যেমন প্রতিদিন বয়সের সঙ্গে সংসারপাতান মায়াজাল উপসংহার করিতে থাকে, তখনি তাহাদের সংযম, সন্তোষ প্রভৃতির কথা অনেক সময়ে মনে পড়ে। কিন্তু ভাল জিনিস চিরকালই ভাল—এজন্য শৈশবাবস্থা হইতে সন্তোষ প্রভৃতি গুণগুলি অর্জ্জন করিতে হয়। দিনের পর দিন অসন্তোষবশে হৃদয়ের অরুন্তুদ হাহাকার লইয়া—তৃপ্তির স্বচ্ছ সুখময় অমৃত-সাগর ছাড়িয়া অতৃপ্তির দুঃখময় লবণসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অথবা সংসারের কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া কেবল পূর্ণঅশ্রুর পিচ্ছিল উপত্যকায় আছাড় খাইয়া জীবনটা অতিবাহিত করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়।

অতএব এস জগৎবাসি! যেখানে অশান্তি নাই, অতৃপ্তি নাই, যেখানে দিগন্তপ্রসারী লেলীহান্ কামনার জলন্ত অনল নাই, যেখানে সকল সময় সুখ—যে সুখসৌদামিনীদীপ্তি মুহূর্ত্ত মনোহর নয়; সেই সুখের আশায় সন্তোষ ও সংযম অবলম্বন করি।

শ্রীপঞ্চানন স্মৃতিতীর্থ।

মেৎনীর দেউল।*

মেৎনীর পিত্রালয় হরদৌ জেলার ভিখনপুরে। ইহার পিতা সরবরীয়া ব্রাহ্মণ। এই অঞ্চলের সাধারণ ব্রাহ্মণশ্রেণীর সহিত এই সরবরীয়া ব্রাহ্মণগণের সামাজিক আহার-ব্যবহার নাই। মেৎনী অতি সুন্দরী এবং ধর্ম্মগতপ্রাণা বলিয়া একজন কণৌজি ব্রাহ্মণ তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। এই বিবাহই মেৎনীর জীবনের প্রধান পরিবর্ত্তন।

ভিখনপুরের ব্রাহ্মণগণ এবং সাধারণ কণৌজি ব্রাহ্মণগণ এই বিবাহ ব্যাপার লইয়া তর্কবিতর্কে এক ভীষণ দলাদলির সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন। মেৎনীর স্বামী আত্মীয়স্বজনগণের সহিত সুবিধায় বাস করিতে না পারিয়া শ্বশুর শ্বাশুড়ীসহ একটী প্রকাণ্ড সপ্তচ্ছদ তরুর নিকটে গ্রামের বাহিরে একখানি সামান্য মাটীর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিল। এই

* একদিন অপরাহ্ণু চারিটার সময় একজন অযোধ্যাবাসী লালার সহিত একটী রোগী দেখিতে গিয়াছিলাম। আমি অযোধ্যার নূতন ডাক্তার; লালার সহিত বিশেষ পরিচিত। এক্কায় উঠিয়া হঠাৎ একটা মাঠের মধ্যে ভগ্নপ্রায় একটি মন্দির দেখিয়া জিজ্ঞাসায় লালার মুখে এক গল্প শুনিলাম—লালা বলিল ভাল হইল, দীর্ঘপথ এই গল্পে কাটিয়া যাইবে। শুনুন ইহাকে মেৎনীর দেউল বলে। এখানে এখনও যাত্রী আসিয়া থাকে।

সময় মেৎনীর মূর্ত্তি ভাদ্রের কুলপ্লাবনকারিণী উদ্দামগতি গঙ্গার ন্যায় ঢলঢল। তাহার স্বামী আত্মীয়গণ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া দিনদিন কৃশ হইতে লাগিল। একদিন রাত্রিতে তাহার এবং তাহার শ্বশুরের উৎকট. জ্বর হইল। পরদিন প্রাতেই বৃদ্ধের জীবনস্রোত মেৎনীর সেই পূর্ণিমার প্রতিচ্ছবি মুখের উপর রাখিয়া এক অজানিত স্থানে চলিয়া গেল। তখন মেৎনী আর তাহার স্বামী বৃদ্ধের সৎকার করিতে একটি মৃতপ্রায় নদীর ধারে উপস্থিত হইল।

এই নদীর নিকটে একটী উন্নতমনা সাহেব দিব্য একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া রেশমের ব্যবসা করিতেন। যখন মৃতদেহ চিতায় উঠাইয়া মেৎনীর স্বামী জ্বরের যাতনায় মাটিতে শুইয়া যন্ত্রণাভোগ করিতেছিল, সেই সময় একটী প্রাচীন ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিল— তোমরা এই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও—আমি এই স্থানে প্লেগের সময় বাস করিব। এই জমি আমার। তোমাদের ন্যায় জাতিভ্রষ্ট খৃষ্টানের নিকট বর্ণাশ্রমী হিন্দু থাকিতে পারে না।

মেৎনী আর তাহার স্বামী আবার এক নূতন বিপদে পড়িল। কিন্তু নিকটবর্ত্তী সদাশয় সাহেব তাহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন বলিয়া গ্রামের বিরক্তহৃদয় ব্রাহ্মণগণ তাহার আর কোন বিঘ্ন করিতে পারিল না।

মৃতের সৎকার করিয়া ফিরিবার সময় মেৎনী শিক্তবস্ত্রে একবার সাহেবের নিকট একখানি গোগাড়ীর প্রার্থনা জানাইল কেননা, তাহার স্বামী আর পায়ে হাঁটিয়া ঘরে উপস্থিত হইতে পারে না। যখন ষোড়শী সুন্দরী শিক্তবস্ত্রে সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত, তখন সাহেব তাহাদের জাতীয় বিড়ালাক্ষি স্বর্ণকুন্তলা কামিনী হইতে এই দরিদ্রা অশিক্ষিতা ব্রাহ্মণকামিনীকে স্বর্গের পরী মনে করিয়া একবার শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। মেৎনীর পটোলচেরা নীল চক্ষু দুটির দিকে চাহিয়া কি জানি কেমন একরূপ স্নেহমাখা দৃষ্টিতে সাহেব তাহার বাধ্য হইয়া উঠিলেন। গাড়ি আসিল। সন্তঃ শোকসন্তপ্তা মেৎনী স্বামিসহ গাড়ীতে বসিয়া যখন গৃহে উপস্থিত হইল—তখন তাহার বৃদ্ধা মাতা একটী চারিপায়ার উপর পড়িয়া ছটফট করিতেছিল। মেৎনী ইহা দেখিয়া একবার উপরের দিকে চাহিয়া যুক্তকরে কি জানি কি ভাবিয়া বলিল—"রামজী তোমারি মরজী।"

এদিকে তাহার স্বামীর দুই কর্ণমূল ফুলিয়া উঠিল—জ্বর বৃদ্ধি পাইল, সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। দুইটী রোগী লইয়া মেৎনী পুনর্ব্বার সাহেবের-আশ্রয় লইল। সাহেব "প্লেগ সলুসন" দিয়া তাহাদের চিকিৎসা করিলেন—কিন্তু মেৎনীর স্বামী মেৎনীর আর সেই যৌবনচঞ্চল মুখশ্রী দেখিবার সময় পাইল না, তাহার জীবনবায়ু বাহির হইয়া গেল—বুড়ি বাঁচিয়া গেল। মেৎনী বিধবা হইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। অতি কষ্টে সাহেবের অর্থ-সাহায্যে কোনরূপে তাহার গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে লাগিল। কিন্তু এত দুঃখের মধ্যেও তাহার অক্ষুন্ন সৌন্দর্য্যচ্ছটা অল্প হওয়া দূরে থাকুক বরং দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মেৎনী প্রত্যহ প্রাতে সন্ধ্যায় রাত্রিতে স্বামীর জীবনবায়ু বাহির হইবার সেই পুরাতন সপ্তচ্ছদতরুতলে যুক্তকরে

বসিয়া কিজানি কি ভাবিতে লাগিল। তাহার বৃদ্ধা মাতা মেৎনীর শশিকরস্নাত মুখখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া একদিন বলিল—রামজী মেৎনী তোমহারা।

এইরূপ দুঃখে চারি মাস অতীত হইল। বিধবা মেৎনী ফুল, বিল্বপত্র, তুলসী আর জল লইয়া সেই বৃক্ষটির নিকট মন্ত্রহীন তন্ত্রহীন পূজা করিতে লাগিল। সাহেব তাহা দেখিয়া আরও তুষ্ট হইলেন, তিনি মাসিক ছয়টি টাকা হিসাবে তাহাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন। একদিন শ্রাবণমাসে যখন অযোধ্যায় "ঝুলনমেলা" সারিয়া দোকানদারগণ ঘরে ফিরিতে ছিল, সেই সময় রাত্রিতে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হইয়া সমস্ত হরদৌ প্রদেশটি বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছিল। বৃষ্টির আগে সাহেব অশ্বারোহণে গ্রামের কৃষকগণের বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া কুঠিতে ফিরিতেছিলেন। পথে বৃষ্টির জন্য মেৎনীর গৃহে আশ্রয় লইলেন। বৃষ্টি এরূপভাবে হইতেছিল, যে তাহার আর বিরাম নাই। সাহেব একবারে ভিজিয়া বেরাল হইয়া গিয়াছেন। শীতে আর অজস্র জলে সাহেবের জাতীয়ভাব উড়িয়া গিয়াছে, ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হইয়া ঘোড় ছাড়িয়া মেৎনীর মাটির ঘরে বসিয়া পড়িলেন।

মেৎনী তাহার সধবা থাকিবার সময়ের একটী চুনারীর ঘাঘরা আনিয়া সাহেবকে পরিতে দিল। পুরাতন একখানি পরিষ্কার কাঁথা গায়ে দিতে দিল। সাহেব এই কাঁথার সূক্ষ্মকার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাহার সম্মুখে একটী মাটির ডিবায় কেরোসিন জ্বলিতে লাগিল। শীতকম্প হ্রাস হইলে সাহেব ক্ষুধার কথা বলিলেন। মেৎনী তখন মহা চিন্তিত হইল—কি কোথায় পাইবে ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া অন্ধকারে জলবৃষ্টির মধ্যে গ্রামের গৃহস্থগণের গৃহে গিয়া সাহেবের খাদ্যোপযোগী আহার্য্য খুঁজিতে লাগিল। কোথাও কিছু পাইল না, লাভের মধ্যে একটী মহাকলঙ্ক লইয়া পথে বাহির হইল। যে কলঙ্কে কামিনীকুল পতিতা এবং ধর্ম্মভ্রষ্টা হয়, মেৎনী সেই কলঙ্ক লইয়া যখন বৃষ্টির জলে ভিজিতে ভিজিতে গৃহে উপস্থিত হইল, তখন সাহেব তাহার মাতার প্রদত্ত দুইখানি শুষ্ক রুটি আর ডাউলের রসে উদর পূর্ণ করিতেছিলেন। মেৎনী ইহা দেখিয়া কান্দিয়া ফেলিল। সাহেব মেৎনীকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন—"রোর মত" দুনিয়াকা এহি হাল "কভি রাজা কভি ডোক্‌লা"—তুম্ আউর মত তকলিপ লেও।"

মেৎনী সাহেবের এই অবস্থা দেখিয়া উর্দ্ধে হাত তুলিয়া কেবল একবারমাত্র কহিল—"রামজী।" এইসময় বৃষ্টি কিছু থামিয়াছে। একটী যৌবনমদিরামত্ত মেৎনীর রূপলাবণ্যমুগ্ধ যুবক কৌতূহলের এবং আশা অপূর্ণ জন্য প্রতিশোধের উদ্দীপনায় সেই দূর গ্রাম হইতে তথায় উপস্থিত হইয়া গোপনে অন্ধকারে ছাঁচের তলায় দাঁড়াইয়া মেৎনীর আর তাহার মাতার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য চেষ্টিত হইল। ইহা কেহ জানিল না বা দেখিল না। বৃষ্টি যখন ধরিয়া গেল, তখন সাহেব কুঠিতে যাইবার জন্য উদ্যত হইলে মেৎনী কহিল—"সড়ক্‌পর বহুৎ পানি জমাট্ হো রহা। আউর আঁধারা বাদলা বহুৎহি রহে।" সাহেব একবার ক্ষুদ্র ক্যারোসিনের আলোতে পথটি দেখিলেন কিন্তু দিগন্তব্যাপী স্তূপাকার অন্ধকারে কিছু না দেখিতে পাইয়া ছাতের

তলার দিক চাহিবামাত্র একটী নরমূর্ত্তির ছায়া দেখিলেন। তখন শিক্ত বস্ত্রের মধ্য হইতে একটী পিস্তল বাহির করিয়া ছায়া লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন। "ধুপ" শব্দ শুনিয়া মেৎনীর বৃদ্ধা মাতা বৃক্ষের নিকট গিয়া দেখিল একজন যুবক পড়িয়া ছটফট করিতেছে। তখন মেৎনী আর ঘাঘরাপরিহিত সাহেব উপস্থিত হইয়া যুবকটাকে দেখিবামাত্র আরো ক্রুদ্ধ হইয়া "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" মারিলেন। সাহেব এক লাথি মারিলেন। যুবক লাথি খাইয়া গুলির আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া দৌড়িয়া পলাইল। সাহেব তখন মেৎনীপ্রদত্ত শুষ্ক পরিচ্ছদ পরিতে পরিতে একটি অঙ্গুরী লইয়া কহিলেন—"মেৎনী আমি বোধ হয় শীঘ্রই এই কুঠি উঠাইয়া হরদৌ চলিয়া যাইব। তোমার মাসিক সাহায্য তথা হইতে পাঠাইব। যদি কখনো আর কোন অভিনব বিপদে পতিত হও, তবে এই অঙ্গুরীটি দেখাইলে আমার আত্মীয় অথবা কর্ম্মচারিগণ এবং আমি তোমার সাহায্য করিব। আমি চলিলাম মেৎনী তুমি যদি এই ভারতে না জন্মিয়া ইউরোপের কোন ক্ষুদ্র পল্লীতেও জন্ম গ্রহণ করিতে তাহা হইলে আজ তোমার ন্যায় রূপসীর এবং সুশীলার নাম জগৎময় ব্যাপ্ত হইত।" সাহেব এই বলিয়া বিদায় হইলেন। মেৎনী আর তাহার জননী পথের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শেষে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘরে গেল। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। রাস্তায় জল অনেকটা শুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু পল্লীগ্রামের পথ—স্থানে স্থানে গর্ত্ত। তাহাতে আবার জল বাঁধিয়া আছে। সাহেবের গমনের বিঘ্ন হইতে লাগিল। অতি কষ্টে সাহেব চলিতে চলিতে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে চলিলেন। শিক্ষিত প্রভুভক্ত অশ্বটী সমস্ত রাত্রি একটী অজনের মধ্যে দাঁড়াইয়া কষ্ট সহ্য করিয়াছে। সাহেবকে দেখিয়া ফুৎকার করিল। তাহার প্রভু তখন তাহাকে পাইয়া আনন্দে আরোহণ করিলেন। অশ্ব বেগে কুঠিতে উপস্থিত হইল।

রাত্রি প্রভাতে মেৎনী একটী ক্ষুদ্র ফুলের ডালা লইয়া রাত্রির বর্ষণক্লিষ্ট দলশূন্য কাঠ মল্লিকা ফুল তুলিয়া সেই সপ্তচ্ছদতরুতলে গিয়া যুক্তকরে যোগাসনে অতি বিনীতভাবে অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষে উপবেশন করিল। তাহার জননী তাহাকে পূজার রত দেখিয়া রাত্রির উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিয়া কূপের নিকট গিয়া দাড়াইল। বৃদ্ধা জল তুলিতে অশক্তা জানিয়া মেৎনী পূজা অৰ্দ্ধ সমাপন করিয়াই তাহাকে জল উঠাইয়া দিল। এই সময় পূর্ব্বের সেই উজ্জ্বল চরিত্র যুবক এবং আর দুই তিন জন লোক আসিয়া কহিল মেৎনী তোর জাতি গিয়াছে, তুই এই স্থান হইতে উঠিয়া যা, আমরা খৃষ্টানীর সংস্পর্শে থাকিব না। যদি সহজে না যাইবি, তবে তোর প্রতি অত্যাচার করিব। মেৎনী বলিল—তোমারা পূর্ব্ব হইতেই আমাকে সমাজচ্যুত করিয়াছ, তোমাদের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। যদি নিতান্ত অত্যাচার কর, তবে রামজী তাহা দেখিবেন, আর আমি সহজে আমার পিতার আর স্বামীর বুক পোড়ান স্থান ত্যাগ করিব না।

গ্রাম্য লোকগণ বলিল—তুই আমাদের স্ত্রীলোকগণের সহিত যদি আলাপ না করিস্, তবে এই স্থানে থাকিতে পারিস, কিন্তু সাবধান কোন বালক বা বালিকাকে পর্য্যন্ত স্পর্শ করিস না।

মেৎনীর জননী কহিল—পাঁড়েজী আমরা পূর্ব্বেই বা এমন কি কুকার্য্য করিয়াছিলাম যে আমাদিগকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিলে, আর এখনইবা এমন কি কার্য্য করিয়াছি যে খৃষ্টানী হইয়া গিয়াছি? গুলি-সাহেবের লাথি ও আহত মিছির যুবক কহিল, আমি নিজ চক্ষে দেখিয়াছি মেৎনী সাহেবের কোলে বসিয়াছে। তুমি তাহার সহিত এক সঙ্গে রুটি খাইয়াছ।

মেৎনী এতক্ষণ শান্তভাবে ছিল, যখন তাহার নারীধর্ম্মের উপর আঘত দিয়া মিছির যুবক কথা বলিল, তখন ষোড়শী মেৎনী ফুলিয়া যেন দুইটা হইয়া বলিল, কুকুরে ঘেউ ঘেউ করিলে হস্তিনী তাহার গতির প্রতিরোধ করে না, আর গঙ্গার উপর লোকে "সারিগীত" গাইলে গঙ্গা পতিতা হয় না। অদ্য হইতে আমি আর তোমাদের গ্রাম্য লোকের নিকট যাইব না, ইহাতে মরি স্বর্গে যাইব। মা ঘরে চল, এই সকল পাতিকুকুরের ডাকে ভয় পাইওনা, আমাদের একজন আছেন, যিনি দিবারাত্রি করেন—সেই রামজী। মেৎনী আর কথা বলিলনা, ঘরে মাকে টানিয়া লইয়া গৃহের কপাট বন্ধ করিল।

গ্রাম্য কুচক্রিগণ আর সেই পাষণ্ড মিছির যুবক গুলির আঘাতপ্রাপ্ত ক্ষতে হাত দিতে দিতে চলিয়া গেল। মনে মনে স্থির করিল মেৎনীকে চটাইলে আশা পূর্ণ হইবেনা, কৌশলে মিষ্ট কথায় এই অনাঘ্রাত ফুলটির গন্ধ লইতে হইবে। এই সময় বেলা বাড়িয়া গিয়াছে জানিয়া মেৎনী কূপ হইতে জল তুলিতে গিয়া আবার ঐ নরাধম মিছিরির সম্মুখে পড়িল।

এইবার মিছির অতি স্থিরভাবে মোলায়েম কথায় বলিল—মেৎনী আমি তোমাকে কত পিয়ার করি তাহা তুমি জাননা—তোমার স্বামীর দেহ আমি সৎকার করিয়াছি—আমার আর কেহ নাই। হাতে হাজার টাকা আছে, জমীজমা বাড়ীঘর সব আছে। তোমার স্বামীকে শ্মশানে লইয়া গিয়াছি বলিয়া গ্রাম্যলোকে আমাকেও ত্যাগ করিতে চাহে। আমি সেই জন্য গত রাত্রি তোমার সাহায্যদাতা সাহেবের আশ্রয় লইতে আসিয়া বৃথা আঘাত পাইয়াছি। আমি তোমার জাতি মারিবার কথা বলি নাই—পাঁড়েজী তোমার পিতার বহুদিনের শত্রু, তাহা তো জান। সেই তোমাকে জব্দ করিতে এরূপ কথা বলিয়াছে। গত রাত্রিতে তুমি যখন গ্রামে খাদ্য অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিলে, তখনি পাঁড়েজী তোমার সর্ব্বনাশ করিতে প্রস্তুত হয়। আমাকে টাকার লোভ দিয়া সঙ্গী করিয়াছে। মেৎনী, তুমি আমার কথা শুন—দুইজনে চল অযোধ্যায় গিয়া বৈষ্ণব হই। তোমার মাকে আমি "মা" বলিয়া প্রতিপালন করিব। সমাজের ধার ধারিব না। দুইজনে মোহান্ত রাঘবদাসের শিষ্য হইয়া মহাসুখে দিন কাটাইব। দেখ মেৎনী—তুমি সুন্দরী যুবতী। পৃথিবীর এতবড় একটা দৈহিক সুখ ত্যাগ করিও না, আমার কথা শুন।" মিশ্রঠাকুর যত বেলা দীর্ঘ ভূমিকা জুড়িয়া মেৎনীকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছিল—তত বেলা ব্রহ্মচারিণী ব্রাহ্মণবিধবা জগৎস্বামীকে ডাকিয়া হৃদয়ে একটী উলাঙ্গিনী সংহারময়ী খড়্গধারিণী দেবীর ছায়া দেখিয়া বলিল—তুমি মানুষ নও, বিশেষ ব্রাহ্মণবংশে চামার।" মেৎনী আর কিছু না বলিয়া জল লইয়া গৃহে আসিল। যুবক মিশ্র সেদিন আর নয় ভাবিয়া গৃহে গেল। মেৎনী যুক্তকরে উলাঙ্গিনী

কাল কামিনীর ছায়া লক্ষ্য করিয়া কহিল মাগো সতীশ্বরি! হৃদয়ে শক্তি দাও—সাহস দাও, তুমি ইচ্ছাময়ী অসুরনাশিনী,এই অসুরের হাত হইতে অসহায়া ব্রাহ্মণকন্যার সতীধর্ম্ম রক্ষা কর।

যখন মেৎনী এইরূপ চিন্তা করিয়া মাটিতে শুইয়া পড়িল তখন শূন্যে অতি শুন্যে একটী তাণ্ডব নৃত্যকারিণী রমণী হাসিয়া যেন কহিলেন—মেৎনী, তুমি আমার সঙ্গিনী, তোমার চিন্তা নাই, আমি সময়ে তোমার হৃদয়ে আবির্ভূতা হইব। উঠ কন্যে তোমার নারীধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারে এমন জীব ধাতা সৃষ্টি করেন নাই। এই দেখ আমি রক্তমাখা খড়্গ তোর জন্য সর্ব্বদা তোর মস্তকের উপর রাখিলাম।

সহসা একটা প্রবল বায়ুস্রোত বহিয়া গেল। মেৎনীর জননী আসিয়া বলিল, মা—আমি বড় অসুখ বোধ করিতেছি—আমার আবার বুঝি সেই "তাউল" (প্লেগ) হইল। বলিয়াই বুড়ি কাঁপিতে কাঁপিতে জল খাইতে চাহিল। মেৎনী মাতাকে জল দিয়া সাহেবের পূর্ব্বপ্রদত্ত "প্লেগসলুসন" ঔষধ খাইতে দিবার জন্য শিশি বাহির করিল, কিন্তু আশা পূর্ণ হইলনা; মুখ খোলা থাকায় ঔষধ শূন্য হইয়া গিয়াছে। তখন তার জননী কাঁপিতে কাঁপিতে শয়ন করিল। মেৎনী সাহসে ভর করিয়া সাহেবের কুঠির দিকে চলিল। কিন্তু হায় সরলা মেৎনী, তোমার আশা পূর্ণ হইল না। সাহেব এই কুঠি পরিত্যাগ করিয়া হরদৌ জেলায় চলিয়া গিয়াছেন। মেৎনী কুঠির নিকটবর্ত্তী হইলে একটী সাঁওতালজাতীয় বৃদ্ধ কহিল—মাই, তুহার নাম করিয়া সাহেব এই কুটীর মাটির তলে কিজানি কি পুতিয়া রাখিয়া আমাকে বলিয়া গিয়াছে চামুরু! মেৎনী যখন সন্ন্যাসিনী হইয়া জটা নাড়িয়া চিমটাঘুরাইয়া "দেওকালী দেওকালী" বলিয়া বেড়াইবে, তখন তুমি তাহাকে ইহা খুঁড়িতে দিও, যা মাই আজ আর তুই সাহেবকে পাইবি না।

অগত্যা মেৎনী হতাশের তপ্তশ্বাস ফেলিয়া গৃহে আসিল। তখন তাহার মাতার জর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধার জীবন আশা অতি কম চিন্তা করিয়া মেৎনী বসিয়া ভাবিতেছে; এমনি সময় আবার সেই মিছির আসিয়া কহিল—মেৎনী ভাবিয়া উপায় নাই। মা—বাপ চিরদিন কাহারো থাকে না, আমি আসিয়াছি, প্রাণের সহিত তোমার উপকার করিব। কেবল আমার সেই বৈষ্ণব হইবার কথাটি তোমায় রাখিতে হইবে। এই বলিয়াই মিশ্রঠাকুর মেৎনীর হাত ধরিয়া বসিলেন, পরপুরুষ স্পৃষ্টা মেৎনী লজ্জাবতী লতার ন্যায় অধোমুখ হইয়া কেবল বলিল আমার মাতা স্বর্গে যাইতে বসিয়াছেন—এই সময় যাহা করিতে হয় কর—পরে শুনিব।

কাম মুগ্ধ মিশ্র আহ্লাদে গলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। মেৎনীর জননীর পূর্ব্ববারের প্লেগ পূর্ণরূপ আরোগ্য না হইয়াই আবার বাড়িল। বৃদ্ধশরীরে তাহার অসহ্য উৎকট যন্ত্রণা সহ্য হইল না। বৃদ্ধা সমস্ত যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া সন্ধ্যার সময় স্বামী আর জামাতার নিকট প্রস্থান করিল।

অকস্মাৎ এই নূতন শোক পাইয়া মেৎনী প্রস্তর তুল্য হইয়া গিয়াছিল, তাহার স্ত্রীসুলভ রোদনের পরিবর্ত্তে গম্ভীর অবস্থা উপস্থিত হইল। মাত্র নীল চক্ষু দুইটি রক্তিমাকার করিয়া

তাহার ঘোর শত্রু মিশ্রযুবকের সহিত মাতার সৎকার করিয়া রাত্রিতে সিক্ত বস্ত্রেই নির্দ্দিষ্ট ছাতের তলায় গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল। মিশ্র যুবক লুব্ধ আশ্বাসে তাহার সিক্ত বস্ত্রের মধ্য হইতে যে রূপরাশি বাহির হইতেছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে অবশ হইয়া গেল। এইরূপে সেই রাত্রি প্রভাত হইল। পরদিন মেৎনী জননীর পারত্রিক কার্য্য করিবার জন্ত পুরোহিত অনুসন্ধান করিতে বাহির হইল। যুবক তখন তাহার নিজের স্থানে চলিয়া গেল।

বলা বাহুল্য মেৎনীর পুরোহিত অনুসন্ধান হইল না। কেননা তাহার আর পল্লীমধ্যে গমনের সাধ্য নাই। একে সরবরীয়া ব্রাহ্মণকন্তা হইয়া কনৌজির সহিত পরিণীতা ছিল, তাহার পর সাহেবের সহিত একসঙ্গে রাত্রিবাস কৃত অপরাধ। সুতরাং গ্রামের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাবলম্বী গৃহস্থগণ তাহার উপর বিষম বিরক্ত। যখন কার্য্য শেষ করিতে না পারিয়া অকৃত-কার্য্যতার নিশ্বাসসহ মেৎনী গৃহে ফিরিল, তখন আবার সেই কামুক আসিয়া এইবার প্রকৃত কামান্ধের ন্তায় ব্রহ্মচর্য্যব্রতপরায়ণা মেৎনীর হাত ধরিয়া একটুকু বল প্রকাশ করিল। মেৎনীর মাথায় তখন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। পরক্ষণে প্রত্যুৎপন্নমতি মেৎনী স্থির করিল—আমি বাহির দৃশ্যে অসহায়া, কিন্তু ভিতরে "দেও কালী তো আছেন। এই কামান্ধ মূর্খকে প্রথমে কৌশলে সরাইবার উপায় করি, তাহাতে কার্য্য না হয়, উপস্থিত মত যাহা হয় করিব।

মেৎনী ব্যাকুলস্বরে কহিল—"তোমার বুদ্ধি নাই, তুমি আমার এত উপকার করিলে আর আমি তোমার কথা শুনিব না?—দুই চারিদিন যাইতে দেও আমি তোমার হইব।" কামান্ধ যুবক বড় তুষ্ট হইল, কিন্তু তাহার স্থিরপ্রজ্ঞা তখন সমস্তই উন্মত্ততার সহিত মিশিয়া গিয়াছে—তাই অপেক্ষা করিতে পারিল না—দুই হাতে মেৎনীকে সাপটিয়া ধরিল। অসহায়া যুবতী মুহূর্ত্তমাত্র নিজেকে সামলাইয়া অর্দ্ধকম্পিত শরীরে বলিল—আচ্ছা তবে একটুকু বিলম্ব কর—আমি একটুকু বাহির হইতে প্রস্তুত হইয়া আসি। মিশ্র তখন প্রকৃত বুদ্ধিশূন্ত, চতুরা মেৎনীর বাক্‌ভঙ্গীতে সত্য ভাষণ বুঝিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। আসন্ন বিপদপতিতা মেৎনী বাগুরা-মুক্ত বাঘিনীর ন্তায় ক্ষণেক মুক্ত হইয়া গৃহের বাহিরে যে স্থানে তাহার স্বামী জীবন ত্যাগ করিয়াছিল, সেই স্থানে মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া কহিল—স্বামি! আমার কণ্ঠরত্ন! তুমি স্বর্গে গিয়াছ, একবার তথা হইতে চাহিয়া দেখ আমি তোমার অভাবে কি বিপদে পড়িয়াছি। কিন্তু কান্ত হৃদয়ে মা সতীশ্বরী আছেন। এই চলিলাম—মায়ের ইচ্ছায় পরিচালিতা হইব, বলিয়াই মেৎনী একখানি ক্ষুরধার "হাঁসুয়া" (বঁটি) বস্ত্রাভ্যন্তরে কি জানি কেন কাহার আদেশে লুকাইয়া রাখিল। মিশ্রঠাকুর এই সল্প সময়টুকু অপেক্ষা করিতে না পারিয়া আবার আসিয়া একেবারে মেৎনীকে জড়াইয়া ধরিল।

মেৎনী অবশ হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার নিকটেই শোণিতস্রাবে প্লাবিত ছিন্নগ্রীব যুবক দুইটি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া একটীমাত্র "হো" শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল। কখন কোনরূপে কিভাবে তাহার গ্রীবায় হাঁসুয়ার তীক্ষ্ণমুখ অংশ প্রবেশ করিয়াছিল, ইহা দেখিবার কেহ

ছিলনা বায়ু বা বিশ্বের কেন্দ্রশক্তিটি পর্য্যন্ত তাহা দেখিল না। মেৎনী মাটীতে মুহূর্ত্ত পড়িয়া থাকিয়া পরে বিকট হাসির সহিত উচ্চ চীৎকারে বলিল—তোমার আমার এই মিলন বড় সুখের—বড় সুখের। মা—বাবা দেওকালী—স্বামি আমি জগৎ গ্রাস করিব! বড় ক্ষুধা পৃথিবীটা চিবিয়া খাইব। পাহাড়পর্ব্বত, বৃক্ষ, নদী, রবি, শশী বায়ু জল সমস্ত গ্রাস করিব। উন্মাদিনী মেৎনীর উচ্চ চীৎকারে, আর গভীর বিকট হাসিতে সেই বধ্যভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল। নিকটে একটী কৃষক একজোড়া বলদ লইয়া মাঠে যাইতেছিল—সে আসিয়া এই ভীষণ রাক্ষসী মূর্ত্তি আর ছিন্নশির মিশ্রকে দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া পল্লীর দিকে চলিয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তথায় চার পাঁচ জন পুরুষ, তিন চার জন স্ত্রীলোক, দুই একটি বালক বালিকা উপস্থিত হইয়া মেৎনীর সংহার-ময়ী মূর্ত্তি আর রুধির স্রোত মধ্যে ছিন্ন শীর্ষ মিশ্রকে দেখিয়া কেহই সাহস করিয়া সেই অর্দ্ধউলাঙ্গিনী সংহারিণী মেৎনীকে স্পর্শ করিতে পারিল না।

একজন লোক ছুটিয়া গিয়া গ্রাম্য চৌকিদারকে সংবাদ দিল। চৌকিদার দ্রুতপদে নিকটবর্ত্তী পুলিশষ্টেশনে গিয়া বলিবামাত্র একজন দারোগা দ্বিচক্রযানে আর তিনচারজন কনেষ্টবল দৌড়িয়া ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইল। কুঠির পুরাতন সাঁওতাল ভৃত্য আসিয়া ইতিমধ্যেই পশ্চাৎ হইতে দৃঢ়ভাবে মেৎনীকে ধরিয়া বসিয়া পড়িল। তখন মেৎনী একেবারে জ্ঞানশূন্য। দারোগা উপস্থিত হইয়া শবদেহ স্থানান্তরিত করিল—রক্তধারা ধুইয়া ফেলিল। স্থানটীকে পূর্ণরূপে পরিষ্কার করিল। গ্রাম্যলোকগণ মেৎনীকে বাতাস দিয়া জলের ঝাপটা দিয়া সংজ্ঞাযুক্তা করিল। তখন দারোগা জিজ্ঞাসা করিল—তুমি মিছিরঠাকুরকে চিন। উত্তর—না "মানুষ চিনি না—কতকগুলি অসুরকে জানি আর একটা বিকটাকার দানবকে খুব চিনি তাহার মাথা নাই—আমার খড়্গ"—বলিয়াই মেৎনীর প্রকৃত জ্ঞান হইল। চাহিয়া দেখিল তাহার চারিপার্শ্বে লোকারণ্য এবং শান্তিরক্ষাকারী দারোগা কনেষ্টবল। অর্দ্ধ-উত্থিতভাবে বলিল—তুমি চামুরু, আমাকে ধরিয়া বসিয়াছ কেন ?—আমার শরীরে এত তেল জল কোথা হইতে আসিল। চামুরু কহিল "তেরি মুড়ি"। দারোগা তখন তাহাকে বস্ত্রাংশ দিয়া বাঁধিয়া সমস্ত লোকগুলির জবানবন্দি লিখিতে লাগিল। মেৎনী বলিল—আমি কি খুনী আসামী ? একবাক্যে সকলি বলিল—হাঁ। মেৎনীর মুখ কালি হইয়া গেল।

দারোগা তখন শবদেহটি এক গাড়ীতে উঠাইয়া আর একখানি গাড়ীতে মেৎনীকে আবদ্ধাবস্থায় কনেষ্টবলবেষ্টিত করিয়া হয়লৌ পাঠাইল। গ্রাম্য সামাজিক গোলমাল এতদিনে মিটিয়া গেল।

হয়লৌ জেলা কমিসনারি প্রদেশ। এই স্থানে গবর্ণমেণ্টের একজন ডিপুটীকমিশনার অধিকাংশ সময় অবস্থান করেন। সম্প্রতি পূর্ব্বের ডিপুটীকমিশনার বদলি হইয়াছেন। তাঁহারি স্থানে আমাদের রেশম কুঠীর মালিক মহানুভব আর জি ক্লাবেড়িং কার্য্য করিতেছেন।

এই প্রদেশে একটি প্রবাদ আছে যে মিষ্টার ক্লাবেণ্ডিং খাঁটি ইংরেজ নহেন, কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ-সন্তান; কোন দৈবঘটনায় ক্লাবণ্ডিং নামক এক প্রকৃত ইংরেজ ইহাকে অতি শিশুকালে এক জঙ্গলে পাইয়াছিলেন। ঘটনাসূত্রে ক্লাবেণ্ডিং নিঃসন্তান ছিলেন। সুন্দর সুশ্রী বালকটীকে পুত্ররূপে প্রতিপালন করিয়া ইংলণ্ডে রাখিয়া সাহেব তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান ক্লাবেণ্ডিং বড় উদার এবং ধর্ম্মভীরু। প্রথমে ভারতে আসিয়া সরকারী চাকুরী মিলে নাই, তাই রেশম ব্যবসা করিয়া দিন কাটাইতেন। সম্প্রতি এই হরদৌ জেলার ডিপুটীকমিশনার হইয়া রেশমকুঠি ত্যাগ করিয়াছেন। আসিবার সময় মেৎনীর রূপে গুণে মুগ্ধ ক্লাবেণ্ডিং কুঠির মৃত্তিকায়—তাহার রেশমী উপার্জ্জন পুঁতিয়া চামুরু ভৃত্যকে রাখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস আছে যে, মেৎনী জগৎ পবিত্র করিবে। তাই সাহেব তাঁহাকে নিজের উপার্জ্জিত অর্থরাশি জগৎ উদ্ধার কার্য্যে ব্যয় করিবার অনুমতি দিয়া ডিপুটিকমিশনারী করিতেছেন। মেৎনী কিন্তু ইহার কিছুই জানে না, মাত্র একদিন চামুরুর নিকট একটা ক্ষীণ অস্পষ্ট কথা শুনিয়াছিল যে সন্ন্যাসিনী হইলে এই কুঠিবাড়ীর মাটী খনন করিয়া যাহা পাইবে তাহা তাহার।

সাহেব ক্লাবেণ্ডিং এইরূপ স্থির করিয়া আজ একমনে সরকারী কার্য্য করিয়া যাইতেছেন। কোন এক সময় ক্লাবেণ্ডিং ইউরোপীয় বিবাহ না করিয়া ভারতীয় কোন রূপসীকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এই সময় মেৎনী তাহার রূপজমুগ্ধ চক্ষুর দৃশ্য হয়। কিন্তু মেৎনী এই সময় কণৌজি ব্রাহ্মণের গলে বরমাল্য দান করে। তাই সাহেব মেৎনীকে মনে মনে ভালবাসিয়া প্রণয়ের প্রকৃত পরিচয় দিয়াছিলেন। সাহেব ক্লাবেণ্ডিং প্রকৃত প্রেমিক—তাই প্রেমের অপব্যবহার করেন নাই।

তিনি যখন বিচারাসনে উপবিষ্ট, তখন মেৎনী পুলিষ কর্ত্তৃক খুনি মোকর্দ্দমায় তাঁহার নিকট উপস্থিত। দেখিয়াই সাহেব শিহরিয়া উঠিলেন। আদালতে প্রকৃতভাবে তাহার বিচার চলিতে লাগিল। একজন উন্নত চরিত্র নব্য উকীল সাহেবের গুপ্ত অর্থে মেৎনীর পক্ষে উকীল খাড়া হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাহারি জামিনে সাহেব মেৎনীকে রাখিয়া বিচার করিতেছেন। বহু সাক্ষীসাবুদ প্রমাণ আইন বলে মেৎনীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আদেশ হয় হয় সময় একটী পুরাতন উকীল বোম্বাই হাইকোর্টের একটী নজির সাহেবের সম্মুখে ধরিলেন। বিচারক সাহেব ক্লাবেণ্ডিং নজীরটি পড়িয়া মহা আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে উকীল-বৃদ্ধকে ধন্যবাদ দিয়া মেৎনীকে বেকসুর খালাস দিলেন।

গবর্ণমেণ্টের উকীল আপত্তি করিলে সাহেব কহিলেন—"নিজের সতীধর্ম্ম রক্ষা করিতে স্ত্রীলোকে স্বজ্ঞানে শতটি পর্য্যন্ত লোক খুন করিলেও সে নির্দ্দোষ, ইহাই আইনের মর্ম্ম। নজির "ফুলবেঞ্চের বিচার।" সুতরাং আর কেহ কিছু বলিতে পারিলনা। মেৎনী মুক্ত হইয়া উকীলবাবুর বাসায় দুইদিন পরে সুস্থচিত্তে আহার করিল। একবারমাত্র ভাবিল—আর অদ্য হইতে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়া আমার পরম দেবতা নারীর সর্ব্বস্বধন পরমদেবতা যে স্থানে জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন সেইস্থানে "দেওকালী" মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া সতীধর্ম্ম শিক্ষা

দিতে অবস্থান করিব। যেসময় বিপদমুক্তা মেৎনী এইরূপ ভাবিতেছে, সেইসময় সহসা আকাশ হইতে একটা অস্পষ্ট শব্দ হইল। তাহাতে মেৎনী আর উকীল বাবু বুঝিলেন—"দেউল" আর কিছু কেহ বুঝিল না।

প্রাত্যহিক সরকারী কার্য্য করিয়া সাহেব ক্লাবেণ্ডিং সন্ধ্যা ভ্রমণে বাহির হইয়া থাকেন। অদ্য কাছারীর ঘটনা আর বহুদিনের গুপ্তপ্রেমের আকরভূমি মেৎনীর কথা মনে পড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে উকীলবাবুর বাসায় উপস্থিত হইলেন। মেৎনী আর উকীলবাবু আসিয়া অভিবাদন করিবামাত্র সাহেব কহিলেন—মেৎনী, দেখ দেখি আমায় চিনিতে পার কি? মেৎনী দেখিল তাইতো, এ দেখি সেই রেশমকুঠির সাহেব। যে তাহাকে একদিন সাহায্য করিয়াছে এবং একটী স্বর্ণাঙ্গুরী দিয়াছিল, ইনি সেই সাহেব।

তখন মেৎনী অঙ্গুরীটি খুলিয়া বলিল আমি বিপদে পড়িলে এই অঙ্গুরী দেখাইলে আপনি না কি আমার উপকার করিবেন বলিয়াছিলেন। অদ্য আমাকে বিনা অঙ্গুরীতেই মুক্তি করিয়াছেন। এখন অঙ্গুরী দিলাম, অপর কার্য্যটি করিয়া দিন।

উকীল বিস্মিত হইলেন। ডিপুটীকমিশনারের সহিত মেৎনী এতই পরিচিতা, তবে বোধ হয় ইহার চরিত্র যবনদোষে দুষ্ট। উকীলের উৎফুল্ল মুখ কিছু মলিন হইল। সাহেব এবং মেৎনী প্রকৃত ঘটনা বলিয়া তাহার সন্দেহ ভঙ্গ করিলেন। তখন ক্লাবেণ্ডিং কহিলেন—উকীলবাবু আপনি ব্রাহ্মণ। সুতরাং আমার কার্য্যভার দিতে আর বাধা নাই। আপনি এই মেৎনীকে লইয়া আমার পূর্ব্ব কুঠিতে যাইবেন। তথায় মাটির তলে যাহা পাইবেন, তদ্বারা মেৎনীকে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিতা করাইয়া একটী কালীমূর্ত্তি স্থাপন করাইয়া মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিবেন। আমি চলিলাম। সাহেব প্রস্থান করিলেন। পরদিন প্রভাতে উকীল হরকিষণ মেৎনীকে লইয়া তাহার বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন।

রেশমকুঠিতে পূর্ব্ব ভৃত্য চামুরু ছিল, সে তখন মেৎনীর কথায় মাটি খুড়িয়া একটী ক্ষুদ্রকায় ডিকাণ্টার বাহির করিল তাহার মধ্যে একসঙ্গে ৫০০শত স্বর্ণমুদ্রা পাইল। উকীল হরকিষণ যুবক; তিনি রূপসী মেৎনীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী বহুদিনের উদাসীন পণ্ডিত বদ্রিদাস বাবাজির হাতে মৎনীকে আর ৫০০শত মোহর দিয়া সমস্ত বুঝাইয়া বলিয়া গেলেন। চামরু মেৎনীর ভৃত্য হইয়া রহিল। পণ্ডিত বদ্রিদাস অতঃপর মেৎনীর গুরু এবং অভিভাবক হইয়া রহিলেন।

বৈশাখী অমাবস্যা সমগ্র হরদোপ্রদেশ ভীষণ আঁধি (ঝড়) দ্বারা একরূপ বিপর্য্যস্ত। ভীষণ অন্ধকারে পণ্ডিত বদ্রিদাস একটী নাতিদীর্ঘ লৌহদণ্ড লইয়া মেৎনীদিগের বসতির নিকটবর্ত্তী স্থান খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া সপ্তচ্ছদতলে দাঁড়াইলেন। একবার শূন্যে কালরূপিণী কালিকার মূর্ত্তি যেন দেখিতে পাইলেন তখন "মা দেওকালী, এহি" বলিয়া জলবৃষ্টির মধ্যে সেইখানে বসিলেন। ক্রমে আঁধি থামিয়া গেল। মেৎনী গুরুদেবকে খুঁজিতে খুঁজিতে একাকিনী তথায় উপস্থিত হইল।

এই সময় এই স্থানে একটা অনৈসর্গিক জ্যোতিঃ সহসা জ্বলিয়া উঠিল। বদ্রিদাস মেৎনী সেই আলোতে শিহরিয়া দেখিল খড়্গ খর্পরধারিণী নৃমুণ্ডমালিনী গলরুধীর ধারাপ্রবাহিনী সংহারময়ী কালিমূর্ত্তির ছায়া বায়ুহিল্লোলে দুলিতেছে। তখন আর উভয়ে প্রসীদ—প্রসীদ বলিয়া প্রণত হইল। মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল।

পণ্ডিত বদ্রিদাস মেৎনীকে সেই দিন গভীর রাত্রে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। প্রভাতে উঠিয়া যে স্থানে অনৈসর্গিক আলো ফুটিয়াছিল সেই স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তথায় একটী মন্দির প্রস্তুত করাইলেন। একখানি কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরে সংহারময়ী কালিমূর্ত্তির ছায়া অঙ্কিত করিয়া তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া মেৎনীকে উহা পূজা করিতে নিযুক্ত করিলেন। মেৎনী প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিয়া শক্তীশ্বরীর আরাধনা করিতে লাগিল। ক্রমে তাহার নাম চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল। সমগ্র হরদৌ জেলার হিন্দুসাধারণে তাহাকে "মাই" নামে ডাকিতে লাগিল।

এইরূপে শক্তিপূজা করিয়া মেৎনী দীর্ঘকাল এই অঞ্চলে অতি প্রসিদ্ধ সাধিকা বলিয়া পরিচিত হইল। কবে কোন সালে তাহার জীবন এই জগৎ ত্যাগ করিল, তাহার কোন স্থিরতা নাই; কিন্তু মন্দির গাত্রে প্রস্তরে খোদিত আছে ১৯৪০ সম্বত ১৫ই বৈশাখ এই 'দেওকালি' মন্দির প্রতিষ্ঠিত।

বলা বাহুল্য অদ্যাপিও এই অংশের লোকে ইহাকে "মেৎনীর দেউল" বলিয়া থাকে।

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ।

পঞ্জিকা-সংস্কার সমালোচনার বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা।

পূজ্যপাদ বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ-সভার পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা নিরূপণ ব্রতের আনুকূল্যে আহূত মতামতের মধ্যে কোন কোনটি ব্রাহ্মণ-সমাজ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সংস্কার পক্ষে ও তদ্বিরুদ্ধে ব্যক্তিবিশেষ কি যুক্তি দেখাইতে পারেন ও সেই যুক্তি কোন্ ভিত্তি-মূলক একথা সাধারণের গোচর করাই সম্ভবতঃ সভার উদ্দেশ্য। বিগত চৈত্র সংখ্যায় এ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহাতে লেখকের মত ও তাঁহার স্বপক্ষ সমর্থক যুক্তি অপেক্ষা বিরুদ্ধ মতের খণ্ডনই মুখ্যতর উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। সংস্কারের অনাবশ্যকতা না দেখাইয়া লেখক মহাশয় দেখাইতে চাহেন যে সংস্কার পক্ষীয় ব্যক্তিবিশেষের যুক্তি অকিঞ্চিৎকর। এরূপ করিলে একজনের কথার মূল্য যাইতে পারে, কিন্তু সংস্কারবিরুদ্ধ পক্ষের সমর্থন হয় না। সংস্কারের আবশ্যকতা দেখাইতে গিয়া যদি ব্যক্তিবিশেষের পদস্খলন হয়, যদি তিনি তাঁহার

পক্ষ সমর্থন করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অনুপযুক্ততা প্রতিপন্ন হইল বটে সংস্কার বিরোধী মতের পুষ্টি সাধিত হইল না। কিন্তু সাধারণ পাঠক মনে করিতে পারেন যে সংস্কার পক্ষীয় মত যখন এতাদৃশ অকিঞ্চিৎকর তখন ফলে দাঁড়াইল সংস্কারের অনাবশ্যকতা। সেইরূপ উদ্দেশ্যে লেখক ব্যক্তিবিশেষের যুক্তি খণ্ডন প্রয়াসে সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছেন এবং সমালোচনার দৌর্ব্বল্য অনুভব করিয়া যথাসাধ্য অসম্মানসূচক ভাষা প্রয়োগ দ্বারা তাহার বলাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক মহাশয়ের ভাষা ভাব ও যুক্তির মূল্য দেখাইবার জন্য তাঁহার প্রবন্ধের বিশ্লেষণ ও পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলাম।

আমরা সকলেই সম্পূর্ণ অবগত আছি যে বিচার স্থলে কটু ভাষার বিশেষ মূল্য নাই বরং এরূপ ভাষা দুর্ব্বলতার চিহ্ন। কিন্তু কলহ দেখিলে আমরা স্বভাবতই একটু উত্তেজিত হই * এবং সেই উত্তেজনার আস্বাদে অবজ্ঞাসূচক কটূক্তিকে ওজস্বিতা বলিয়া মনে করি। সেইজন্য সর্ব্বজন-জানিত স্বতঃসিদ্ধির পুনরুল্লেখ দোষে কলুষিত হইয়া আমরা বলিতে বাধ্য হইলাম যে দন্তনিষ্পেষণ যেমন বিক্রম নহে, চীৎকার যেমন সঙ্গীত নহে, শিরশ্চালনাদি মুদ্রাদোষ যেমন বাক্‌কুশলতা নহে, ব্যস্ততা যেমন ক্ষিপ্রহস্তের পরিচায়ক নহে, দম্ভ যেমন বিদ্যার নিদর্শন নহে, মূকভাব যেমন বিজ্ঞতার চিহ্ন নহে, লম্ফঝম্প যেমন কার্য্যদক্ষতা নহে, কটুভাষার প্রয়োগ সেইরূপ শাস্ত্রীয় বিচারদক্ষতা নহে। বসা বিমিশ্রিত ঘৃতের ন্যায় দুর্ব্বাক্য সমন্বিত শাস্ত্রবিচারের মর্য্যাদা অতি লঘু। শাস্ত্রীয় বিচার দেবভোগ্য পদার্থ হইলেও কটুভাষার আশ্রয়ে নিম্নগামী হয়। শাস্ত্রবিচারে প্রযুক্ত হইলেও দুর্ব্বাক্যের দুঃশীলতা অপনীত হয় না। মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ!

বিরুদ্ধ লেখকের কুৎসা কাহারও নিজের গুণগ্রামের উৎকর্ষের হেতুবাদ নহে (ক)। তথাপি কুৎসার অবলম্বনে উদ্দেশ্য সাধন তাদৃশ বিরল নহে। অসতর্ক পাঠককে স্বপক্ষ পোষক করিবার, দুর্ব্বল পক্ষকে সবলের আকারে সাজাইবার অন্যতম উপায় প্রতিদ্বন্দ্বীর নিন্দাবাদ। উপস্থিত ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত সাতকড়ি সিদ্ধান্ত-জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় তাঁহার সমালোচনায় লিখিতেছেন যে, ৺পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য মহাশয়ের মতে "বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার গণক শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র এম, এ মহাশয় সংস্কৃত জ্যোতিষের কিছুই দেখেন না। স্ন্যাটিক্যাল বুঝেন * * তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র দেখেন না। ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা হউক বা না হউক তাহাতে তাহার কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।" এ বিষয়ে তিনটি কথা বলিবার আছে। প্রথমত ৺পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য মহাশয়ের অবজ্ঞা উদ্ধৃত করিবার সময় একটু ভাষান্তর করিয়া লেখক মহাশয় নিজের কার্য্যোপযোগী করিয়া লইয়াছেন ও যে সময়ের এবং যে পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন সে সময়ে ও সে পুস্তকে এ কটূক্তির অবতারণা করা হয় নাই। সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় আশুবাবুকে গালি দিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু লেখক মহাশয় সে গালির সামান্য ভাষান্তর ও বিলক্ষণ সমর্থন

---

* After all we love to look on at a quarrel—Helps.

(ক) "But soiling another, Annie, will never make one's self clean."

করিয়া পুস্তকান্তরের উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হওয়াতে করিয়াছেন কিনা সে কথা পাঠক মহাশয়গণ বিবেচনা করিবেন। দ্বিতীয় কথা এই যে কেহ মনঃসংযোগ করিয়া পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন যে যেস্থলে এই কুৎসা সন্নিবেশিত হইয়াছে তথায় কথা প্রসঙ্গে এ নিন্দা আসিতে চায় না; এই কুৎসা প্রকাশের খাতিরে যেন অংশটি লিখিত। জিবীতের নিন্দা প্রয়াসে লেখক মহাশয় মৃতের স্মৃতির গ্লানি করিতে দ্বিধা করেন নাই। অনায়াসে লিখিলেন "সাহিত্যাচার্য্যের অন্যান্য ভ্রান্ত ধারণার উহা অন্যতম।" (খ) তৃতীয়ত পাঠকগণের নিকট আমাদের অনুরোধ এই যে তাঁহারা যেন মনে না করেন যে আশুবাবুর অজ্ঞতা প্রতিপন্ন হইলেই সংস্কার অনাবশ্যক হইয়া পড়িল।

পরগ্লানি সাধারণতঃ লেখকের রুচিসম্ভূত হইলেও সর্ব্বদা উদ্দেশ্য বিহীন হয় না। এক্ষেত্রে আশুবাবুর প্রদর্শিত সংস্কারাকাঙ্ক্ষী শাস্ত্রবচনের প্রতি লোকের লক্ষ্য যাহাতে না যায় তাহাই বোধ হয় লেখকের প্রয়াস। আশুবাবু ব্রাহ্মণ-সমাজের ১৩২২ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে ও মুরশিদাবাদ সম্মিলনে পঠনার্থে লিখিত নিবেদন পুস্তিকায় (গ) সিদ্ধান্ত-শিরোমণি হইতে, ভারতীয় জ্যোতীষের দৃক্‌সিদ্ধি অভিপ্রায় দেখাইয়াছেন। উদ্ধৃত বচনাদির বিরুদ্ধে সাতকড়ি বাবু কিছু বলেন নাই। সে সকল খণ্ডন করা দূরে থাকুক তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখও করেন নাই। সম্ভবতঃ এ সকলের খণ্ডন সাধ্যাতীত অথবা একান্ত দুরূহ বিবেচনা করিয়াছেন এবং অনন্যোপায় হইয়া প্রদর্শকের কুৎসা দ্বারা প্রদর্শিত বিষয়ের আলোচনায় সাধারণকে বিরত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

সাধারণের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে তাঁহারা বক্তিবিশেষের নিজমত বা পরমত খণ্ডনের দিকে তাদৃশ দৃষ্টি না করিয়া বিশিষ্টব্যক্তি ও পুস্তকের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। যেহেতু সারকথা সকলের নিকট পাওয়া যায় না; শৈলে শৈলে ন মাণিকং মৌক্তিকং ন গজে গজে। সিদ্ধান্তজ্যোতির্ভূষণ সাতকড়িবাবু যদি সিদ্ধান্ত পুস্তক নিহিত বা বিশিষ্টব্যক্তি লিখিত সংস্কার-বিরোধী উদ্দেশ্য বা বাক্য দেখাইতেন তাহা হইলে তাঁহার প্রবন্ধের মূল্য বাড়িয়া যাইত। যাহাই হউক জনসমাজ যেন মনে রাখেন যে আশুবাবু বিপুল কুৎসার পাত্র হইলেও তাঁহার প্রদর্শিত জ্যোতিগ্রন্থ বা জ্যোতির্ব্বিদের মতামত বিশেষ বিবেচনার বস্তু; অপরপক্ষে, রূঢ়ভাষা ওজস্বিতা নহে বরং দুর্ব্বলের অবলম্বন। No case, abuse the adversary's. advocate. অতঃপর লেখক মহাশয়ের যুক্তি পরীক্ষা করা যাইবে।

(খ) লেখক মহাশ বলিতে চাহেন যে তিনি ৺পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য মহাশয়ের গালাগালির অনুমোদন করেন না। কিন্তু তাহা হইলে এ কথা উত্থাপনেরই প্রয়োজন হইত না। প্রবন্ধের অন্যান্য অংশ হইতেও দেখা যায় তিনি কটূক্তির পক্ষপাতী। Mark Antony রোমের নাগরিক বর্গকে বলিয়াছিলেন,—"It is his will which pardon me I do not mean to read * * * I must not read it."

(গ) ১৩২৪ সালের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার জ্যোতিষ সংস্করণে সিদ্ধান্ত শিরোমণির দৃক্‌সিদ্ধি আলোচনা পুনর্মুদ্রিত করা হইয়াছে।

স্বাধীন ত্রিপুরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সভা।

স্বাধীন ত্রিপুরাধীশ্বর ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর, সনাতনধর্ম্ম শাস্ত্র ও তদ্বুচিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষার জন্ত রাজধানী আগরতলায় "স্বাধীন ত্রিপুরা ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সভা"নামে একটী স্থায়ী সমিতির সংস্থাপন করিয়াছেন। বিগত ৯ই জ্যৈষ্ঠ অত্রত্য রাজপ্রাসাদে উক্ত সভার প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় সভ্যরূপে ত্রিপুরা ও ঢাকা জেলার প্রায় বিশজন প্রধান ব্রাহ্মণপণ্ডিত, স্থানীয় সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীবর্গ ও ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। সভার স্থায়ী সভাপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর অসুস্থ ছিলেন বলিয়া স্থায়ী সহকারী-সভাপতি মহারাজ কুমার শ্রীল শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রথমতঃ সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কাব্যব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ মহাশয় রচিত কয়েকটী মঙ্গলাচরণ শ্লোক তৎকর্তৃক পঠিত হইলে সম্পাদক শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সুললিত ভাষায় সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্য বর্ণন করেন। তৎপর সভার অন্যতম সভ্য পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত-সমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্নমহাশয় সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা পঠিত হয়। অতঃপর অত্রত্য উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র বিদ্যানিধি এম,এ মহোদয় কর্তৃক লিখিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মবিষয়ক সুচিন্তিত প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কাব্যব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ মহাশয় রচিত "স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যে সনাতন ধর্ম্মের প্রভাব" শীর্ষক প্রবন্ধ এবং শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র জ্যোতীরত্ন মহাশয় লিখিত পঞ্জিকায় দৃক্‌সিদ্ধি বিষয়ক প্রবন্ধ লেখকগণ কর্তৃক পঠিত হয়। তৎপর সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র তর্কসাংখ্যবেদান্তমীমাংসাতীর্থ মহাশয় বর্ণভেদ বিষয়ক বক্তৃতা করেন। অন্যান্য বহু পণ্ডিতগণও সনাতন ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা করেন, সভাপতি শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের সুচিন্তিত ও সারগর্ভ অভিভাষণ বিগত অধিবেশনের সভাপতি কর্তৃক পঠিত হয়। সভার অন্যতম সভ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ মহাশয় একটী কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠন করিবার প্রস্তাব করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী পরিগৃহীত হয়। পরিশেষে সভাপতিমহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক সর্ব্বমঙ্গলময় জগদীশ্বর সমীপে সভার সংস্থাপক সনাতন-ধর্ম্ম রক্ষক শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের সর্ব্ববিধ মঙ্গলকামনা করিয়া সভাভঙ্গ হয়। এতৎসহ সভার নিয়মাবলী ও সভাপতি সম্পাদক ও সভ্য প্রভৃতির মুদ্রিত নাম ধামাদিযুক্ত পত্র প্রেরিত হইল।

স্বাধীন ত্রিপুরা ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সভার সভাপতি, সম্পাদক ও সভ্যগণ।

সভাপতি—মহারাজাধিরাজ স্বাধীন ত্রিপুরাধীশ্বর "ধর্ম্মধুরন্ধর" "ন্যায়নিধি" "বিদ্যারঞ্জন" "পূর্ণানন্দ কলানিধি" শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর।

সহকারী সভাপতি—মহারাজ-কুমার শ্রীল শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন কাব্যরত্ন রাজপণ্ডিত।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণ।

সহকারী সম্পাদক – শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কাব্যব্যাকরণ সাঙ্খ্যতীর্থ কাব্যবিনোদ সাঙ্খ্যসাগর।

সভ্যগণ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ, (অধ্যাপক গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ।) পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, (পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের সভাপতি।) শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ তর্কতীর্থ, (ঢাকা প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক।) শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর ন্যায়রত্ন, সাহাপুর—ত্রিপুরা। শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন কাব্যবিনোদ সিদ্ধান্তবাগীশ, কুমিল্লা। শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু তর্কনিধি, সাহাপুর—ত্রিপুরা। শ্রীযুক্ত কালীনাথ তর্করত্ন, সাহাবাজপুর—ত্রিপুরা। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র কাব্যতীর্থ, কাশাড্ডা—ত্রিপুরা। শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র জ্যোতীরত্ন, চক্রধা—ঢাকা। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র তর্কসাঙ্খ্যবেদান্ত মীমাংসাতীর্থ সিদ্ধান্তবাগীশ ন্যায়রত্ন সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী, শূইলপুর—ত্রিপুরা। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার কাব্যতীর্থ, (হেড্ পণ্ডিত উমাকান্ত একাডেমী আগরতলা।) শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র বিদ্যানিধি এম্, এ, (হেড্ মাষ্টার উমাকান্ত একাডেমী আগরতলা।) শ্রীযুক্ত রাসমোহন স্মৃতিভূষণ (অধ্যাপক রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয় আগরতলা)। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণ, (শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের দ্বারপণ্ডিত।) শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কাব্যব্যাকরণ সাঙ্খ্যতীর্থ কাব্যবিনোদ সাঙ্খ্যসাগর, (রাজপুরোহিত ও আগরতলা রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক।) শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, জিনদপুর—ত্রিপুরা।

শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের অভিপ্রেত স্বাধীন ত্রিপুরা ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সভার নিয়মাবলী।

১। উক্ত সভা "স্বাধীন ত্রিপুরা ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সভা" নামে অভিহিত হইবেন।

২। স্বাধীন ত্রিপুরাধীশ্বর "ধর্ম্ম ধুরন্ধর" "ন্যায়নিধি" "বিদ্যারঞ্জন" "পূর্ণানন্দকলানিধি" মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীযুত বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর উহার সভাপতি থাকিবেন।

৩। মহারাজ-কুমার শ্রীল শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন কাব্যরত্ন রাজ-পণ্ডিত সহকারি-সভাপতি থাকিবেন।

৪। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণ সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কাব্যব্যাকরণসাঙ্খ্যতীর্থ কাব্যবিনোদ সাঙ্খ্যসাগর সহকারি-সম্পাদক থাকিবেন।

৫। উক্ত সভায় অন্যূন পঞ্চদশজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত সভ্য থাকিবেন। আবশ্যকমত সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইবে।

৫। (ক) সভায় ন্যায়, সাঙ্খ্য, বেদান্ত, স্মৃতি, কাব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, তন্ত্র, পুরাণ ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের পণ্ডিত সভ্য থাকিবেন। সুবিধা হইলে বৈদিকপণ্ডিতও সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন।

৬। সাধারণ ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশন বৎসরে অন্ততঃ　　করিয়া হইবে।

৭। নিরূপিত সভ্যদিগের মধ্যে অন্যূন আটজন উপস্থিত থাকিলেই সভার কার্য্য হইতে পারিবে।

৮। সভা হইতে শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থাদি প্রদত্ত হইবে।

৯। সভায় ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী প্রশ্ন ও তাহার মীমাংসা হইবে।

১০। সভা দেশাচার ও সামাজিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১১। সভা দেশাচার বিরোধী অথচ শাস্ত্রসম্মত বিষয়ের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিবেন।

১২। সভা কৃতবিদ্য ছাত্র ও ব্যক্তিবিশেষকে উপাধি প্রদান করিতে পারিবেন।

১৩। সভায় ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতাদি হইবে।

১৪। সভা সম্পর্কীয় পরামর্শ সভার অধিবেশন বৎসরে অন্ততঃ তিনবার করিয়া হইবে।

১৫। সভ্যগণের মধ্যে চারিজন উপস্থিত হইলেই পরামর্শ সভার অধিবেশন হইতে পারিবে।

স্বাধীন ত্রিপুরা ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সভার সভাপতির অভিভাষণ।

যিনি দৃশ্যমান চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি অসীম কৃপায় প্রাণিসমূহের প্রতিপালন করিতেছেন, এই জগৎ-প্রপঞ্চ প্রলয়ে যাঁহাতে বিলীন হয়, যিনি বাঙ্মনোঽতীত সেই সর্ব্বশক্তিমান্ কল্যাণময় অন্তর্য্যামী ভগবান্‌কে আমি প্রেমপুষ্পাঞ্জলি উপহারে বন্দনা করিতেছি।

মনীষী মানব—সম্পদ, বিপদ, উভয়কালে যাঁহাকে ঐকান্তিক ভক্তির সহিত ধ্যান করেন, যাঁহার চিন্তাবিমুখ মানবচিত্তে অলক্ষিতভাবে পাপ প্রবেশ করে, পাপ, তাপ ও বিঘ্নরাশি যাঁহার অণুমাত্র প্রসন্নতায় প্রবল পবনচালিত মেঘের ন্যায় দূরীভূত হয়, সেই পরমারাধ্য জগন্নিয়ন্তার শ্রীশ্রীচরণকমলে মধুলুব্ধ ভৃঙ্গের ন্যায় প্রেমলোভে মদীয় অন্তঃকরণ নিরত হউক; তাহা হইতে স্পৃহনীয় বস্তু জগতে আর নাই।

যে ব্রাহ্মণগণকে স্বয়ং ভগবান্ স্বীয় অংশ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সৃষ্টি হইতে যাঁহারা তপোবলে আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার বিপদের নিবৃত্তি করিয়া আসিতেছেন, সেই ব্রাহ্মণকুল-সম্ভূত রত্নোপম সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীকে আমি ভক্তিসহকারে অভিবাদন করিতেছি।

ক্ষত্রবংশাবতংস মদীয় প্রাতঃস্মরণীয় পূর্ব্ববর্ত্তিগণ ব্রহ্মণ্যদেব ও ব্রাহ্মণগণের চিরসেবক ছিলেন। আমি তাঁহাদিগের নগণ্য বংশধর, তাঁহাদিগের পদাঙ্কানুসরণে অধিকারলাভই আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। এই ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সভা আমার উপাস্যমূর্ত্তি আমার সাধনার মন্ত্র। ইহাঁর সহিত আমার আপাত-প্রতীয়মান সভাপতিত্ব রূপান্তরিত সেবকত্বমাত্র। ইহাঁর সহিত সেব্য-সেবকত্ব সম্বন্ধেই আমি পরিতৃপ্ত।

যাঁহারা অত্যানুগ্রহে স্মরণাতীতকালের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও তদুচিত আচার ব্যবহার পুনর্ব্বার স্মৃতিপথে জাগাইয়া প্রচণ্ড কলিপ্রতাপে নাস্তিকতা ও অবিশ্বাসের তরঙ্গে ভাসমান আর্য্যজাতির পুনরুত্থানে যত্নপর হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগের রাজ্যপালন কার্য্যে আংশিক সহায়তা করিতেছেন। প্রজাপুঞ্জ ধর্ম্মপরায়ণ হইলে রাজ্যের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম্মের শক্তি বলবতী ও সর্ব্ববিধ মঙ্গলের প্রসূতি। চিরদিন ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণজাতি প্রকার ভেদে পরস্পর পরস্পরের রক্ষক ছিলেন। আজও সেইভাব আমার উদ্দেশ্যের বহির্ভূত নহে।

যে আর্য্যাবর্ত্তে শান্তির জয়পতাকা উড্ডীন ছিল, যে আর্য্যাবর্ত্ত ধর্ম্মের আলোকে দেদীপ্যমান ছিল, যে স্থানে মানব হৃদয়ে মঙ্গলময়ী বৃত্তি সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিত, মহর্ষিগণের গম্ভীর বেদধ্বনি দিগন্তপূত করিয়া যেস্থানে তির্য্যগ্‌জাতিকেও জ্ঞানাধিকারী করিত, যজ্ঞীয় ধূম সসৌরভে উত্থিত হইয়া যে দেশ আচ্ছন্ন করিত, আজ যুগধর্ম্মে তাহা অজ্ঞান অমানিশার ঘোর তমসাবৃত! নৈরাশ্য জলধির অন্তস্তলে নিপতিত! দেশে চতুর্ব্বর্ণ, শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্যকলাপ নিরত থাকিয়া অশান্তি বা দুঃখকে আকাশ কুসুম মনে করিত, তাহা আজ অশান্তি ও দুঃখের বিলাসকানন। যাহা চিরদিন "পুণ্য ভূমি" আখ্যায় অলঙ্কৃত ছিল চতুর্ব্বর্ণের আচার ব্যবহারে তাহা বিপরীত আখ্যার যোগ্য। ইতিহাস ও পুরাণাদি পাঠে এই পুণ্যভূমির পূর্ব্বকাহিনী যাহা অবগত আছি বর্ত্তমানাবস্থার তুলনায় তাহা স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল জগতে শুভাশুভ ক্রম বিপর্য্যস্ত হইতেছে সুতরাং পুনরুত্থানে আমরাও আশা করিতে পারি। আশাই মানবের উন্নতি সোপান বিপদে অবলম্বন। দিন দিন বর্ণাশ্রমাচারের বিলোপই এই অবনতির মুখ্যতম কারণ বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

যদিও আমরা নানা বিপ্লবে ও সংস্রবে সেই ঋষি পরম্পরাগত সদাচার ভ্রষ্ট হইয়া অবনতির সহিত নৈকট্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া থাকি, তথাপি সমবেত শক্তির প্রভাবে সর্ব্বোপরি মঙ্গলময় জগদীশ্বরের কৃপায় পুনর্ব্বার উন্নতি লাভ করিতে পারিব।

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ তাপাহত ব্যক্তিরই ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান সময় ত্রিতাপ আমাদিগের সম্মুখে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই অধিকাংশ মানবের হৃদয়ে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসারূপ মঙ্গলময়ী বৃত্তি উদিত হইয়াছে। এই বৃত্তি মঙ্গলময়ের ইচ্ছার ফল। ইহাও আমাদিগের অভ্যুত্থানাশার অন্যতম কারণ। কিছুকাল আমাদিগের হীনাবস্থা হইয়াছে বলিয়া নিরাশ হইবার কারণ নাই—নিজ শক্তিতে অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই—কর্ত্তব্যকার্য্যে শিথিলতার কারণ নাই। আবার সুশিক্ষা ও সদুপদেশের প্রভাবে অজ্ঞানের সূচীভেদ্য অন্ধকারাবৃত ভূমণ্ডলে মধুর মঙ্গলমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জ্ঞানের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ উদিত হইবে। আবার এদেশ পুণ্যভূমি পরিচয়ের যোগ্য হইবে। এই আশাই আমাদিগকে এই স্থানে সমবেত করিয়াছে। চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যথাযোগ্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সদাচার সম্পাদনই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য।

ভগবদ্ বাক্য ও ঋষিবাক্যে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইয়াছে তাহাই ধর্ম্ম তাহার

অন্যথা অধর্ম বা স্বেচ্ছাচার। এখন স্বেচ্ছাচারের ঘন ঘটায় —স্বেচ্ছাচারের ঝঞ্ঝাবাতে আর্য্যাবর্ত্ত— রূপান্তরিত ও চঞ্চল। প্রাচীন মহর্ষিগণ যুগযুগান্তর কঠোর তপস্যাবলে যে উজ্জ্বল জ্ঞানালোক লাভ করিয়াছিলেন সেই আলোক তন্ন তন্ন করিয়া জগতের কল্যাণকল্পে গভীর গবেষণায় যাহা ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য বলিয়া সংহিতাদি ধর্ম্মগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া যে স্বেচ্ছাচার দাবাগ্নি উত্থিত হইয়াছে তাহাই এই মহাবনের প্রলয়াগ্নি। এই অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে হইবে।

প্রত্যেক মানবে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ সন্নিবিষ্ট আছে। প্রত্যেক গুণের বর্দ্ধক ও নিবর্ত্তক আহার ব্যবহারও নিরূপিত আছে। স্বেচ্ছাচারের ফলে প্রায়ই রজোগুণের বর্দ্ধক আশুরম্য আহার্য্য সাদরে গৃহীত হয়, তাহাতেই সত্ত্বগুণ ক্ষীণ হয়। সত্ত্বগুণের ক্ষীণতাই শাস্ত্রবিশ্বাস ও সদাচারের প্রতিপন্থী হইয়া ক্রমে শান্তিলতিকার মূলোচ্ছেদ করে।

আমরা নিরন্তর শান্তি চাই, শান্তির জন্য বিজ্ঞানোদ্ভাবিত অনেকপ্রকার কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করি কিন্তু শান্তি আমাদের জ্ঞানপথের অতিদূরে। সে আরোগ্য নাই সে শক্তি নাই সে দীর্ঘ জীবন নাই। কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না ধর্ম্ম হীনতাই ইহার প্রধান কারণরূপে নিশ্চিত হইবে এই ধর্ম্মহীনতা দূরীভূত করিতে হইবে। ধর্ম্ম বলই প্রধানবল, ধনবল, জনবল ও আধিপত্যবল প্রকৃতবল নহে তাহা ক্ষণভঙ্গুর। বৃন্ত ও পুষ্পের যেরূপ সম্বন্ধ ধর্ম্ম ও জীবনে তাদৃশ সম্বন্ধ আছে, পুষ্পবৃন্ত চ্যুত হইলে রমণীয়তা ও সৌরভ প্রভৃতি স্বতঃসিদ্ধ গুণরাশি বিহীন হইয়া ক্রমে ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়। ধর্ম্মচ্যুত জীবনও মনুষ্যোচিত সদ্‌গুণ বিরহিত হইয়া লয়প্রাপ্ত হয়। এই ধর্ম্ম হীনতাই পারত্রিক কল্যাণেরও অন্তরায়।

জগতের সৃষ্টিকাল হইতে আমার সুগৃহীত নামধেয় মূর্দ্ধাভিষিক্তগৌরব পূর্ব্বপুরুষগণ পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের অনুষ্ঠিত কার্য্যে রাজশক্তি প্রয়োগ করিয়া সনাতনধর্ম্ম রক্ষার সহায়তা করিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে যথাযোগ্য শক্তি প্রয়োগে কুণ্ঠিত হইব না। ভরসাকরি এই সভার সভ্যবৃন্দও যথাশক্তি কর্ত্তব্য সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইবেন না। মঙ্গলময় সমীপে আমি এই সভার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করিতেছি, ইতি। ১৩২৭ ত্রিপুরাব্দ, ৭ জ্যৈষ্ঠ।

সংবাদ।

পূর্ব্বস্থলী শাখা-ব্রাহ্মণ-সভা।

গত ৩১শে বৈশাখ সোমবার চুপির স্বধর্ম্মপরায়ণ জমিদার দেওয়ান মহাশয়দিগের বাটীর শ্রীশ্রী৺ রাধাবল্লভ জিউর নাট-মন্দিরে পূর্ব্বস্থলী চুপী, কাষ্ঠশালী, গোপীপুর মেড়তলা এই পঞ্চগ্রামস্থ ব্রাহ্মণবর্গকে লইয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার একটী শাখা-সভার সংস্থাপন হইয়াছে, ঐ

অধিবেশনে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার পক্ষ হইতে ব্রাহ্মণ সভার ধর্ম্মপ্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রেবতীকান্ত তর্কপঞ্চানন এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কান্তকুমার তর্কনিধি মহাশয় যোগদান করিয়াছিলেন, অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় ধ্বনিকল্প মহামহোপাধ্যায় ৺কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীননাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভায় কার্য্যারম্ভ হয় শ্রীযুক্ত ধরণীধর কাব্যতীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক মঙ্গলাচরণ ও ব্রাহ্মণবালকদ্বয়ের ব্রাহ্মণোদ্বোধন পদ্য পাঠের পর কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়। পরে উক্ত তর্কনিধি মহাশয় ব্রাহ্মণোদ্বোধন সম্বন্ধে প্রায় ১।০ ঘণ্টা বক্তৃতা করেন্ তদন্তে ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত তর্কপঞ্চানন মহাশয় সন্ধ্যোপাসনায় কর্ত্তব্যতা বিষয়ে গভীর গবেষণাপূর্ণ হৃদয়গ্রাহিনী বক্তৃতায় সমাগত ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করেন, তদন্তে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় ব্রাহ্মণ-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে হতোৎসাহ না হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্যারম্ভ করিলে আবার ব্রাহ্মণের অতীত অভ্যুদয়ের আবির্ভাব হইবে এই মর্ম্মে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন্, তাহার পরে পূর্ব্বস্থলী স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব্রাহ্মণজাতির অভ্যুদয়ের উপায় বিষয়ে একটী নাতি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠে সভ্যগণকে আসাদিত করার পর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়। দেওয়ান মহাশয়দের আদর আপ্যায়নেও বক্তৃগণের বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই পরিতৃপ্তি-লাভে ব্রাহ্মণ কর্ত্তব্যপালনে পূর্ণ উৎসাহী হইয়া ছিলেন।

কার্য্যকরি সদস্যগণের নাম ও পরিচয়।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত শারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ বিদ্যাবিনোদ।

সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত দীননাথ ভট্টাচার্য্য—পূর্ব্বস্থলী। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় মহাশয় (জমিদার —চুপি। (রায়সাহেব) শ্রীযুক্ত দীননাথ মুখোপাধ্যায় —(কাঠশালী)।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ধরণীধর মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস ভট্টাচার্য্য— চুপি)।

হিসাব পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র রায় —পূর্ব্বস্থলী)।

ধর্ম্মব্যবস্থাপক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ—(পূর্ব্বস্থলী)। শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ স্মৃতিতীর্থ (পূর্ব্বস্থলী)।

কার্য্যকরী-সমিতির অতিরিক্ত সদস্য—শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র তরফদার, শ্রীযুক্ত বামাচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত সুরসন্তোষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য্য।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

প্রাপ্তি স্বীকার।

বর্দ্ধমানের স্বনামধন্য জমিদার ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের শুভবিবাহ উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-সভার স্থায়ী ধনকোষে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

"Registered No. C.—875.

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

(মাসিক পত্র)

A Non—Political Hindu Religious & Social Magazine.

পঞ্চম বর্ষ—দশম সংখ্যা।

আষাঢ়।

বার্ষিক মূল্য সর্বত্র ২৲ দুই টাকা।

প্রতি খণ্ড ।০ আনা।

সন ১৩২৪ সাল।

এই সংখ্যার লেখকগণ।

শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য, এম্, এ।

শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র সান্যাল।

শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রীকাব্যতীর্থ।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র, এম্, এ।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন।

শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সম্পাদকদ্বয়—

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার তর্কনিধি।

কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

	বিষয়		নাম	পৃষ্ঠা
১।	শঙ্কর-পূজা	...	শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী	৫০৯
২।	শিক্ষা	...	শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য, এম্, এ,	৫১০
৩।	জাতীয় উত্থান	...	শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র সান্যাল	৫১৬
৪।	বৈদিকক্রিয়া ফল	...	শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৫২৩
৫।	রাখলদাস-স্মরণার্চ্চনা	...	শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রীকাব্যতীর্থ	৫২৫
৬।	পৌরাণিক ভারতবর্ষ	...	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ	৫৩০
৭।	পঞ্জিকা-সংস্কার	...	শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র, এম্, এ,	৫৩৮
৮।	নদীর প্রতি	...	শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৫৪৩
৯।	সন্ধ্যা	...	শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন	৫৪৪
১০।	হিন্দুজীবনের-লক্ষ্য	...	শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৫৪৬
১১।	সংবাদ	...		৫৫১

REGISTERED No. C—675.
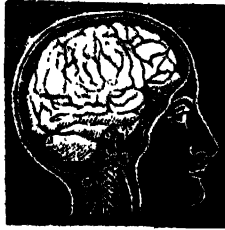
পঞ্চম বর্ষ। { ১৮৩৯ শক, ১৩২৪ সাল, আষাঢ়। } দশম সংখ্যা।

শঙ্কর-পূজা।

কি সুন্দর বেদগানে   কোটি কণ্ঠে শিবনামে
ভেসেছিল আর্য্যাবর্ত্ত ভূমি।
দূর মালাবার হ'তে   আর্য্যধর্ম্ম রক্ষামতে
যবে দেব এসেছিলে তুমি।
কোথায় কোয়েলা গ্রাম   কোথা হিমাচলধাম,
সমস্ত ভারত বেপেছিলে।
কোটি আর্য্যের সন্তান   আজও গাহে তব নাম,
সার্থক পুরুষ জন্মেছিলে!

*   *   *   *   *

সে দিন গিয়েছে চলে,   হের এবে পাপ-জালে
জড়িত আবার দেখ সেই বসুন্ধরা।
আবার এসহে প্রভু   আর্য্যধর্ম্ম রক্ষ, বিভু!
বন্ধন-যাতনা আর কত সহি মোরা?

দয়া ভক্তি উপকার, সরলতা এ ধরার
সকলি করেছে ত্যাগ মানবের জাতি।
আবার এসহে তুমি উজল ভারতভূমি
এ প্রগাঢ় অন্ধকারে জেলে দাও বাতি।

* * * * * *

আজি এই পুষ্পভার দিব চরণে তোমার,
বিশ্বপতি, তব কাছে ক্ষুদ্র উপহার।
জানি ইহা বনফুল, তথাপি পাইবে কূল
ভক্তের প্রদত্ত বলি চরণে তোমার।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

শিক্ষা।*

সুপবিত্র আর্য্যসমাজে কালবশে ঘটনাপরম্পরার আবির্ভাবে প্রভূত মালিন্য উপস্থিত হইয়াছে। সম্প্রতি সে চিত্র প্রকটভাবে অঙ্কিত করিবার প্রবৃত্তি আমার নাই। সমাজ-দেহে যে বিকার উপস্থিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আমরা সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে অভিজ্ঞ—সকলেই ভুক্তভোগী; সুতরাং, এতৎ সম্বন্ধে সমধিক আলোচনা প্রয়োজনীয় নহে মনে করি। কিন্তু এই ব্যাধির অন্যতম একটী উৎকট উপসর্গ লক্ষিত হয়, তাহার প্রতিকারকল্পে কিঞ্চিৎ উল্লেখ আবশ্যক বোধ হইতেছে। আধুনিক চাকচিক্যময়ী আপাতরমণীয়া ইহকালসর্ব্বস্বভূতা বহির্মুখী বৈদেশিকী শিক্ষার ফলে ও বলে বর্ত্তমান সমাজ-দেহ জর্জ্জরিত ও বিকারগ্রস্ত। যাহারা ব্যাধিগ্রস্ত, তাহারা কিন্তু জানে না তাহাদের ব্যাধি আছে বা ব্যাধি কোথায়। তাহারা রোগের জ্বালাও অনুভব করে না। তাহারা জানে—তাহারা বেশ আছে; তাহারা বিদেশের সভ্যতার মোহিনী শক্তি দ্বারা অভিভূত। সে দেশের সভ্যতার কি মহনীয়তা, কি লক্ষ্য, কি গতি, সে বিষয়ে তাহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ বা উদাসীন। পক্ষান্তরে যাঁহারা প্রাচীনভাবে শিক্ষিত-তাঁহারা নবীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যাধির তত্ত্ব—ব্যাধির নিদান বা মূলকারণ অনুসন্ধান করিবার পক্ষে উদাসীন। নবীন সম্প্রদায় যে শাস্ত্র পাঠ করিয়া যে ভাবে ভাবিত

---

* মাদারীপুরে 'ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনে' ব্রাহ্মণবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণেতর বর্ণের বৃত্তিব্যবস্থা প্রস্তাব সমর্থনকল্পে পঠিত।

হইয়াছেন, তাহা তাঁহাদের জানিবার অবসর হয় নাই। এই ব্যাধির যাঁহারা চিকিৎসক, সেই পণ্ডিতসমাজ যদি নব্যদলের চাল-চলন, ধরণ-ধারণ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হন, তবে আমাদের সমাজসংস্কার সুদূরপরাহত হইবে সন্দেহ নাই। উপদেষ্টা বিজ্ঞ ভূসুরগণকে আধুনিক শিক্ষার দোষজ্ঞ ও গুণগ্রাহী হইতে হইবে। অতএব, আমার ধারণা এই যে বিদেশী সাহিত্য, দর্শন, গণিত, খগোল, ভূগোল, জ্যামিতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির তত্ত্ব স্থূলতঃ ও মূলতঃ আমাদের দেশের সুধীবৃন্দকেও আয়ত্ত করিতে হইবে। নিরপেক্ষভাবে যদি তাঁহারা নবীন শিক্ষার দোষগুণ প্রদর্শন করিতে পারেন, তবে তাঁহাদের বাক্যে তত্ত্বপ্রয়াসী ব্যক্তিমাত্রেরই শ্রদ্ধা হইবে। আমাদের শাস্ত্রের, আমাদের অনুষ্ঠানের কদর্থ করিয়াই বহু বৈদেশিক প্রচারক "বাহবা" লইতেছেন এবং নিজের সঙ্ঘের দিন দিন পুষ্টিসাধন করিতেছেন, ইহা নিত্যই আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। অতএব, একমাত্র সত্যপ্রতিষ্ঠার কামনায় যদি তাঁহারা ধীর ও সংযতভাবে বিদেশীয় শাস্ত্র ও আচারানুষ্ঠানের সমালোচনা করেন, তবে তাঁহাদের উপদেশ সাদরে গৃহীত হইবে সন্দেহ নাই।

আমাদের প্রবর্ত্তিত আদর্শবিদ্যালয়ে বিদেশী দর্শন, গণিত, কলাবিদ্যা প্রভৃতির আলোচনাজন্য হ্রস্ব আয়োজন রাখিতে হইবে, আমরা আবালবৃদ্ধ নরনারী প্রায় সকলেই নবীনভাবে ভাবিত। বিকার না ধরিতে পারিলে প্রতিকার কিরূপে হইবে? বিদেশী শিক্ষায় সু ও কু উভয়ই আছে। বিষাদপি অমৃতং গ্রাহ্যম্। আমার বিশ্বাস এই অমৃত কিছু একটা অভিনব জিনিস হইবে না, কিন্তু আমাদের মধ্যে আমাদের শাস্ত্রে যে লুপ্ত বা অর্দ্ধলুপ্ত সত্যরাশি ছিল ও আছে, তাহার পুনরুদ্ধার করিতে এই অভিনবের গবেষণা সাহায্য করিবে। আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতগণ বৌদ্ধদর্শন ও চার্ব্বাগাদি নাস্তিক দর্শন সাদরে স্বগৃহে রক্ষা করিতেন এবং খণ্ডন-মণ্ডন দ্বারা নিজের সত্যপক্ষ সমর্থন করিতেন।

আমরা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে আস্থাবান্। ভারতের উত্থান-পতনের মূলে ব্রাহ্মণের উত্থান-পতন কাজেই আমরা বিশ্বাস করি, ব্রাহ্মণের সংস্কারে সর্ব্ববর্ণের সংস্কার হইবে—ভারতের কল্যাণ হইবে। আমাদের ব্রাহ্মণ-বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়াস কেবল ব্রাহ্মণদিগের জন্যই নহে—ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের জন্য। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই অন্যান্য বর্ণের গুরু ও উপদেষ্টা, সুতরাং গুরুগণ সুশিক্ষিত হইলে ছাত্রগণ স্বভাবতঃ সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইবে। কুর্ব্বন্ কিঞ্চিন্ন বা কুর্ব্বন্ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে। ব্রাহ্মণ সর্ব্বভূতের মিত্র—ব্রাহ্মণের কল্যাণে সর্ব্বজীবের কল্যাণ। এই বিশ্বজনীন কল্যাণসাধনই ব্রাহ্মণের যথার্থ ব্রত। অতএব, আমাদের ব্রাহ্মণের সংস্কারকল্পে বিদ্যালয়সংস্থাপন এবং ব্রাহ্মণেতর বর্ণত্রয়ের যাহাতে বৃত্তি রক্ষা হয়, তজ্জন্য তাঁহাদের বৃত্তির উপযোগিনী শিক্ষার প্রস্তাব প্রয়োজনীয়। এক সমাজ-দেহের ব্রাহ্মণাদি বর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। এই উভয় প্রয়োজনীয় বিষয়ই একই প্রস্তাবে এই জন্যই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে বালক ও যুবকের শিক্ষার উপরেই সমাজের সমগ্র ভবিষ্যৎ কল্যাণ নির্ভর করে। পক্ষান্তরে ইহাদের অশিক্ষায় ও কুশিক্ষায় সমাজের অকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

আজ যে আমরা এই প্রস্তাব করিতেছি, ইহা ভারতবর্ষের চক্ষে কোনও অভূতপূর্ব্ব প্রতি-রূব ব্যাপার নহে। বিদ্যার্থিগণপরিমণ্ডিত গুরুগৃহ আবহমান কাল হইতে মহাতীর্থসদৃশ মহনীয় গৌরবের আস্পদ। ইহার সেবায় ভারতবাসী গৃহস্থমাত্রই চিরাভ্যস্ত। এই গুরু-গৃহের জীর্ণ কঙ্কাল বর্ত্তমান চতুষ্পাঠীসমূহ পূর্ব্বগৌরবের স্মৃতি জাগরূক করিয়া আজও আমাদের আদর, সম্মান ও পূজার সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে। শিক্ষা সমাজের প্রাণ, গুরুগৃহ ভারতের প্রাণের সামগ্রী। আজ আমরা জীর্ণ কঙ্কালে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে যাইতেছি। অতি ভাগ্যবান আমরা, যদি এই মহাব্রতের উদ্‌যাপনে আত্মনিয়োগ করিতে পারি। আশা, উৎসাহ ও আনন্দরসে আমাদের হৃদয় স্বতঃই যেন অভিষিক্ত হইতেছে। আবার আমরা গুরুগৃহের শান্তিনিকেতনে সংসার-সাহারার দগ্ধপ্রাণ জুড়াইতে পারিব। আবার সামঝঙ্কারে উপনিষদের গভীর গবেষণায় আমাদের মনপ্রাণ মাতোয়ারা হইয়া উঠিবে। আবার ধর্ম্মনীতি অর্থনীতির চর্চ্চায়, কৃষি, গো-রক্ষা ও বাণিজ্যের তত্ত্বশিক্ষার বলে আমাদের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি, পূর্ব্ব মহিমা জীবন্ত হইয়া উঠিবে—বৃত্তি-সঙ্কট দূরীভূত হইবে—বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে মিলনমাধুরী সমাজময় পরিব্যাপ্ত হইবে—পরার্থপরতায় স্বার্থপরতা ডুবিয়া যাইবে—সমাজ-দেহ নিরাময় হইবে। কল্পনায় কতই মনে হইতেছে। এই কল্পনা কি নিতান্তই অলীক—অলস-মানস-প্রসূত দিবাস্বপ্ন? আমার কিন্তু সেরূপ বিশ্বাস হয় না। ঋষিদিগের চরণে ভক্তি ও রতি থাকিলে—ঋষিপ্রবর্ত্তিত বর্ত্মে চলিতে পারিলে, এ: কল্পনা সফল হইবেই হইবে। জগতে কতই অচিন্তাপূর্ব্ব অদ্ভুত ঘটনা ঘটিতেছে, আর আমরা ধর্ম্মপথে থাকিয়া খাঁটী প্রাণে কাজ করিলে আমাদের পুরুষকার সাফল্যলাভ করিবে না কেন? "সর্ব্বমেবেহ হি সদা সংসারে রঘুনন্দন, সম্যক্ প্রযুক্তাৎ সর্ব্বেণ পৌরুষাদধিগম্যতে।"

আমরা যে বিরাট সারস্বত যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়াস করিতেছি, ইহার জন্য যোগ্য যজমান চাই—ঋত্বিক চাই—ধন চাই,—রাক্ষসাদি হইতে হবী রক্ষার ব্যবস্থা চাই, তবেই অমৃতময় ফল ফলিবে। আমার প্রথম কথা, আমরা প্রারম্ভেই একটা কিছু ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিব না। সর্ব্বারম্ভা হি ধূমেন। তৎপরে 'শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ কন্থাঃ শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্', আমাদের শক্তির অনুরূপ কার্য্যে সর্ব্বাগ্রে হস্তক্ষেপ করিব এবং ক্রমে অগ্রসর হইব। কিন্তু আদর্শ থাকিবে বিরাট—প্রকাণ্ড। উদ্যোগপর্ব্বেই যেন আমাদের সমগ্র উদ্যম নিঃশেষিত না হয়। এই সারস্বতযজ্ঞের যজমান সামাজিকগণকে ধর্ম্মবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। ব্যক্তিগত পসার প্রতিপত্তির দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে—সমাজ জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে উপস্থিত; ইহার হিতসাধনে ব্রতী না হইলে, এই সমাজধ্বংসের জন্য তাঁহারাই দায়ী—ইহ পরকালে তাঁহারাই পাপভাগী। সরসপ্রাণে, পূর্ণ উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। উত্তরাধি-কারিবর্গের জন্য যেরূপে আমরা সম্পত্তিরক্ষা এবং নূতন সম্পত্তি অর্জ্জন করিতে প্রয়াস করি, উপস্থিত ক্ষেত্রে ততোঽধিক উৎসাহে কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। উত্তরাধিকারিগণের ও

আমাদের ইহ পরকালের পরমকল্যাণকর এই ব্যাপার, ইহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। এই পবিত্র সভাক্ষেত্রে মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা মিলিত হইয়াছি। এই সময়ে আমাদের প্রাণে যে মহান্ ভাব জাগরূক হইয়াছে, এই ভাব যেন আমরণ দেদীপ্যমান রাখিতে পারি; সঙ্কল্প যেন না টলে— ব্রত ভঙ্গ যেন না হয়—প্রতিজ্ঞা যেন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা হয়। চাই প্রাণ—চাই আগ্রহ—চাই অনন্ত জীবন্ত উৎসাহ;—চাই রণে ভঙ্গ না দেওয়া—শত বাধাবিপত্তির সহিত অক্লান্তভাবে সংগ্রাম করা। আমরা যেন জাতিধ্বংসের, কুলধ্বংসের, সমাজধ্বংসের কারণ না হই, আমরা যেন কুলাঙ্গার না হই। ঋত্বিক্ পণ্ডিতমহাশয়গণকেও এই কথা মনে রাখিতে হইবে—বিশিষ্টভাবে মনে রাখিতে হইবে। তাঁহারা যেন ভগবদনুরাগরঞ্জিত হইয়া সমাজের এই জীবন্ত কুসুম-নিচয়কে নিত্য নূতনভাবে ফুটাইয়া তুলিতে প্রযত্নপরায়ণ হইতে পারেন এবং নিষ্কামভাবে ধর্ম্মবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া ইহাদিগকে সমাজরূপী বিশ্বমূর্ত্তি ভগবানের চরণে অর্ঘ্যদানের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারেন। প্রাচীন পণ্ডিতগণ যেরূপ ছাত্রময়জীবিত ছিলেন, তাঁহাদিগকেও সেইরূপ হইতে হইবে। কিন্তু সামাজিকগণকেও মনে রাখিতে হইবে 'অনাশ্রয়ে ন জীবন্তি পণ্ডিতা বণিতা লতাঃ'। ইহাঁদিগকে কেবল আশ্রয় দিলে হইবে না, সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় আদর, যত্ন ও পূজা করিতে হইবে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আপাততঃ আমরা কিরূপে অনুষ্ঠের ব্যাপারে অগ্রসর হইব? আমরা কলিকাতা এবং কতিপয় নগরে ও গ্রামে আদর্শবিদ্যালয় স্থাপন করিব। বিদ্যালয়ে বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন, সাহিত্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রাদি নানা শাস্ত্রের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হইবে। ছাত্রগণকে কোনও একটী শাস্ত্র বিশিষ্টভাবে অপরাপর শাস্ত্রপ্রয়োজনানুরূপ শিক্ষা দেওয়া হইবে। সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম এবং দশকর্ম্মাদি ছাত্রগণ শিক্ষা করিবেন। তাঁহাদিগকে সরস ও প্রাঞ্জলভাবে অনুভবের উপযোগী করিয়া তাৎপর্য্যার্থ বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে। ইদানীং যে ভাবে শিক্ষা-দীক্ষা চলিতেছে, তাহাতে শাস্ত্রসমূহ বর্ত্তমানে শুষ্ক, নীরস ও কঠোর এবং ভবিষ্যতের দৃষ্টিতে সংশয়পূর্ণ ও অন্ধকারময় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এই নির্জ্জীব শিক্ষা মানবকে ইহকালে উৎসাহিত ও পরকালের জন্য নির্ভীক ও আশান্বিত করিতে পারে না। আমাদের শিক্ষা একদিকে অর্থকরী ও আনন্দকরী, অপরদিকে পরমার্থকরী হইবে। একদিকে বিলাসে অরুচি ও অনবসর এবং অপরদিকে তত্ত্বানুসন্ধানে একাগ্র অভিনিবেশ উৎপাদন করিবে। এক কথায়, এই শিক্ষা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের সাধনার সম্পূর্ণ উপযোগী হইবে।

উপস্থিত সময়ে আমাদের সমাজে পূজা-পার্ব্বণ দশকর্ম্ম চলিতেছে—আমরা তোতাপাখীর-মত মন্ত্র আওড়াইতেছি এবং অনুষ্ঠানগুলি করিয়া যাইতেছি—"রোগী যথা খায় নিম মুদিয়া নয়ন।" গুরু ও পুরোহিত মহোদয়গণ যাহাতে মন্ত্রসমূহ যথাযথভাবে উচ্চারণ করিতে পারেন এবং মন্ত্রার্থ ও মন্ত্ররহস্য বুঝিতে ও বুঝাইতে পারেন, গুরু গৃহ হইতেই ছাত্রগণকে সেইরূপ

শিক্ষা দিতে হইবে। আমাদের গুরুপুরোহিতগণ আমাদের ইহপরকালের চরমবন্ধু—আমাদের সর্ব্বস্ব। সেই গুরু-পুরোহিতগণ আজ যাত্রার-দল ও থিয়েটারে প্রহসনের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইহা হইতে আমাদের লজ্জা, অবমান ও অনুতাপের কারণ আর কি হইতে পারে? আমরা কি 'অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ' হইয়া থাকিব? ইহাতে আমাদিগের একদিকে কলঙ্ক, অপরদিকে ইহ-পরকালে সর্ব্বনাশ।

এই বিদ্যালয়সমূহে গীতা, চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি হিন্দুর বিশেষ প্রয়োজনীয় মহাগ্রন্থ-সমূহের পঠনপাঠন হইবে। ছাত্রগণকে যথাশাস্ত্র সাত্ত্বিক আহার ব্যবহার, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান ইত্যাদির অভ্যাস করিতে হইবে। অনধ্যায় দিবসে ও রাক্ষসী বেলায় পাঠ বন্ধ থাকিবে। প্রাচীন গুরুগৃহের নিয়মে ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে থাকিয়া ভাবী-গৃহস্থ জীবনের উপযোগী অভ্যাসসমূহও আয়ত্ত করিতে থাকিবেন। ছাত্রগণ নিজ নিজ রন্ধনাদি ক্রিয়া নিজেরাই নির্ব্বাহ করিবেন। গো-সেবা, গৃহসংস্কারাদি কার্য্যেরও সাহায্য করিতে অভ্যস্ত হইবেন। মুষ্টিভিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ছাত্রগণ যাহাতে সপ্তাহে একদিন ভিক্ষা সংগ্রহ করেন, বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। এই বিদ্যালয়-সমূহ প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ জন্য ধনী দরিদ্র সকলেই যথাশক্তি অর্থ সাহায্য করিবেন।

বর্ত্তমানে স্কুলের ছাত্র, যাত্রার দলের ছোকরা, ও টোলের বিদ্যার্থী ইহাদের মধ্যে আহার-ব্যবহার, আচারানুষ্ঠান ও পোষাক-পরিচ্ছদে কোনও একটা পার্থক্য বিশিষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় না; সর্ব্বত্রই বিলাসপরায়ণতা—সর্ব্বত্রই শ্রমবিমুখতা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে সেরূপ হইলে চলিবে না। তাহাদিগকে ভীষণ জীবনাহবে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, যাহাতে ভবিষ্যতে অল্প আয় দ্বারা অভ্যাসের গুণে হৃষ্টচিত্তে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। চা—চুরুট-ছড়ি-ঘড়ি জামা-জোড়ার ব্যয় নির্ব্বাহের ভারে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন যেন দুর্ব্বহ না হয়।

এই সমস্ত বিদ্যালয় পরিদর্শনজন্য কতিপয় পরিদর্শক নিযুক্ত করিতে হইবে। বেদশিক্ষার জন্য আপাততঃ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বেদাধ্যাপক নিযুক্ত করা সম্ভবপর হইবে না, তজ্জন্য ২।৩ জন অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া শিক্ষাদান করিবেন। প্রতিবিদ্যালয়ে একটী পুস্তকাগার থাকিবে। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পারদর্শিতার পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে এবং পারিতোষিক বিতরণ করিতে হইবে।

ইতঃপূর্ব্বকালে পণ্ডিতগণ সভাস্থলে আহূত হইয়া বিচার করিয়া কোনও তত্ত্বাবধারণ করিতেন। বর্ত্তমান সময়েও সেইরূপ বিচারপদ্ধতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। অধিকন্তু কিরূপ তর্কপ্রণালীর অনুসরণে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল, তাহার ধারাবাহিক লিপি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের উচ্চতর সোপানের কৃতী ছাত্রগণের হস্তে সেই লিপি রক্ষার ভার থাকিবে। বিচার্য্য বিষয় কেবলমাত্র দর্শনশাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব

হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে সমাজে যে যে সমস্যা উপস্থিত হয়, তাহার মীমাংসার জন্য যে সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণাদির এবং যে যে সদ্‌যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করা হয়, সেইগুলি সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও তাহার কার্য্য-প্রণালী স্থিরীকৃত করিবার জন্য একটী সমিতি গঠিত করিতে হইবে, যাহাতে প্রস্তাব অচিরে কার্য্যে পরিণত হয়।

অন্যান্য জাতির বৃত্তির উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা।

আমাদের সহৃদয় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি যুদ্ধবিদ্যাশিক্ষার্থ আহ্বান করিয়া এদেশের মুমূর্ষু ক্ষাত্রশক্তির পুনর্জ্জীবনের ব্যবস্থা করিতেছেন; ইহা আমাদের বিশেষ আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য শিক্ষারও কিছু কিছু ব্যবস্থা চলিতেছে। কিন্তু আমাদিগকে নিজের পায়ের উপরে দাঁড়াইয়া নিজেদের কিছু করিতে হইবে। ভারতীয় শিক্ষার বিশিষ্টতা এই যে ইহাদের সর্ব্বশিক্ষার মূলে ধর্ম্ম—গোড়ায় ভগবান্। আমাদের সর্ব্ব ব্যঞ্জনে একটা ধর্ম্মের পাঁচফোড়ণ চাই—একটা ভগবদনুরাগের বহ্নিসংযোগ চাই। তা না হইলে কোন কার্য্যে আমাদের উৎসাহ জাগে না—বলাধান হয় না। তাই যেরূপ ধর্ম্মভাবে ভাবিত করিয়া ব্রাহ্মণবিদ্যালয় সংস্থাপিত করিতে হইবে, সেইরূপ ধর্ম্মভাবে ভাবিত করিয়া আমাদিগের শিল্প-বিজ্ঞান, কৃষি বাণিজ্যাদি শিক্ষারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্ত্তমান বৃত্তি-সঙ্কট ও বৃত্তিসঙ্কোচের দিনে এতাদৃশ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না, সুতরাং এবিষয়ের আলোচনা প্রয়োজনহীন পুনরুক্তি মাত্র। আমাদের সমাজের কল্যাণকর কার্য্যে আমরা পরমুখাপেক্ষী কেন হইব? আমাদের কার্য্য আমাদের মতন করিয়া অন্যে করিবে, একথা হইতেই পারে না। এ ক্ষেত্রেও আমাদিগকে সমিতি গঠন করিয়া সত্বর কর্ত্তব্যসাধনে ব্রতী হইতে হইবে। 'অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া 'বিলম্বে কার্য্যহানিঃ স্যাৎ' এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া আমরা আজ সমাজের সর্ব্ববর্ণ একীভূত ও বদ্ধপরিকর হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব।

ভূসুরগণ! আপনাদের চরণস্পর্শে এই সভাস্থল আজ তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। আজ ব্রহ্মণ্যদেবের কৃপাকটাক্ষের বলে আমরা খাঁটীপ্রাণে প্রতিজ্ঞা করিলে এবং স্বীয় স্বীয় শক্তির অনুরূপ ধনবল, জ্ঞানবল ও সজ্ঘবলের যথাযথরূপে প্রয়োগ করিলে, এই প্রস্তাবিত বিষয় কার্য্যে পরিণত করা অমাদের পক্ষে নিতান্তই অনায়াস সাধ্য হইবে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের মুকুটমণি সর্ব্বৈশ্বর্য্যের খনি সুজলা সুফলা ভারতভূমি আজ শত দুঃখদীর্ণা, দীনা, বিষাদমলিনা; আজ আমাদের গুরু-পুরোহিত নট-নর্ত্তকের ক্রীড়ার সামগ্রী। আমাদের লাঞ্ছনার আর কি অবধি আছে? মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত; আজ বিধবা! তোমার কার্পাসসূত্রের যজ্ঞোপবীত উপহার দাও, সন্ন্যাসি! তোমার জীর্ণ কন্থা দাও, কবি! তোমার দীর্ণ-হৃদয়ের করুণ গাথা লইয়া অগ্রসর হও; ধনি! মুক্তহস্ত হও—রত্নভাণ্ডারের দ্বারোদ্‌ঘাটন কর; জ্ঞানি! তুমি মেঘের বারিধারার ন্যায় জ্ঞানরাশি বিতরণ কর। "ত্যাগেনৈকে-

হমূতত্বমানশুঃ" "দীয়তাং দীয়তাং-শ্রিয়া দেয়ং, হ্রিয়া দেয়ং ভিয়া দেয়ং সম্বিদা দেয়ং শ্রদ্ধয়া দেয়ং"—অশ্রদ্ধয়া দেয়ং," দেয়ম্ দেয়ং দেয়ম্। পরস্পরের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া দিতে থাক। 'দানমেকং কলৌ যুগে।' মাভৈঃ -

আপাততঃ সকলে কিছু কিছু প্রদান করিলেই অনায়াসে এই ব্যাপার কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। যাহার যেরূপ ইচ্ছা কিছু দাও—এক কপর্দ্দকও দাও। রামায়ণে দেখিতে পাই ব্রাহ্মণেরাও সহস্রদ ছিলেন। তোমরা কানাকড়ি দাও, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। সকলেই কিছু কিছু দিয়া জিনিসটাকে আপনার করিয়া লও। ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-অপণ্ডিত সকলেরই এই সমাজ,—সকলের কল্যাণের জন্যই এই বিদ্যালয়স্থাপনের প্রয়াস—এই আয়োজন। ইহাতে এদেশে গ্রাসাচ্ছাদনের সংগ্রহ হইবে—অন্নের ব্যবস্থা হইবে; একের শক্তিতে এই মহদনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইতে পারে না; হইলে তোমার মনুষ্যত্ব ম্লান ও ম্রিয়মান হইবে। তুমি সাহায্য দানের অধিকারী, এই কৃতার্থতার বুদ্ধি লইয়া দান কর, তোমার হৃদয় আনন্দোচ্ছ্বাসে ভরিয়া যাইবে—উৎসাহের বৈদ্যুতিক প্রবাহে সমাজে নব-যুগের সৃষ্টি হইবে। নব নব সারস্বতনিকুঞ্জ জ্ঞানবিজ্ঞানসুধাময় কোকিলকাকলীমুখরিত হইয়া অমৃতায়মান হইবে, —স্বরগ বীণায় ঐ শোন রে ঝঙ্কার, কিবা পীযূষ বরষে, হেন শুনেছ কি আর ?

শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য।

জাতীয় উত্থান।

হিন্দু সমাজের বর্ণভেদ তথাকথিত শিক্ষিত হিন্দু সন্তানগণের চক্ষুশূল। পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা হইতেই এই শিক্ষিত হিন্দুসন্তানগণ ক্রমাগত জাতিভেদ উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। অনেকে জাতিভেদ অসহ্য জ্ঞানে হিন্দুসমাজ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমাজান্তরে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যাঁহারা হিন্দুসমাজের জাতিভেদে নিন্দাপরায়ণ, সমাজান্তরে যাইয়াও তাঁহারা জাতিভেদপরায়ণ। যে সকল হিন্দুসন্তান খৃষ্টান বা ব্রাহ্ম হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও অসবর্ণবিবাহ বিরল দৃষ্ট'। শিক্ষিতদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রকাশ্যে সমাজান্তর গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা কি যেন কি ভাবিয়া নানা উপায়ে অলক্ষিত-ভাবে আবার এই বর্ণভেদাত্মক হিন্দুসমাজে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পিতৃপুরুষগণের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন। যাঁহারা হিন্দুসমাজের বর্ণাশ্রম স্বার্থপর ব্রাহ্মণগণের কুকীর্ত্তি বলিয়া তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক সমুদ্রপথে বিদেশে গিয়াছিলেন, স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহারাও নানা কৌশলে তাঁহাদিগের পৈতৃক বর্ণাশ্রমভুক্ত হইবার নিমিত্ত সচেষ্ট। সমাজভুক্ত

হিন্দুসন্তানগণ মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষিতই আহারবিহারে, আচারনিয়মে, কথায়-কাজে অহিন্দু ; কিন্তু পরিচয় দিতে কেহই আপনাকে অহিন্দু বলেন না। জাতিভেদের ঘোর বিরোধী হইয়াও অকুণ্ঠিতভাবে মুক্তকণ্ঠে আপনাকে স্বীয় পৈতৃক বর্ণাশ্রমী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এ প্রহেলিকার ভাবোদ্ধার বড়ই দুরূহ ব্যাপার।

শিক্ষিতগণ বলেন—সমাজপ্রণেতা ব্রাহ্মণগণ স্বার্থান্বেষণে অন্ধ হইয়া সমাজমধ্যে বর্ণভেদ-রূপ বিদ্বেষবীজ বপন করিয়া গিয়াছেন ; যে সমাজে এত বর্ণভেদ, সে সমাজের উৎকর্ষ-লাভ সুদূষ্কর ও অসম্ভব ; ব্রাহ্মণগণ কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে এত দিন জাতিটাকে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় লোকের চক্ষু ফুটিয়াছে, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূরীভূত হইয়াছে, এখন আর জাতিভেদ থাকা উচিত নহে, থাকিতেও পারিবে না। স্বামী বিবেকানন্দকেও এই মতের সমর্থক দেখিতে পাওয়া যায়।

হিন্দুশাস্ত্রমতে বর্ণবিভাগ মনুষ্যকৃত নহে। উহা স্বাভাবিক। নিরাকার, নিরুপাধি, নিস্ক্রিয় ব্রহ্ম আত্মাশক্তিযোগে সাকার, সোপাধি ও সক্রিয় হইয়া সৃষ্টিসময়ে মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র সৃষ্টি করিয়াছেন। গীতায় ও ভগবান্ বলিয়াছেন।

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈ গুণৈঃ॥"

ঈশ্বরই বর্ণভেদের কর্ত্তা এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্মনির্দ্দেশক। এই চারি মহাবর্ণ অসংখ্য প্রকার অন্তর্ব্বর্ণে বর্ণসঙ্কররূপে বিভক্ত। এইরূপ জাতিবিভাগ ও প্রত্যেক বর্ণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ মনুষ্যকৃত বলা যাইতে পারে না। শিক্ষায় স্বভাবের অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তন হইতে পারে বটে, কিন্তু তজ্জন্য লোকের রুচি, প্রবৃত্তি, স্বভাব মনুষ্যকৃত বলা যাইতে পারে না। জাতিভেদ ও জাতীয় ধর্ম্ম ও সেই প্রকার স্বাভাবিক, মনুষ্যের চেষ্টায় কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তন ঘটে মাত্র। লোকদিগকে এত অধিক সংখ্যক জাতিতে বিভক্ত করিয়া তাহাদিগের প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে সভ্যতা ও জ্ঞানের যে পরিমাণ উৎকর্ষের প্রয়োজন, জাতি ও কর্ম্মবিভাগ তাহার বহুপূর্ব্বে হইয়াছে। এখনও মনুষ্যসমাজ তাদৃশ সার্ব্বজনীন জাতিবিভাগ ও জাতীয় ধর্ম্মনির্দ্দেশের উপযোগী হইতে পারে নাই। হিন্দুর মধ্যে যে রূপ জাতিবিভাগ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সুব্যবস্থা দেখা যায়, তাহা মনুষ্যশক্তি ও মনুষ্য-বুদ্ধির অগম্য। মনুষ্যের শক্তি ও বুদ্ধি সীমাবদ্ধ। আমরা কল্পনাবলে শক্তিকে অতিরঞ্জিত করিতে পারি বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ সে অতিরঞ্জিত কাল্পনিক শক্তির সম্ভাব্য কোথাও দেখাইতে পারে না। আমরা পাশব শক্তিপ্রয়োগে অথবা সর্ব্বসম্মতিক্রমে কতক পরিমাণ লোককে বিভিন্ন জাতিরূপে পরিণত করিয়া নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মবিশেষে প্রবৃত্ত করাইতে পারি, কিন্তু সার্ব্বজনীন জাতি ও কর্ম্মবিভাগ আমাদের সাধ্যায়ত্ত কোন ক্রমেই হইতে পারে না। হিন্দু

সার্ব্বজনীন জাতিবিভাগ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যে মনুষ্যকৃত নহে, উহা যে স্বাভাবিক, তৎসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না।

অতিরঞ্জন পাশ্চাত্য শিক্ষার একটি মহৎদোষ। এই দোষ অধিকাংশ অনর্থের হেতুভূত। স্কুল, কলেজে প্রবেশ করিবামাত্র আমরা ঘোর জ্ঞানাভিমানী হইয়া উঠি এবং তর্কশাস্ত্রে আপনাদিগকে বিশ্বজয়ী মনে করি। প্রাতঃস্মরণীয় পিতৃপুরুষগণ অলোকসামান্য জ্ঞান-প্রতিভায় হিন্দুসমাজকে জগতের আদর্শস্থানীয় করিয়াছিলেন, উঁহাদিগের জ্ঞানাধিক্যের তুলনা এখন পর্য্যন্ত কোথাও দেখা যায় না। জ্ঞান বুদ্ধিতে নগণ্য হইয়াও আমরা তাঁহাদিগকে তুচ্ছ ও এবং আপনাদিগকে অভ্রান্তজ্ঞানী মনে করি। এই কুবুদ্ধি ও কুশিক্ষাদোষে আমরা শাস্ত্রে ও সমাজে অশ্রদ্ধাবান হইয়া দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছি; ভুক্তভোগী হইয়াও আত্মদোষ বুঝিতে পারিতেছি না। উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশংসনীয় জ্ঞানে বাতুলবৎ মহোৎসাহে সমাজধর্ম্ম জাতি-বিভাগ ভাঙ্গিয়া একাকারকরণার্থ বদ্ধপরিকর হইয়াছি। পাশ্চাত্য জ্ঞানাভ্যাসে অভ্রান্ত জ্ঞানীও বিশ্বজয়ী তর্কবাগীশ হইয়া বর্ণবিভাগ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মনুষ্যকৃত বলিতেছি বটে, কিন্তু কোন সময়ে কাহার কর্তৃক কিরূপে এই বর্ণবিভাগ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার শক্তি কাহারও দেখা যায় না। আমরা সহজবুদ্ধিতে মনুষ্যদিগকে পিতৃমাতৃ-সংযোগে সম্ভূত বলিয়া বিশ্বাস করিলেও যেমন আদিসৃষ্টি ঈশ্বরকৃত স্বীকার না করিয়া পারি না, সেইরূপ জাতিবিভাগও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ঈশ্বরকেই আদিকর্ত্তা বলিয়া মানিয়া লওয়া উচিত। মনুষ্য রূপান্তরের কর্ত্তা হইতে পারে, কিন্তু আদিকর্ত্তা হইতে পারে না।

ব্যাকরণ না জানিলে ভাষা বিশুদ্ধরূপে লেখা যায় না বটে, কিন্তু তজ্জন্য ভাষাসৃষ্টির পূর্ব্বে ব্যাকরণ হইয়াছে সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে। সেইরূপ শাস্ত্রে বর্ণভেদ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বর্ণনা থাকিলেও, জাতিবিভাগ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নির্দ্দেশ শাস্ত্রমূলক নহে। ভগবান মনুষ্যদিগকে নানা বর্ণে ও নানাবিধ কর্ম্মে নিয়োজিত করিবার বহুকাল পরে তদ্বিবরণ শাস্ত্রভুক্ত হইয়াছে; জাতি-বিভাগও ঈশ্বরকৃত, সুতরাং তাহা জগতের সর্ব্বাংশেই আছে, বর্ণভেদেও বর্ণগত কর্ম্মভেদ ব্যতীত মনুষ্য দৃঢ়ভাবে সমাজবদ্ধ হইতে পারে না এবং কোন প্রকার স্থায়ী উৎকর্ষও লাভ করিতে পারে না। আর্য্য ব্যতীত অন্য কোন জাতির জ্ঞান অত্যুৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই, তজ্জন্য কেবলমাত্র আর্য্যগণই ভগবৎকৃত জাতিবিভাগও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম শাস্ত্রান্তর্গত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, জগতের অন্য কোন জাতি তাহাদিগের বর্ণবিভাগ ও বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে শাস্ত্র-প্রণয়নে সমর্থ হয় নাই। তাহাদিগের মধ্যেও জাতিবিভাগ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আছে, কিন্তু হিন্দুর ন্যায় সুশৃঙ্খলভাবে নাই। তাহারাও কর্ম্মবিভাগ সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মৌলিক ভিত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ ও অনুবর্ত্তন করে বটে, কিন্তু উদ্‌ভ্রান্তভাব সম্যক নিবারণ করিতে পারে না; তজ্জন্য তাহারা অচিরস্থায়ী সাময়িক উৎকর্ষে সুপ্রতিষ্ঠ হয়, কিন্তু কালচক্রের প্রতিকূল আবর্ত্তন সময়ে আত্মরক্ষা করিতে পারে না।

হিন্দুকে সকলেই জগতের আদিম সভ্য বলিয়া স্বীকার করেন। হিন্দুজাতি যেমন সহজে

সমাজচ্যুত হয়, অন্য কোন জাতি তেমন সহজে সমাজচ্যুত হয় না। অন্যান্য জাতি সহজেই সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কিন্তু হিন্দু একবার জাতিচ্যুত হইলে, আর সমাজে গৃহীত হয় না, পতিত হইয়া থাকে। আর অন্য সমস্ত জাতিই কায়পুষ্টির জন্য ব্যাকুল, কোন না কোন সুযোগে ধর্ম্মান্তর হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া মহাকায় হইবার জন্য সচেষ্ট। হিন্দু অন্য কাহাকেও নিজ সমাজে গ্রহণ করে না এবং কোন সূত্র পাইলে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। ছলে, বলে, প্রলোভনে, কৌশলে জগতের সর্ব্ববিধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ই হিন্দুকে নিজধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য লালায়িত, তথাপিও হিন্দু চিরজীবী, জগতের আদি সভ্য হিন্দু এখন পর্য্যন্ত অচল অটলভাবে হিমাদ্রিবৎ সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। কত শত জাতি উত্থিত, প্রতিষ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হইয়া গেল, স্মরণাতীতকাল হইতে হিন্দুর সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইলেও হিন্দু এখনও পর্য্যন্ত জগতে আত্মসত্তা প্রদর্শনে সক্ষম। সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিলে ইহা প্রতিপন্ন হইবে যে জাতিভেদ ও জাতিধর্ম্মের সুব্যবস্থাই হিন্দুর ঈদৃশ চিরস্থায়িত্বের মৌলিক হেতু। হিন্দুর ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে হিন্দু যতদিন জাতিভেদ ও জাতীয় ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান ছিল, ততদিন তাহাদের সৌভাগ্যতপনের অত্যুজ্জ্বল কিরণে জগৎ আলোকিত করিয়াছে। জাতিভেদ ও জাতীয় ধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনে হিন্দুর এই অধঃপতন হইয়াছে এবং জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিলুপ্তি চেষ্টায় হিন্দু এখন ধ্বংসাভিমুখ। যবনপ্রাধান্য সময়ে যে দেশ যবনাধিকৃত হইয়াছে, সেই দেশবাসিগণই স্বীয় জাতীয়তা রক্ষায় অসমর্থ হইয়া যবনত্বে পরিণত হইয়াছে। কেবল একমাত্র হিন্দুই বর্ণভেদ ও বর্ণাশ্রমের সুব্যবস্থায় যবনত্বে পরিণত হয় নাই। হিন্দুনাশে কৃতসংকল্প যবন—প্রবলরাজদণ্ডহস্তে সহস্রাধিক বৎসর নিরীহ হিন্দুর উপর যথাসাধ্য অত্যাচার করিয়াও হিন্দুর যে পরিমাণ ক্ষতি করিতে সমর্থ হন নাই, দুইশত বৎসরের অনধিক-কালব্যাপী বিজাতীয় শিক্ষার ফলে বর্ণভেদ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিকূলাচরণহেতু হিন্দু তদপেক্ষা সহস্রগুণে ক্ষতিগ্রস্ত। মুসলমানেরা বলপূর্ব্বক সহস্র সহস্র হিন্দুকে মুসলমান করিয়াছে, যবনাত্যাচারভয়ে কতশত হিন্দু নরনারী প্রাণবিসর্জ্জন দিয়া স্বীয় জাতীয়তা রক্ষা করিয়াছে, তথাপিও ভারতে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু সংখ্যায় ১০ গুণ ছিল। খৃষ্টানরাজত্বে হিন্দুসমাজের উপর রাজার অত্যাচার নাই, বরং জাতিধর্ম্মরক্ষার্থে রাজসাহায্য সর্ব্বত্র সুলভ, তথাপিও বর্ণভেদ ও বর্ণাশ্রমের প্রতিকূলাচরণে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইয়াছে এবং প্রতিবারের মনুষ্যগণনায় হিন্দুর সংখ্যা উত্তরোত্তর কমিয়া যাওয়া পরিলক্ষিত হইতেছে।

দৈশিক স্বভাবের অনুগত বর্ণভেদে ও বর্ণানুগত কর্ম্মবিভাগের গুণে প্রাচীন কার্থেজ, গ্রীশ, উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তদন্যথাচরণে ধ্বংস হইয়াছে। যতদিন প্লিবিয়ান্ ও পেট্রিসিয়ান্ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিল, ততদিন রোমকজাতি চরমোৎকর্ষ লাভ করিতেছিল। কালে যখন জাতি ও কর্ম্মবিভাগের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া প্লিবিয়ান ও পেট্রিসিয়ান সমান হইয়া গেল, অমনি তৎকালীনপরিজ্ঞাত জগতের রাজমুকুটধারী রোমের রাজশ্রী ভূলুণ্ঠিত হইয়া গেল।

জাতি বিভাগ মনুষ্যকৃত প্রমাণকরণার্থে কেহ কেহ নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করেন :—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বং সৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতং॥

কিন্তু এ শ্লোকদ্বারা বর্ণবিচারের অনৈসর্গিকত্ব প্রতিপন্ন হয় না। কর্ম্মই জাতিবিভাগের সূত্র। ঈশ্বর যাহাকে যে কর্ম্মোপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সংসারে সে সেই বর্ণাশ্রমী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। 'সর্ব্বং জগৎ ব্রহ্মময়ং' এক অভিন্ন আত্মা সর্ব্বভূতে সমভাবে বিরাজমান আছেন। উজ্জ্বল জ্ঞানপ্রভাবে যিনি আপনাতে ও সর্ব্বভূতে একই আত্মার অধিষ্ঠান দর্শন করেন, তিনি ত্রিগুণাতীত। বর্ণবিভাগ বা জাগতিক পৃথক্‌ভাব তাঁহাতে স্থান পায় না। জ্ঞানী স্থাবর জঙ্গমে-কোনপ্রকার পার্থক্য অনুভব করেন না; তিনি বর্ণধর্ম্মের অতীত। তুমি আমি মানুষ, পশু অভিন্ন বলিতে পারি না। আমাদিগের অবিদ্যাচ্ছন্ন চক্ষু সংসার বৈষম্যময় দেখে। তাদৃশ বুদ্ধি লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলে বর্ণবিভাগ স্বাভাবিক বা ঈশ্বরকৃত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যিনি যে কর্ম্মের উপযোগী—ঈশ্বর জাতিবিভাগকালে যাঁহাকে যে জাতীয় কর্ম্মোপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সংসারে বিকাশ পাইয়া সেই জাতীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। সুতরাং এ জাতিবিভাগ মনুষ্য করে নাই, এ বিভাগ ঈশ্বরকৃত।

কেহ কেহ বলেন ঈশ্বর যাহাকে যে কর্ম্মের উপযুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সে সেই বর্ণ বলিয়া পরিগণিত হয় হউক, উহা বংশানুক্রমিক করা অন্যায় হইয়াছে। কর্ম্মানুসারে স্বভাব গঠিত হইয়া জীব সংসারে আগমন করে; সুতরাং যাহার স্বভাব যে কর্ম্মের উপযোগী, সে সেই বর্ণে জন্মগ্রহণ করে, তজ্জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বংশানুক্রমিক হওয়া উচিত। যাঁহারা পূর্ব্বজন্ম অথবা কর্ম্মায়ত্ত প্রকৃতি বিশ্বাস করেন না, তাঁহারাও পিতৃগুণ পুত্রে সংক্রামিত হওয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। পিতৃগুণ পুত্রে সংক্রামিত হইলেও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বংশানুক্রমিক স্বীকার করিতে হয়।

শিক্ষা ও আলোচনায় শক্তি বৃদ্ধি দেখা যায় বটে, কিন্তু স্বভাব একবারে নষ্ট করা যায় না। স্বভাবের অনুকূল চর্চ্চা যেমন সুফলপ্রদ, স্বভাববিরুদ্ধ কর্ম্মে সহজে তেমন উৎকর্ষ লাভ করা যায় না। এ নিমিত্ত প্রত্যেক বর্ণ যত সহজে যত শীঘ্র তাহার স্বীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মে উন্নতি লাভ করিতে পারে, বর্ণান্তরের কর্ম্মে সে প্রকার কৃতকার্য্যতা সে সহজে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যাহারা অসাধারণ প্রতিভাবান্ তাহারা বর্ণাশ্রমান্তরের কার্য্যে কতকটা আপাততঃ জ্ঞান লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাদিগকে ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করিতে দিলে জাতীয় ব্যবসায়ে অবসাদ জন্মে; তজ্জন্যও সকলেরই পৈতৃক ব্যবসায়ের অনুবর্ত্তন বিধেয়।

উদ্‌ভ্রান্ততায় বর্ত্তমানযুগে আমরা সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী হইয়াছি। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতগণের বুদ্ধিবিকার এত অধিক যে তাঁহারা পরমসংযমী শাস্ত্রকারগণেকেও স্বার্থপর বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা মনে করেন না। যাঁহারা লোকাতীত কঠোর মুনিব্রতপালনপূর্ব্বক সমাজের কল্যাণার্থে ঐহিক সর্ব্ববিধ ভোগ পরিত্যাগী, যাঁহাদিগের সুব্যবস্থায় হিন্দুসমাজ

চিরস্থায়ী, বিকৃতবুদ্ধি শিক্ষিতগণ প্রাতঃস্মরণীয় পরমপূজ্য ব্রাহ্মণদিগকেও স্বার্থান্ধ বলিয়া স্বীয় জ্ঞানপ্রাচুর্য্যের শ্লাঘাপরায়ণ! শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের জন্য কোনপ্রকার বৈষয়িক ভোগের ব্যবস্থা নাই। বৈষয়িক সর্ব্ববিধ সুখ সুবিধা অপর বর্ণের সাধ্য যথোচিতরূপে বিভাগ করিয়া দিয়া আপনাদিগের জন্য যাঁহারা চিরদারিদ্র্য ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, ঘোর উন্মাদ ও কৃতঘ্ন ব্যতীত তাঁহাদিগের প্রতি স্বার্থপরতা দোষারোপ অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। কেহ কেহ বলেন শাস্ত্রে সকল স্থানেই ব্রাহ্মণকে দান ধর্ম্ম বলিয়া প্রকীর্ত্তিত, সর্ব্ববিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানই 'ব্রহ্মণায়াহং দদানি' ভিন্ন 'কায়স্থায়াহং দদানি' অথবা 'চণ্ডালায়াহং দদানি' নাই। ইহা কি স্বার্থপরতা নয়? শাস্ত্রাধ্যয়ন ও সমাজের হিতচিন্তা ব্রাহ্মণেরই ব্যবসায়।

অধ্যয়ন অধ্যাপনা-যজন-যাজন-দান-প্রতিগ্রহ এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য বলিয়া ব্যবস্থিত। এখন বিদ্যাবিক্রয় যেরূপ লাভজনক ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পূর্ব্বে তেমন ছিল না; বিদ্যাবিক্রয় মহাপাপ বলিয়া গণ্য ছিল। পূর্ব্বে তাঁহারা বিনা ব্যয়ে ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন। ছাত্রগণকে স্বগৃহে রাখিয়া কৃতবিদ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পুত্রবৎ লালনপালন করিতেন; লোকে ধর্ম্মবুদ্ধিতে প্রশস্ত চিত্তে যাহা কিছু দান করিত, তদ্দারাই তাঁহারা অতিকষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ব্রাহ্মণে দান জমীদারের খাজনা বা গভর্ণমেণ্টের টেক্স নহে। সদনুষ্ঠানাদিতে 'ব্রাহ্মণায়াহং দদানি' আছে বটে, কিন্তু দানের পরিমাণ নাই। যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই দিবে, এমন কি একটি হরীতকি বা জলগণ্ডূষ দানও অগ্রাহ্য নহে। সুতরাং, তজ্জন্য কাহারও ঈর্ষান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। যাঁহারা কোন প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবলমাত্র স্বোদরপরায়ণ, তাঁহাদিগের উপার্জ্জিত ধনাংশ ব্রাহ্মণে দান করিবার জন্য শাস্ত্র কাহাকেও বাধ্য করেন না। আত্মভোগের খর্ব্বতা ও 'ব্রাহ্মণায়াহং দদানি'র অর্থ বা অভিপ্রায় নহে। যজ্ঞার্থে ব্রাহ্মণকে যৎকিঞ্চিৎ দিতে হইবে বলিয়া অন্য কাহাকে দানেরও কোন বাধা নাই। ব্রাহ্মণকে দান করিলে পুণ্য হয় বলিয়া অন্য কাহাকেও দানে যে পুণ্য নাই, শাস্ত্র কোথাও এরূপ বলেন নাই। সুতরাং যিনি কোন প্রকার সদনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণে যৎকিঞ্চিৎ ধন দানেও কুণ্ঠিত, তিনি যজ্ঞস্থলে ব্রাহ্মণকে জলগণ্ডূষ দক্ষিণা দিয়া তাঁহাদিগের তৃপ্তিসাধক অন্য কাহাকে যথেষ্ট ধনদান করিতে পারেন। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাহা দেওয়া যায়, তাহাই প্রকৃত দান; যে স্থানে শ্রদ্ধার অভাব তথায় দান বিফল, তাদৃশ দানে প্রত্যবায় ভিন্ন ঐহিক বা পারত্রিক কোন সুফল লাভ হয় না। শাস্ত্রমতে তাদৃশ দান 'ব্রাহ্মণায়াহং দদানি'র লক্ষিত দানসংজ্ঞার অন্তর্ভূত নহে। সুতরাং, সর্ব্বথা অনিন্দিত সদনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণে দানের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তদ্দারা কোন ব্রাহ্মণ যে সম্পত্তিবান্ হইয়াছেন, এরূপ দৃশ্য অতি বিরল। এইরূপ সামান্য দানে ব্রাহ্মণেরা অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ তদুপায় প্রায় বন্ধ করিয়া দেওয়ায় জীবিকার দায়ে শূদ্রবৃত্তিপরায়ণ হইয়া বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণগণ বাধ্য হইয়া হীনাচারী ও বিলাসী হইয়া পড়িয়াছেন।

এখন যে দেশময় একটা বিদ্বেষভাব উদ্দীপিত দেখা যাইতেছে, ইহা কুশিক্ষাজনিত

কুবুদ্ধির ফল; বর্ণভেদ ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ইহার কারণ নহে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় যে চক্ষুকোটা-রোগ দেখা দিয়াছে—পরস্পর ঈর্ষা দ্বেষ সেই চক্ষুকোটা-রোগজনিত বিকার। এই চক্ষুকোটা-রোগ আমাদিগের সর্ব্ববিধ অকল্যাণের ভিত্তি। কুশিক্ষা হেতু আমরা যেমন আত্মদোষ দর্শনে অন্ধ, অন্যের উপর মিথ্যা দোষারোপে তেমনি সুপটু। তাই যত দোষ পিতৃপুরুষগণের মস্তকে চাপাইয়া বিজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপ্রবৃত্তি দেশময় জাগিয়া উঠিয়াছে। কুতর্কে লোকের নিকট বাহোবা পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কুবুদ্ধিমূলক কুক্রিয়ার কুফল নিবারিত হয় না। চক্ষুকোটা—রোগে ভেদবুদ্ধি প্রবল হইয়া দেশ, জাতি, সমাজ, ধর্ম্ম দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে। পরস্পর বিচ্ছিন্নতা, হিংসা, দ্বেষ, উচ্ছৃঙ্খলতা, উদ্‌ভ্রান্ততা, স্বার্থপরতা, ধর্ম্মে অনাস্থা, অশান্তি, অসুখ, অভাব, দারিদ্র্য প্রভৃতি যত প্রকার দুর্লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, চক্ষুকোটারোগই তৎসমুদয়ের মৌলিক হেতু। আমরা মনে করি চক্ষুকোটা পাশ্চাত্য শিক্ষাহেতু জ্ঞানের বিকাশ, চক্ষুকোটা-প্রভাবে আমরা অন্ধকার হইতে আলোকে আসিয়াছি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা জ্ঞানের বিকাশ নহে, ঘোর অবিদ্যা—তামিস্রের সমাচ্ছন্নতা। এই চক্ষুকোটারোগের সমুৎপত্তির পূর্ব্বে জমিদার প্রজায় বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল, ধর্ম্মে আস্থা, শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, গুরুজনে ভক্তি, স্বজনে স্নেহ, সমাজের আনুগত্য, বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অনুরাগ, বিভিন্ন বর্ণের একত্বভাব পরিলক্ষিত হইত, এমন কি হিন্দুমুসলমানে বৈজাতিক বুদ্ধিও প্রায় তিরোহিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় কুবুদ্ধি সমুদ্দীপিত হইয়া সমস্তই বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। মুখে সৌজন্য, অন্তরে ঈর্ষাবিষ পরিপূর্ণ।

হিন্দু-সমাজের এ বর্ণভেদ আধুনিক নহে। যখন জ্ঞানপ্রতিভায় হিন্দু সমস্ত জগতের আদর্শ স্থানীয় ছিল, তখনও হিন্দু-সমাজে বর্ণভেদের বিলক্ষণ প্রাবল্য। বরং বর্ত্তমানেই বর্ণাশ্রমের অন্তিম অবস্থা, অথচ পরস্পর হিংসা, দ্বেষ হিন্দু-সমাজের মর্ম্মদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। শিক্ষিত হিন্দুসন্তানগণ আহারবিহারে এখন অবারিতদ্বার। ভ্রাতৃভাবে উদ্বোধিত হইয়া মুসলমানসহ আহারাদিতে অভূতপূর্ব্ব মেশামিশি-পরায়ণ, অথচ ভিতরে ভিতরে মুসলমানগণ হিন্দুর প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষভাবান্বিত, হিন্দুগণ মুসলমানের প্রতিও সেইরূপ। পূর্ব্বে বাহ্যিক সৌজন্য এরূপ প্রখর না থাকিলেও, ভিতরে ভিতরে হিন্দু মুসলমানে বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ্য ছিল। এদেশে যে সকল মুসলমান আছেন, বঙ্গদেশই তাঁহাদিগের চিরনিবাস। সুতরাং কেবলমাত্র ধর্ম্মপার্থক্যই হিন্দু মুসলমানে পার্থক্য। শিক্ষারম্ভের পূর্ব্বে বা আদ্যাবস্থায় যে পার্থক্য মধ্যেও একটা একতার ভাব ছিল, উভয়েই উভয়ের উপাস্য দেবতার দেবত্ব স্বীকার করিত এবং একে অন্যের উপাস্য দেবতার নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করিত। পাশ্চাত্য শিক্ষাজনিত চক্ষুকোটা-রোগে পরস্পর ভেদবুদ্ধি উদ্দীপিত হইয়া ভাবান্তর ঘটাইয়া দেশের ভাবী উন্নতির পথ একবারে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

বৈদিক ক্রিয়া ফল।

অভিজ্ঞতার সহিত কার্য্যের সম্বন্ধ শিথিল হইলে, সে অভিজ্ঞতা অন্তরে উঠিয়া অন্তরে বিলীন হয়। শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া, দেবকল্প মহর্ষিদিগেব পদচিহ্নের সন্ধানলাভ করিয়া আমরা যদি শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পথে এবং দেবকল্প মহর্ষিদিগের পদচিহ্নেব অনুসরণে কার্য্যক্ষেত্রে পথ দেখিয়া পা ফেলিতে না পারি, গন্তব্যপথে চলাচল করিতে না পারি আমাদের শাস্ত্র পাঠের এবং মহর্ষিগণের পদচিহ্নের সন্ধানলাভের অভিজ্ঞতা অন্তরে উঠিয়া অন্তরেই বিলীন হইবে, কোন ফলোদয় হইবে না। মানুষের সুষুম্নাপথ পরিষ্কৃত না থাকিলে তাহার প্রজ্ঞাশক্তি ক্ষীণ ও হীন হইতে থাকে। প্রজ্ঞার শক্তিহীনতা হেতু অভিজ্ঞতা উদ্গানেই বিনষ্ট বা লয় হয়। অতীত এবং বর্ত্তমানকালের অভিজ্ঞতায় প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠা ভবিষ্যৎ আলোচনায় ইহার সম্যক দৃষ্টি। এই প্রতিষ্ঠা এবং সম্যক দৃষ্টির জন্য মানুষের সুষুম্নাপথ পরিষ্কৃত থাকা প্রয়োজন। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকিলে, সুষুম্না-পথ অপরিষ্কৃত হইতে পায় না॥ বৈদিক কর্ম্ম কাণ্ডের ৪টী স্তর। ইহার প্রথম স্তরের কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রজ্ঞাপথ পরিষ্কারে জ্ঞানোদয় হয়, দ্বিতীয় স্তরে সুষুম্নাপথ পরিষ্কারে চৈতন্যের বিকাশ দৃষ্ট হয়, আর তৃতীয় স্তরে প্রেম ভক্তির উদয় হয় এবং চতুর্থ স্তরে জীবনমুক্তি লাভ ঘটে। কিন্তু জ্ঞানাভিমানী আমরা—আমরা শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে এবং মহর্ষিগণের পদচিহ্নের অনুবর্ত্তনে কর্ম্মক্ষেত্রে পথ দেখিয়া বিচরণ করিতে বিরত থাকিয়া আমাদিগের মস্তিষ্কাভ্যন্তরে অতীতের স্মারক-লিপি সূক্ষ্মাবস্থাতে প্রজ্ঞারূপে নিহিত আছে, তাহাব শক্তি পর্য্যন্ত হীন, ক্ষীণ ও দুর্ব্বল করিয়া থাকি, সুষুম্নাপথ অপরিষ্কৃত হইতে দেই। আমরা ভগবৎপ্রিয়কার্য্যসাধনের আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকি। আমরা যে সকলেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর পরম পিতার সন্তান, তিনি আমাদের পরমাশ্রয়, একমাত্র গতি, তাঁহার প্রিয়কার্য্য যে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান, তাহা আমরা একেবারে ভুলিয়া যাই। আমাদের হৃদয়মধ্যে পাপপুণ্যদর্শী পরমপুরুষ বর্ত্তমান। যিনি আমাদের সকলকার্য্য দেখিতেছেন এবং জানিতেছেন তাঁহার অন্তর্দর্শিত্ব ও সর্ব্ব ব্যাপিত্ব জানিয়াও সর্ব্বদা মনে রাখিতে পারি না। জ্ঞানাভিমানে বিভ্রান্ত আমরা যদি এইটুকুমাত্র মনে রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারিতাম—আমাদের হৃদয় ও মন ব্রহ্মতেজে পূর্ণ থাকিত। পূর্ণতেজে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপু সকল ভয়ে আমাদের নিকট অযথা ভাবে অগ্রসর হইতে পারিত না। আমাদের ব্রহ্মকবচে আবৃত ব্রহ্মদুর্গকে ভেদ করিতে পাপের শক্তি সামর্থ্য থাকিত না এবং আমরাও নির্ব্বিবাদে কামনাহীন নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্মেব অনুগমনে পবমানন্দে নিববচ্ছিন্ন শান্তি সুখ উপভোগে সামর্থ্যবান থাকিতাম। কিন্তু আমরা জ্ঞানাভিমানে এতই অন্ধ হইয়াছি যে,

আমাদের সে দৃষ্টিশক্তি, সে অনুভব শক্তি, সে ধারণাশক্তি, সে কর্ত্তব্যবিচার শক্তি চির অন্তর্হিত হইয়াছে। জ্ঞানাভিমানী আমরা সদাচার সহকারে ও কামনারহিত হইয়া বেদোক্ত বিধানানুসারে স্বস্ব বর্ণ আশ্রমোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ভগবত্তুষ্টিসাধন অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম জানিয়াও অনায়াসে তৎকার্য্যসাধনে উদাসীন থাকি। জানি আমরা ভগবত্তুষ্টিসাধন মানসে কামনা ও সঙ্কল্পাদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি যুক্ত চিত্তে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে দেবতা ও তীর্থস্থানাদি দর্শন ও সেবায় ধীরে ধীরে চিত্তশুদ্ধি হয়; তথাপি তৎকার্য্য সাধনে পরাঙ্মুখ। এই যে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ, যাহা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে ঐ সকল কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান না করাহেতু আমাদিগের যে পাপ হয়, ঐ পাপের ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়, কিন্তু আমরা ঐ পাপ কার্য্যের ফল ভোগতত্ত্বে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এই অভিজ্ঞতা নাই বলিয়াই আমরা অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন করিতে পারিনা। এই জন্যই স্বপ্নাবস্থায় যে কর্ম্ম আমরা করি এবং নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া যে সকল লৌকিক কর্ম্মাদি আমরা করি, এই উভয় কর্ম্মই মিথ্যা বলিয়া এই কর্ম্মকে, কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন বলিয়া আমরা বুঝিতে পারিনা। আমাদের অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন, এবং কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন জ্ঞান নাই। এই জ্ঞানের অভ্যুদয় হইলে আমরা বুঝিতে পারিতাম যে নিত্য নৈমিত্তিক ও দেবতার উদ্দেশে কর্ম্ম সমুহের ফল চিত্তশুদ্ধি এবং দেবলোক-প্রাপ্তি। শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন কর্ম্মের ফল তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইলে তখন এই জ্ঞানাভিমানী আমরা, সংসার ভুলিয়া মায়া মোহের মৃদুমোহনমধুর আহ্বান উপেক্ষা করিয়া অহঙ্কারের হস্ত অতিক্রমানন্তর ঐকান্তিকভাবে কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই; আত্মযোগ, কর্ম্মযোগ, মন্ত্রযোগ, জ্ঞানযোগ সর্ব্বকর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া ভক্তিযোগে নিরত থাকি এবং ভগবৎপরাভক্তির সাধনা দ্বারা কৈবল্য মুক্তিলাভের অধিকারী হই। ভক্তিযোগ রূপ কর্ম্মই জীবের সর্ব্বকামনার কামধেনু স্বরূপ, এবং উহাই মুক্তির নিদান। ভগবদর্থে অনুষ্ঠিত কর্ম্মাদি হইতে জ্ঞান ভক্তি দৃঢ় হইলে, হৃদগ্রন্থি অর্থাৎ আত্মার সহিত অন্তঃকরণাদির তন্ময়ভাব বিদূরিত হইয়া যায়। মনে ইন্দ্রিয় সকলের অভিনিবেশ করিয়া মনকে অহংকারে স্থাপিত করিলে এবং অহংকারকে বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে, প্রকৃতিকে পুরুষে এবং পুরুষকে পরব্রহ্মে বিলীন করিলে, অহং ব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞান জ্যোতি প্রকাশ পায়। ঐরূপ জ্ঞানজ্যোতি প্রকাশ পাইলে সাধক মুক্তি লাভের অধিকারী হন। আর সাধক তখন সর্ব্ব প্রপঞ্চভাব পরিত্যাগে নির্ব্বিকার চিত্তে ভগবানই আমার ধ্যেয়, আমি তাঁহার ধ্যান করি, এই প্রকার ভগবদনুস্মরণ রূপ পরম যোগসাধনা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান-লাভ করিয়া সমাধিতে উপনীত হয়েন, আর সেই সমাধি অবস্থাতে তখন তাঁহার ধ্যান, ধ্যেয় এবং ধ্যাতা এই ত্রিপুটী লয় হয়। তখন তিনি ভগবানের নিকটস্থ হইয়া প্রণবধ্বনি শ্রবণ করেন। প্রণব মন্ত্র ব্রহ্ম-বাচক এবং বীজমন্ত্র দেবদেবীর বাচক। যোগী ঐরূপ সমাধির অবস্থায়, প্রকৃতির বিশিষ্ট বিশিষ্ট অবস্থার, শব্দের সহিত দেবদেবীর বীজধ্বনি সকলও শ্রবণ

করেন এবং অবশেষে সাধক যোগী-পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি করেন। আমরা জ্ঞানাভিমানী, আমরা যদি এই ভাবে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে উদাসীন না থাকিয়া শাস্ত্রবিধি মানিয়া তদনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করি, মন প্রাণ উৎসর্গ করি, তাহা হইলে এই কার্য্যক্ষেত্রে আবার আমাদের সেই অতীতের সুখস্বাচ্ছন্দ্য এই সনাতন হিন্দুর পবিত্র আকাশে দেবকল্প ঋষিগণের দিব্যজ্ঞানজ্যোতিঃ আবার ফিরিয়া আসিবে, আবার এই অন্ধকারাচ্ছন্ন অশান্তি-পাপতাপপূর্ণ হিন্দুর ধর্ম্মাকাশে সুবিমল সুধাংশুর আলোকমালা পরিদৃশ্য হইবে, সেই মেঘবিনি-র্ম্মুক্ত শারদীয়শশাঙ্কের সুবিমল সৌন্দর্য্যপ্রভা সন্দর্শনে ভারতবাসী কৃতার্থ হইবে, মর্ত্তে নন্দনকাননের—স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাইবে, সমুচ্ছ্বসিতবেগা আনন্দমন্দাকিনীর লহরীলীলা ভারতবাসী হৃদয়ে আবার অনুভব করিবে।

যদ্ভদ্রং তন্ন আসুবং।

শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাখালদাস-স্মরণার্চ্চনা।*

আজি আমরা যে মহাপুরুষের পূতপাদপদ্ম শ্রদ্ধার অর্ঘ্য, ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি, গৌরবের শ্বেতচন্দন চর্চ্চিত করিয়া পূজা করিতে আসিয়াছি, যে পবিত্র নামস্মৃতিমন্ত্র-উচ্চারণে দেহ শুদ্ধ, ইন্দ্রিয় পুলকিত, চিত্ত কৃতার্থ করিবার আয়োজন করিয়াছি, যাঁহার জন্য আজি এই বিরাট স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের সম্মান দিতে আসিয়াছি, সেই বিশ্ব-বিশ্রুতকীর্ত্তি মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহোদয়কে না জানেন কে? রঘুনাথ, শ্রীচৈতন্য, চণ্ডীদাসের লীলাভূমি যাঁহাকে প্রসব করিয়া জগৎসমক্ষে সগর্ব্বে দাঁড়করাইয়া গৌরব করিতে পারেন—সেই বাঙ্গলা ইঁহার জন্মভূমি; যে গ্রাম পণ্ডিতপ্রধান স্থান বলিয়া সম্মানিত—সেই ভট্টপল্লী ইঁহার বাসস্থলী; আর যে সিদ্ধবংশ বাঙ্গলার অধিকাংশ ব্রাহ্মণ-সমাজের গুরুতার মহনীয় পদবীতে অধিষ্ঠিত—সেই বশিষ্ঠকুল ইঁহার দ্বারা অলঙ্কৃত। একাধারে সুকুমার সাহিত্য ও কঠোর ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চায় যিনি বাল্য ও তরুণ বয়স অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, যিনি মধ্যজীবনে অধ্যাপনা এবং তর্কযুদ্ধে বঙ্গীয় পণ্ডিতবর্গকে পরাজিত করিয়া তৎসমাজে সার্ব্বভৌম প্রতিপত্তিলাভে যশস্বী ও বরেণ্য হইয়া রহিয়াছেন, আবার শেষজীবনে সেই যশঃপ্রতিপত্তি ধূলিমুষ্টির মত পরিহার করিয়া বিষয়স্পৃহায় জলাঞ্জলি দিয়া যিনি ৺বিশ্বনাথপাদপদ্মে শরণ লইয়া ছিলেন—সেই মহাত্মাকে সমবেতভাবে স্মরণ করা

* বারাণসী "রাখালদাস" স্মৃতি-সভায় লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

আমাদের কি কর্ত্তব্য নহে? যে কাশীধামে ইনি এতদিন গৌরবের সহিত কাটাইয়া এই পবিত্র ভূমিতে শেষ নিশ্বাসটুকু রাখিয়া গেলেন, তজ্জন্ত তাঁহার নামকীর্ত্তন করায় কি জাতীয়তার সম্মান, পাণ্ডিত্যের পূজা, মানবত্বের সমাদর, প্রতিভার পুরস্কার নহে? এত বড় তার্কিক হইয়া কবি, এত বড় দিগ্বিজয়ী দার্শনিক হইয়াও ত্যাগী—স্বধর্ম্মানুরাগী, সেই মহাত্মার একটি শ্বেত প্রস্তরময়ী কিম্বা স্ফটিকময়ী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা কি আমাদের করণীয় নহে?

সেই কষিতকনকোজ্জ্বলা কান্তি, সেই আজানুলম্বিত বাহু, সেই দীর্ঘাকার স্বতন্ত্র-উন্নত মস্তক আর কোথায় দেখিব? সেই তর্কোজ্জ্বলা বুদ্ধিপ্রতিভা, সেই অন্তর্ভেদিনী সূক্ষ্ম দৃষ্টি, সেই মৌলিক অনন্যসাধারণী শাস্ত্রচিন্তার বিকাশ আর কাহাতে পাইব? তর্কের শাণিত অস্ত্রের প্রভাবে সমস্ত পণ্ডিতের যুক্তিজাল ছিন্ন করিবার মত শক্তি আজ চিরদিনের মত বিলুপ্ত, বাঙ্গলার তথা ভারতের একটি আলোকময়ী শিখা অন্ধকারের গর্ভে আজ জন্মের মত লুক্কায়িত।

গৌতম-কনাদের পদাঙ্কানুসারী, রঘুনাথ, জগদীশ প্রভৃতির সম্প্রদায়ভুক্ত, বাঙ্গালী অধ্যাপকের পক্ষে বাঙ্গলার গৌরব ন্যায়শাস্ত্রের মত রক্ষা করা, ঐ মত প্রতিষ্ঠিত করা কি ধর্ম্ম নহে? গুরুপরম্পরালব্ধ মতটির প্রচারকল্পে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা, তাঁহার দিক্ দিয়া দেখিলে, কি কঠোর কর্ত্তব্য নহে? অদ্বৈতবাদখণ্ডন * করিয়া তাহার মসনদে বাঙ্গলার জিনিষ ন্যায়শাস্ত্র দ্বৈতবাদকে বসাইবার জন্য আমরণ সাধনা কি তাঁহার দেশবাসীর শ্লাঘার বিষয় নহে? বাঙ্গলার গৌরব রক্ষার জন্য বাঙ্গালীর অধ্যাপকের এই প্রাণপাত শ্রম, এই কঠোর তপস্যা কি বঙ্গবাসীর হৃদয়ে গর্ব্বের, বিস্ময়ের ও আনন্দের উদ্রেক করে না? বঙ্গজননী যে কনকমুকুট তাঁহার শিরে নিজহাতে আদরে পরাইয়া দিয়াছেন, তাহার যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া কি বঙ্গসন্তানগণের অবশ্য বিধেয় নহে?

তাঁহার জন্য দেশ কাঁদিবে না? বাঙ্গলার এমন একটি রত্ন কাল হরণ করিয়া লইল, তাহার জন্য বঙ্গবাসী দুই ফোঁটা চক্ষুর জল ফেলিবে না? রাজা মহারাজ, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ সকলকেই যে তিনি আপনার বোধে আদর-আপ্যায়িত করিতেন, বিচারসভায় পরাজিত বয়োজ্যেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলীর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া তাঁহাদের দৃঢ়নিখাত লজ্জাশল্য উন্মোচিত করিতে যে তিনি অবহিত থাকিতেন, বয়ঃকনিষ্ঠ বিজিতপণ্ডিতগণকে ভাই বলিয়া কোলে টানিয়া তাঁহাদের বিষণ্ণ ম্লান মুখে যে হাসি না ফুটাইয়া ছাড়িতেন না। তাঁহার জন্য দেশ কাঁদিবে না? শ্রদ্ধার সহিত এই যে নামোচ্চারণ, ইহাই তাঁহার শ্রাদ্ধ, তাঁহার উদ্দেশ্যে দুইচারি ফোঁটা অশ্রুপাতই তাঁহার তর্পণ, দেশের মধ্যে দ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতেই যে তাঁহার তৃপ্তি।

---

* সম্প্রতি, রত্নপ্রসূ ভট্টপল্লীর নানাদর্শনাচার্য্য পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় 'অদ্বৈতবাদ-খণ্ডনের' মত 'দ্বৈতোক্তিরত্নমালা' প্রণয়ন করিয়া অনন্যসাধারণী প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন।

কাশীবাসী মহাত্মবর্গ! সেই মহাপুরুষের প্রতি আপনাদের কি কোন কর্ত্তব্য নাই? তিনি যে এই স্থানের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্যই ৺ বিশ্বেশ্বর-পুরীতে বাস করিয়াছিলেন, ওই কলনাদিনী জাহ্নবীর কোলেই যে তাঁহার আত্মা চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছে—এগুলি কি ভুলিয়া গেলেন? জীবনের ধ্রুবতারা, বংশের উজ্জ্বল প্রদীপ হরকুমারের মত একমাত্র পুত্র হারাইয়া তবু যে তিনি নিজ সাধনাপথ হইতে একটুও বিচ্যুত হন নাই, অধ্যাপনা, শাস্ত্র-চিন্তা, লোকসঙ্গ হইতে একদিনের জন্যও যে বিরত হন নাই, "দত্তাপহারী" ৺বিশ্বনাথের "দাস্ত" মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত হইবার কল্পনা করেন নাই। সেই কাশীধামে তাঁহার একটি স্থায়ী কীর্ত্তিরক্ষার ব্যবস্থা আজিও হইল না, ইহা কি কম লজ্জা ও ক্ষোভের কথা?

বিশ্বের স্রষ্টা পরমেশ্বরই একমাত্র সম্পূর্ণ মায়াতীত, সর্ব্বদোষনির্মুক্ত। তাঁহাতে মিশিবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত মানব কখন সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, মায়ার সর্ব্বাঙ্গীণ উচ্ছেদ করিতে পারে না, সর্ব্ববিধ দোষ হইতে অব্যাহতি পায় না। মানবের মধ্যে দেবত্বের বিকাশ, ঈশ্বরত্বের ঐশ্বরিক ভাবের স্ফুরণ হইতে পারে বটে, কিন্তু তথাপি তাহার মানবত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না। মানব মানবই; যতদিন মানব মানবপ্রকৃতি, ততদিন মানব দেবতা বা ঈশ্বর নহে। মানবোচিত দুর্ব্বলতা, ত্রুটি বিচ্যুতি, শোকদুঃখ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি মানব প্রাপ্ত হয় না। মানবধর্ম্মা ন্যায়রত্নমহাশয়ের এইরূপ যদি কোন ত্রুটিবিচ্যুতি, যদি কোন দুর্ব্বলতা দোষ কাহারও চক্ষুতে পড়িয়া থাকে, তজ্জন্য কি তাঁহার নিন্দা করা, তাঁহার উপর ক্রোধান্ধ দ্বেষভাব পোষণ বা প্রদর্শন করা কি স্বর্গগতমহাত্মার প্রতি অবমাননা নহে? আর তাহা কি "একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ" এই কবিবাক্যের বিষয় নহে, ইহার তিরোভাবে সারা বাঙ্গলার কি সমূহ ক্ষতি সংসাধিত হইয়াছে, গৌরবের কি স্বতস্মোন্নত স্বুবর্ণচূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, প্রকৃত নৈয়ায়িকতার কি সমুজ্জ্বলশেষ অতলজলে ভাসিয়া গিয়াছে, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখেন? প্রকৃত নৈয়ায়িক যে একপ্রকার সর্ব্ব-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত, ন্যায়শাস্ত্রের তীক্ষ্ণশরজালে যে সমস্ত মতই খণ্ডনীয়, সকল শাস্ত্রবিৎই যে ন্যায়শাস্ত্রের নিকট নতশির—তাহার দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ আর কোথায় মিলিবে? মহাজ্ঞানী সন্ন্যাসী বিশুদ্ধানন্দস্বামী যাঁহাকে "গৌতমকনাদ কী মূর্ত্তি" বলিয়া আদর করিতেন, কাশীসমাগত বা কাশীস্থ সকল পণ্ডিতই যে তাঁহার পদতলে ভক্ত শিষ্যের মত, বিনীত ছাত্রের মত উপবেশন করিতেন। এক্ষণ ভাবুন দেখি, তাঁহার তিরোধানে আমরা কি হারাইয়াছি?

আবহমানকাল প্রচলিত, অধুনা বিলুপ্তপ্রায়, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতোচিত যোগ্য সম্মান সর্ব্বত্র লাভ করিয়া, পণ্ডিতসম্রাট্‌পদবীর হৈমসিংহাসনে আপনার তেজে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, সকল স্থানে সকল সময়ে আপনার প্রতিষ্ঠাও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াই তিনি চলিয়া গিয়াছেন। তিনি যে স্থানে থাকুন না কেন—সর্ব্বত্রই স্বমহিমোন্নত, সর্ব্বজনোপরিসমারূঢ় স্বীয় তেজে সমুজ্জ্বল ছিলেন। তিনি থাকিলে সাধ্য কি কেহ সভাপতিত্বে সাহসী হয়, দেশনায়ক-পদবীতে অধিষ্ঠিত হইবার বাসনা করে। লক্ষ জনতার মধ্যে তাঁহাকে বসাইয়া রাখ,

সকলের যুগপৎ দৃষ্টি অগ্রে তাঁহাতেই নিপতিত হইবে, তাঁহার সার্ব্বভৌমত্ব সকলে নতশিরে মানিয়া লইবে।

আপনারা বাহির হইতেই তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছেন, বাহির হইতেই তাঁহার সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহার ভিতরকার সরল,অনাড়ম্বর,শুভ্র আন্তরমূর্ত্তির সহিত সম্যক পরিচয় বোধ করি আপনাদের অনেকের ঘটে নাই,সে সৌভাগ্য সে সুযোগ লাভের মাহেন্দ্র যোগও অনেকের অদৃষ্টে মিলিবার সম্ভাবনা হয় নাই। দূর হইতে সমুদ্র কথনও শান্ত, কথন ক্ষুব্ধ, কথন ভয়ঙ্কর; অভ্যন্তরভাগে তাহার কিন্তু সর্ব্বদাই স্বচ্ছসলিলরাশি বিদ্যমান। মহা-সমুদ্রোপম এই আচার্য্যবরও এইরূপই ছিলেন। তাঁহার গাম্ভীর্য্য ও সারল্য, সৌম্যভাব ও ভীষণতা হাস্য ও ভৎর্সনা তাঁহাকে তাঁহারই মত একটি স্বতন্ত্র মানুষরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিল। জানেন কি—একমাত্র পুত্র হরকুমারের সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া পূজাবিঘ্নাশঙ্কায় তিনি সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তেও ৺ ইষ্টদেবতার পূজায় গিয়া বসিলেন, নির্ব্বিকারচিত্তে একই ভাবে একই মত ধ্যানপূজা-স্তবপাঠাদি সমাধা করিলেন। আপনারা দেখিয়াছেন কি, রোগে উত্থানশক্তিবিরহিত অবস্থায়, মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বেও কি জ্বলন্ত উৎসাহে অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন? যথন সেই গৌরকান্তি ব্রাহ্মণ্যের মূর্ত্তিমান আদর্শ শিবভক্ত মহাপুরুষ চক্ষু মুদিয়া ধ্যানে বসিতেন, প্রাণ ভরিয়া 'হর হর বম্‌বম্‌' শব্দে গৃহ প্রতিধ্বনিত করিতেন, সুললিতকণ্ঠে প্রাচীন ঋষিদের বেদসঙ্গীতবৎ স্তোত্র পাঠ করিতেন, সেই রোমাঞ্চকর ইন্দ্রিয়চিত্তহারী প্রাচীন ঋষির মত সুমধুর স্তোত্র পাঠ করিতেন—সে দৃশ্য দেখিয়া কেহ কি ধন্য হইয়াছেন? তাহা দেখিলে—শুনিলে আরও সুস্পষ্ট, আরও জ্বলন্ত, আরও সজীবভাবে তাঁহাকে সম্যক বুঝিতে পারিতেন; জানিতে পারিতেন তাঁহার অন্তরের শুভ্র মূর্ত্তিটি কিরূপ ছিল, বুঝিতে পারিতেন কলির ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যের ছায়াপাত, ঋষিজীবনের প্রতিবিম্ব, দেবত্বের বিকাশ কিরূপ হইয়াছিল।

ন্যায়রত্নমহাশয় দয়াপ্রাণ, সরল, উদার, নির্ভীক ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। কাপট্য, ছলাকলা, ভণ্ডামী কথন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সকলপ্রকার প্রচ্ছন্নতাই তাঁহার সারল্যের তীক্ষ্ণধারে কুণ্ঠিত হইয়া যাইত। সর্ব্বদা হাস্যমুখ, সুপ্রসন্ন, স্বমহিমোন্নত, আত্মতৃপ্ত, তিনি সত্যই অতুলনীয় ছিলেন। তাঁহার ক্রোধ, বিরক্তি বা তিরস্কারের মধ্যেও একটা সরলতা, নিষ্কাপট্য ও অনাড়ম্বরভাব বিদ্যমান ছিল। তাই সে ক্রোধ ও বিরক্তি বিদ্যুৎবিকাশের মত দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যাইত, তাঁহার তিরস্কার মুহূর্ত্তের মধ্যেই আদরে পরিণত হইত।

পূজ্যপাদ সর্ব্বজনপূজিত এই আচার্য্যপ্রবরের পাদমূলে যে কয়েক দিনের জন্য আমরা শিষ্যভাবে ছাত্রভাবে বসিবার অধিকার পাইয়াছিলাম, তজ্জন্য আমরা কৃতার্থ, ধন্য ও গৌরবান্বিত। কথন তাঁহার মৌলিক দার্শনিক গবেষণা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি, কথন অদ্বৈতপক্ষীয় উপনিষদ্বাক্যের দ্বৈতানুকূল ব্যাখ্যা শুনিয়া বিস্ময়সাগরে ভাসমান

হইয়াছি, কখন তর্কের নিত্য নূতন উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িয়াছি, আবার কখন বা কবিত্বের লহরীমালা নিরীক্ষণ করিয়া অপূর্ব্ব রসে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছি।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যশোরাশি যে ভারতবর্ষের তাবৎ প্রদেশেই বালারুণচ্ছটার মত বিকীর্ণ হইয়া আছে, তাঁহার অদ্বৈতবাদখণ্ডন, মায়াবাদনিরাস যে সুমেরুশৃঙ্গের মত আপনার গৌরবে অটলভাবে দাঁড়াইয়া আছে, ইহা কে অস্বীকার করিবে? এমত যশোভাগ্য সারা ভারতবর্ষে অতি অল্প লোকেরই দেখা যায়। বর্ত্তমানকালে অপর কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সৌভাগ্য এমত দেখা যায় নাই, ইহা বোধ করি সর্ব্বজনসম্মত। শ্রীশ্রীকাশীরাজ ইহাঁর পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক এই যে সে দিন অর্ঘ দান করিয়া বাঙ্গালীপণ্ডিতের প্রতি অসামান্য সম্মান দেখাইলেন, যথার্থ গুণের পূজা করিয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মর্য্যাদা বাড়াইলেন, তাহা অপর কোন বাঙ্গালী, কোন বিদেশীয় পণ্ডিত যে প্রাপ্ত হন নাই, ইহা সকলে অবগত আছেন।

পঞ্চাশৎ বৎসর ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়া, শাঙ্কর মতের বিরুদ্ধে একটি প্রবল আন্দোলন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, বহু কৃতবিদ্য দেশমান্য ছাত্র প্রচ্ছাত্র দেশকে দান করিয়া তিনি যে কি অপূর্ব শক্তির বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকা যায় না। সপ্তাশীতিতম বৎসর বয়ঃক্রমে সেই মহাপুরুষ আদি মণিকর্ণিকার গৌরীকুণ্ডে চারিরাত্রি বাস করিয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন; ভারত ভূমির বক্ষ হইতে একটি মহামূল্য হীরকখণ্ড জাহ্নবী বক্ষে খসিয়া পড়িল।

ইনি দীধিতিকার রঘুনাথের ন্যূনতা দেখাইয়া, জগদীশ গদাধরের চিন্তাশক্তির দোষ ধরিয়া দিয়া যে কুশাগ্রীয় বুদ্ধির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, ইহা কি কম প্রতিভার পরিচায়ক?

ইনি নৈয়ায়িক, সকলে ইহাই অবগত আছেন, কিন্তু ইনি যে কিরূপ কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন, তাহা বোধ করি সকলে জানেন না। ইহাঁর সরল কবিত্বপূর্ণ সংস্কৃত শ্লোক-গুলি যিনি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে ইনি প্রকৃত কবিও ছিলেন, 'কাশীবাস' নামক গ্রন্থে তাঁহার কিয়ৎ পরিমাণে পরিচয় সকলেই পাইতে পারেন।

মহাত্মন্! আপনি যে কি বুদ্ধিপ্রতিভা ও গভীর পাণ্ডিত্যে এই পল্লবগ্রাহিতার দিনে মণ্ডিত ছিলেন, কি মহত্তম উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা কয় জনে বুঝেন? আজ আমরা আপনার স্মরণরূপ উপাসনা করিবার উদ্দেশ্যে এই স্মৃতিসভার আয়োজন করিয়া নিজেদেরই কর্ত্তব্য পালন মাত্র করিতেছি। ইহাতে আপনার লাভালাভ নাই। এ লাভালাভ হইতে আপনি এখন অনেক উর্দ্ধে। তবে আমাদের আত্মতৃপ্তি বলিয়া যদি এই হৃদয়প্রতিষ্ঠিত আপনার অশরীরিণী দৈবী মূর্ত্তির কথঞ্চিৎ সন্তোষ সাধিত করিতে পারি, তাহা হইলে এই স্মৃতিসভা সার্থক, আমরা ধন্য।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ।

পৌরাণিক ভারতবর্ষ।

বিবুধাকাঙ্ক্ষিত পবিত্র ভারতভূমি আমাদের জন্মস্থান। কত যুগযুগান্তের পুণ্যফলে আমরা স্বর্গ ও মোক্ষের সোপান-স্বরূপ এই কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যে স্থান পাইবার জন্য দেবগণও সতত আগ্রহশীল, আমরা সেই পবিত্র ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াও এই জননী ভারতভূমির সম্যক্ পরিচয়ে পরাঙ্মুখ, ইহা সামান্য দুর্ভাগ্যের বিষয় নহে।

আমাদের জন্মভূমির পরিচয়গ্রহণে কোন্ পর্য্যাটকের শরণাপন্ন হইব? কে আমাকে এই সুবিস্তীর্ণ ভারতভূমির সম্যক পরিচয় প্রদান করিবে? যাঁহাদের আর্ষজ্ঞান আছে, করকুবলয়ের ন্যায় নিখিলবিশ্ব যাঁহাদের নিকট সতত প্রকাশিত, যাঁহারা ইচ্ছামাত্র পৃথিবীর নানা স্থানে, এমন কি গ্রহে উপগ্রহে বিচরণ করিতে পারিতেন, তাঁহাদের বর্ণনা হইতে ভারতভূমির পরিচয় করিয়া লইব। সেই পুরাণকর্ত্তা মহর্ষিগণ একবাক্যে বলিতেছেন, সমুদ্রের সহিত সমগ্র পৃথিবী ৫০ কোটি যোজন বিস্তৃত। পৃথিবী গোলাকার, তাহার মধ্যস্থলে লক্ষ যোজন বিস্তৃত জম্বুদ্বীপ, জম্বুদ্বীপের দ্বিগুণপরিমাণ লবণসমুদ্র বলয়াকারে জম্বুদ্বীপকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। উক্ত লবণসমুদ্র আবার তাহার দ্বিগুণপরিমিত প্লক্ষদ্বীপদ্বারা পরিবেষ্টিত। এইরূপে ক্রমে ইক্ষুসমুদ্র,—শাল্মলীদ্বীপ; সুরাসমুদ্র,—কুশদ্বীপ; ঘৃতসমুদ্র, ক্রৌঞ্চদ্বীপ; দধিসমুদ্র,—শাকদ্বীপ; দুগ্ধসমুদ্র,—পুষ্করদ্বীপ; তৎপরে স্বাদূদকসমুদ্র। পর পরটী পূর্ব্ব পূর্ব্বটীর দ্বিগুণপরিমিত, সকল গুলিই বলয়াকার এবং পরপরটীর দ্বারা পূর্ব্বপূর্ব্বটী বেষ্টিতভাবে অবস্থান করিতেছে।

জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগে গোলাকার সুমেরুপর্ব্বত, ইহাই ভূপদ্মের কর্ণিকাস্বরূপ। জম্বুদ্বীপ নববর্ষে বিভক্ত। সুমেরুপর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে বলয়াকার ইলাবৃতবর্ষ, ইলাবৃতের দক্ষিণ-পার্শ্বে পূর্ব্বপশ্চিমসমুদ্রে প্রবিষ্ট নিষধপর্ব্বত, নিষধের দক্ষিণে হরিবর্ষ, তাহার দক্ষিণে নিষধের ন্যায় পূর্ব্বাপরসমুদ্রপ্রবিষ্ট হেমকূটপর্ব্বত, হেমকূটের দক্ষিণভাগে কিম্পুরুষ-বর্ষ, তৎপর পূর্ব্বাপরসমুদ্রপ্রবিষ্ট হিমালয়পর্ব্বত, হিমালয়ের দক্ষিণে ভারতবর্ষ দক্ষিণসমুদ্রপ্রান্তে ধনুরাকারে অবস্থিত,—হিমালয় সেই ধনুর গুণস্থানীয়। এইরূপে সুমেরুর উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্ নামক তিনটী বর্ষপর্ব্বত, তন্মধ্যে ক্রমে রম্যক, হিরণ্ময়, উত্তরকুরু নামক তিনটী বর্ষ বিদ্যমান। উত্তরকুরু ভারতের ন্যায় ধনুরাকারে উত্তর-সমুদ্রপ্রান্তে অবস্থান করিতেছে। ইলাবৃতের পূর্ব্বে নীল হইতে নিষধ পর্য্যন্ত দক্ষিণোত্তরে বিস্তৃত মাল্যবান্ পর্ব্বত, তাহার পূর্ব্বে সমুদ্রপর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ ভদ্রাশ্ববর্ষ। এইরূপ পশ্চিমে নীল হইতে নিষধ পর্য্যন্ত দক্ষিণোত্তরে বিস্তৃত গন্ধমাদনপর্ব্বত ও কেতুমালবর্ষ বিদ্যমান।

লবণাম্বুধিপরিবেষ্টিত জম্বুদ্বীপে উক্তরূপে নদী ও পর্ব্বতান্তরিত নয়টী বর্ষ বিদ্যমান আছে। মধ্যভাগে ৮৪ হাজার যোজন উচ্চ ও মূলে বত্রিশহাজার যোজন প্রবিষ্ট সুমেরু

পর্ব্বত। পূর্ব্বপশ্চিমে সমুদ্রপর্য্যন্তপ্রবিষ্ট যে ছয়টী পর্ব্বত অর্থাৎ হিমালয়, হেমকূট ও নিষধ; নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্, ইহাদের প্রত্যেকের দক্ষিণোত্তরে বিস্তার দুইহাজার যোজন। নিষধ ও নীলপর্ব্বত লক্ষ যোজন, শ্বেত ও হেমকূট নব্বইহাজার যোজন এবং হিমালয় ও শৃঙ্গবান্ আশী হাজার যোজন দীর্ঘ। ভারত, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, রম্যক, হিরণ্ময় ও উত্তরকুরু এই কয়টী বর্ষ প্রত্যেকে উত্তরদক্ষিণে নয়হাজার যোজন বিস্তৃত।

ভারত-পরিচয়।

পুরাণকারগণের বর্ণনা হইতে বুঝিতেছি, যে ভূমিখণ্ড সুমেরুপ্রদেশের দক্ষিণে দক্ষিণ-সমুদ্রপ্রান্তে ধনুরাকারে অবস্থিত, যাহার উত্তরদিকে হিমালয় নামক বর্ষপর্ব্বত ধনুর গুণের ন্যায় সরলভাবে ৮০ হাজার যোজন দৈর্ঘ্য ধারণপূর্ব্বক পূর্ব্ব ও পশ্চিমসমুদ্রে প্রবিষ্ট রহিয়াছে, তাহাই ভারতবর্ষ এবং উহাও দক্ষিণসমুদ্র হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত ৯ হাজার যোজন উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত।

মুনি-ঋষিদের নির্দ্দেশমত যে ভারতবর্ষের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহা কোথায়? আধুনিক মানচিত্র দর্শনে জানিতে পারা যায় কুমারিকা্দ্বীপ হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের নাম বর্ত্তমানকালে ভারত। ইহা উত্তরদক্ষিণ ঊর্দ্ধ সংখ্যা দুই সহস্র মাইলের অধিক হইবে না। পুরাণে দেখিলাম ভারতবর্ষের উত্তরদক্ষিণ ৯ সহস্র যোজন। অবশ্য পুরাণের সময় হইতে অদ্যপর্য্যন্ত প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে পরিমাণের কিঞ্চিৎ হ্রাসবৃদ্ধি অসম্ভব নহে। তথাপি ৯ হাজার যোজন বা ৭২ হাজার মাইলের স্থলে মাত্র ২ হাজার মাইল হইতে পারে না।

তাহার পর সকল পুরাণেই উক্ত সীমানাবিশিষ্ট ভারতবর্ষকে পুনর্ব্বার নয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা:—(১) ইন্দ্রদ্বীপ (২) কশেরুমান্ (৩) তাম্রপর্ণ (৪) গভস্তিমান্ (৫) নাগদ্বীপ (৬) সৌম্য (৭) গান্ধর্ব্ব্য (৮) বারুণ (৯) সাগরসংবৃত দ্বীপ। মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই নবম দ্বীপকে ভারতদ্বীপনামে আখ্যাত করিয়া বলিয়াছেন, এই দ্বীপ সাগরসংবৃত। উক্ত দ্বীপের পরিচয় মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে—

অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরঃ॥
আয়তস্তু কুমারীতো গঙ্গায়াঃ প্রবহাবধিঃ।
তির্য্যগূর্দ্ধন্তু বিস্তীর্ণঃ সহস্রাণাং দশৈব তু॥
দ্বীপোহ্যুপনিবিষ্টোঽয়ং ম্লেচ্ছৈরন্তেষু সর্ব্বশঃ।
যবনাশ্চ কিরাতাশ্চ তস্যান্তে পূর্ব্বপশ্চিমে॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ।
ইজ্যাযুদ্ধবণিজ্যাদি বর্ত্তয়ন্তো ব্যবস্থিতাঃ॥

তেষাং সব্যবহারোহয়ং বর্ত্তনন্ত পরস্পরম্।
ধর্ম্মার্থকামসংযুক্তো বর্ণানান্ত স্বকর্ম্মসু॥
ইহ স্বর্গাপবর্গার্থং প্রবৃত্তিরিহ মানুষে।
যস্ত্বয়ং মানবো দ্বীপ স্তির্য্যগ্যামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
য এনং জয়তে কৃৎস্নং স সম্রাড়িতি কীর্ত্তিতঃ।

৯—১৫।১১৪ অঃ।

তন্মধ্যে নবম এই সাগরসংবৃত দ্বীপ, ইহা উত্তরদক্ষিণে সহস্র যোজন কুমারী হইতে গঙ্গা-প্রবহপর্য্যন্ত বিস্তৃত; ইহার দৈর্ঘ্য বক্রভাবে দশসহস্র যোজন; এই দ্বীপের পূর্ব্বে কিরাত ও পশ্চিমে যবনেরা বাস করে; ইহার সকল সীমানায় ম্লেচ্ছদিগের উপনিবেশ আছে; মধ্যভাগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতি যজ্ঞ, যুদ্ধ, বাণিজ্য ও সেবাদিদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে এবং পরস্পর সংবদ্ধভাবে থাকিয়া পরস্পর পরস্পরের উপকার করিয়া থাকে। তাহাদের স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের সাধক। ইহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন করে, এই স্থানেই মানুষের স্বর্গ ও অপবর্গের জন্য প্রবৃত্তি হয়। যিনি এই বক্রভাবে অবস্থিত দ্বীপ সম্পূর্ণরূপে জয় করেন, তিনিই সম্রাট্ হইয়া থাকেন।

এই বর্ণনা মৎস্যপুরাণের হইলেও বিষ্ণু, মার্কণ্ডেয়, কূর্ম্ম ও শ্রীমদ্ভাগবতাদিপুরাণের বর্ণনাও ঠিক এইরূপ। কুমারিকা হইতে গঙ্গাপ্রবহ পর্য্যন্ত বিস্তারের কথাটা কেবল মৎস্যপুরাণেই আছে। বামনপুরাণে লিখিত আছে উহা উত্তরে তুরস্ক পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অন্যান্য সীমা ও আচার-ব্যবহারাদির বর্ণনা সকল পুরাণেই একরূপ।

এই সকল শাস্ত্রীয় বর্ণনাপাঠে প্রতীতি হইতেছে—বর্ত্তমান মানচিত্রে যাহা ভারতবর্ষ বলিয়া প্রদর্শিত হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণ প্রাচীন ভারতবর্ষ নহেই, ভারতবর্ষের একনবম ভাগ ভারত-দ্বীপ, বা সাগরসংবৃতদ্বীপের কিয়দংশ মাত্র। এই জন্যই বুঝি এখনও ইহার নাম ভারত-উপদ্বীপ?

ভারতবর্ষের অপর আটভাগ এক্ষণে কোথায়? ভারতদ্বীপের সমপরিমাণ আরও আটটী স্থান প্রাচীন ভারতবর্ষে থাকিবে। অবশ্য আমার আলোচিত পুরাণাদিমধ্যে সেই বিভাগগুলির সীমা ও সেই সেই দেশবাসীর আচারব্যবহারাদি বিশদভাবে পরিবর্ণিত না থাকিলেও বায়ুপুরাণে লিখিত আছে,—

ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদা নিবোধত।
পর্ব্বতান্তরিতা জ্ঞেয়া স্তে হ্যগম্যাঃ পরস্পরম্॥

এই ভারতবর্ষের নয়টী ভেদ শ্রবণ কর, ইহা পর্ব্বতদ্বারা অন্তরিত ও পরস্পর অগম্য। এই নবসহস্র যোজন-বিস্তৃত ভারতবর্ষের নবভেদ প্রত্যেকটী সহস্রযোজনপরিমাণ। ভারতদ্বীপের ন্যায় সহস্রযোজনপরিমাণ আরও আটটী স্থান পরিচয় করিতে গেলে, এইভূমণ্ডলে যেসকল দেশ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিতেই এক ভারতবর্ষই পোষাইবে না এবং তখন

বলিতে হইবে সমগ্র প্রাচীন ভারতবর্ষ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই, ভারতের অনেক অংশ এখনও মনুষ্য চক্ষুর অজ্ঞাত স্থানে রহিয়াছে। আবিষ্কৃত স্থান মধ্যে নামের সৌসাদৃশ্যে বলা যাইতে পারে হয়ত ইন্দ্রদ্বীপ শব্দ হইতে ইয়ুরোপ, কশেরুমান্ হইতে রুমান বা রুম, গভস্তিমান্ হইতে গ্রীস, তাম্রপর্ণ হইতে তুরস্ক নামের প্রসিদ্ধি হইয়া থাকিবে, কিন্তু দেশের সংস্থান পূর্ব্বরূপ নাও থাকিতে পারে।

হিমালয় পর্ব্বত।

ভারতদ্বীপের বাহিরে ইন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি বর্ণিত আটটী স্থান নির্ণয় করিয়া লইতে হইলে প্রায় আবিষ্কৃত সমগ্র ভূমণ্ডলটাই প্রাচীনভারতবর্ষ হইবে, কিন্তু তাহাতে একটী গুরুতর অনুপপত্তি আছে হিমালয় পর্ব্বত লইয়া, কারণ পুরাণের মতে হিমালয় একটী বর্ষপর্ব্বত, তাহা ভারতবর্ষের উত্তর দিকে অবস্থিত।

পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।

পৃথিবীর মানদণ্ডের ন্যায় হিমালয় পূর্ব্বাপরসমুদ্রে অবগাহন করিয়া রহিয়াছে, একথা প্রায় সকল পুরাণেই উক্ত আছে। হিমালয় নামধেয় পর্ব্বত যখন ভারতউপদ্বীপের উত্তরে ঠিক সরলভাবে পূর্ব্বপশ্চিম সমুদ্রপর্য্যন্ত বিস্তৃত না হইয়া একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া উভয় সমুদ্রই স্পর্শ করিয়াছে, তখন এই দ্বীপটাকেই সমগ্র ভারতবর্ষ না বলিয়া ভারতের সীমা লইয়া দূরে যাইব কিরূপে?

অবশ্য এই সন্দেহের প্রচুর কারণ থাকিলেও পুরাণীয় বর্ণনার সকল দিকের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বলিতে হয়, যে দৃশ্যমান হিমালয় নামধেয় পর্ব্বত পুরাণবর্ণিত পূর্ব্বাপর ৮০ হাজার যোজন দীর্ঘ ও ধনুকের গুণের ন্যায় সরলভাবে অবস্থিত হিমবান্ নামক বর্ষপর্ব্বত নহে। হয় ত এসিয়ার সাইবিরিয়া ও ইয়ুরোপের উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত মেরুনামে ব্যবহৃত স্থানের তুষারপুঞ্জ হইতে সেই বর্ষপর্ব্বত হিমালয়ের দক্ষিণপ্রান্তের সূচনা হইয়াছে, প্রকৃত হিমালয়নামক বর্ষপর্ব্বত এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

কারণ, দৃশ্যমান হিমালয় ভারতবর্ষের বর্ষপর্ব্বত হইলে, তাহার উত্তরের ভূভাগ পুরাণমতে কিম্পুরুষবর্ষ হইবে এবং তদুত্তরে হেমকূটপর্ব্বত পূর্ব্বাপর বিস্তৃত থাকা আবশ্যক; কিন্তু কিম্পুরুষবর্ষের মনুষ্যের যেরূপ আকৃতি ও পরমায়ুপরিমাণ পুরাণে নির্দ্দিষ্ট আছে, তদ্দেশে তাহা কদাচ লক্ষিত হইবেনা। বিশেষতঃ চীনপ্রভৃতি দেশ ভারতবর্ষমধ্যে ছিল বলিয়া মহাভারতাদি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এই হিমালয় ভারতের উত্তরের বর্ষপর্ব্বত হইলে চীন ভারতবর্ষমধ্যে আসিবে না।

কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলনাটকের সপ্তম অঙ্কে দুষ্মন্তের অমরাবতী হইতে প্রত্যাগমন বর্ণনা-উপলক্ষে হেমকূটপর্ব্বত ও কিম্পুরুষবর্ষ মনুষ্য জাতীয়ের লৌকিক গতির অগম্য স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাসের সময়েও চীন, তুরস্ক বা রুষিয়া মনুষ্যের অগম্য ছিলনা। সুতরাং, এই সকল স্থান হিমালয়-বর্ষপর্ব্বতের উত্তরবর্ত্তী কিম্পুরুষবর্ষ হইতে পারে না।

যেমন হিমালয় বর্ষ-পর্ব্বত হিমযুক্ত, তেমনি হেমকূট সুবর্ণময়; কিন্তু বর্ত্তমান মেরুপ্রদেশ-পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিলেও বোধ হয় তেমন পর্ব্বতের আবিষ্কার কেহ করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ পুরাণে ভারতবর্ষকে হৈমবতবর্ষ বলা হইতেছে; ভারতের অধিক স্থানই যে হিমপ্রধান হইবে, এইরূপ উক্তিও পুরাণে আছে।

বামনপুরাণে ভারতের একনবমাংশ সাগরসংবৃত দ্বীপ বা ভারতদ্বীপ, তাহার উত্তরসীমায় তুরস্করাজ্য নির্দ্দিষ্ট আছে, সুতরাং দৃশ্যমান হিমালয় কথনই বর্ষপর্ব্বত নহে, তাহা আরও অনেক উত্তরে অবস্থিত, এইরূপ সিদ্ধান্তও অসঙ্গত হইবে না।

ভারতবর্ষের উত্তরে যেমন বর্ষপর্ব্বত হিমালয়, তেমনি ভারতদ্বীপের উত্তরেও অপর হিমালয়ের অবস্থিতির কথা পুরাণ পাঠে জানা যায়। এই ভারতদ্বীপ ক্ষুদ্র ভারত বা ভারত-বর্ষের সারভূমি, সমগ্র ভারতের প্রাকৃতিক লক্ষণ সংক্ষিপ্তভাবে ইহাতে আছে; বিশেষতঃ এই স্থানেই চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা, এই স্থানেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের সাধনা, এই স্থান লক্ষ্য করিয়াই ভারতের এত গুণ-গাথা পুরাণাদিতে বর্ণিত। যিনি এই দ্বীপ জয় করেন, তিনিই সম্রাট্ হইয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে হরিশ্চন্দ্র, নল, পুরু, পুরূরবা, সগর, কার্ত্তবীর্য্য, জরাসন্ধ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সম্রাট্ ছিলেন, আর অধুনা পৃথিবীমধ্যে একমাত্র সম্রাট্ আমাদের ইংরেজরাজ, যেহেতু সমগ্র পৃথিবীর সারভূত এই ভারতদ্বীপ তাঁহার শাসনাধীন অবস্থিত।

পুরাণপাঠে জানা যায় শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, গোমতী, কৌশিকী, গণ্ডকী প্রভৃতি কয়েকটী নদী হিমালয়ের পার্শ্বদেশ হইতে নিঃসৃত। সুতরাং, দৃশ্যমান হিমালয়ের নাম যে হিমবান্ তাহাও নিশ্চিত। রামায়ণে দেখিতে পাই, সুগ্রীব সীতার অন্বেষণে বানরগণকে উত্তর দিকে প্রেরণ করিয়া হিমালয়পর্য্যন্ত গমনের যে পথ বর্ণনা করিয়াছেন এবং যেসকল রাজ্য ও স্থান অতিক্রম করিয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আধুনিক মেরুপ্রদেশই সেই হিমালয় বলিয়া মনে হয়। সুগ্রীব উত্তরদিকের বিশেষণে "হিমশৈলাবতংসিকাং" বলিয়াছেন, হিমালয়পর্ব্বত উত্তরদিকের শিরঃস্থান অবতংস বা শিরোভূষণ-স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহাতেও বোধ হয় হিমালয়পর্ব্বত উত্তর দিকের লৌকিক গতির শেষসীমা।

মহাভারতের সভাপর্ব্বে অর্জ্জুনের দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, তিনি উত্তর দিগ্‌জয়ে বহির্গত হইয়া অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, উপগিরি, উলুকদেশ, মোদাপুর বামদেব, সুদামন্ দেবপ্রস্থ ও কতিপয় পার্ব্বত্য রাজ্য, পৌরবরাজ্য, পার্ব্বত্য দস্যু, উৎসবসঙ্কেত নামক সাতটী অসভ্য জাতি * দশটী মণ্ডলের সহিত লোহিতরাজ্য, ত্রিগর্ত্ত, দার্ব্ব, কোকনদ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজ্য, সিংহপুর, সুহ্মচোল, বাহ্লিক, দরদ, কাম্বোজ, পার্ব্বত্য দস্যুজাতি, উত্তর ঋষিক, এই সকল রাজ্য বিজয়ের পর কিম্পুরুষের সহিত হিমালয় জয় করেন। দৃশ্যমান হিমালয়ের দক্ষিণেও ইন্দ্রপ্রস্থের (দিল্লীর) উত্তরে, এতগুলি রাজ্যের অবস্থিতি সম্ভবপর নহে। মধ্যে

* "উৎসবকালের জনতায় স্ত্রীপুরুষের মিলনে যাহাদের সাময়িক (অস্থায়ী) বিবাহের ব্যবস্থা হয়, তাহাদের নাম "উৎসবসঙ্কেত" (নীলকণ্ঠ টীকা)।

যে সকল জাতির বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতেও বোধ হয় আধুনিক মেরুপ্রদেশেই তখনও হিমালয় বলিয়া ব্যবহৃত হইত।

এই সকল কারণপরম্পরায় মনে হয়, এই ভূমণ্ডলে যে সকল দেশ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সকলটাই প্রাচীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। কেন না আধুনিক আবিষ্কৃত ভূমণ্ডলের ব্যাস ৮০০০ হাজার মাইল ও পরিধি ২৫০০০ হাজার মাইল পুরাণমতে দেখিতে পাই, এক ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণ বিস্তার ৯০০০ হাজার যোজন বা ৭২০০০ হাজার মাইল। এই ধনুরাকার ভারতবর্ষের গুণস্থানীয় যে হিমালয়পর্ব্বত, উহাও আশী হাজার যোজন বা ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দীর্ঘ এবং পূর্ব্বাপর সমুদ্রে প্রবিষ্ট। সুতরাং, আবিষ্কৃত ভূমণ্ডলে সমগ্র ভারতের স্থান হইতেছে না। মনুষ্যের শক্তি কল্পনা যে কত ক্ষুদ্র, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

আধুনিক ভূগোল-আবিষ্করণের মূলেও আর একটী সন্দেহ আমাদের অন্তরে স্থান পাইতেছে;

জ্যোতিঃশাস্ত্রে লিখিত আছে,—

যল্লঙ্কোজ্জয়িনী পুরোপরি কুরুক্ষেত্রাদিদেশান্ স্পৃশেৎ
সূত্রং মেরুগতং বুধৈর্নিগদিতা সা মধ্যরেখা ভুবঃ।*

লঙ্কা হইতে উজ্জয়িনীও কুরুক্ষেত্রাদি দেশ স্পর্শ করিয়া মেরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে সূত্র, তাহাই পৃথিবীর মধ্যরেখা। কিন্তু ভূমণ্ডলের মানচিত্রে লঙ্কাদ্বীপ ৮০ ও ৮২ দ্রাঘিমার মধ্যভাগে এবং কুরুক্ষেত্র ৭৫ দ্রাঘিমায় প্রদর্শিত; সুতরাং লঙ্কা হইতে কুরুক্ষেত্রের উপর দিয়া মেরু পর্য্যন্ত সূত্রপাত করিলে, সূত্রটা ঠিক দক্ষিণোত্তরভাবে নিপতিত হয় না এবং ভূগোলের অধিকাংশ পশ্চিমদিকে ও অল্পাংশ পূর্ব্বদিকে পতিত হয়। শাস্ত্রমতে ভূচিত্রের বিশুদ্ধতা থাকিলে কখনই এইরূপ হইত না। পঞ্জিকা-বিভ্রাটের এস্থানেও মূলসূত্র নিহিত থাকিতে পারে কি না, মনীষিগণ বিবেচনা করিবেন।

জ্যোতিঃশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট মধ্যরেখা স্বীকার করিলে বলিতে হয়, ভূমণ্ডলে পূর্ব্বদিক্ হইতে আরও স্থান লইতে হইবে।

* শিলন-লঙ্কা হইতে উজ্জয়নী স্পর্শ করিয়া রেখা টানিলে সে রেখা মেরু স্পর্শ করে না। জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত ঐ লঙ্কা শিলন নহে,ইহা বিবেজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন; সুতরাং লেখক মহাশয়ের এই প্রমাণ তাঁহার উত্থাপিত প্রসঙ্গের পোষক বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারিলাম না।

দ্বিতীয় কথা—প্রাচীন ভারতবাসীর সে চিত্র লেখকমহাশয় ব্রাহ্মণসমাজে উপস্থিত করিয়াছেন ঐ সম্বন্ধে অনেক বলিবার থাকিলেও সমাজের আর কেহ কিছু ঐ চিত্রের অনুকূল বা প্রতিকূল প্রসঙ্গ উপস্থিত করেন কিনা দর্শনের অভিপ্রায়ে এবার আমরা নীরব থাকিলাম।

ব্রাঃ সঃ সঃ)

আধুনিক মানচিত্রে যে সকল স্থান সাগর—মহাসাগর নামে প্রদর্শিত হইতেছে, তাহা পুরাণবর্ণিত সমুদ্র নহে। জম্বুদ্বীপের বহির্ভাগে যে লবণসমুদ্রের বর্ণনা আছে, তাহাও অনেক দূরে অবস্থিত।

এই সকল সাগর—মহাসাগর কোনটী সগরপুত্রগণের খাত, আর কোনটী বা নদী। সাইবিরিয়ারও ইয়ুরোপের উত্তরদিক্‌বর্ত্তী তুষারপুঞ্জের পর যে মেরুদেশ, তাহাই পুরাণবর্ণিত হিমালয়নামক বর্ষপর্ব্বত এবং উত্তরমহাসাগর নামে যে স্থান পরিচিত, তাহাও সম্ভবতঃ নদী। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে,—

"সপ্ত তানি নদীভেদৈরগম্যানি পরস্পরম্"।

তন্মধ্যে সাতটী বর্ষ বিভিন্ন নদীদ্বারা পরস্পর অগম্য, অতএব উত্তরমহাসাগর হিমালয়ের প্রান্তবর্ত্তিনী বর্ষবিভেদিতা দুর্লঙ্ঘ্যা নদীমাত্র।

আবিষ্কৃত সমগ্রভূভাগ পৌরাণিক ভারতবর্ষমধ্যে থাকার অপর কারণ, (পুরাণের মতে) ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য অষ্টবর্ষে সত্যাদি-যুগ পরিবর্ত্তিত হয় না ; সেই সকল স্থানে সর্ব্বদা ত্রেতাযুগ। কিম্পুরুষাদি অষ্টবর্ষ ভৌমস্বর্গ নামে পরিচিত। তাহাতে মানুষের শোক, ভয়, বিষাদ, উদ্বেগ কিছুই নাই। সেই সকল বর্ষের কোনটীতে মনুষ্য দশহাজার কোথাও বা বারহাজার এবং কোনও বর্ষে তেরহাজার বৎসর জীবিত থাকে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৫৬ অধ্যায়ে লিখিত · এক ভারতবর্ষব্যতীত অন্যত্র মেঘের জল হয় না, অন্যান্য স্থানের জল কেবলমাত্র উদ্ভিদ্। এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে, আবিষ্কৃত সমগ্রভূভাগ পৌরাণিক ভারতে অবস্থিত। ১০।১২।১৩ হাজার বৎসরজীবী মনুষ্য আবিষ্কৃত ভূমণ্ডলে আছে কি ? পৃথিবীর কোন্ স্থানের মনুষ্য উৎকর্ষাপকর্ষবিহীন ? কোথায় শোক, ভয়, বিষাদ, ক্ষোভ, দুঃখ ও দারিদ্র্য নাই ? কোন্ স্থানের মনুষ্য স্থিরযৌবন ? এসিয়া, ইয়ুরোপ, আফ্রিকা বা আমেরিকা সকল দেশেই ত অল্পবিস্তর বৃষ্টি হয়, সকল দেশেই ত জরা, ব্যাধি, শোক, ভয়, বিষাদ আছে। সকল দেশেই ত মানুষ ছোটবড় আছে, তবে আর তাহা পুরাণের মতে ভারতছাড়া হইবে কিরূপে ?

মেরুপ্রদেশ যে আমরা হিমালয় বলিয়া নির্ণয় করিতেছি, তাহার আর একটী সুন্দর প্রমাণ আছে। হিমালয় দেবভূমি। জটিল ব্রাহ্মণরূপধারী মহাদেব তপঃপরায়ণা পার্ব্বতীদেবীকে বলিয়াছিলেন,—

দিবং যদি প্রার্থয়সে বৃথা শ্রমঃ।
পিতুঃ প্রদেশাস্তব দেবভূময়ঃ॥

তুমি যদি স্বর্গ প্রার্থনায় তপস্যা কর, তাহা হইলে তপঃশ্রম বৃথা, কেন না তোমার পিতার (হিমালয়ের) প্রদেশই দেবভূমি-স্বর্গ। হিমালয় যে দেবভূমি, তাহা পুরাণাদিতেও বর্ণিত। মানবপরিমাণের এক বৎসরে দেবতাদের অহোরাত্র হয়, আমাদের উত্তরায়ণ ছয়মাস দেবলোকের ক্রমশঃ দিবা ও দক্ষিণায়ণ ছয়মাস ক্রমশঃ রাত্রি। বর্ত্তমান মেরুমণ্ডলে,

উত্তরায়ণে ক্রমশঃ ছয়মাস দিন ও দক্ষিণায়নে ক্রমশঃ ছয়মাস রাত্রি হয়। ইহাও তাহার দেবভূমিত্বের পরিচায়ক।

গ্রীস্ ঐতিহাসিক আরিয়ানের মতে ভারতবর্ষের সীমানা উত্তরে তরাস্ পর্ব্বতমালা। তরাস্ গিরিশ্রেণী এসিয়া-মহাদেশের তুরস্করাজ্যে অবস্থিত। তরাস্ হইতে ককেসাস্ ও ককেসাস্ হইতে হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর পর্য্যন্ত আরিয়ানের মতে ভারতবর্ষের সীমানা ছিল। তাহা হইলে আরব, পারস্য ও তুরস্কের কিয়দংশ এবং মধ্যএসিয়ার বহুদূর পর্য্যন্ত (আফগানিস্থান ও বেলুচীস্থানসহ) ভারতবর্ষের অন্তর্নিবিষ্ট থাকা সম্ভবপর।

প্রবন্ধমুখেই পুরাণমতে সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্রের সংস্থান বিবরণ বলা হইয়াছে। কিন্তু কর্ণেল উইল্ ফোর্ড্ সাহেব ভারতবর্ষকে জম্বুদ্বীপ, এসিয়ার উত্তরভাগ ও সমগ্র আমেরিকামহাদেশকে প্লক্ষদ্বীপ, আয়র্লণ্ড পুষ্করদ্বীপ, বৃটিশদ্বীপপুঞ্জ শকদ্বীপ, জর্ম্মণী ক্রৌঞ্চদ্বীপ, আড্রিয়াটীক ও বাল্টিকসাগরের সন্নিকটস্থ দেশসমূহ শাল্মলীদ্বীপ, ভারতবর্ষের পশ্চিমসীমান্তস্থিত কাস্পীয়ান সমুদ্র ও পারস্য-উপসাগরের সন্নিহিত দেশসমূহ কুশদ্বীপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের এতাদৃশ সিদ্ধান্তসমূহের সহিত পুরাণমতের কোনওরূপ সামঞ্জস্য নাই, সুতরাং তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু, পুরাণাদিসর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় পৃথিবীর ইতিহাসের ভারতখণ্ডের প্রথমভাগে লিখিয়াছেন,—জম্বু, প্লক্ষ, পুষ্কর, ক্রৌঞ্চ, শক, শাল্মলী ও কুশ এই সপ্তদ্বীপ এক্ষণে পর্য্যায়ক্রমে,—এসিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা, ইয়ুরোপ, দক্ষিণমেরুর সন্নিহিত প্রদেশ অষ্ট্রেলিয়াও ওশেনিয়া নামে পরিচিত।

বিশেষজ্ঞ লাহিড়ীমহাশয়ের সিদ্ধান্তের সহিতও পুরাণের কোনও রূপ সামঞ্জস্য দেখিতেছি না। কেন না তিনি এসিয়াকে জম্বুদ্বীপ বলিতেছেন। পুরাণমতে জম্বুদ্বীপ লবণসমুদ্রে বেষ্টিত থাকিবে, তাহার পরিমাণ হইবে লক্ষযোজন, মধ্যে সুমেরুপর্ব্বত থাকিবে, উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্পর্ব্বত, রম্যক; হিরণ্ময় ও উত্তর কুরুবর্ষ: পূর্ব্বে মাল্যবান্পর্ব্বত ও ভদ্রাশ্ববর্ষ, পশ্চিমে গন্ধমাদনপর্ব্বত ও কেতুমানবর্ষ; দক্ষিণে নিষধ, হেমকূট ও হিমবান্পর্ব্বত এবং হরি, কিম্পুরুষ ও ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষেও ইন্দ্রদ্বীপাদি প্রত্যেকে সহস্রযোজনপরিমিত নয়টী ভাগ থাকিবে। এই সকল যে এসিয়ামহাদেশে পাওয়া যায় না, তবে আর ইহা জম্বুদ্বীপ হইবে কিরূপে? এইরূপ দক্ষিণআমেরিকা ও প্লক্ষদ্বীপ ইহতে পারে না। কারণ, জম্বুদ্বীপের বাহিরে বলয়াকারে লবণসমুদ্র এবং লবণসমুদ্রের দ্বিগুণ প্লক্ষদ্বীপ, লবণসমুদ্রকেও বলয়াকারে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং প্লক্ষদ্বীপেরও বাহিরে থাকিবে বলয়াকার ইক্ষুসমুদ্র, এইরূপে এক একটী সমুদ্র এক একটী দ্বীপকে বেষ্টন করিবে এবং দ্বীপগুলিও কেবল স্বাদুদকসমুদ্র ব্যতীত সকল সমুদ্রকেই বেষ্টন করিবে। এক জম্বুদ্বীপ ব্যতীত সকলটাই বলয়াকার, কিন্তু লাহিড়ীমহাশয়ের আফ্রিকা, আমেরিকা কোনটাই কথিতমত অবস্থিত নহে।

অবশ্য বিশেষজ্ঞ লাহিড়ীমহাশয় মনু ও মনুপুত্রগণের বংশবর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, -প্রিয়ব্রতের পৃথিবীবিভাগ, অগ্নীধ্রের জম্বুদ্বীপবিভাগ প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিলে জম্বুদ্বীপকে একমাত্র ভারতবর্ষ বলিয়া মনে হয় না। তিনি বলেন জম্বুদ্বীপ অর্থে সমগ্র প্রাচীন গোলার্দ্ধকেই বুঝাইয়া থাকে।, তিনি ব্রহ্মপুরাণের মতানুসারে বলেন, "ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে সমুদ্র" ইহা ব্রহ্মপুরাণে কেন, প্রায় সকল পুরাণেই আছে, কিন্তু পূর্ব্বে কিরাত ও পশ্চিমে যবন, এই সীমা ভারতবর্ষের নহে, ভারতদ্বীপের বা সাগরসংবৃতদ্বীপের বিশেষজ্ঞ লাহিড়ীমহাশয় অন্যান্য বহুতর প্রতিপাদ্য বিষয়ে অধিকতর মনঃসংযোগ করায় এই বিষয়টী উত্থাপনপূর্ব্বকই সাধারণভাবে সমাপ্ত করিয়াছেন। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা এই বিষয়ের তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে সমাজের এক মহা উপকার সাধিত হইবে, পুরাণাদির প্রতি লোকের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইবে। আমি এই গুরুতর বিষয়ের মাত্র সূচনা করিলাম, বিশেষজ্ঞ মহাত্মগণ এই বিষয়ে মনোনিবেশ করুন। ইহা আমার প্রাথমিক অনুসন্ধান, পরে আরও গভীরভাবে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

পঞ্জিকা-সংস্কার।

(পঞ্জিকাসংস্কার সমালোচনার সমালোচনা।)

রূঢ়ভাষায় অনুশীলনান্তে আমরা লেখকমহাশয়ের যুক্তির পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় বিবেচনা করি। প্রবন্ধের কোন অংশে সংস্কারের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে লেখকের মত স্পষ্টভাষায় উল্লিখিত হয় নাই। সর্ব্বত্রই বিষয়বিশেষের দূষণমাত্রই পরিদৃষ্ট হয়; দূষিত বিষয়ের পরিবর্ত্তে লেখকমহাশয় কি করিতে বলেন, তাঁহার মতে বিষয়টি কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা জানিবার অবকাশ নাই। দোষনির্দ্দেশার্থে ব্যবহৃত যুক্তিও এতাদৃশ বিজড়িত যে অনেক স্থলে লেখক কি উদ্দেশ্যে প্রস্তাব বিশেষ করিয়াছেন, তাহাও নিরূপণ করা কষ্টসাধ্য ও কল্পনা সাপেক্ষ। সুতরাং, বিষয়ের পর বিষয় গ্রহণ করিয়া তাহার সমালোচনা সম্ভবপর নহে। এমন স্থলে যুক্তির প্রণালীপরীক্ষা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। বিবিধ উদাহরণ দ্বারা সাধারণ অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে পারিলে লেখকমহাশয়ের ব্যক্তিগত মতের গুরুত্বের অনেক লাঘব হইবে এবং তাহা হইলেই তাঁহার প্রবন্ধেরও মূল্যের হ্রাস হইবে, কেন না প্রবন্ধে ব্যক্তিগত মতেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

প্রথম উদাহরণ। বঙ্গে সভায় বিষয় অনেক কথা লেখক মহাশয় বলিয়াছেন। সেই সুদীর্ঘ বিচারের প্রারম্ভে লিখিলেন "পঞ্জিকা শোধন করাই বঙ্গে সভার একমাত্র স্থির উদ্দেশ্য"

(ক) তৎপরে বিচারান্তে লিখিলেন "প্রচলিত গণনা প্রকারান্তরে সভার অভিপ্রেত" (খ), দুইটি একত্র করিলে কি দাঁড়ায় তাহা আমরা বলিতে পারিলাম না। পাঠক মহাশয়গণের উপর এ গুরুভার অর্পণ করিতে বাধ্য হইলাম। "পঞ্চাঙ্গ শোধনের স্থির উদ্দেশ্য" রূপ আদি 'প্রচলিত গণনাভিপ্রায়'রূপ অন্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিলে দেখা যায় যে সভা অপ্রকাশ্যভাবে যে সকল কথা মনে করিয়াছিলেন তাহা লইয়াই লেখকমহাশয় তাঁহার শেষসিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। সভার গুপ্ত উদ্দেশ্য নিরূপণের জন্য যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা স্বতঃই আনুমানিকতানিবন্ধন জটিল। যাহাই হউক জ্যোতির্ভূষণমহাশয়ের যুক্তির মর্ম্মভেদ করিতে না পারিলেও দেখা যায় যে তাঁহার মতে সভার দুইটি বিরুদ্ধ উদ্দেশ্য ছিল; একটি পঞ্চাঙ্গশোধন অর্থাৎ প্রচলিত গণনার পরিবর্ত্তন, অপরটি প্রচলিত গণনা সংরক্ষণ।

দ্বিতীয় উদাহরণ। লেখক মহাশয়ের মতে "হিন্দুসমাজ শাস্ত্রীয় জ্যোতিষকে আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন" (গ) এবং "হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন যে আপ্তবাক্য কখনই বিজ্ঞানবিরুদ্ধ হইতে পারে না" (ঘ) সিদ্ধান্তজ্যোতির্ভূষণ মহাশয়কে আমরা এই 'হিন্দুসমাজ' ও হিন্দুগণ শব্দের অন্তর্ভূত বলিয়া ধরিয়া লইলাম, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে তাঁহার মতে জ্যোতিষ বিজ্ঞানসম্মত আপ্তবাক্য। কিন্তু পর পৃষ্ঠাতেই (চ) লেখা আছে "আপ্তবাক্যানুরোধে ধর্ম্মকর্ম্মের কালনির্ণায়কত্ব বলিয়া বৈজ্ঞানিক বলা গেলেও, সূর্য্যসিদ্ধান্তের অপ্রশস্ত বর্ষমানটি প্রকৃত প্রস্তাবে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কিনা ইহাই দেখিতে হইবে"। প্রথম কয়েকটি কথার অর্থসঙ্গতি দুষ্কর হইলেও মোটামুটি বুঝা যায় যে লেখকমহাশয়ের মতে সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত বর্ষমান বিজ্ঞানসম্মত নহে। বর্ষমানসম্বন্ধে পরেও যাহা বলিয়াছেন তাহাতেও এই মতই প্রতিপন্ন হয়। এই মতের বিরুদ্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নাই; আমরা অন্যত্র এই বর্ষমানকে ভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। লেখকমহাশয়ের বিবিধবাক্যসংযোজনা মাত্র আমাদের উদ্দেশ্য। সব কথা একত্র করিলে দেখা যায় যে সিদ্ধান্তজ্যোতির্ভূষণমহাশয় বলিতেছেন জ্যোতিষ আপ্তবাক্য; আপ্তবাক্যমাত্রেই বিজ্ঞানসম্মত; ergo * সূর্য্যসিদ্ধান্ত বিজ্ঞান সম্মত নহে।

তৃতীয় উদাহরণ। ব্রাহ্মণসভা সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন যে তাঁহারা পূর্ব্বপক্ষের নিকট যুক্তিচালনা ও জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া গণ্ডগোলে জড়িত হইতে চাহেন না। ভাল; তবে আমরা জিজ্ঞাসা করি সিদ্ধান্তজ্যোতির্ভূষণ মহাশয় সুদীর্ঘ আলোচনা করিলেন কেন? আমরা কি বুঝিব যে ব্রাহ্মণসভা একমাত্র তাঁহাকেই উত্তম স্থানে অভিষেক করিতে সঙ্কল্প

(ক) ব্রাহ্মণ সমাজ ১৩২৩ চৈত্র পৃষ্ঠা ৩৬৩।

(খ) পৃষ্ঠা ৩৭৫। (গ) ৩৬৫ পৃঃ। (ঘ) ৩৬৫ পৃঃ।

চ ৩৬৬ পৃ। * argal an you please.

করিয়াছেন; তাই এত আয়াস, তাই এত পরিশ্রম? যদি সভা উভয়পক্ষ হইতেই ঋণগ্রহণে সমভাবে পরাঙ্মুখ হন, তাহা হইলে লেখকমহাশয়ের শ্রম বিফল হইয়া পড়ে।

আবার দেখুন "ক্ষণিক বোম্বাই পঞ্জিকাসংশোধনসভার ন্যায় তাঁহারা পক্ষাশ্রয় করেন নাই, তাঁহারা নিরপেক্ষ বিচারকের পবিত্র ও উচ্চাসনে সমারূঢ়, বিচারকের গুরুতর দায়িত্বে ও কঠোর কর্ত্তব্যে বৃত"। ক্ষণিক কথাটার অন্বয় আমরা বুঝিতে পারিলাম না। অবশিষ্ট অংশের অর্থে বুঝিলাম ব্রাহ্মণসভা বিচারক বলিয়া বম্বেসভা হইতে উচ্চ। তবে আমাদের একটা কথা মনে হয়; (ব্রাহ্মণ-সভার অনুমতি অনুমান করিয়া লিখিলাম) সভা যদি কখন বিচারনিষ্পত্তি করিয়া সংস্কার আবশ্যক বা অনাবশ্যক কোন প্রকার রায় দেন, তাহা হইলে তাঁহারাও কি বম্বেসভার দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িবেন না? লেখকমহাশয় কি পরামর্শ দেন যে পঞ্জিকাসম্বন্ধে বঙ্গীয়ব্রাহ্মণসভার কোন সমাধানে উপস্থিত হইয়া কাজ নাই। কেন না, তাঁহাদের বিচারফল যাহাই হউক, তাহা প্রকাশ করিলেই তাঁহারা 'ক্ষণিক পক্ষাশ্রয়' দোষে কলুষিত হইয়া পড়িবেন? ব্রাহ্মণসভা কি করিবেন জানিনা, সিদ্ধান্তজ্যোতির্ব্বিভূষণমহাশয়কে এইরূপ নিরপেক্ষ আসনে চিরাসীন দেখিলে আমরা হৃষ্ট হইতাম।

চতুর্থ উদাহরণ। জ্যোতির্ভূষণমহাশয় বলেন যে জ্যোতিষশাস্ত্র যোগবলের উপর সংস্থাপিত। লিখিতেছেন "সংস্কার প্রয়াসিগণ বলিয়া থাকেন, যে তাৎকালিক শাস্ত্রকারগণ এই সকল সংস্কার অজ্ঞতাপ্রযুক্ত (ক) নির্ণয় করিতে পারেন নাই—অর্থাৎ তাঁহাদের বুদ্ধিতে কি বুদ্ধিপ্রসূত যন্ত্রাদিতে উহা ধৃত করিতে পারেন নাই বলিয়া অনুভূতি হয় নাই (খ)। হিন্দুর নিকট ইহা বাচালতা (গ)। যে হেতু উহা ধর্ম্মের মূলসূত্রের প্রতিকূল, কারণ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতৃগণের সর্ব্বজ্ঞতাই মূলভিত্তি। ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতা ব্যতীত তাঁহারা ভগবদ্‌প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতায় এবং অলৌকিক যোগদৃষ্টির সহায়তায় ধর্ম্মকর্ম্মের কর্ত্তব্যতা স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নবাবিষ্কৃত যন্ত্রের প্রয়োজন ছিল বলিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয় এবং তাঁহারা ত্রিকালজ্ঞভাবে জ্যোতিষ লিখেন নাই বলিলে কপটাচারী বলিয়া পাপার্জ্জন করিতে হয়।" যোগবলে জ্যোতিষপ্রণয়ন সাতকড়িবাবুর মুখে প্রথম শুনিলাম। সৌরবাশিষ্ঠাদি কোন সিদ্ধান্তে যোগবলের কোন আভাস পাওয়া যায় না। ভাস্করাচার্য্য, লল্ল, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহিরাদি কাহারো যোগবল ছিল বলিয়া খ্যাতি নাই, এবং ইঁহাদের মধ্যে কেহই কোন যোগবল লিখিত পুস্তকের কথা ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করেন নাই। পরন্ত

(ক) ভাষালালিত্য লেখকমহাশয়ের নিজের, সংস্কার প্রয়াসীদিগের নহে।

(খ) অয়নাংশ সম্বন্ধে ভাস্করাচার্য্য বলিতেছেন "তদা স্বল্পত্বাৎ তৈর্নোপলব্ধঃ। ইদানীং বহুত্বাৎ সাম্প্রতৈরুপলব্ধঃ।

(গ) সুতরাং ভাস্করাচার্য্য বাচাল!

ভাস্কর জ্যোতিষকে নিজকৃত শাস্ত্র বলিয়াছেন (ক); ভাস্কর ও বরাহমিহির পুরাণের মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন (খ); বরাহমিহির সৌরাদিশাস্ত্র লইয়া তাহাদের পরস্পর তুলনা করিয়া পৈতামহ সিদ্ধান্ত ও বশিষ্ঠসিদ্ধান্তকে হেয় পুস্তক বলিয়াছেন(গ)এসকল আলোচনা করিলে জ্যোতিষে যোগবলের অভাবই অনুভূত হয়। সূর্য্যসিদ্ধান্তের উৎপত্তিস্থলে লিখিত আছে (ঘ) যে ময়নামক মহাসুর জ্যোতিষ শিক্ষার জন্য 'আরাধয়ন্ বিবস্বন্তং তপস্তেপে সুদুশ্চরম্।' তাহাতে সূর্য্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া ময়দানবের প্রার্থনা পূরণজন্য তাঁহার নিজ অংশ-পুরুষকে সেই কার্য্যের ভার দিলেন। তখন সেই সূর্য্যাংশ-পুরুষ ময়দানবকে সম্যক্ জ্যোতিষশাস্ত্র শিখাইলেন। আরম্ভ করিবার সময় বলিতেছেন "শৃণুষ্বৈকমনাঃ পূর্ব্বং যদুক্তং জ্ঞানমুত্তমম্, যুগে যুগে মহর্ষীণাং স্বয়মেব বিবস্বতা"। ইহাতে যোগবলের কোন কথা পাওয়া যায় না। এশিক্ষা গুরুর নিকট শিষ্যের শিক্ষা। এযুগে ময়দানব শিষ্য, সূর্য্যাংশ-পুরুষ গুরু; অন্যান্য যুগে মহর্ষিরা শিষ্য, স্বয়ং সূর্য্যদেব গুরু। এতদ্ব্যতীত আর কিছু দেখা যায় না। আবার ময়াসুরের শিক্ষা শেষ হইলে ঋষিগণ ময়াসুরের নিকট তাঁহার লব্ধ জ্ঞান শিক্ষা করিলেন, এইকথা সূর্য্যসিদ্ধান্তপুস্তকের শেষ দুই শ্লোকে লিখিত আছে। (ক) যোগবলের কোন কথা নাই। ইহাতে যদি সূর্য্যদেব কি অপর কাহাকেও কপটাচারী বলিয়া পাপার্জ্জন করিতে হয়, তাহা হইলে সে ভার সিদ্ধান্ত-জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়ের উপর অর্পণ করিলাম। বস্তুতঃ জ্যোতিষ ধর্ম্মশাস্ত্র নহে; ধর্ম্মশাস্ত্রের সহকারী মাত্র। জ্যোতিষ বেদ নহে, বেদাঙ্গ; ব্যাকরণও বেদাঙ্গ; তাহা বলিয়া ব্যাকরণ যোগবলে রচিত হইয়াছে, একথা কেহ মনে করেন না। জ্যোতিষ বিদ্যাবিশেষ, ইহাতে দক্ষতা লাভ করিতে হইলে যন্ত্রকুশল হওয়া আবশ্যক। সূর্য্যসিদ্ধান্তের নক্ষত্র গ্রহযুত্যধিকারের দ্বাদশ শ্লোকের শেষ চরণ "গোলং বদ্ধা পরীক্ষেত বিক্ষেপং ধ্রুবকং স্ফুটম্"। আবার ত্রিপ্রশ্নাধ্যায়ের আরম্ভে "শিলাতলেঽম্বুসংশুদ্ধে বজ্রলেপেঽপি বা সমে। তত্র শঙ্কঙ্গুলৈরিষ্টৈঃ সমং মণ্ডলমালিখেৎ॥" ব্রহ্মসিদ্ধান্তে লিখিত আছে "সংসাধ্যং স্পষ্টতরং বীজং নলিকাদিযন্ত্রেভ্যঃ তৎসংস্কৃতগ্রহেভ্যঃ কর্ত্তব্যৌ নির্ণয়াদেশৌ।" সূর্য্যসিদ্ধান্তে শঙ্কুযন্ত্রের বিস্তর ব্যবহার আছে, যেমন "স্বশঙ্কুমূর্দ্ধগৌ ব্যোম্নি গ্রহৌ দৃক্‌তুল্যতামিতৌ"। সিদ্ধান্ত

(ক) অথ নিজকৃতশাস্ত্রে তৎপ্রসাদাৎ পদার্থান্ শিশুজনসুগময়াহং ব্যঞ্জয়াম্যত্র গূঢ়ান্।

(খ) মূর্ত্তো ধর্ত্তা চেদ্ধরিত্র্যাস্ততোঽন্যস্তস্যাপ্যন্যোঽপ্যেবমত্রানবস্থা।

(গ) পৌলিশরোমকবাশিষ্ঠসৌরপৈতামহাস্তু সিদ্ধান্তাঃ। পৌলিশকৃতঃ স্ফুটোঽসৌ তস্যাসন্নস্তু রোমকঃপ্রোক্তঃ। স্পষ্টতরঃ সাবিত্রঃ পরিশেষৌ দূরবিভ্রষ্টৌ।

(ঘ) মধ্যাধিকার দুই হইতে আট পর্য্যন্ত শ্লোক।

(ক) জ্ঞাত্বা তমৃষয়শ্চাথ সূর্য্যালব্ধবরং ময়ম্ পরিবব্রুরুপেত্যাথো জ্ঞানং পপ্রচ্ছুরাদরাৎ।
স তেভ্যঃ প্রদদৌ প্রীতো গ্রহাণাং চরিতং মহৎ অত্যদ্ভুততমং লোকে রহস্যং
ব্রহ্মসম্মিতম্।

শিরোমণিতে প্রায় পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যন্ত্র ব্যবহারের উপদেশ দেওয়া আছে। বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় * যন্ত্রদ্বারা বেধ করিয়া তিথি পরীক্ষা করিবার উপায় দেওয়া আছে। এসকল দেখিয়া আমরা কি বুঝিব তাহা সিদ্ধান্ত-জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় শিক্ষা দেন নাই। সহজ বুদ্ধিতে এইমাত্র আইসে যে যোগদৃষ্টির সহায়ে নবাবিষ্কৃত যন্ত্রের আবশ্যক না হইলেও পুরাতন তাৎকালিক যন্ত্রের আবশ্যক হইত। জ্যোতির্ভূষণমহাশয়ের উপহাসাস্পদ যাবতীয় পুরাতন জ্যোতির্বেত্তারা আধুনিক যন্ত্র পাইলে কি করিতেন জানি না; তাঁহারা এই সকল যন্ত্রের অভাবে ব্যবহার হইতে বিরত ছিলেন, কি যোগভঙ্গের ভয়ে সে সকল অনাবিষ্কৃত যন্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করিতে যে সূক্ষ্মদৃষ্টির আবশ্যক তাহা আমাদের নাই।

পঞ্চম উদাহরণ। ৩৭৩ পৃষ্ঠার শেষভাগে লেখকমহাশয় বলিতেছেন "সূক্ষ্মতিথি বলিতে নব্যসংস্কার সঙ্কিত (ক) চন্দ্রসূর্য্যাবস্থান হইতে গণিত তিথি—দৃক্‌প্রত্যয়ের জন্য। কিন্তু ইহাপেক্ষাও সূর্য্যসিদ্ধান্তের স্ফুটতিথি আরও সূক্ষ্ম, (খ) যেহেতু চন্দ্রের মধ্যগ্রহণ স্ফুট পূর্ণিমার অন্তে হইবে লেখা আছে"। লেখক মহাশয়ের হেতুবাদ একটু বিস্ময়কর। "স্ফুটতিথ্যবসানে তু মধ্যগ্রহণমাদিশেৎ" একথা সূর্য্যসিদ্ধান্তে আছে বটে, কিন্তু তাহাতে সেই তিথি নব্যসংস্কার 'সঙ্কিত' (?) তিথি হইতে আরো সূক্ষ্ম (খ) কেমন করিয়া হইল? ইংলণ্ডের নাবিক-পঞ্জিকায় * প্রদত্ত স্ফুট পূর্ণিমান্ত ও চন্দ্রগ্রহণ মধ্যে ঊর্দ্ধসংখ্যা ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত পার্থক্য দেখা যায়। গ্রহণের গ্রাস যত অধিক, এই পার্থক্য তত অল্প ও গ্রাসমান যত অল্প পার্থক্য তত অধিক হইয়া থাকে। এই নিয়ম গণিতোদ্ভূত ও উপপত্তিমূলক। ইহার অস্বীকার গণনার স্থূলতার পরিচায়ক, সূক্ষ্মতার নহে। যাহাই হউক, এ বৎসর আষাঢ় মাসে যে চন্দ্রগ্রহণ আছে—যাহার স্পর্শ মোক্ষকাল গুপ্তপ্রেশ, বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত, বাকচীপ্রমুখ সকল পঞ্জিকাতেই নাবিক-পঞ্জিকা হইতে গৃহীত—সেই গ্রহণের মধ্য রাত্রি তিনটা বত্রিশ মিনিট। নাবিক পঞ্জিকায় প্রদত্ত পূর্ণিমান্ত মিনিট দুই পরে। সিদ্ধান্ত জ্যোতির্ব্বিদ মহাশয়ের গণিত স্ফুটতিথ্যব-সান রাত্রি তিনটা বাজিয়া উনপঞ্চাশ মিনিট; অর্থাৎ ১৭ মিনিটের পার্থক্য। ইহাতে কি বলিব যে সিদ্ধান্ত-জ্যোতির্ভূষণমহাশয়ের গণিত পঞ্জিকা আরো সূক্ষ্ম, সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইতেও সূক্ষ্ম, যেহেতু তিথ্যন্ত ও গ্রহণ মধ্যে প্রভেদ ১৭ মিনিট? ক্রমশঃ।

শ্রীআশুতোষ মিত্র।

---

* চতুর্দ্দশ অধ্যায় ১২ এবং ১৩ শ্লোক।

(ক) 'সঙ্কিত' পদটী দুর্ব্বোধ্য। (খ) আরও সূক্ষ্ম অর্থ কি? আরো সূক্ষ্ম—প্রায় অস্তিত্ববিহীন?

* যে পুস্তক হইতে জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় তাঁহার গণিত বা তাঁহার তত্ত্বাবধানে গণিত বাকচী-পঞ্জিকায় গ্রহণের স্পর্শ-মোক্ষাদি কাল গ্রহণ করিয়া থাকেন। সূর্য্য চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে যোগবল সম্বরণ কেন করা হয়, সে বিষয় লেখক মহাশয়ের সুদীর্ঘ আলোচনার কুত্রাপি উল্লেখ নাই।

নদীর প্রতি।

[১]

গাহ কার গুণ-গীতি বল তরঙ্গিণি ?
তুষিতে কাহার প্রাণ,
সুমধুর এ কলতান
গেয়ে গেয়ে নেচে ধাও কোথা স্রোতস্বিনি ?

[২]

বালুময় বেলাভূমি তরঙ্গে প্লাবিয়া—
ষোড়শী রূপসী মত
লাবণ্য ছড়ায়ে এত
চলেছ লহরীমালা গলায় পরিয়া !

[৩]

কি জানি কি মহাভাবে হইয়া বিভোর
নগর প্রদেশ কত
সিক্ত করি অবিরত
অদম্য উৎসাহে বেগে ধাও নিরন্তর !

[৪]

মহাঅর্ণবের দেহে মিশিতে আপনি
কি মহা উদ্দেশ্য ল'য়ে
চলেছ বিবশা হ'য়ে
তুলি মৃদু কলনাদে মহতী রাগিণী !

[৫]

জগৎ ভ্রমিয়া গাহ কার গুণগীতি ?
বল গো আদেশে কার
ধাইতেছ অনিবার
মঞ্জুল রাগিণী হেন গাহি স্রোতস্বতি ?

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

———

সন্ধ্যা।

দ্বিতীয় পত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শিরোমন্ত্রের ঋষ্যাদির মধ্যে "গায়ত্রীচ্ছন্দঃ" বসিবার কারণ—

বাচস্পতিমিশ্রের গ্রন্থে উহা দেখিয়া এবং রঘুনন্দনের "ছন্দোবৃদ্ধিরার্ষত্বাৎ সুঘটা" এই লিখনে কথঞ্চিৎ স্বরস বুঝিয়া কেহ কেহ নিজপুস্তকে ঐ পাঠ বসাইয়াছেন। বাচস্পতিমিশ্রের মত যে দুষ্ট, তাহা মূলপত্রে লিখিয়াছি। আর রঘুনন্দনের বাস্তবিক স্বরস থাকিলে তিনি "শিরসশ্চাহ" বলিয়া যে বচন তুলিয়াছেন, তাহাতে ছন্দের কথা না থাকায় সেইখানেই এ বিচার তুলিতেন, অনেক ব্যবস্থায় তাঁহার এইরূপ অস্পষ্টোক্তি আছে। তজ্জন্য সেই সকল ব্যবস্থায় অধ্যাপকদিগের বিরুদ্ধ মত বা মতভেদ ঘটে, তন্মধ্যে একটা উদাহরণ দিতেছি।

তিথিতত্ত্বে "উপাকর্ম্ম তথোৎসর্গঃ প্রসবাহোঽষ্টকাদয়ঃ। মানবৃদ্ধৌ পরাঃ কার্য্যা বর্জয়িত্বা তু পৈতৃকম্" এই বচন তুলিয়া অষ্টকাসাহচর্য্যন্যায় হেতু (১) এবং জন্মাষ্টমীতে তথাদর্শনহেতু (২) জন্মতিথিকৃত্যে "পৌর্ণমাস্যন্ত মাসাদয়", অর্থাৎ গৌণচান্দ্রের উল্লেখ হইবে লিখিয়াছেন। আবার মলমাস-তত্ত্বে "অথ সাংবৎসরং শ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যং মাসচিহ্নিতং" এই বচন তুলিয়া তাহার ব্যাখ্যায় জন্মতিথিকৃত্যে মুখ্যচান্দ্রমাসের উল্লেখ ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন।

তিথিতত্ত্বের লিখনের উপর টীকাকার গোস্বামী লিখিয়াছেন—বস্তুতস্তু জন্মতিথৌ মুখ্য-চান্দ্রেন বাক্যরচনা, জন্মাষ্টম্যাস্তিথিবিশেষকৃত্যত্বেন বৈষম্যাৎ, অষ্টকাসাহচর্য্যন্যায়স্যাপি শেষং চন্দ্রাশ্রিতং কর্ম্ম ইত্যাদি বচনাৎ দুর্ব্বলত্বাচ্চ।"

অর্থ—বস্তুতঃ জন্মতিথিতে মুখ্যচান্দ্রে বাক্য হইবে।. নির্দ্দিষ্ট তিথিতে যে কার্য্য হয়, তাহা-কেই তিথিকৃত্য বলে, সুতরাং জন্মাষ্টমীর ন্যায় জন্মতিথি তিথিকৃত্য নহে (একই নির্দ্দিষ্ট তিথিতে সকলের জন্মতিথি হয় না) আর বচনের কাছে ন্যায় (যুক্তি) দুর্ব্বল।

অবশিষ্ট কর্ম্ম মুখ্যচান্দ্রে হইবে, এই বচন থাকায় (অবশিষ্টের মধ্যে জন্মতিথি পড়ায়) সাহচর্য্যন্যায় এখানে খাটিতে পারে না। টীকাকার কাশীরামবাচস্পতি লিখিয়াছেন "অত্র তু জন্মতিথিকৃত্যস্য তিথিকৃত্যত্বাভাবেন মুখ্যচান্দ্রেনৈব বাক্যরচনা মলমাসতত্ত্বে স্মার্ত্ত-স্যাপি তথৈব স্বরসঃ। জীমূতবাহনস্তু জন্মতিথিকৃত্যে সৌরমাসাদর ইত্যাহ। তন্মতং দূষয়িতুমুপক্রমতে অষ্টকাসাহচর্য্যাদিত্যাদিনা।"

---

(১) বচনান্তরে অষ্টকাশ্রাদ্ধে গৌণচান্দ্রবিহিত হওয়ায়, উক্ত বচনে অষ্টকারই কাছে প্রসবাহ (জন্মতিথি) বলায় সহচর্য্যন্যায় খাটিবে।

অর্থ। জন্মতিথিকৃত্য তিথিকৃত্য নহে বলিয়া মুখ্যচান্দ্রেই বাক্য হইবে। মলমাসতত্ত্বে স্মার্ত্তেরও সেই অভিপ্রায়। জীমূতবাহন সৌরমাস বলিয়াছেন তাহাই খণ্ডন করিবার জন্য এখানে একথা বলিয়াছেন। এখন যে কোন স্মার্ত্ত অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করিবেন, তিনিই মলমাস-তত্ত্বে গ্রন্থকারের নিজ লিখন ও টীকাকারদের লিখন লক্ষ্য না করিয়া কেবল তিথিতত্ত্বের লিখন অনুসারে ব্যবস্থা দিবেন, জন্মতিথিকৃত্যে গৌণচান্দ্রমাসের উল্লেখ হইবে। 'ক্রিয়াকাণ্ড-পদ্ধতি'র আলোচনাকালে এই ব্যবস্থা লইয়া বাদানুবাদ হইয়াছিল বলিয়া আমি সবিশেষ জানি, যাঁহারা তাহা দেখিয়াছেন, তাঁহারা এখন কি বলিবেন জানি না। কিন্তু অধিকাংশ অধ্যাপকই যে গৌণচান্দ্রের ব্যবস্থা দিবেন ইহা নিশ্চিত। আপনি ইচ্ছা করিলে পরীক্ষা করিতে পারেন।

শিরোমন্ত্রের বিচারেও সেইরূপ তিনি গায়ত্রীচ্ছন্দে কথঞ্চিৎ স্বরস দেখাইয়া বাচস্পতি-মিশ্রের ব্রহ্ম পদত্যাগ যে দুষ্ট, তাহাই একস্থানে সপ্রমাণ করিয়াছেন, এবং অন্যত্র যাজ্ঞবল্ক্যবচন তুলিয়া, কোনও কথা না বলিয়া তাঁহার মতই গণ্য করিয়াছেন। বাচস্পতিমিশ্র ঋষি ছিলেন না, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্যের মত অগ্রাহ্য করিয়া বাচস্পতিমিশ্রের মতে ছন্দঃ বসান উচিত নহে। সারদাতিলকের মতে যে তন্ত্রোক্ত গায়ত্রী শিরের ঐ ছন্দঃ হইতে পারে, তাহা মূল পত্রে লিখিয়াছি। (২।৩) প্রাতঃসন্ধ্যা অহর্ম্মুখে ও সায়ংসন্ধ্যা রাত্রিমুখে কর্ত্তব্য বলিয়া রাত্রিকৃত পাপ অহঃ নষ্ট করুক, এবং অহন্ কৃতপাপ রাত্রি নষ্ট করুক, এইরূপ প্রার্থনা সঙ্গত মনে করিয়া কোনও পণ্ডিত তৈত্তিরীয়, আরণ্যক, তদ্ভাষ্য তদুদ্ধৃত শ্রুতি, গৃহ্যপরিশিষ্ট এসমস্ত না দেখিয়াই, কেবল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই মন্ত্রের পাঠ এবং তদনুসারে গুণবিষ্ণুর পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাই মনে হয়। বচনের কাছে যে যুক্তি দুর্ব্বল, তাহা গোস্বামীর লিখনেই উক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রুতির কাছে কোন বচনই খাটে না। যেহেতু মনু-বলিয়াছেন—"শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব বলীয়সী, (৪) পুনর্মার্জ্জনস্থলে গোভিলসূত্র ও ছন্দোগপরিশিষ্টের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কেবল "ইতিস্মৃতি" বলিয়া আমি যে বচনটী আহ্নিকতত্ত্ব হইতে তুলিয়াছি, তাহার উপরই নির্ভর করিয়া, এবং তাহাতে কেবল আপোহিষ্টাদি মন্ত্রত্রয়েই মার্জ্জনের কথা থাকায় (প্রণব, ব্যাহৃতি, গায়ত্রীর উল্লেখ না থাকায়) কোন পণ্ডিত ভাবিয়াছেন, যে জলে গায়ত্রী জপ করিয়া তদনুমন্ত্রিত জলেই আপোহিষ্টাদি মন্ত্রে মার্জ্জনা করা সঙ্গত। এই ভাবিয়া তিনি ঐরূপ লিখিয়াছেন।

(৫) ওঁ নমো ব্রহ্মণে হইতে উপজায়ন্ত মন্ত্রের পরেই যখন তর্পণের বিধান আছে এবং ঐ মন্ত্রে যখন সূর্য্যের উল্লেখ নাই, তখন উহা সূর্য্যোপস্থানের অন্তর্গত নহে, তর্পণেরই অন্তর্গত।

(২) ব্রহ্মপুরাণে তিথিকৃত্য মাত্রেই—গৌণচান্দ্রবিহিত, সেইজন্য জন্মাষ্টমীব্রত গৌণচান্দ্রেই হয়, তদনুসারে জন্মতিথিও গৌণচান্দ্রে হওয়া উচিত।—

এবং রুদ্রোপস্থানের পর 'ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ' ইত্যাদি বলিয়া যখন জল দেওয়া রহিয়াছে, তখন তদনুকরণে 'ওঁ নমো ব্রাহ্মণে' ইত্যাদি বলিয়া জল দেওয়াই ঠিক এইরূপ মনে করিয়া কেহ ঐরূপ করিয়াছেন এবং উপজায়ত"র অর্থ না বুঝিয়া তৎপূর্ব্বে কতকগুলি 'চ' দেখিয়া এবং ব্রহ্মণে হইতে সমস্ত পাঠ চতুর্থ্যন্ত দেখিয়া 'উপজায়'কেও চতুর্থ্যন্ত পদ করিয়া ত স্থানে চ বসাইয়াছেন।

স্কুলপাঠ্য পুস্তকের ন্যায় ধর্ম্মপুস্তকের বারংবার পরিবর্ত্তন অনুচিত, ইহা অন্তরের সহিত স্বীকার করি। কিন্তু কি করিব নিজের অজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞ উপদেশকের অভাববশতঃ বিষম সমস্যায় পড়িয়াছি, একবারে সমস্ত স্থির করিতে পারিতেছি না। যে বারে যতদূর স্থির করিয়া ছাপাইয়াছি, সে সমস্ত যদি ঠিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাঁহারা সব অশুদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা আহ্নিককৃত্য দেখিয়া কতক শুদ্ধ করিতেছেন, তাঁহাদের তৎপরিমাণে অধিক ইষ্টলাভ হইতেছে বলিতে হইবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীশ্যামাচরণ শর্ম্মা।

চতুর্ব্বর্গ।

(হিন্দু-জীবনের লক্ষ্য।)*

আর্য্যগণ যে চতুরাশ্রমরূপ জীবনাদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, 'চতুর্ব্বর্গ' সেই চতুরাশ্রমেরই লক্ষ্যরূপে কল্পিত হইয়াছিল। 'চতুর্ব্বর্গ' পুরুষার্থ নামেও অভিহিত হয়। 'অর্থ' শব্দের দ্বারা প্রয়োজন বুঝায়। সুতরাং 'পুরুষার্থ' শব্দ পুরুষ বা মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য' অর্থই প্রকাশ করে। চতুর্ব্বর্গ সম্বন্ধে অমরকোষের নিরুক্তি এইরূপ :—

"ত্রিবর্গোধর্ম্মকামার্থৈশ্চতুর্ব্বর্গ স মোক্ষকৈঃ।"

ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ত্রিবর্গ, ইহাদের সহিত মোক্ষ যোগ করিয়া 'চতুর্ব্বর্গ' হয়।

আশ্রম চতুষ্টয়ের নির্ব্বাচন এইরূপ :—

"ব্রহ্মচর্য্যগৃহিবানপ্রস্থভিক্ষু চতুষ্টয়ম্।"

"ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রম।"

প্রথম আশ্রমে ধর্ম্মজীবনে দীক্ষিত হইয়া বেদাচরণ ও বেদ-শিক্ষা করিতে হইত বলিয়াই বেদের ব্রহ্ম-নামানুসারে ইহার নাম "ব্রহ্মচর্য্য" হইয়াছিল। এইরূপে ধর্ম্মেই জীবনের আরম্ভ

---

* বিগত ৯ই জ্যৈষ্ঠ আগরতলায় আহূত ব্রাহ্মণসভায় পঠিত।

হইত বলিয়াই চতুর্ব্বর্গের প্রথমেই আমরা ধর্ম্মকেই উল্লিখিত দেখিতে পাই। গার্হস্থ্যাশ্রমে দারপরিগ্রহ ও অর্থোপার্জ্জন করিতে হইত। সুতরাং, অর্থ ও কামকে আমরা গার্হস্থ্যাশ্রমের লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। বানপ্রস্থাশ্রমে নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্মকার্য্যেরই অনুষ্ঠান হইত। সুতরাং, চতুর্ব্বর্গের ধর্ম্মকে বানপ্রস্থাশ্রমের লক্ষ্য বলা যাইতে পারে। ভিক্ষুকাশ্রমে মুক্তিই একমাত্র সাধন হইত। সুতরাং, চতুর্ব্বর্গের 'মোক্ষ' ইহার লক্ষ্য হইয়াছে।

কবিকুল-চূড়ামণি কালিদাস তদীয় রঘুবংশকাব্যে রঘুবংশীয়দিগের জীবনের যে আদর্শ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে উপরি উক্ত লক্ষ্য সকলই বিশেষরূপে পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। যথা :—

"শৈশবেঽভ্যস্ত বিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্দ্ধকে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম॥"

উপরি উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে বৈদিক দীক্ষা ও বৈদিক শিক্ষা প্রথম আশ্রমের অঙ্গীভূত হইলেও কালে সাধারণ শিক্ষাই যে ইহার লক্ষীভূত হইয়াছিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। নিম্নোক্ত সুপ্রচলিত বাক্য হইতে কিরূপে কেবল 'ব্রহ্মচর্য্য' নহে পরন্তু আশ্রমচতুষ্টয়ই জীবনের সাধারণ আদর্শের রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা পরিস্কৃতরূপেই বুঝিতে পারা যায়, :—

"প্রথমে নার্জ্জিতা বিদ্যা দ্বিতীয়ে নার্জ্জিতং ধনম্।
তৃতীয়ে নার্জ্জিতো ধর্ম্ম শ্চতুর্থে কিং করিষ্যসি ?"

"জীবনের প্রথমভাগে বিদ্যা উপার্জ্জন না করিলে, দ্বিতীয়ভাগে ধনার্জ্জন না করিলে এবং তৃতীয়ভাগে ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে, চতুর্থভাগে কি করিবে ? অর্থাৎ কিরূপে মুক্তি লাভ করিবে ?"

উপরে চতুর্ধাবিভক্ত জীবনকালের সাধারণ জীবনাদর্শের যে রেখাপাত আমরা পাইয়াছি, কি প্রক্রিয়াদ্বারা আমাদের জীবনে ইহাকে প্রকৃত গঠনপ্রদান করিতে পারি, তাহারও আভাস আমরা ইহা হইতেই প্রাপ্ত হই। আমরা বুঝিতে পারি যে মোক্ষকে আমাদের জীবনের চরম ফল বলিয়া মনে রাখিয়া, ইহারই উপযোগী করিয়া আমাদের জীবনকে গঠিত করিয়া তুলিতে পারিলেই প্রকৃত আদর্শ আমাদের জীবনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে। জীবনকে মোক্ষলাভের উপযোগী করিবার জন্য সমস্ত জীবনব্যাপারকে ধর্ম্মের অনুপ্রাণতাদ্বারা সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মার্থক করাই একমাত্র উপায়। কালিদাস মহারাজদিলীপের জীবনবৃত্তান্তে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মার্থক প্রক্রিয়ার অতিসুন্দর বর্ণনাই প্রদান করিয়াছেন, যথা :—

"অপ্যর্থকামৌ তস্যাস্তাং ধর্ম্মএব মনীষিণঃ।"

সেই মনীষী মহারাজের অর্থ—কামব্যাপারও ধর্ম্মানুমোদিত হইয়াছিল।"

মল্লিনাথ এই ধর্ম্মপ্রবণতাহেতু মহারাজদিলীপকে 'ধর্ম্মোত্তর' বলিয়া ব্যাখ্যাত করিয়াছেন ও তৎসমর্থনে সংহিতাকার গৌতমের মত এইরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন—"আহ চ গৌতমঃ "ন পূর্ব্বাহ্নমধ্যন্দিনাপরাহ্নানফলান্ কুর্য্যাৎ যথাশক্তি ধর্ম্মার্থ-কামেভ্যঃ তেষু ধর্ম্মোত্তরঃ স্যাৎ।"

"দিবসের পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণকে যেন ধর্ম্মার্থ কামোৎপন্ন ফলসংযোগে যথাশক্তি সফল করা হয়, তবেই এই সমস্ত বিষয়ে (অনুষ্ঠাতা) "ধর্ম্মোত্তর" (উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশীল) হইয়া থাকেন।

এই 'ধর্ম্মোত্তর' ধর্ম্মপ্রাণেরই নামান্তর। আমাদের সমস্ত অনুষ্ঠানকে ধর্ম্মনিমিত্তক করিয়াই আমরা এই ধর্ম্মপ্রাণতা লাভ করিতে পারি। উদ্ধৃত স্থল সকল হইতে আমরা এই বুঝিতে পারি যে জীবনের বিশেষ ভাগে যেমন ধর্ম্মার্থকামের অনুষ্ঠানের বিধান আছে, তেমনই প্রতিদিন ধর্ম্মার্থ কামের অনুষ্ঠানেরও সাধারণ বিধান আছে; এবং বিশেষ ও সাধারণ সর্ব্ব ব্যাপারেই তুল্যরূপে ধর্ম্মের সম্পর্ক বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই প্রকারে হিন্দুর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সমস্তকার্য্যের মধ্যেই ধর্ম্মের সম্পর্ক সংস্থাপিত হওয়াতে সর্ব্ববিষয়ে ধর্ম্মপ্রাণতা হিন্দুর জাতীয়জীবনাদর্শের বৈশিষ্ট্য হইয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যকে উপলক্ষ্য করিয়াই বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছিলেন—"With others there are things secular and things religious, but with the Hindu, his whole life is religion."

অন্য জাতির পক্ষে প্রার্থিব বিষয়ে ও পরমার্থিক বিষয় এইরূপ ভেদ আছে, কিন্তু হিন্দুর পক্ষে তাহার সমগ্র জীবনই ধর্ম্ম।"

হিন্দুর জীবন এইরূপে ধর্ম্মময় বলিয়াই হিন্দু আধ্যাত্মিক জগতে যতদূর উন্নত হইতে পারিয়াছে, ততদূর আর অন্য কোন জাতিই পারে নাই।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়যোগেই সমস্তসৃষ্টিব্যাপার নির্ব্বাহিত হইতেছে, তাহাতেই সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি ত্রিগুণময়ী হইয়াছে। মানব-প্রকৃতিতে ত্রিবিধ গুণের ভিন্ন ভিন্ন প্রেরণায় ইহার গতিও যে মার্গত্রয়ানুসারিণী হইবে, তাহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। এই প্রকারেই মানব-জীবনের লক্ষ্য ত্রিবিধ ভাবাপন্ন হইয়াছে। কারণ, ধর্ম্ম সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রণোদিত, 'অর্থ রজোগুণের দ্বারা প্রণোদিত এবং 'কাম' তমোগুণের দ্বারা প্রণোদিত। এই গুণ ত্রয়ের সংযোগ হইতেই আমাদের জীবনের কর্ত্তব্যত্রিতয় "ত্রিবর্গ" এই স্বতন্ত্র এক সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের জীবনের চতুর্থ কর্ত্তব্য "মোক্ষ" নির্গুণ ও নির্ব্বিকার ভাব বলিয়া ইহার সহিত ত্রিগুণের সংশ্রব না থাকায়, ইহা পৃথক্‌রূপে চতুর্ব্বর্গের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

রজঃ ও তমোগুণকে সম্পূর্ণরূপে সত্ত্বগুণের অনুগামী করিয়া সত্ত্বগুণের পূর্ণপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, যে বিশুদ্ধসাত্ত্বিকভাব সঞ্জাত হয়, তাহাই গুণাতীত-মোক্ষভাবের কারণ হইয়া থাকে। গীতাতে এ সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে:—

"যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥"

(১৪শ অধ্যায়)

যদি সত্ত্বগুণ বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইলে জীব মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, তখন সে ব্রহ্মবিদ্‌গণের প্রকাশময় লোকসকল প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ তাহার উত্তম গতি হয়)। আর্য্যমিশন অনুবাদ।

সাত্ত্বিকভাবই ধর্ম্মের প্রকৃত অবলম্বন। সুতরাং, ধর্ম্মকে তৌলদণ্ড করিয়াই আমাদের সমস্ত ব্যাপারের প্রকৃত মান ও মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে করা হইয়াছে। ধর্ম্মই স্পর্শমণিরূপে অর্থ ও কামকে সাত্ত্বিকভাবে পরিণত করে, আবার চিন্তামণিরূপে আমাদের চিরবাঞ্ছিত মোক্ষকে আমাদের সাক্ষাতে উপস্থিত করে। কূর্ম্মপুরাণে ধর্ম্মের এই মহাপ্রভাব সম্বন্ধে বিশেষ বিশদ বিবৃতিই পাওয়া যায়। আমরা তাহা এখানে উদ্ধৃত করা একান্ত কর্ত্তব্য বোধ করি :—

"পরিত্যজেদর্থকামৌ যৌ স্যাতাং ধর্ম্মবর্জ্জিতৌ ॥ ৫৩ ॥
ধর্ম্মাৎ সঞ্জায়তে হ্যর্থো ধর্ম্মাৎ কামোঽভিজায়তে।
ধর্ম্মএবাপবর্গায় তস্মাদ্ধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৫৪
ধর্ম্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ ত্রিবর্গাস্ত্রিগুণো মতঃ।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি তস্মাদ্ধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৫৫
যস্মিন্ ধর্ম্মসমাযুক্তৌ হ্যর্থকামৌ ব্যবস্থিতৌ।
ইহলোকে সুখী ভূত্বা প্রেত্যানন্তায় কল্পতে ॥ ৫৭
ধর্ম্মাৎ সঞ্জায়তে মোক্ষো হ্যর্থাৎ কামোঽভিজায়তে।
এবং সাধনসাধ্যত্বং চাতুর্ব্বর্গ্যে প্রদর্শিতম্ ॥ ৫৮
য এবং বেদ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষস্য মানবঃ।
মাহাত্ম্যঞ্চানুতিষ্ঠেত স চানন্তায় কল্পতে ॥ ৫৯
তস্মাদর্থঞ্চ কামঞ্চ ত্যক্ত্বা ধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ।
ধর্ম্মাৎ সঞ্জায়তে সর্ব্বমিত্যাহু র্ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৬০

(পূর্ব্বভাগ ১ম অধ্যায়)

ধর্ম্মহীন অর্থকাম পরিত্যাগ করিবে। ধর্ম্ম হইতে অর্থলাভ হয়, ধর্ম্ম হইতে অভিলষিত দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং ধর্ম্মই মোক্ষের কারণ। অতএব, ধর্ম্ম আশ্রয় করিবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ ই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটী গুণ বলিয়া কথিত হইয়াছে ; অতএব, ধর্ম্ম আশ্রয় করিবে। যে ব্যক্তিতে ধর্ম্মযুক্ত অর্থ, কাম অবস্থিত হইয়াছে, তিনি ইহলোকে সুখী হইয়া পরলোকে অনন্ত সুখলাভ করেন। ধর্ম্ম হইতে মোক্ষ হয়, অর্থ হইতে কাম্য বস্তু লাভ হয়, চতুর্ব্বর্গ বিষয়ে এই প্রকার সাধনসাধ্যত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। যে মানব ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের এই প্রকার মাহাত্ম্য অবগত আছেন এবং ইহার অনুষ্ঠান করেন, তিনি অনন্ত সুখের ভাগী হন্। অতএব, অর্থ-কাম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম আশ্রয় করিবে। ব্রহ্মবাদীরা বলেন ধর্ম্ম হইতেই সমুদায় লাভ হয়।" বঙ্গবাসীর অনুবাদ।

ধর্ম্ম, পূর্ব্বোক্তরূপে আমাদের সমস্ত জীবনলক্ষ্যেরই কেন্দ্রীভূত হইতেছে। কিন্তু ধর্ম্ম কর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ; সুতরাং, কর্ম্মের প্রকৃতি ও প্রণালীভেদ দ্বারাই ধর্ম্মের উৎকর্ষাপকর্ষ হইয়া থাকে। এই কর্ম্ম প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক দ্বিবিধরূপে দেখিতে পাওয়া

যায়। ইহার মধ্যে প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মের অপকর্ষ ও নিবৃত্তিমূলক কর্ম্মের দ্বারা ইহার উৎকর্ষ হইয়া থাকে। সংসারের অনিত্য বস্তু হইতে মনকে নিবৃত্ত করিতে করিতে ক্রমে আমাদের পরমার্থজ্ঞান সম্প্রাপ্ত হইলে,:আমরা তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারি। এই তত্ত্বজ্ঞান হইতেই আমাদের মুক্তি বা মোক্ষ লাভ হয়। কূর্ম্মপুরাণে এই সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছেঃ—

"প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্মবৈদিকম্।
জ্ঞানপূর্ব্বং নিবৃত্তং স্যাৎ প্রবৃত্তং যদতোঽন্যথা॥ ৬৩
নিবৃত্তং সেবমানস্তু যাতি তৎপরমং পদম্।
তস্মান্নিবৃত্তং সংসেব্যমন্যথা সংসরেৎ পুনঃ॥ ৬৪

(পূর্ব্বভাগ—১ম অধ্যায়)

"প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক দ্বিবিধ বৈদিক কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। পরমার্থজ্ঞানমূলক যে কর্ম্ম উহাকে নিবৃত্তিমূলক কর্ম্ম বলে, উহার বিপরীত যাহা, উহাই প্রবৃত্তিমূলক। নিবৃত্তিমূলক কর্ম্মের যিনি সেবা করেন, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন। অতএব নিবৃত্তিমূলক কর্ম্মই আশ্রয়ণীয়, অন্যথা করিলে পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিতে হয়।"

মহর্ষি মনু ও "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" বলিয়া নিবৃত্তি ধর্ম্মেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এই নিবৃত্তিই গীতার অনাসক্তি বা নিষ্কামভাব। অনাসক্তি হইতেই মুক্তিলাভ হয়। সুতরাং, নিবৃত্তিভাব হইতেও যে মোক্ষলাভ হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। মোক্ষই চতুর্ব্বর্গের শেষবর্গ। মোক্ষের এক নাম অপবর্গ। ইহার ধাত্বর্থ হইতেও আমরা নিবৃত্তির অর্থই প্রাপ্ত হই। অপ-পূর্ব্বক বর্জ্জ-ধাতু হইতেই 'অপবর্গ' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে, বর্জ্জ-ধাতু বর্জ্জন বা পরিত্যাগের অর্থই প্রকাশ করে। ইহা হইতে বিষয়াদির বর্জ্জন, অর্থাৎ বিষয়াদি হইতে নিবৃত্তিদ্বারাই যে মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে, তাহাই বুঝিতে পারা যায়।

মহাকবি কালিদাসচিত্রিত দিলীপচরিত্রের আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই কিরূপে শাস্ত্রের প্রাগুক্ত অনাসক্তি ও নিবৃত্তিভাব আর্য্যজীবনে প্রতিফলিত হইয়া আর্য্য-জীবনকে সাংসারিক সুখভোগের মধ্য দিয়া মোক্ষের পথে পরিচালিত করিয়াছে।

দিলীপজীবনের প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে—"অসক্তঃ সুখমন্বভূৎ" "তিনি আসক্তি রহিত হইয়া সংসারের সুখভোগ করিতেন।" তাঁহার জীবনের শেষে লিখিত হইয়াছেঃ—

"অথ স বিষয়ব্যাবৃত্তাত্মা যথাবিধি সূনবে।
নৃপতিককুদং দত্ত্বা সিতাতপবারণম্।
মুনিবনতরুচ্ছায়াং দেব্যা তয়া সহ শিশ্রিয়ে।
গলিতবয়সামিক্ষ্বাকূনামিদং হি কুলব্রতম্।" ৭০

রঘুবংশম্ ৩য় সর্গঃ।

"অনন্তর বিষয়নিবৃত্তচিত্ত দিলীপ যথাবিধানে পুত্রকে রাজচিহ্নরূপ ধবল ছত্র প্রদান করিয়া

মহিষীর সহিত তপোবন তরুচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কারণ বৃদ্ধবয়সে ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের ইহাই কুলপ্রথা।"

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাইলাম চতুর্ব্বর্গের সাধন প্রকৃত ধর্ম্মেরই সাধন; আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত হিন্দুজীবনে ধর্ম্মেরই অনুপ্রাণনা। এই ধর্ম্মানুপ্রাণনারই ফল আধ্যাত্মিকতা। তাহাতেই চতুর্ব্বর্গের সাধনদ্বারা হিন্দুজাতি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জাতিরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সংবাদ।

১। দিল্লী—ইন্দ্রপ্রস্থ ব্রাহ্মণ-মহাসভা।

গত বৈশাখ মাসে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থে ভারতের বর্ত্তমান রাজধানীতে শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরের সভাপতিত্বে ব্রাহ্মণ-মহাসভার অধিবেশন হয়। মজঃফরপুর, ময়রাষ্ট্র (মীরাট), কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থান হইতে সমাগত বহুসহস্র ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী এই মহাসভায় যোগদান করিয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সকল ঘোষণা করেন :—

১। এই মহাসভা ব্রাহ্মণদিগের বেদোক্ত সংস্কারসমূহ যথাসময়ে যথাবিধি অনুষ্ঠান করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণকে অনুরোধ করেন, আর দ্বিজাতির মধ্যে ইহা যথাশক্তি প্রচারকরণ জন্য প্রার্থনা করেন।

২। এই সভা, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পরস্পর প্রীতিবর্দ্ধনের হেতু, প্রধান প্রধান স্থানে আবশ্যকতানুসারে ব্রাহ্মণসভা সংস্থাপন কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন।

৩। এই ইন্দ্রপ্রস্থীয় ব্রাহ্মণ-মহাসভা ব্রাহ্মণকুমার ও অন্য দ্বিজবালকগণের সদাচার ও ধর্ম্ম-বৃদ্ধির নিমিত্ত সন্ধ্যোপাসনাদি অত্যাবশ্যক নিত্যকর্ম্ম ও অন্যান্য আচারাদি শিক্ষার জন্য নিম্ন-লিখিত উপায় সকল কার্য্যে পরিণত করিতে ব্যবস্থা করেন যথা—

(১) স্কুল, পাঠশালাদি শিক্ষালয়ে ও গৃহস্থগণের গৃহে বালকগণের সদাচার শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়।

(২) সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্মপুস্তক প্রকাশিত করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

(৩) মন্ত্রোপদেষ্টা আচার্য্যের কর্ত্তব্য যে শিষ্যকে সন্ধ্যোপাসনা শিক্ষাদানসময়ে তাঁহার নিকট হইতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন যে, সে নিয়মত সন্ধ্যোপাসনাদি প্রত্যহ করিবে এবং যেস্থলে তাহা সম্ভবপর হইবে না, সেখানে দীক্ষা দিতে তিনি অস্বীকার করিবেন।

(৪) গৃহ্যসূত্রানুসারে সমাবর্ত্তনের কালবৃদ্ধিসম্বন্ধে যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়।

(৫) অন্যান্য ব্রাহ্মণসভাকেও উপরোক্ত উপায়াবলম্বন করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়।

৪। শ্রীমান বরোদা-মহারাজ নিজরাজ্যে যে পুরোহিত আইন পাশ করিয়াছেন আর শ্রাদ্ধ-অশৌচাদিসম্বন্ধে বর্ণাশ্রমানুকূলনিয়মবিরুদ্ধ যে বিল্ নিজ ব্যবস্থাপক সভায় এ সময় উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং শ্রীমান ইন্দোর-মহারাজ বিবাহসংস্কারের যে প্রাচীননিয়মবিশৃঙ্খলজনক ব্যবস্থা উপস্থিত করিয়াছেন, এই সভা ঐ সকল অনিষ্টকর কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন এবং অন্যান্য ধর্ম্মাত্মা স্বতন্ত্র নরপতিগণ, ভারতসরকারের অনুসরণে, ধর্ম্ম ও সামাজিক বিধানে যেন হস্তক্ষেপ না করেন, পরন্তু ধর্ম্মপালন ও ধর্ম্মবৃদ্ধির চেষ্টা করেন, এই সভা তাঁহাদিগের নিকট এরূপ আশা করেন।

৫। এই মহাসভা, গৌড়মহাসম্মিলনের প্রস্তাবানুসারে ভারতের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে এমন একটী ব্রাহ্মণাশ্রম স্থাপন অত্যাবশ্যক বিবেচনা করেন, যেখানে স্কুল, কলেজ, পাঠশালা, বিদ্যালয়াদির ব্রাহ্মণছাত্রগণ অবস্থান করিয়া ব্রাহ্মণ্যভাব রক্ষা করিয়া বিদ্যার্জ্জন করিতে পারেন।

৬। হিন্দুধর্ম্মের গ্লানিকর যে সকল বিষয় পাঠ্যপুস্তকমধ্যে :সন্নিবিষ্ট আছে, এই সভা তাহা নিষ্কাসন করার আবশ্যকতা অনুভব করেন এবং এতদর্থে কাশীর অখিলভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ-সভাকে এই অনুরোধ করেন যে এই সভাকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সদস্যগণের নিকট এই প্রার্থনা করা হয় যে, তাঁহারা আপনাপন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভায় প্রশ্ন ও প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া পাঠ্যপুস্তকসমূহের উপরোক্ত যেসকল নিন্দনীয় অংশে হিন্দুধর্ম্মের গ্লানিজনক কথা বা কটাক্ষ আছে, তাহা নিষ্কাসনের ব্যবস্থা করেন।

৭। এই সভা কাশীর অখিলভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ-মহাসভার প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং আশা করেন, ইন্দ্রপ্রস্থীয় ব্রাহ্মণসভার সহযোগিতা গ্রহণ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণমহাসভা ব্রাহ্মণজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতিসাধন করিয়া আপন উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবেন।

৮। এই ইন্দ্রপ্রস্থীয় ব্রাহ্মণসভা রাজভক্তিপ্রকাশ এবং সম্রাটের দীর্ঘ জীবন, নিরন্তর বিজয় ও অভ্যুদয় কামনা করেন।

৯। এই সভা বৈদিক-সংস্কারাদিতে বেশ্যানৃত্য, বখের, অশ্লীল গীতাদি, আতসবাজী ও অন্যান্য অপব্যয় নিবারণ করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছেন।

২। শাখাসভা।

(ক) চন্দ্রপ্রতাপ ব্রাহ্মণসভা।

গত ১২ই আষাঢ় মঙ্গলবার মাণিকগঞ্জ ৺আনন্দময়ী কালীবাড়ীর প্রাঙ্গণে চন্দ্রপ্রতাপ ব্রাহ্মণসভার ৪র্থ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় স্থানীয় ও নানা গ্রামস্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অন্যান্য ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। মিতরানিবাসী শ্রীযুক্ত হৃদয়ানন্দ ভট্টাচার্য্য বেদান্ত-বাচস্পতি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি অভিভাষণ পাঠ করিলে পর সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমেশানন্দ ভট্টাচার্য্য তর্কচূড়ামণি মহাশয় গতবৎসরের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। তৎপর বেতিলানিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র

গোস্বামী, মথুরানিবাসী শ্রীযুক্ত রামকমল ভট্টাচার্য্য ও মাণিকগঞ্জের উকিল শ্রীযুক্ত মনোমোহন নেউগীমহাশয়গণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সারবত্তা ও ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য ও উন্নতি সম্বন্ধে সুললিত বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠদ্বারা সভাস্থ জনগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তৎপর ঐ সভায় নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১। মাণিকগঞ্জে ৺কালীবাড়ীর সংস্রবে একটী টোল স্থাপন এবং তন্নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের উপায় নির্দ্ধারণ করা।

২। যাজনিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং গুরুতা ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ তাহাদের কার্য্যস্থলে লোক যাহাতে বেদবিহিত কার্য্য ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালনবিষয়ে যত্নবান হয় তাহার চেষ্টা করেন এবং হিন্দুর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা তাঁহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন।

৩। বিবাহে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ হিন্দুধর্ম্ম বিগর্হিত বলিয়া ঘোষণা করা ও তাহা নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ ও অবলম্বন করা।

৪। ব্রাহ্মণসভার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে যাজনিক ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা বিবাহাদি ব্যাপার উপলক্ষে দান সংগ্রহের চেষ্টা করা।

৫। মাণিকগঞ্জের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ যাহাতে নিমন্ত্রণ প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়েন, তাহার ব্যবস্থা করা এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের নাম সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণসভায় রক্ষিত করা।

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন।

(খ) ভাটাদিবঙ্গেশ্বরদী ব্রাহ্মণসভা।

গত ১৫ই আষাঢ় ফরিদপুর জেলায় ভাটাদিবঙ্গেশ্বরদী গ্রামে, ভাটাদি জমিদারবাটীতে মহাসমারোহে ব্রাহ্মণসভার অধিবেশন হয়। জমিদার শ্রীযুক্ত আশুতোষ রায়চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রাইচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সহকারী সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় যথাক্রমে সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের ভার গ্রহণ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবস্থাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর স্মৃতিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রয়োজন মত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাদি দিবেন স্বীকার করেন। নিকটবর্ত্তী ১২ খানি গ্রামের লোক ঐ সভায় উপস্থিত থাকিয়া সকলে সোৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

(গ) উজিরপুর শাখাসভা।

১। ধূলজোড়া, উজিরপুর, পরমেশ্বরদি প্রভৃতি গ্রামের ব্রাহ্মণমণ্ডলী সমবেত হইয়া ধূলজোড়া "বীণাপাণি" পুস্তকালয়ে সভার অধিবেশন করেন।

সভাপতি—শ্রীশ্রী৺ব্রহ্মণ্যদেব।

সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্য

" " " দিগম্বর ভট্টাচার্য্য

সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
" " " বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য
" " " কাশীশ্বর ভট্টাচার্য্য
" " " কালিদাস চৌধুরী
" " " ক্ষীরোদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
" " " নেপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
" " " চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য
" " " রামরত্ন বেদান্ততীর্থ
" " " সুরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ
" " " অমরেন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণ ন্যায়তীর্থ।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
" " " নীলরতন ভট্টাচার্য্য।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সহকারী কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত রসিকলাল চট্টোপাধ্যায়।

হিসাবপরীক্ষক—শ্রীযুক্ত যদুনাথ কাব্যতীর্থ।

সহকারী হিঃ পরীক্ষক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

ধর্ম্মব্যবস্থাপক—শ্রীযুক্ত নীলকান্ত তর্কবাগীশ
" " গঙ্গাদাস স্মৃতিতীর্থ
" " রামগোপাল স্মৃতিতীর্থ।

(৬) যশোহর—শাখা-সভা।

স্থান—রঘুনাথ চতুষ্পাঠী।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রামচরণ ন্যায়ভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

ব্রাহ্মণসভার কার্য্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য ও ব্রাহ্মণসমাজপত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার তর্কনিধি মহাশয় সভাপতিমহাশয় কর্ত্তৃক সভার উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা বর্ণনার্থ আহূত হইয়া গভীরার্থপূর্ণ বক্তৃতা করেন।

১। সর্ব্ববাদিসম্মতি মতে স্থিরীকৃত হইল যে যশোহরে বঙ্গীয়ব্রাহ্মণসভার একটী শাখা-সভা স্থাপিত হইল।

২। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচরণ ন্যায়ভূষণ মহাশয় যশোহর ব্রাহ্মণ-সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। শ্রীযুক্ত অমরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত ললিতমোহন

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সহঃ-সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামদাস স্মৃতিতীর্থ ও শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মুকুন্দবিহারী, বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রায়চৌধুরী শ্রীযুক্ত লালনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য মনোনীত হইলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী এই সভার ধর্ম্মব্যবস্থাপক মনোনীত হইলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভারতী এই সভার আচার্য্যপদ গ্রহণ করিলেন।　　　　শ্রীরামচরণ ন্যায়ভূষণ।

৩। সদনুষ্ঠান।

মেদিনীপুর জেলার গুমগড় পরগণার অন্তর্গত বয়ালগ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ পাণ্ডা ও শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ পাণ্ডা মহাশয়ের বাটীতে বিগত ৬ই আষাঢ় মহাসমারোহে ৺শিব-প্রতিষ্ঠা ও তুলাপুরুষদান সম্পন্ন হইয়াছে। বহু অধ্যাপক এই উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। যথোচিত দান ও ভূরিভোজনের ব্যবস্থার কিছুমাত্র ত্রুটি লক্ষিত হয় নাই। আজকাল শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মকর্ম্মে লোকের আস্থা ও ব্যয় বিরল হইয়া আসিতেছে; এমন সময়ে এই সদনুষ্ঠানে পাণ্ডামহাশয়েরা অন্যূন দশ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন। তাঁহাদের এই ধর্ম্মকার্য্য সর্ব্বথা প্রশংসনীয় ও হিন্দু জমীদারগণের অনুকরণীয়।

(ক) বিবাহে পণগ্রহণে অস্বীকার।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত চিরসুহৃৎ লাহিড়ী ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী মহাশয় পুত্র ও ভ্রাতার বিবাহোপলক্ষে কন্যাপক্ষীয়কর্ত্তৃক প্রদত্ত প্রচুর বরপণগ্রহণে অস্বীকার করিয়া মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহাদের উদাহরণ সমাজসংস্কারেচ্ছু মহোদয়গণের অনুকরণীয়। শুধু গলাবাজীর ফল—মাথাধরা মাত্র।

(খ) ৺সীতাকুণ্ড।

৺চন্দ্রনাথতীর্থের পবিত্র আদিতীর্থ 'সীতাকুণ্ড' বহুকাল পূর্ব্বে লুপ্ত হইয়াছে। যাহার নামে স্থানের পরিচয়, সেই তীর্থের পুনরুদ্ধার জন্য মহাপ্রাণ অনেক ব্যক্তি চেষ্টা করিয়াও এতদিন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সম্প্রতি স্বাধীনত্রিপুরেশ্বর স্বর্গীয় মহারাজ রাধা-কিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্যবাহাদুরের মহিষী শ্রীশ্রীমতী রত্নমঞ্জরী মহাদেবীর অর্থসাহায্যে লুপ্ত সীতাকুণ্ডের পুনরুদ্ধার সাধিত হইয়াছে। গত ৬ই আষাঢ় মহারাণী মাতা তথায় উপস্থিত থাকিয়া মন্দিরমধ্যে ৺সীতাদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ভোজন, কাঙ্গালীবিদায় প্রভৃতি কার্য্য রাজোচিত আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্মমাণিক্য বাহাদুরের পুণ্যবতী মহিষী এই লুপ্ত তীর্থের পুনরুদ্ধারে চিরস্মরণীয়া হইলেন। সুখের বিষয় বর্ত্তমান ত্রিপুরেশ্বরবাহাদুরের পুণ্যের সংসারে এইরূপ কীর্ত্তি বিরল নহে।

৪। বৃষোৎসর্গের বৃষ।

বড়লাট সভার অতিরিক্ত সদস্য মাস্তবর শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দ এম্, এ, বি, এল মহোদয় উৎসৃষ্ট বৃষের প্রতি কুব্যবহার নিবারণকল্পে আইনের এক পাণ্ডুলিপি সিমলা বড়লাটসভায় পেশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তৎসম্বন্ধে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার মত জানিতে চাহিয়াছেন। মান্যবর শ্রীযুক্ত কামিনী বাবুকে ব্যবস্থাপক পারিষদমণ্ডলী যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার প্রতিলিপি নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

"উৎসৃষ্ট বৃষে কাহারও স্বত্ব না থাকিলেও সর্ব্বরক্ষক রাজার ঐ বৃষরক্ষায় স্বামিত্ব আছে। "রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ।" মনু ৭ম ৩। যাহার কেহ রক্ষক নাই, রাজাই তাহার রক্ষক। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"কুলানি জাতীঃ শ্রেণীশ্চ গণান্ জনপদাংস্তথা। স্বধর্ম্মচলিতান্ রাজা বিনীয় স্থাপয়েৎ পথি॥" ১মঃ ৩৬১। উৎসৃষ্ট বৃষের প্রতি যে সকল আচরণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তাহা যে ব্যক্তি করিবে, তাহারই অধর্ম্ম; দণ্ড-প্রায়শ্চিত্তবিধি দেখিলে সেই অধর্ম্ম নির্ণয় করা যায়। মুষ্কমোচন ও হত্যা নিষেধ; যথা - দণ্ডবিধিপ্রকরণে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"লিঙ্গস্য চ্ছেদনে মৃত্যৌ মধ্যমো মূল্যমেব চ। মহাপশূনামেতেষু স্থানেষু দ্বিগুণো-দমঃ॥" ২য়ঃ ২২৯। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃতস্মৃতিসাগরে গোভিলঃ—"বৃষভঞ্চ সমুৎসৃষ্টং কপিলাং বাপি কামতঃ। যোজয়িত্বা হলে কুর্য্যাদ্ব্রতং • চান্দ্রায়ণদ্বয়ম্॥" উৎসৃষ্ট বৃষকে হলে যোজিত করিলে দুই চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত। হলযোজন শব্দ দ্বারা শকটযোজনও বুঝিতে হইবে। বৃষোৎসর্গস্থলে 'ন বাহ্যং' বাহন অর্থাৎ হল বা শকটে যোজনা নিষেধ,—শুদ্ধিতত্ত্ব ও প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে উদ্ধৃত কল্পতরুধৃত ব্রহ্মপুরাণবচনে ইহা স্পষ্ট আছে। অতএব এ সকল অধর্ম্ম নিবারণ রাজার কর্ত্তব্য। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর রক্ষাধিকারের ন্যায় অস্বামিক বৃষের রক্ষাধিকার রাজার আছে। "রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ।"

(মনু ৭মঃ ৩)।

স্বচ্ছন্দচারী বৃষের দ্বারা গোজাতির উপযুক্ত বংশরক্ষা ও বৃদ্ধি হয়। মনুষ্যরক্ষায় গোবংশ যথেষ্ট সহায়। মানবরক্ষায় যত্নপরায়ণ নরপতির স্বচ্ছন্দচারী বৃষ রক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য। উৎসৃষ্ট বৃষের হত্যানিবারণ, মুষ্কমোচন নিবারণ ও হলশকটযোজনা নিবারণ যে রাজবিধি দ্বারা হইতে পারে, তাহার উদ্ভাবন কর্ত্তব্য। এতদর্থে যে নজির দ্বারা হাইকোর্ট উৎসৃষ্ট বৃষহত্যায় অপরাধ হয় না এইরূপ বলিয়াছেন, সেই নজিরকে দুর্ব্বল করা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। আপাততঃ এই পর্য্যন্তই করণীয় বলিয়া বিবেচিত।

হাইকোর্টের নজির যে শাস্ত্র ও যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহাও এই স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে:—

স্বত্বাধিকারীর ইচ্ছায় তাঁহার নিজ স্বত্ব নাশ ও অন্যের স্বত্ব উৎপত্তি হইতে পারে। এই ইচ্ছা দান বিক্রয়ের আকারে অভিব্যক্ত হয়। উপেক্ষা-স্বরূপ ইচ্ছায় স্বত্বাধিকারীর স্বত্ব নাশ হয় এবং উপেক্ষিত বস্তুতে অন্যের ঔপাদানিক স্বত্ব হইতে পারে। বৃষোৎসর্গস্থলে উৎসর্গ কারী যে ইচ্ছা করিয়া বৃষের প্রতি নিজ স্বামিত্ব বিসর্জ্জন দিতেছেন, সে ইচ্ছা দান, বিক্রয়

বা উপেক্ষার আকারের নহে, তাহার মধ্যে একটু চুক্তি আছে, সেই চুক্তি এই যে, এই বৃষের উপর আমার যে স্বত্ব ছিল, তাহা ত্যাগ করিতেছি বটে, কিন্তু অপরে যেন ইহা গ্রহণ না করেন, তাঁহাদের ঔপাদানিক স্বত্ব হওয়া আমার অভিপ্রেত নহে। সেই বৃষ অন্যে হল-শকটাদিতে যোজিত করিতে পারিবে না, সেই বৃষসঙ্গিনী উৎসৃষ্ট বৎসতরীর দুগ্ধও পেয় নহে। দাঁড়াইল এই যে, আমার এ বৃষ উৎসৃষ্ট হইলেও অন্যে ইহার অধিকার করিলে আমার আপত্তি থাকিল, সেই আপত্তি করিবার ক্ষমতা স্বত্বের যেটুকু সম্বন্ধ থাকিলে হয়, মাত্র ততটুকু সম্বন্ধ আমার থাকিবে, তাহার অতিরিক্ত কোন স্বত্ব-সম্বন্ধ এ বৃষে বা বৎসতরীতে নাই। ব্রাহ্মণগণ ! আপনারা এ বিষয়ে সাক্ষী।' এই ভাব নিম্নলিখিত বচনে স্পষ্টীকৃত আছে ;—
"অথ বৃত্তে বৃষোৎসর্গে দাতা বক্রোক্তিভিঃ পদৈঃ। ব্রাহ্মণানাহ যৎ কিঞ্চিন্ময়োৎসৃষ্টস্ত নির্জ্জনে ॥ তৎ কশ্চিদন্যো ন নয়েন্ন বিভাজ্যং যথাক্রমম্। ন বাহ্যং ন চ তৎক্ষীরং পাতব্যং কেন চিৎ কচিৎ ॥" (কল্পতরুধৃত ব্রহ্মপুরাণবচন)।

এই বচন শুদ্ধিতত্ত্ব ও প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। 'বক্রোক্তিভিঃ' এই অংশ দ্বারা স্পষ্টই বুঝান হইয়াছে যে, এই উৎসর্গের মধ্যে দাতার অভিসন্ধি আছে। সে অভিসন্ধিও স্পষ্ট উল্লিখিত। এই কারণে উৎসৃষ্ট বৃষ কাহারও ক্ষেত্রে শস্য নাশ করিলেও ক্ষেত্রস্বামী তাহাকে ধরিয়া রাখিলে রাজদণ্ড পাইত। কেননা রাজবিধি ছিল ;—

"মহোক্ষোৎসৃষ্টপশবঃ সূতিকাগন্তুকাদয়ঃ।
পালো যেষান্তু তে মোচ্যা দৈবরাজপরিপ্লুতাঃ ॥"   (যাজ্ঞবল্ক্য ২য়, ১৬৬)

৫। শ্রীশ্রীপুরীরাজের প্রস্তাবিত পোষ্যপুত্র ঃ—

সংবাদপত্রাদিতে :পুরীরাজ-কর্তৃক পোষ্যপুত্রগ্রহণ প্রস্তাবের আলোচনায় আমরা অবগত হইতেছি যে কয়েকজন স্বার্থসন্ধ ব্যক্তির প্ররোচনায় শ্রীমান্ পুরীরাজ দ্বীপান্তরপ্রত্যাগত ভিন্নবংশীয় সুঙ্গীরাজের পুত্রকে দত্তকগ্রহণে মনস্থ করিতেছেন। পুরীরাজ ভগবান শ্রীপুরুষোত্তমের প্রথমসেবাধিকারী বিধায়, হিন্দুর নিকট তিনি ভগবানের দ্বিতীয় মূর্ত্তি বলিয়া সম্মানিত। এইরূপ ক্ষেত্রে তিনি যদি শাস্ত্র, ধর্ম্ম ও সমাজকে অবজ্ঞা করিয়া ম্লেচ্ছান্নভোজী ভিন্নবংশীয় সুঙ্গীরাজপুত্রকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে নিখিলভারতের হিন্দু-সমাজ বিক্ষুব্ধ এবং ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রেই মর্ম্মাহত হইবে। তিনি বিশ্রুতকীর্ত্তি যশোধবলিত গঙ্গা-বংশের পূতধারা। চেষ্টা করিলে এই গঙ্গাবংশ হইতেই তাঁহার সপিণ্ড বা সগোত্র উপযুক্ত কোন বালককে গ্রহণ করিতে পারেন।

প্রস্তাবিত বালককে পোষ্যপুত্র গ্রহণে হিন্দুর আপত্তি আছে। কেননা, তাঁহার পুত্র তাঁহার স্থানীয় বলিয়া হিন্দুর বহুমানপাত্র। সেই সম্মান বিশুদ্ধধারায় অর্পণ করিতে হিন্দুর স্বাভাবিক ইচ্ছা। এই ইচ্ছা পূরণ করা শ্রীপুরুষোত্তমের দ্বিতীয় মূর্ত্তির কর্ত্তব্য—কেননা তিনি তীর্থেশ্বর। এই ইচ্ছা জানাইয়া বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণসভা পুরীরাজের নিকট আবেদন করিয়াছেন ও শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিয়াছেন। সেই আবেদন ও ব্যবস্থাপত্রের প্রতিলিপি উদ্ধৃত হইল :—

স্বস্তি সততশুভানুধ্যায়িবঙ্গীয়ব্রাহ্মণ-সভাপারিষদানাং সসম্মানাশীরাশিসমাবেদনমেতৎ— শ্রীমন্তো ভবন্তঃ খলু নিখিলেঽস্মিন্ ভারতবর্ষে সর্ব্বেষামেব সনাতনধর্ম্মাবলম্বিনাং নিতরাং বহুমানপাত্রম্। ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য প্রথমসেবাধিকারেণ শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবয়োরভেদাচ্চ ভগবতো দ্বিতীয়া মূর্ত্তিঃ পুরীরাজ ইতি ব্যপদিশ্যতে লোকৈঃ। তৎ শ্রীমতাং স্বজনপরিজনপরিবৃতৌ ধর্ম্মাচারভূমানমাকলয্য যথা প্রীয়তে তথৈবাশীয়াংসমপি তদ্বিরুদ্ধাচারমুপলভ্য দূয়তে সর্ব্বৈঃ। সাম্প্রতং তাবন্মহীয়স এবাধর্ম্মাচারস্য শ্রীমদ্ভিরনুভিষ্ঠাসিতস্য বার্ত্তাং সংবাদপত্রাদিষু প্রকটিতামবগম্য বজ্রাহতা ইব সনাতনধর্ম্মাবলম্বিনঃ সংবৃত্তাঃ, ততো বয়ম্ স্বয়ংপ্রবৃত্তা বহুভিস্তথাবিধৈশ্চ প্রবর্ত্তিতাঃ প্রার্থয়ামহে নিবর্ত্তন্তাং শ্রীমন্ত অস্মাদ্বিরুদ্ধাচরণাদিতি।

বিদাঙ্কুর্ব্বন্তু চ শ্রীমন্তো দ্বীপান্তরপ্রত্যাগতস্য চিরকালজ্ঞানকৃতম্লেচ্ছান্নাদ্যভক্ষ্যভক্ষণজনিতপাতিত্যস্য প্রায়শ্চিত্তেতরবৈধদানানধিকারিতয়া তৎপ্রদত্তপুত্রো দত্তকতয়া গৃহীতোঽপি ন পুত্রোচিতায়ৈ ক্রিয়ায়ৈ প্রভবতি, ন বা গ্রহীতৃধনে স্বাম্যং লভতে তৎপুত্রত্বস্যৈবাসিদ্ধেঃ, কেবলং পতিতপ্রথমসংসর্গিসংসর্গেণ গ্রহীতুর্ম্মহানধর্ম্মঃ সাধ্যতে। এতদনুগুণসিদ্ধান্তশ্চ কলিকাতাব্রাহ্মণমহাসম্মিলনসমিতিসমাগতবারাণসেয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবকুমার শাস্ত্রিপ্রমুখবঙ্গোৎকলাদিষু প্রতিষ্ঠিতাধ্যাপকভূয়িষ্ঠপণ্ডিতবৃন্দারকৈঃ সুনির্ণীতঃ প্রচারিতশ্চেতি শিবম্।

পুরীরাজের দত্তক গ্রহণ সংক্রান্ত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভায় ব্যবস্থাপত্রের প্রতিলিপি—

শ্রীরামঃ— বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা ৯।৩।২৪

ম্লেচ্ছদেশগমনাভ্যস্তজ্ঞানকৃতম্লেচ্ছান্নভক্ষণাদিজনিতপাতিত্যস্য প্রায়শ্চিত্তসন্ধ্যোপাসনস্নানহরিস্মরণাতিরিক্তনিখিলবৈধকর্ম্মানধিকারিতয়া স্বত্বনাশেন চ স্বৌরসপুত্রদানেঽপ্যধিকারো নাস্তি। যদৃচ্ছয়া কৃতমপি তদ্দানমকৃতমেব। দানাসিদ্ধৌ চ পুত্রস্য দত্তকত্বাভাবাদ্‌গ্রহীতৃধনাদাবনধিকারশ্চেতি বিদুষাম্পরামর্শঃ।

অত্র প্রমাণম্—

দ্বিজাতিকর্ম্মভ্যো হানিঃ পতনং পরত্র চাসিদ্ধিস্তামেকে নরকমিতি গৌতমবচনম্।

স্বতন্ত্রোঽপি হি যৎকার্য্যং কুর্য্যাদপ্রকৃতিং গতঃ।
তদপ্যকৃতমেব স্যাদস্বাতন্ত্র্যস্য হেতুতঃ॥

ইতি স্মার্ত্তধৃতনারদবচনম্। অপ্রকৃতিং গতঃ পাতিত্যোন্মাদাদিযুক্ত ইত্যুদাহাদিতত্ত্বলিখিততদ্ব্যাখ্যানম্। বিনষ্টে বাপ্যশরণে পিতুর্য্যপরতস্পৃহে ইতি স্বত্বনাশকপ্রকরণীয়নারদবচনস্য, বিনষ্টে পতিতে ইতি দায়ভাগব্যাখ্যানম্। গোত্ররিক্‌থে জনয়িতুর্ন হরেদ্দত্রিমঃ সুতঃ। ইত্যাদিকাপ্যথা দাস উচ্যতে ইত্যন্তোদাহৃতস্বধৃতবচনানুগতযুক্তিশ্চ।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন দেবশর্ম্মণাং, শ্রীদুর্গাসুন্দর স্মৃতিরত্ন দেবশর্ম্মণাং, শ্রীরামকৃষ্ণ ন্যায়তর্কতীর্থ দেবশর্ম্মণাং, শ্রীবীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ দেবশর্ম্মণাং, শ্রীজগদ্দুর্লভ স্মৃতিতীর্থ দেবশর্ম্মণাং, শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ দেবশর্ম্মণাং শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ দেবশর্ম্মণাং, শ্রীঅমরনাথ স্মৃতিতীর্থ দেবশর্ম্মণাং।

নূতন চতুষ্পাঠী স্থাপন।

গত চৈত্রমাসে মাদারীপুর ব্রাহ্মণমহাসম্মিলনের উৎসাহে মাদারীপুরব্রাহ্মণসভা কর্ত্তৃক তথায় একটী চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইয়াছে। আশা করা যায় এই চতুষ্পাঠী স্থাপনে স্থানীয় একটী বিশেষ অভাব মোচন হইবে।

ব্রাহ্মণ-সমাজের নিয়মাবলী।

১। বর্ষগণনা—১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্বিন হইতে ভাদ্র পর্যান্ত বৎসর পরিগণিত হইয়া থাকে। ১৩২৩ সালের বর্ত্তমান আশ্বিন হইতে ইহার পঞ্চম বর্ষ চলিতেছে।

২। মূল্য—ব্রাহ্মণ-সমাজের বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র দুই টাকা। ভিঃ পিঃ ডাকে লইতে হইলে দুই টাকা দুই আনা লাগিবে। স্বতন্ত্র ডাকমাশুল লাগিবে না। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। ব্রাহ্মণ-সমাজের মূল্য অগ্রিম দেয়। বৎসরের কোন ভগ্নাংশের জন্য গ্রাহক গৃহীত হয় না। বৎসরের যে মাসেই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আশ্বিন হইতেই তাঁহার বার্ষিক চাঁদার হিসাব চলিবে।

৩। পত্রপ্রাপ্তি—ব্রাহ্মণ-সমাজ বাঙ্গলা মাসের শেষ তারিখে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোনও গ্রাহক পর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে ব্রাহ্মণ-সমাজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। না জানাইলে পরে তাঁহাদের ক্ষতি পূরণ করা কঠিন হইবে।

৪। ঠিকানা পরিবর্ত্তন—গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া—তাঁহাদের নাম ধাম পোষ্ট অফিস ইত্যাদি যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কিম্বা অন্য প্রয়োজনে চিঠিপত্র লিখিলে অনুগ্রহ করিয়া সর্ব্বদা নিজের গ্রাহক নম্বরটী লিখিয়া দিবেন।

৫। চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি—"ব্রাহ্মণ-সমাজে" কোনও প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইলে লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। আর সর্ব্বদাই কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। ব্রাহ্মণ-সমাজ-সম্পাদক প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইবার ভার গ্রহণকরিতে অক্ষম। চিঠিপত্র বা প্রবন্ধ সমস্তই সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদকের নামে ৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। টাকাকড়ি—৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ব্রাহ্মণসভার কার্য্যালয়ে ব্রাহ্মণসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

বিদেশীয় গ্রাহকগণকেও টাকার রসিদ দেওয়া হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ২য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের হার মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ৩য় পৃষ্ঠা ও পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ পৃষ্ঠা ৪৲ চারি টাকা হিসাবে লওয়া হয়। অন্য পেজ ৩৲ তিন টাকা—বার্ষিক স্বতন্ত্র।

২। তিন মাসের কম সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। তিন মাসের মধ্যে বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তিত হয় না।

৩। বিজ্ঞাপনের মূল্যের অর্দ্ধেক টাকা অগ্রিম জমা না দিলে ছাপা হয় না।

৪। দীর্ঘকালের নিমিত্ত বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইলে কার্য্যালয়ে জানিতে পারা যায়।

ব্রাহ্মণসমাজ সম্পাদক
৬২ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা—৮২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ নবদ্বীপ সমাজ সম্মিলিত—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা হইতে
ব্রাহ্মণসমাজ কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১২নং সিমলা ষ্ট্রীট।
শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা মুদ্রিত।

REGISTERED No. C—675.

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

ব্রাহ্মণসমাজ

(মাসিক পত্র)

A Non—Political Hindu Religious & Social Magazine.

পঞ্চম বর্ষ—একাদশ সংখ্যা।

শ্রাবণ।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ দুই টাকা।

প্রতি খণ্ড ।০ আনা।

সন ১৩২৪ সাল।

এই সংখ্যার লেখকগণ।

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরঞ্জন।
শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র সান্যাল।
শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখর রায় বাহাদুর।
শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রীকাব্যতীর্থ।
শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণ।

সম্পাদকদ্বয়—
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার তর্কনিধি।
কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

	বিষয়		নাম	পৃষ্ঠা
১।	মা	...	শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়	৫৫৯
২।	ব্রাহ্মণসভা প্রতিষ্ঠা	...	শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরঞ্জন	৫৬০
৩।	পঞ্চতত্ত্বসাধনার শাস্ত্রীয় সমাধান	...	শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৬৬
৪।	হিন্দুসমাজে পণপ্রথা (বিবাহ ব্যবসায়)		ঐ	৫৭০
৫।	জাতীয় উত্থান	..	শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র সান্যাল	৫৭৫
৬।	ব্রাহ্মণ্য-সাধনা	...	শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখর রায় বাহাদুর	৫৮৩
৭।	শাণ্ডিলী ও সুমনা	...	শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী-কাব্যতীর্থ	৫৯৪
৮।	প্রতিবাদের প্রতিবাদ	...	শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণ	৬০১
৯।	সংবাদ	...		৬০
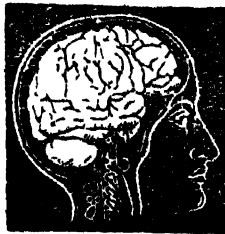
REGISTERED No. C—675.

পঞ্চম বর্ষ। { ১৮৩৯ শক, ১৩২৪ সাল, শ্রাবণ। } একাদশ সংখ্যা

মা!

কালেংড়া—একতালা।

আমি তোমায় ডাকবো না মা,
আপনি তোমায় আস্‌তে হবে।
ইচ্ছা হয়তো হৃৎকমলে
উদয় হ'য়ে আপনি র'বে॥
ফেলেছ যে বিষম ফেরে
ডাকবো কখন মা তোমারে,
(আমি) বিষম পাঁকে আছি প'ড়ে
আপনি তুমি তুলে ল'বে॥
দুষ্ট ছেলে হ'লে পরে
মা কি তারে ফেল্‌তে পারে?
মায়ের মতন মা যদি হও
ছেলে ফেলে কোথায় র'বে?
দৌড়ে আমি পালিয়ে যা'ব,
কভু তোমার নাম না ল'ব,
আপনি তুমি পেছন্ থে'কে
ধ'রে আমায় কোলে ল'বে॥

শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মণসভা প্রতিষ্ঠা।

কলিকাতা বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ সভার ব্যবস্থায়, বীরভূম ও মুর্শীদাবাদ জেলার নানাস্থানে এবং অন্যান্য জেলায়ও ব্রাহ্মণসভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ও হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ সভার বহুল প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এই সকল সভাপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা ভাবিয়া দেখিলে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই নিদারুণ ক্ষোভে অবসন্ন হইবেন সন্দেহ নাই। হায়! যাঁহারা সমাজের নিয়ামক, রক্ষক এবং পালক ছিলেন, কালবশে আজ তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা ও আয়োজন হইতেছে। কেননা অধিকাংশ ব্রাহ্মণগণের স্বধর্ম্মচ্যুতিরূপ—অধঃপতনই হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণ। বিশাল হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণই মূলভিত্তি। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের উপরই হিন্দুসমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই হিমাদ্রিসদৃশ অটল অচল হিন্দুসমাজ-ভিত্তি কালবশে আজ টল্‌টলায়মান। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণগণ হিন্দুসমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন। মৃত্তিকা-সংযোগশূন্য বৃক্ষমূল যেমন বৃক্ষের সজীবতা রক্ষা করিতে পারে না, বৈদিকমন্ত্রার্থ জ্ঞানসংস্রবশূন্য বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠানবিহীন ব্রাহ্মণও সেইরূপ হিন্দুসমাজ-সংরক্ষণে অসমর্থ। এক্ষণে অধিকাংশ ব্রাহ্মণই বেদবিহিত জ্ঞান ও বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠান-বিহীন হইয়াছেন।

অহো! যে ব্রাহ্মণের অব্যর্থ অমোঘ বাক্যে—জলনিধির সলিল লবণাক্ত ও সুধানিধি চন্দ্র ক্ষয়গ্রস্ত হইয়াছেন; যে ব্রাহ্মণের কোপদৃষ্টিতে বিশাল সগরবংশ ভস্মে পরিণত হইয়াছে; যে ব্রাহ্মণ, ঐন্দ্রজালিকবৎ অচিন্ত্য শক্তিরপ্রভাবে, অপার মহোদধির অগাধ অনন্ত বারিরাশি গণ্ডূষে পান করিয়াছিলেন, অধিক কি যে ব্রাহ্মণ পূর্ণব্রহ্মসনাতন ভগবানের বক্ষে সদর্পে পদাঘাত করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই স্বয়ংরক্ষিত জগদ্‌বরেণ্য ব্রাহ্মণবংশধরগণ অনেকে বেদার্থজ্ঞানশূন্য ও বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানবিহীন হওয়ায়, আজ আপনাকে রক্ষা করিতে অক্ষম, অপিচ অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছেন, ইহা অপেক্ষা গভীর পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? আমরা শাণ্ডিল্য, কশ্যপ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি ত্রিকালদর্শী শুদ্ধসত্ত্ব ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন দ্বিজগণের বংশধর হইয়া, শিক্ষা ও সৎসঙ্গের অভাবে, জাতীয়গুণক্রিয়া, স্বভাবধর্ম্ম, শক্তিসামর্থ্য হারাইয়াছি ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যে আর্য্যগণ, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এবং "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" দর্শন করিতেন, তাহা প্রত্যক্ষ করা দূরে থাকুক, আমরা তাহা কল্পনা করিতেও সমর্থ নহি। আমাদের চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় এবং দেহ, মন, প্রাণ সমস্তই বিকৃত হইয়াছে। আমাদের চক্ষু কেবল কামিনীর কামবিলাসময়ী কমনীয়তা দেখিয়া অহর্নিশ মুগ্ধ। আমাদের কর্ণ এখন আর শাস্ত্রালোচনা ধর্ম্মতত্ত্বাদি সৎকথা শুনিতে চাহে না। পরনিন্দা, কুৎসা এবং সেই কামিনীকাঞ্চনের কথা শুনিতেই অধিক অনুরক্ত। শাস্ত্রকথাশ্রবণ অপেক্ষা বারবিলাসিনী বদননিঃসৃত

বীভৎস সঙ্গীত শ্রবণ করিতেই শ্রবণ এখন সমধিক সোৎসুক। অগুরু চন্দন, কুঙ্কুম, কস্তুরী, কর্পূরাদির পবিত্র গন্ধ এক্ষণে আমাদের প্রীতিকর নহে, অটো, অডিকলন, ল্যাভেণ্ডার আদি অপবিত্র বিদেশীয় অস্পৃশ্য নির্য্যাস প্রভৃতির গন্ধাঘ্রাণে আমরা অধিক লালায়িত। ঘৃত প্রভৃতি দেবভোগ্য পরম পুষ্টিকর সাত্ত্বিক আহার্য্য এখন আমাদিগকে ভাল লাগে না, বরং অনেকের এখন ম্লেচ্ছাহার্য্য সবিশেষ রুচিকর ও নিত্যব্যবহার্য্য হইয়াছে। দুঃসহ গ্রীষ্মে তিন চারিটী জামায় দেহ আবৃত না করিলে, এখন আমাদের শরীরের উষ্ণতা রক্ষা হয় না। তাই বলিতেছি, আমাদের দেহেন্দ্রিয়, মনপ্রাণ সমস্তই বিকৃত হইয়া গিয়াছে। যে আর্য্যগণ, শীত গ্রীষ্ম সকল সময়েই প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি প্রাতঃকৃত্য সমাধান পূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনা, ইষ্টপূজনাদি নিত্যানুষ্ঠান করিতেন,: সংযম নিয়মাদি ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে যাগযজ্ঞ ব্রতোপবাসাদি কঠোর কর্ম্মানুষ্ঠান যাঁহাদের জীবনের নিত্য অনুষ্ঠেয় ছিল, যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত বিধানে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞ সম্পন্ন করিতেন, সেই সত্য, শৌচ সদাচার ও সরলতার মূর্ত্তি তপস্তেজোদীপ্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের খনি এবং ক্ষমা ও আস্তিক্যের অবতার ব্রাহ্মণগণের বংশধর হইয়া আমরা স্বজাতীয় আচার ব্যবহার, বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মানুশীলনাদি সমস্তই প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছি।

আমাদের অনেকের শাস্ত্রজ্ঞান ও শাস্ত্রবাক্যে আদৌ বিশ্বাস নাই। এই শাস্ত্রজ্ঞানহীনতা ও শাস্ত্রবিশ্বাসের অভাববশতঃ এবং আর্য্যাচারবিহীনের সংসর্গহেতু যথেচ্ছাচারিতার প্ররোচনায় আপাতমধুর ম্লেচ্ছাচার, আমাদের দেহেন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, অস্থিমজ্জা, প্রভৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আমাদের সাত্ত্বিকভাব নষ্ট করিয়া দিতেছে। আমাদের আহার বিহার, আচার-ব্যবহার আলাপ-সম্ভাষণ, বসনভূষণ কোন কিছুই এখন ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক নহে। বাহ্যিক আভ্যন্তরিক কোন ভাবদ্বারা এখন আর আমাদিগের অনেককেই সেই ধর্ম্মপ্রাণ, ব্রহ্মতেজঃ-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিয়া লইবার উপায় নাই। শাস্ত্রবিধিমতে অনেকেই আমরা খাদ্যাখাদ্য, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য, পবিত্রাপবিত্র প্রভৃতি কোন কিছুই লক্ষ্য করি না। সংসারে স্বাস্থ্যকর সুস্বাদু সাত্ত্বিক আহার্য্য থাকিতে আমরা অহিন্দুর প্রস্তুত বিষকূটতুল্য বিস্কুট এবং পাপপূর্ণ পাপরুটী সাধ করিয়া আগ্রহের সহিত ভোজন করি। অম্ল ও অজীর্ণ রোগের সুলভ ও উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং তৃষ্ণানিবারণের অত্যুত্তম পানীয় ডাবের জল ত্যাগ করিয়া নানাজাতির স্পৃষ্ট ও উচ্ছিষ্ট সোডাওয়াটার, লেমনেড পান করিয়া লোক সমাজে বাহাদুরী দেখাইয়া থাকি। ইহাতে যে কেবল আমরা স্বধর্ম্ম ও জাতীয়গুণাদি হারাইতেছি তাহা নহে, অনেক সময় বিবিধ বৈদেশিক সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইতেছি।

আহার বিহারাদির ব্যভিচারই ব্যাধিগ্রস্ত হইবার প্রধান কারণ। আয়ুর্ব্বেদ বলেন—

"আলাপাদ্ গাত্রসংস্পর্শান্নিশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
একশয্যাসনাচ্চৈব বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ॥

কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এবচ।
ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরং॥

(কুষ্ঠনিদান)

এই জন্য ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ, খাদ্যাখাদ্য, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষরূপ বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই জন্য আর্য্যশাস্ত্রে জাতি, ধর্ম্ম, গুণ, কর্ম্ম ও সম্প্রদায়ানুসারে পৃথক্‌ভাবে পঙ্‌ক্তিভেদে অবস্থান, উপবেশন ও আহারাদি করিবার বিধান আছে। কিন্তু আমরা এতই শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন ও অজ্ঞানকলুষিত হইয়াছি যে, ঐ সকল বিধিনিষেধের উপকারিতা ও আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, ঐ সকল পরমমঙ্গলদায়ক শাস্ত্রাদেশ ভণ্ডামি ও অন্ধবিশ্বাস বলিয়া ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়া থাকি। অপরন্তু অনেক স্থলে তাহার অপব্যবহার করিয়া আপনাকে ক্ষমতাশালী মনে করি। কেবল আহার্য্যবিষয়েই যে আমরা স্বেচ্ছাচারী ও ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়াছি তাহা নহে, আমাদের বেশভূষা, হাবভাব, গমনোপবেশন, কথাবার্ত্তা প্রভৃতি সমস্তই ম্লেচ্ছভাবাপন্ন বা বিকৃত হইয়াছে। আমরা মস্তকের সকল অংশের চুল কাটিয়া, আলবার্ট, টেড়ির অনুরোধে, বালকের বুলবুলির ন্যায়, কপালে এক-গোছা চুল রাখিতে পারি, কিন্তু ঐরূপ একগোছা চুল,—ব্রহ্মরন্ধ্রের পশ্চাতে রাখিলে উহা হিন্দুর চিহ্ন শিখানামে অভিহিত হয় বলিয়া, সেরূপ চুল রাখিতে আমরা লজ্জায় মরিয়া যাই। আমাদের দুবেলা পেটপুরিয়া আহারের সংস্থাপন না থাকিলেও, কিম্বা সুদের হারের চক্রবৃদ্ধি সর্ব্বসংহারক ভীষণচক্রের নিষ্পেষণে অস্থিপঞ্জর চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে চলিলেও, নেক্‌টাই সেফ্‌টীপিন, কলার, প্রভৃতি আরও কত অনাবশ্যক বিজাতীয় বেশভূষা গলায় বাঁধিয়া "সাহেব" বা "হঠাৎবাবু" সাজিতে আমাদের অনেকেরই লজ্জা হয় না; কিন্তু হিন্দুর চিহ্ন মালা এবং দ্বিজের প্রধান চিহ্ন ঊর্দ্ধ পুণ্ড্রাদি ধারণ করিতে আমাদের বিশেষ আপত্তি ও লজ্জা হইয়া থাকে। আমরা অস্পৃশ্য কুক্কুরকে স্নান করাইয়া কোলে করিয়া পালন করিতে পারি, কিন্তু যে গাভী হইতে সংসারে অশেষ উপকার হইতেছে, যাহার স্তন্য পান করিয়া এদেহ পরিপুষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, যে গাভী যাগযজ্ঞাদি রক্ষার উপায়,—সেই একান্ত পূজ্যা, অবশ্যপালনীয়া, মাতৃস্থানীয়া নিজের গাভিটী অনাহারে মৃতপ্রায় হইলেও তাহার মুখের নিকট একমুষ্টি তৃণ প্রদান করিতে আমাদের লজ্জা হয় ও উহা নিতান্ত হেয়কর্ম্ম মনে করি। এইরূপে উদরান্নসংস্থানের জন্য বিবিধ হীনবৃত্তি অবলম্বন উপলক্ষে আর্য্যাচারহীন সংসর্গে আমরা বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানে শিথিলপ্রযত্ন হইয়া ক্রমে এতদূর ব্যভিচারী হইয়াছি। পুরাকালে রাজন্যবর্গ ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালন ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতেন, সুতরাং উদরান্নের চিন্তা না থাকায়, ব্রাহ্মণগণও যজনাদি ষট্‌কর্ম্ম, নিত্য পঞ্চযজ্ঞ এবং যথারীতি বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। আমাদের ভারতের রাজন্যবর্গ এখন আর ব্রাহ্মণপালক নহেন, পরন্তু ব্রাহ্মণপীড়ক হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ রাজা, মহারাজ প্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর বাজেয়াপ্তপূর্ব্বক ষ্টেটের

আয়বৃদ্ধি করিয়া, স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিয়া থাকেন। আর সেই বিত্তবিহীন নিরন্ন ব্রাহ্মণগণের হাহাকারাগ্নিতে নিজবংশকে অজ্ঞাতসারে আহুতি দিয়া পোষ্যপুত্র গ্রহণে বংশ রক্ষার চেষ্টা করেন। এইরূপ নানাকারণে ব্রাহ্মণগণ নিরন্ন হওয়ায় উদরান্ন সংস্থাপনের জন্য স্বীয় সাত্ত্বিক বৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষি বাণিজ্য, ওকালতী ও মোক্তারী দোকানদারি, কেরাণীগিরি, দফাদারী, দৌত্য প্রভৃতি হীনবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইতেছেন, আর তাহারই ফলে আমাদের এই অধঃপতন। তাই কেহ কেহ বিদ্বেষ-প্রণোদিত হইয়া বলিয়া থাকেন যে এখন আর ব্রাহ্মণ কে আছে? ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী, কেহ বৈশ্য, কেহ শূদ্র, কেহ ম্লেচ্ছ কেহ বা চণ্ডালধর্ম্মী হইয়া রহিয়াছেন। ইহাদের কাহাকে রক্ষা করিলে ব্রাহ্মণ রক্ষা করা হইবে? আমরা ইহার প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছুক নহি। তবে এইমাত্র বলিতে চাই যে, ব্রাহ্মণগণ বিবিধ হীনবৃত্তি অবলম্বন করিলেও ব্রাহ্মণ রক্ষা অসম্ভব নহে। আর এখনই যে কেবল ব্রাহ্মণ এইরূপ হীনবৃত্ত হইয়াছেন, পূর্ব্বে ছিলেন না, এমত নহে। অত্রিসংহিতায় দশপ্রকার ব্রাহ্মণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

"দেবোমুনির্দ্বিজোরাজা বৈশ্যঃশূদ্রোনিষাদকঃ।
পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥"

পুরাকালে দেবমুনিদ্বিজধর্ম্মী শুদ্ধসত্ত্ব এবং বৈশ্য-শূদ্র ম্লেচ্ছ ও চণ্ডালধর্ম্মী কদাচারী সকল-প্রকার ব্রাহ্মণই ছিলেন। তবে কথা এই যে পুরাকালে দেব-দ্বিজ-মুনিধর্ম্মী ব্রাহ্মণের সংখ্যা অত্যধিক এবং পশুম্লেচ্ছচণ্ডালধর্ম্মী ব্রাহ্মণের সংখ্যা সমাজে অত্যল্প ছিল; এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্য-শূদ্রধর্ম্মী ব্রাহ্মণগণও সদাচারসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু আজকাল পশু-ম্লেচ্ছ-চণ্ডালধর্ম্মী সাদাচার-বর্জ্জিত ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অত্যধিক, কিন্তু তাই বলিয়া দেবমুনিদ্বিজধর্ম্মী ব্রাহ্মণের এখনও অভাব হয় নাই, সংসর্গদোষে কিছু বিকৃত হইলেও দ্বিজধর্ম্মী ব্রাহ্মণ প্রত্যেক সমাজেই এখনও বর্ত্তমান। সদাচারই সমাজ-সংরক্ষণের পরিখাবেষ্টিত প্রাচীর, এখন আর আমরা সেই পরিখার অন্তর্বর্ত্তী নহি; শিক্ষা ও সঙ্গদোষে তাহার বাহির হইয়া পড়িয়াছি, তাই আজ আমাদের হিন্দু-সমাজের এই দুর্দ্দশা।

আমরা বিধিবিহিত যজন-যাজনাদি পরিত্যাগ করিয়া "প্রতিগ্রহ" মাত্রসার হইয়া সর্ব্বদা 'দেহি দেহি' রব করিতেছি এবং সমাজে লাঞ্ছিত ও অবজ্ঞাত হইতেছি। ব্রাহ্মণগণ আর ভূদেবস্বরূপে সমাজে পূজ্য বা সেরূপ সম্মানার্হ নহেন, বরং অনেক স্থলে হেয় এবং অবজ্ঞাত। এখন যাত্রাথিয়েটারের প্রহসন বা বীভৎস রসের অভিনয়ের পাত্র ব্রাহ্মণ। আমাদের এই বর্ত্তমান দুরবস্থা দেখিয়া বেদিয়ার বানরের আক্ষেপোক্তিটী মনে পড়ে। বানর বলিয়াছিল—

"কুন্দকে সাগর উতার গেঁই কোই শিখাওয়ে নীত,
কোই উখারে গিরি পেঁড় দরখৎ কোই কিয়া হায় মিত॥
ক্যব কহেঙ্গে সীতানাথকো হাম্‌নে কিয়া চোরি।
ওহি বন্‌ভূমে জনম্ হামারা বেদিয়া খিঁচে ডোরি॥"

যে ব্রাহ্মণের পদরেণুস্পর্শে সর্ব্বাপৎ নিবারিত হয়, সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়, এবং যে ব্রাহ্মণের পদরজঃ অপার ভবসমুদ্রের সেতু (১) আমরা সেই ব্রাহ্মণের বংশজ।

হরিতে অসাধ্য ব্যাধি বৈদ্য নাহি পান বিধি।
সে রোগের ঔষধি কেবল ব্রাহ্মণের পদ-রজঃ।

আমরা যে সেই ব্রাহ্মণের স্থলাভিষিক্ত উত্তরাধিকারী। ইহা আমরা একবারও ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখি না। তাহা ভাবিয়া দেখিলে আর আমরা এমন কদাচারী হইতাম না এবং হিন্দুসমাজও আর এতদূর দুর্দ্দশাগ্রস্ত, এবং এইপ্রকার কদাচার-কলুষিত হইত না। কেন এমন হইলাম? কেন এমন হইল? ব্রাহ্মণের সর্ব্ববিষয়েই এই প্রকার অধঃপতনের কারণ কি? ধীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব, শাস্ত্রবাক্যে অবিশ্বাস এবং শাস্ত্রোক্তবিধানে সংস্কার না হওয়াই ইহার প্রধান কারণ। বস্তুত; দেখিতে গেলে আমরা অনেকেই জাতিগত ব্রাহ্মণত্ব ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিবার যোগ্য নহি, সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে, অতি অল্পস্থলেই শাস্ত্রবিধিমতে বিশুদ্ধভাবে সংস্কার হইয়া থাকে। অধিকাংশ স্থলেই তাহা ঘটে না। এইজন্য দ্বিজত্ব লাভের পর ব্রাহ্মণগণের দ্বিজোচিত সাত্ত্বিকতার এবং বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠানের কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং, আজকাল উপনয়নসংস্কারের পরও প্রকৃত দ্বিজত্ব লাভ ঘটে না। উপনয়ন-সংস্কারই ব্রাহ্মণ্যবিকাশের প্রধান প্রক্রিয়া। উপনয়নব্যাপারে সাবিত্রীগ্রহণে ব্রাহ্মণত্বসূচক তেজস্বিতার উন্মেষ এবং ব্রাহ্মণোচিত সাত্ত্বিক আচারানুষ্ঠানের আরম্ভ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আজকাল অধিকাংশ স্থলেই উপনয়নের পরেও ব্রাহ্মণ্যের উন্মেষণা ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। সুতরাং বলিতে হয় যে, জাতি-ব্রাহ্মণ ভিন্ন সাধারণতঃ আমাদের অন্য পরিচয় দিবার উপায় নাই। কিন্তু এখনও আমাদের সমাজে দেবমুনিদ্বিজ-লক্ষণান্বিত আদর্শ ব্রাহ্মণের একবারে অভাব হয় নাই, এখনও সদাচারপরায়ণ, বেদবেদান্তপারদর্শী, ষট্‌কর্ম্মনিরত, ঋষিকল্প ব্রাহ্মণ হিন্দুসমাজ অলঙ্কৃত করিতেছেন। এখনও শ্রুতিস্মৃতির অনুশাসন সমাজ হইতে রহিত হইয়া যায় নাই। সুতরাং শাস্ত্রবিহিত বিশুদ্ধভাবে উপনয়ন-সংস্কারের অভাবের কোনও কারণ দেখা যায় না। শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস ও অধিকারী করিতে হইলে যথাশাস্ত্র বিশুদ্ধভাবে সংস্কার সকল পর পর সমাজে প্রবর্ত্তিত করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। মনু বলিয়াছেন, "নিষেকাদি শ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতোবিধিঃ। তস্য শাস্ত্রে-ঽধিকারোঽস্মিন্ জ্ঞেয়ো নান্যস্য কস্য চিৎ) গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া পর্য্যন্ত

(১) বিপদ্‌ঘনধ্বান্ত-সহস্রভানবঃ।
সমীহিতার্থার্পণ-কামধেনবঃ॥
অপারসংসারসমুদ্রসেতবঃ।
পুণাতু মাং ব্রাহ্মণপাদরেণবঃ॥

যাহার যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় সেই শাস্ত্র পাঠের অধিকারী, অন্য কাহারও শাস্ত্রে অধিকার হইতে পারে না, ইহার দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় সংস্কারাদি মরণান্ত অনুষ্ঠানের দ্বারা অন্তঃকরণে স্বাত্ত্বিকভাব প্রস্ফুরিত হয়, বুদ্ধি নির্ম্মল হয়, বুদ্ধি নির্ম্মল হইলেই শাস্ত্রে বিশ্বাস এবং অধিকার হইয়া থাকে, শাস্ত্রবিশ্বাসী হইলে দ্বিজগণ উপনয়ন-সংস্কারলব্ধ গায়ত্রীর মর্ম্মার্থ সম্যক অবগত হইয়া যথাবিধি সন্ধ্যোপাসনা ও ধর্ম্মপরায়ণ হয়েন এবং যাহাতে শৌচ, সদাচার, সত্যনিষ্ঠা, খাদ্যাখাদ্য ও স্পৃশ্যাস্পৃশ্য জ্ঞান সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই চেষ্টা এক্ষণে ব্রাহ্মণসভার সর্ব্বথা করণীয়। সদাচারী ব্রাহ্মণ সন্ধ্যোপাসনা-পরায়ণ হইলেই ক্রমে আবার দ্বিজোচিত প্রতিভা প্রকাশ হইবে সন্দেহ নাই, মনু বলেন।—

"সাবিত্রীমাত্রসারোঽপি বরংবিপ্রঃ সযন্ত্রিতঃ"

অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ না হইয়া সত্য, শৌচ সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ যদি কেবল গায়ত্রী-মাত্র সার করেন, তাহা হইলেও তিনি ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইবেন। যথাবিধি সন্ধ্যোপাসনাই ব্রাহ্মণ্য-বিকাশের প্রথম উপায়।

"সন্ধ্যামুপাসতে যে তু নিয়তং সংশিতব্রতাঃ।
বিধৌতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ং॥"

শাস্ত্রবিশ্বাস ও সত্যসদাচারসহ যথাবিধি সন্ধ্যাগায়ত্রীপরায়ণ হইলেই ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া থাকেন এবং দেহান্তে ব্রহ্মলোক গমন করিতে পারেন। কেবল সন্ধ্যা-গায়ত্রীর প্রকৃত জ্ঞান ও তাহার যথাবিধি অনুষ্ঠান হইতেই, ব্রাহ্মণ নিজের অন্য হইতে বিশিষ্টত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এই বিশিষ্টত্ব হইতেই খাদ্যাখাদ্য স্পৃশ্যাস্পৃশ্য জ্ঞান এবং শৌচ, সদাচারের উপকারিতা বোধ জন্মে এবং ক্রমে শম-দম-তপঃশৌচক্ষান্তি আর্জ্জব জ্ঞান-বিজ্ঞান আস্তিক্যাদি স্বাভাবিক গুণ লাভ করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণ-পদবীতে অধিরূঢ় হওয়া যায়। সর্ব্বমঙ্গলময় গো-ব্রাহ্মণহিতকারী বাসুদেবচরণে প্রার্থনা এই যে এই সকল ব্রাহ্মণসভার প্রতিষ্ঠার ফলে পতনোন্মুখ ব্রাহ্মণ-সমাজ যেন আবার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

উপসংহারে বক্তব্য এই সকল ব্রাহ্মণসভায় যাহাতে হিন্দুসমাজের শাসনশৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা হয় তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। এতদর্থে প্রত্যেক থানার অধীন সমস্ত ব্রাহ্মণ-সভার প্রতিনিধি লইয়া একটী প্রেসিডেণ্ট সভা, সকল প্রেসিডেণ্ট সভার প্রতিনিধি লইয়া প্রত্যেক মহকুমায় একটী বিভাগীয় সভা এবং সকল বিভাগীয় সভার প্রতিনিধি লইয়া প্রত্যেক জেলায় একটী কেন্দ্র সভা প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক, এবং এক থানার অধীন সমস্ত ব্রাহ্মণসভার বিচার ব্যবস্থার ভার প্রেসিডেণ্ট সভা, এক মহকুমার অন্তর্গত সমস্ত প্রেসিডেণ্ট সভার বিচার ব্যবস্থার ভার বিভাগীয় সভা এবং এক জেলার অধীন সমস্ত বিভাগীয় সভার বিচার ব্যবস্থার ভার কেন্দ্রসভা গ্রহণ করিয়া যাহাতে হিন্দুসমাজের স্বেচ্ছাচার কদাচার দূরীভূত হয় এবং সমাজের সকলে তত্তৎসভার ব্যবস্থা মানিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ হয়, তাহার

ব্যবস্থা হওয়া উচিত। নচেৎ এরূপ সরাসরিভাবে সভাস্থাপনে সমাজের প্রকৃত উন্নতি ও উপকার হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান সময়ে কেন্দ্র বঙ্গীয়ব্রাহ্মণসভার নিকট আমাদের এই নিবেদন বঙ্গীয়ব্রাহ্মণসভা যখন জাতীয় উন্নতিকল্পে এতটা অগ্রসর হইয়াছেন, তখন আমাদের এই চিন্তা একদিন সফল হইবে বলিয়া ভরসা হয়।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরঞ্জন।

পঞ্চতত্ত্ব সাধনার শাস্ত্রীয় সমাধান।

ধর্ম্মপ্রাণ সদাচারী অনেক বর্ণাশ্রমী হিন্দুর মনে স্বতই উদিত হয়, দেবদেব মহাদেব পরমপবিত্র তন্ত্রশাস্ত্রে দ্বিবিধ অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়ভাবে পঞ্চতত্ত্ব সাধনার পদ্ধতি-প্রক্রিয়ার বিধিব্যবস্থা কেন করিয়াছেন? মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা, মৈথুন এবং পরকীয়া রমণী প্রভৃতির সহিত স্বামী ও স্ত্রীর ব্যবহারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন দ্বারা স্থূলভাবে পঞ্চতত্ত্ব সাধনা; আর অপর দিকে বিষয়জ্ঞান-পরিশূন্য ব্রহ্মানন্দ জ্ঞান, সদসৎ কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম, অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ এবং ষট্‌চক্রের সাহচর্য্যে কমলকর্ণিকান্তর্গত পরম শিবসহ কুণ্ডলিনীশক্তির সংযোগ—সূক্ষ্মভাবে পঞ্চতত্ত্ব সাধনা। সৎ, অসৎ, পবিত্র, অপবিত্র, অমৃত, গরল, সুনীতি দুর্নীতি একাধারে এবম্বিধ ভাববৈপরীত্য কেন তন্ত্র মধ্যে দেদীপ্যমান? একাধারে দেখিতে পাই, তন্ত্রোক্ত বীজগুলি নাদবিন্দুপরিসমাপ্ত প্রণব লইয়া পরিপুষ্ট, প্রণবতত্ত্বের ব্যাখ্যান, নিখিল-তত্ত্বের সারতত্ত্ব তন্ত্রে প্রকটিত, প্রকৃতির বিশাল বিচিত্র বিশ্বভাণ্ডারের সমুজ্জ্বল মহার্হ রত্নরাশি তন্ত্রমধ্যে নিহিত, শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শনবিধৌত যজ্ঞতত্ত্ব বিষ্ণুপাদবিনিঃসৃতা ভাগীরথীর ন্যায় জগৎ ও জীবতত্ত্বে উদ্ভাবিত হইয়া তান্ত্রিক অন্তর্য্যজনপর্য্যবসিত সাগরসঙ্গমের শোভায় সর্ব্বতোভাবে পরিশোভিত, হইয়া বেদান্ত-মুকুলিততত্ত্বকণিকা তন্ত্রশাস্ত্রে বিকাশলাভ করিয়াছে। সাংখ্যোক্ত যোগ প্রকৃতি ও পুরুষ, শিব ও শক্তির সহিত জীবতত্ত্বের ঐক্যভাব সম্যকভাবে বিবৃত, সাংখ্যের অতি দুর্ব্বোধ তত্ত্বনিচয় সমুজ্জ্বলভাবে বিকশিত বেদোক্ত যোগ, সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব, সাকার-নিরাকার রহস্য, ভৈষজ্যতত্ত্ব, তন্ত্রে পরিস্ফুটভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। স্থূলপঞ্চতত্ত্ব-সাধনার প্রক্রিয়া মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা মৈথুন, যাহা পশুপক্ষী মনুষ্যাদির সাধারণ নৈসর্গিক কর্ম্মমধ্যে পরিগণিত।

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং ॥

ইহা উপাসনার অঙ্গ বলিয়া সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ অনাদিনাথ ভূতভাবন মহামহেশ্বর পরম পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্র তন্ত্রে পরিগ্রহণ করিয়াছেন। একদিকে গভীর গবেষণাপূর্ণ সারগর্ভ তত্ত্বনিচয়ের প্রকরণ-পদ্ধতি বিজ্ঞানের চরমতত্ত্ব, অসাধারণ জ্ঞান, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অভিব্যক্তি, অন্য দিকে কদর্য্য কুক্রিয়ার প্রশ্রয় প্রদান, নৈতিক নীতির, শৌচ সদাচারের যম ও নিয়মের মূলোৎপাটন, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সমাজ-শক্তির বিশৃঙ্খলা সম্পাদনে তাহার অধঃপতন ও ধ্বংসের সূত্রপাত করিয়া পবিত্র তন্ত্রশাস্ত্রের উজ্জল মহিমায় দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা অনুলেপন করিয়াছেন। এ ঘোর কৌতুকাবহ প্রহেলিকার উদ্দেশ্য ও সমাধান অবশ্যই ফল্গুগঙ্গার ন্যায় তন্ত্রশাস্ত্র মধ্যে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

কলৌ পাপসমাচারা ভবিষ্যন্তি জনাঃপ্রিয়ে।
কলৌ নাম্ভবিধানেন কলাবাগমসম্মতাঃ॥

কলিকালে ব্রাহ্মণেতর নিম্ন শ্রেণীর মনুষ্যকে অধ্যাত্ম তত্ত্বে উন্নীত করিয়া সাধনমার্গের পথিক করিবার অভিপ্রায়ে তন্ত্রকার দেবদেব মহাদেব কৌশলে তন্ত্র মধ্যে এইভাবে সূচনা ও প্রবর্ত্তনা প্রকটন করিয়াছেন।

পন্থানো বহবঃ প্রোক্তা মন্ত্রশাস্ত্রে মনীষিভিঃ।
স্বগুরোর্মতমাশ্রিত্য শুভংকার্য্যং ন চান্যথা॥

পরমকারুণিক সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীভগবানের অবিদিত নহে যে পার্থিব প্রধান, আপ্য প্রধান, তৈজসপ্রধান, বাতপ্রধান, নভঃপ্রধান মনুষ্যগণ যথাক্রমে মদ্য, মাংস, মৎস্য মুদ্রা এবং মৈথুনপ্রিয়। এই সকল নিম্ন অধিকারের মনুষ্যদিগকে ইহাদের প্রকৃতির প্রতিকূলে পরিচালনা করিবার বিধিব্যবস্থা তন্ত্রশাস্ত্রানুমোদিত হইলে, এই সকল অধিকারের মনুষ্যগণ সৎ, ন্যায়, নীতি ও ধর্ম্মপথে প্রধাবিত হইতে না পারিয়া ইহকালে কর্ম্মভ্রষ্ট ও অধঃপতিত হইয়া পরকালে ঘোর নরকার্ণবে আপতিত হইত, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। প্রকৃতির প্রতিকূলে উত্থান, প্রকৃতির প্রতিকূলে সমর করিয়া জয়াশা ইহাদের পক্ষে আকাশ-কুসুমবৎ অলীক ও অসম্ভব। দয়াময় শ্রীভগবান এই সকল অধিকারীর কল্যাণ-কামনায়, কেবল ঐ সকল অধিকারীর প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও রুচির প্রতিপোষক ইন্দ্রিয়ভোগ্য, সাধনাচরিতার্থের হেতু মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন এই বস্তু পঞ্চকই তাহাদের পক্ষে সাধনার আদি বলিয়া শাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত করিয়াছে। এই নিম্ন অধিকারের মনুষ্যগণ রজস্তমঃ-প্রধান প্রকৃতির। ঐ প্রকৃতির মনুষ্যের শ্লেষ্মা অত্যধিক। ইহাদের দেহে শ্লেষ্মাধিক্য হেতু কুণ্ডলিনী-শক্তির আধার শ্লেষ্মাভিভূত হয়। এই আধার শ্লেষ্মাভিভূত হইলে কুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগ্রৎ রাখিবার উপায় নাই। সুষুম্নাপরিষ্কারের বিভিন্ন প্রক্রিয়া-পদ্ধতির অবশ্যই তন্ত্র এবং যোগ শাস্ত্রাদিতে সবিশেষ উল্লেখ আছে। ঐ সকল প্রক্রিয়া দ্বারা নিম্নাধি-কারীর শ্লেষ্মাধিক্যের নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত সুষুম্নাপরিষ্কার সুখসাধ্য নহে। আয়ুর্ব্বেদ

বলেন অল্পমাত্রায় মদ্যপান করিলে অল্পদিনের মধ্যে দেহের শ্লেষ্মাধিক্য নাশ হয়। জীবের দেহে সত্ত্বগুণ—পিত্ত, রজঃ বাত এবং তমঃ শ্লেষ্মারূপে পরিণত। শ্লেষ্মার নাশহেতু 'ঔষধার্থং সুরাং পিবেং' এই অভিপ্রায়ে রোগ প্রতিকার না হওয়া পর্য্যন্ত কিছু দিবস ধরিয়া অল্পমাত্রায় সুরাপানের সহিত ভগবদুপাসনার ব্যবস্থা শাস্ত্রে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই শ্লেষ্মাপ্রপীড়িত রোগীর শ্লেষ্মাপ্রতিকারের অভিপ্রায়ে ভগবৎসাধনার সংস্রবে সুরার সাহচর্য্যের সূচনা। এই বিধানব্যবস্থা ইন্দ্রিয়াসক্ত বহির্ম্মুখ জনগণের পরম প্রিয়। ঐ জনগণ ভোগসুখে তন্ময় হইয়া পুনর্ব্বার প্রবৃত্তির পরিপুষ্টি সাধন করিয়া অধ্যাত্মতত্ত্বে উন্নীত হইতে অকৃতকার্য্য হয়েন, এই ভাবিয়া সর্ব্বকালজ্ঞ মহাপুরুষ তন্ত্রবক্তা অনাদিদেব নিবৃত্তিমার্গের প্রতিষ্ঠা ও ফলাধিক্য প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং জীবগণকে তৎপরতার সহিত রোগপ্রতিকার দ্বারা রোগমুক্ত হইয়া নিবৃত্তিমার্গে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ শাস্ত্রাদিতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ভোগাসক্ত নরনারীকে ভোগসুখে নিয়োজিত করিয়া তজ্জনিত ভোগসুখে বৈরাগ্য বা বিরক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যই এই সাধনার প্রবর্ত্তনা। ভগবান মনুও সেই অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন—

> ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
> প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা ॥

ভোগসুখ তন্ময় হইয়া তাহা অবিরাম গতিতে অপ্রতিহতভাবে উপভোগ করিতে থাকিলে ঐ গতির পুনরাবর্ত্তন ঘটিতে পায় না। ভোগানুরাগ প্রজ্জলিত অগ্নিতে ঘৃতনিষেকের ন্যায় ক্রমে অধিকতর প্রবল ও প্রদীপ্ত হইয়া 'নিবৃত্তিস্তু মহাফলা' এই মহামন্ত্রসাধনার অনিবার্য্য বাধা ও বিঘ্ন সমুদিত করে। তামসিক প্রকৃতির নরনারী তাহাদের প্রবৃত্ত্যনুরূপ ভগবদুপাসনার পথে অগ্রসর হইবার অভিপ্রায়ে বিধিকে রক্ষা করিতে না পারিয়া অবিধির নিকট আত্মসমর্পণ করে। উহাদের ভবিষ্যৎ বিপৎপাত হইতে রক্ষাহেতু মহারাজ যযাতির অতৃপ্তকামনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ সাক্ষিস্বরূপে শাস্ত্রে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

> ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥
>
> মহাভারত।

এই জন্য ক্ষণিক রোগপ্রতিকার হেতু ব্রাহ্মণেতর নিম্নাধিকারী জীবের জন্য স্থূল পঞ্চতত্ত্ব সাধনার শাস্ত্রীয় বিধান। উচ্চাধিকারী ব্রাহ্মণের জন্য কালভেদে সূক্ষ্ম পঞ্চতত্ত্ব সাধনার বিধান আছে। দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবের অবিদিত নহে যে কালমাহাত্ম্যে অমানিশার অন্ধতামসে ব্রাহ্মণগণের অদৃষ্টাকাশ সমাচ্ছন্ন হইবে। হিন্দুসমাজরূপ ঘটিকাযন্ত্রের মূলযন্ত্র ব্রহ্মণ্যশক্তি অব্যাহত থাকিবে না। কলির কালধর্ম্মবশে ব্রহ্মণ্য মৃতপ্রায় হইয়া দৃষ্টি ক্ষীণ, নাড়ী হীন হইবে। কিন্তু শ্রীভগবানের ইহাও অবিদিত নহে

যে ব্রাহ্মণের বংশবীজে কেমন একটু বিচিত্র বিশিষ্টতা, কেমন একটু অনন্যসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তিরহস্ত নিহিত আছে। জন্মান্তরীণ পুণ্যকর্ম্মপ্রভাবে অধিক পরিমাণে ঐশ্বরিক ভাব সঞ্চয় করিয়া ঐ শক্তিসহকারে ব্রাহ্মণের জন্ম। জন্মগত ব্রাহ্মণ্যশক্তির সাধনার ও শিক্ষার অভাবে শোচনীয় অবনতি সংঘটিত হইয়া থাকিলেও অল্প আয়াসে সাধনা ও শিক্ষার ফলে ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকলাপদ্বারা ব্রাহ্মণ্যশক্তি ক্রমে বর্দ্ধিত হইবে। ব্রাহ্মণের ধমনীতে ঋষিগণের রক্ত প্রবাহিত, তাঁহাদের ভাব ও শক্তি ব্রাহ্মণের চিত্তে বিকাশ না থাকিলেও অতি সূক্ষ্মাবস্থাতে অন্তর্নিহিত থাকিবেই থাকিবে। সুতরাং অল্প আয়াসে সহজ চেষ্টাতে ঐ অন্তর্নিহিত শক্তি পুনরায় জাগরিত হইবে। বেদাধিকারী সেই ব্রাহ্মণের পক্ষে কালভেদে বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার সাধনা শেষ করিয়া বামাচারে সূক্ষ্ম পঞ্চতত্ত্বের সূচনা হইতে সিদ্ধান্তাচারে, কৌলাচারে সাধনার সিদ্ধি দ্বারা সাক্ষাৎ শিবস্বরূপে কৌল বা যোগিরূপে অভিহিত হয়েন। এ সাধনাতে মদ্য মাংসের প্রয়োজন নাই বলিয়া কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষে এই উচ্চ সাধনার বিধান। তন্ত্রে ব্রাহ্মণের পক্ষে মদ্যপান নিষিদ্ধ, এই বিষয়ে বহুল প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণদিগের মদ্যমাংস সহযোগে ভগবদুপাসনার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া অনেক বর্ণাশ্রমী সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণগণকে নিদারুণ মর্ম্মযাতনা সহ্য করিতে হয়। যাহারা অভিষেকের দোহাই দিয়া সুরাপানে আসক্ত, পরকালে তাহাদের নরকযন্ত্রণা অবশ্যম্ভাবী। ব্রাহ্মণের পক্ষে, বিশেষতঃ কলিকালে, মদ্যপান এবং এই কলিকালে মদ্যশোধন তন্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কালীবিলাস তন্ত্র, কালীতন্ত্র, মুণ্ডমালাতন্ত্র, রুদ্রযামল, কৈবল্যতন্ত্র, কৈলাসতন্ত্র কুলার্ণবতন্ত্র, কুলামৃততন্ত্র, কুব্জিকাতন্ত্র, বারাহীতন্ত্র, প্রভৃতি তন্ত্র শাস্ত্রে এ বিষয়ক বহুল প্রমাণ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কলিকালে শতবর্ষ-ব্যাপী আয়ু লইয়া ব্রাহ্মণেরা তন্ত্রোক্ত আচার সাধনা করিয়া বীর ও দিব্যভাবে সূক্ষ্ম পঞ্চতত্ত্ব সাধনার প্রভাবে কৌল বা যোগী—স্বরূপে অভিহিত হইতে পারিবেন না বলিয়া মহাযোগী মহেশ্বর কলিকালে দিব্য ও বীরভাবের উপাসনা নিষেধ করিয়াছেন।

দিব্যবীরময়োভাবঃ কলৌ নাস্তি কদাচন।
কেবলং পশুভাবেন মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্॥

কালীবিলাস তন্ত্র।

কলিকালে বামাচার, সিদ্ধান্তাচার, ও কৌলাচার বীর ও দিব্যভাবে সাধনার ব্যবস্থা রহিত করিয়া কেবল পশ্বাচার মতে বেদাচার, বৈষ্ণবাচার শৈবাচার এবং দক্ষিণাচার সাধনায় মুক্তি গতি বিধানের জন্য অধিকারভেদে নিম্ন ও উচ্চ এতদুভয় অধিকারীর পক্ষে দ্বিবিধ পশ্বাচার সাধনায় মন্ত্র সিদ্ধির ব্যবস্থা শাস্ত্রে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চাপরজাতিভিঃ।
পশুভাবেন কর্ত্তব্যং কলৌ চ জপপূজনম॥

দিব্যবীরমতং নাস্তি কলিকালে সুলোচনে।
কলৌ পশুমতং শাস্ত্রমতঃ সিদ্ধেশ্বরো ভবেৎ ॥

রুদ্রযামল ১ঃ পটল।

শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিন্দুসমাজে পণপ্রথা (বিবাহ ব্যবসায়)

পুরুষ ও প্রকৃতি মঙ্গলময় বিশ্বনিয়ন্তার দ্বিবিধ সৃষ্টি এবং এই সংসারক্ষারিধির দুইটী অমূল্য রত্ন। ইহাদের পরস্পরের মিলনের ফলেই প্রজাপুঞ্জের উৎপত্তি ও পৃথিবি ব অস্তিত্ব। নতুবা এই অসংখ্য মানবপরিপূর্ণা মুখরিতা পৃথিবী জনমানবহীন সুবিশাল মরুভূমিতে পরিণত হইত। ইহাদের উভয়ের অস্তিত্ব নিবন্ধনই পৃথিবী এখনও জীবিত ও জাগরূক। বস্তুতঃ ইহাদেব একটীও অবহেলার সামগ্রী নহে। পরন্তু উভয়েই সমআদরণীয়। কিন্তু অধুনা কালধর্ম্মে অর্থগৃধ্নু দুর্নীতিপরায়ণ হিন্দুসমাজের নৃশংস ব্যবহারে ইহার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সংসারতরুর দুইটী অমৃতময় ফল—পুত্র ও কন্যা—এখন আর তেমন সমান স্নেহের চক্ষে দৃষ্ট হয় না। পুত্রজন্মগ্রহণের পর হইতেই জনকজননী তদ্দ্বারা "বিবাহ ব্যবসায়" করিয়া যৌতুকস্বরূপ প্রভূত অর্থ সংগ্রহের কল্পনা করিয়া থাকেন এবং বিবিধ সুখস্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। কিন্তু কন্যার জন্মবার্ত্তা কর্ণকুহরে প্রবেশ করা মাত্র যেন শত বজ্রাঘাত হয়; অথবা সহস্র বৃশ্চিক যেন যুগপৎ দংশন করিতে থাকে। কন্যার জন্মমুহূর্ত্ত হইতেই জনকজননী কি যেন এক অবশ্যম্ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন। ভাবী চিতানলের গগনস্পর্শী লেলীহান জিহ্বা তাঁহাদের মানসপটে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া ব্যাকুল করিয়া তুলে। কদাপি স্নেহবশতঃ তাঁহারা নবজাত কন্যার সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কুসুমসদৃশ কোমল বদন চুম্বন অভিলাষী হইলেও ভাবী নিগ্রহের মর্ম্মান্তিক চিত্র মানসপটে উদিত হইয়া হৃদয়ের স্নেহপ্রস্রবণরন্ধ্র আবদ্ধ করিতে সচেষ্ট হয়। দুর্ব্বলহৃদয় পিতা ক্ষণকালের জন্য কন্যাকে বক্ষে লইয়া সুশীতল হইবার উদ্দেশ্যে বাহুপ্রসারণ করিলেও পরক্ষণেই ইহাকে কালনাগিনী বোধে হস্ত অপসারণ করিতে উদ্যত হন। হিন্দুসমাজে প্রচলিত জঘন্য পণপ্রথাই আধুনিক এই অস্বাভাবিক অসামঞ্জস্য ও অশান্তির কারণ।

পূর্ব্বকালে হিন্দু সমাজে "ব্রাহ্ম," "আর্য," "দৈব" "প্রাজাপত্য," "আসুর," "গান্ধর্ব্ব" "রাক্ষস"—ও"পৈশাচ"—প্রভৃতি বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে, শক্ত্যানুরূপ অলঙ্কৃতা কন্যা বরকে সম্প্রদান করা "ব্রাহ্ম বিবাহ" নামে অভিহিত; "এই কন্যার সহিত সম্মিলিত হইয়া ধর্ম্মাচরণ কর" এই নিয়ম পূর্ব্বক কন্যাসম্প্রদানের নাম প্রাজাপত্য বিবাহ; এবং পণগ্রহণ

পূর্ব্বক কন্যাদানের নাম "আসুর বিবাহ"। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ প্রচলিত বিবাহপ্রথায় কি আখ্যা হইতে পারে ইহা স্থির করা কঠিন। কন্যার পিতা পণগ্রহণপূর্ব্বক কন্যাসম্প্রদান করিলে সেই বিবাহকে আসুর বিবাহ বলা হইত। কিন্তু বর্ত্তমান সভ্য ও শিক্ষিত সমাজে শক্ত্যতিরিক্ত ধন (পণ) ও অলঙ্কারাদির সহিত কন্যা সম্প্রদান করিতে কন্যার পিতা বাধ্য। শেষোক্তরূপ বিবাহপদ্ধতি পূর্ব্বকালে সম্ভবতঃ প্রচলিত ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। আসুরিক বিবাহের বিপরীত এই বিবাহপদ্ধতির কোনও বিশিষ্ট আখ্যা শাস্ত্রকারগণ দেন নাই। অধুনা বরপক্ষের ইচ্ছানুরূপ ধন বা পণ ও অলঙ্কারাদি সহ যে প্রণালীতে কন্যাসম্প্রদানের পদ্ধতি হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহাকে "ব্রাহ্ম," "আসুর," ও "প্রাজাপত্য" এই তিন প্রণালীর বিবাহের একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণ বলা যাইতে পারে। ইহার প্রকৃত আখ্যা বর্ত্তমান পণ্ডিতমণ্ডলী স্থির করিবেন।

কন্যার বিবাহে সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করিতে বাধ্য হইয়া বহু সম্পন্ন লোক নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে, বহু মধ্যবিত্তলোক ঋণগ্রস্ত হইতেছে, এবং বহু নিঃস্ব লোক কন্যাবিবাহোপযোগী অর্থ সংগ্রহে অসমর্থ হইয়া ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় দেখিতেছে)

২।১ টী স্নেহলতার আত্মহত্যার সংবাদে হিন্দুসমাজ আজও স্তম্ভিত ; কিন্তু রাঢ়ীয় কুলীনদের ঘরে ঘরে বহু অনূঢ়া "স্নেহলতা" জীবন্মৃত অবস্থায় পরার্থে পবিত্র জীবন উৎসর্গ করিয়া আসিতেছে , তাহাদের দীর্ঘ নিশ্বাসে কি সমাজের প্রাণে আঘাত লাগে না ? বর্ত্তমান সময়ে সংবাদপত্রাদিতে পণগ্রহণ বিনা—বিবাহের সংবাদ পাঠ করা যায় বটে ; কিন্তু ২।১টী ব্যতীত ইহারও অধিকাংশের ভিতরে প্রকারান্তরে ব্যয় বাহুল্যের বিস্তর রহস্য শুনা যায়। যাহা হউক ভাল কথার ঝুটাও ভাল"। আজ যাহারা গোপনে বা প্রকারান্তরে পণগ্রহণ করিয়া প্রকাশ্যভাবে সুখ্যাতিলাভের প্রয়াসী, ভবিষ্যতে হয়ত তাহাদের বা তাহাদের দৃষ্টান্তে অন্যের সুমতি হইবে এবং তাহারা সত্য সত্যই বিনাপণে দুকুল হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইবে না।

"স্নেহলতার" ঘটনার ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের কোনও বন্ধুব্যক্তি তাঁহার শিক্ষিত, সুন্দর ও সুস্থকায় পুত্রের বিবাহোপলক্ষে ৪।৫ হাজার টাকার লোভ সংবরণ করিয়া বিনাপণে কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাহার কন্যা-বিবাহে নব্যশিক্ষিত, ইউনিভারসিটীর উপাধিপ্রাপ্ত যুবক যথাসাধ্য চুষিয়া পণাদি আদায় করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। আমাদের সেই বন্ধু ব্যক্তি কন্যাদায়গ্রস্ত হরিবাবু কিরূপ চক্রান্তে শিক্ষাভিমানী নব্য যুবক মুকুন্দের পিতা সনৎবাবুর কুহকজালে আবদ্ধ হইয়া সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয়বাহুল্য করতঃ বিপন্ন হইয়াছেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

সনৎবাবু সরলপ্রকৃতি, সচ্চরিত্র, অব্যবস্থিতচিত্ত, বনিতাভয়কাতর ও একান্ত নিরীহ স্কুল শিক্ষক। তাঁহার গ্রেজুয়েট পুত্র মুকুন্দ গর্ব্বিত, শিক্ষাভিমানী, ক্রীড়াসক্ত হৃদয়শূন্য, অবিবেচক ও অসামাজিক। সনৎবাবুর স্ত্রী চপলা অত্যন্ত মুখরা, অভিমানিনী,

কর্কশভাষিণী, আত্মসর্ব্বস্বা, হৃদয়শূন্যা, লোভপরায়ণা, অশিক্ষিতা এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত স্ত্রীলোক। চপলার প্রতাপে সনৎবাবু সর্ব্বদা শশব্যস্ত। মুকুন্দ তিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডিগ্রিলাভ করিলে পর তাঁহার মা চপলা ধরাকে সরার ন্যায় দেখিতেন। সনৎবাবুর স্কুলের অন্যতম শিক্ষক মণিবাবু অত্যন্ত ধীর, স্থির, গম্ভীর, সংযত-বাক্, সত্যবাদী ও সদ্‌বিবেচক লোক। ইহাঁদের স্কুলের হেডমাষ্টার নিশিবাবু ধীর, গম্ভীর, কৃপণাশয়, সময়সেবী, চতুর বা পলিটিসিয়ান্, বিষকুম্ভ-পয়োমুখ ও সম্মার্জ্জিত অসত্যবাদী।

হরিবাবুর কন্যা জয়ার সহিত মুকুন্দের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া একদা মণিবাবু নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি হরিবাবুকে লিখিলেন,—

"আপনার কন্যার সহিত মুকুন্দের বিবাহের প্রস্তাব ইতিপূর্ব্বে করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান সময়ে ৫।৭ দিন মধ্যে মুকুন্দের ৩টী সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছে, তিনটীই গ্রহণীয় সম্বন্ধ। কিন্তু আপনার সহিত কার্য্য করিবার ইচ্ছা ও আকর্ষণ আমাদের খুব বেশী, ইহা বলাই বাহুল্য। আপনার শেষ কথা না শুনিয়া আমরা অন্য কাহাকেও কোন কথা দিতে পারিতেছি না। অতএব আপনি শীঘ্র একবার এখানে আসিবেন। টাকার সম্বন্ধে নিম্নে লিখিতেছি,— সনৎবাবুর কিছু ধার আছে, তাহার পরিমাণ ৩০০৲, পড়ার খরচ বাবত ৫০০৲ আপনার সুবিধামত মাসে মাসে দিতে পারেন। অলঙ্কার ও অন্যান্য দানসামগ্রী চলনসই মোটা-মুটি হইলেই চলিবে। নিরর্থক বাজে জিনিষের প্রয়োজন নাই। ঘড়ী, চেইন কম মূল্যের হইলেই চলিবে। এতদ্ব্যতীত বিবাহের ব্যয় বাবত যৎকিঞ্চিৎ নগদ দিতে হইবে। ইহা হইতে সনৎবাবু কিছু লাভ করিতে ইচ্ছা করেন না। এ সম্বন্ধে আপনি মুরুব্বি হইয়া যাহাতে কার্য্য সুসম্পন্ন হয় করিবেন। আপনার অভিমত হইলে কন্যাসহ এখানে একবার আসিবেন।" মণিবাবুর এই পত্র পাইয়া হরিবাবু মনে করিলেন পড়ার ব্যয় প্রতিমাসে ২৫৲টাকা হিসাবে দুই বৎসরে দিলেও তত কঠিন নহে; নগদ পণস্বরূপ ৫০০৲ টাকা দিলেই চলিবে; অলঙ্কারও দানসামগ্রী ঘর হইতে সংগৃহীত হইলে একহাজার টাকার মধ্যেই পাশকরা পাত্রের সহিত কন্যা জয়ার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। জয়ার বয়স তখন সবে ১১ বৎসর। যদিচ আরও ৩।৪ বৎসর বিবাহ না দিলে চলিত, তবুও স্বল্প ব্যয়ে সৎপাত্রে কন্যাদানের এমন সুযোগ, হরিবাবু ইহা ত্যাগ করা সঙ্গত মনে করিলেন না। বৈদেশিক যুদ্ধবিগ্রহে পাটের মূল্য হ্রাস হইয়া যাওয়ায়, জমিদার, মহাজন, প্রজা, চাষা, সকলেরই এবার অর্থাভাব; অর্থাদি আদায় বা সংগ্রহের সুযোগ কিছুমাত্র নাই। দেড় হাজার টাকা কোনও প্রকারে সংগ্রহ করিতে পারিবেন এই ভরসায় হরিবাবু কন্যা জয়াকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। সনৎবাবু, মণিবাবু, চপলা প্রভৃতি সকলেই জয়াকে দেখিয়া পছন্দ করিলেন, কেবল মুকুন্দের বন্ধুগণ বলিলেন "বয়স বড়ই কম।" বলা বাহুল্য যে মুকুন্দও জয়াকে দেখিয়াছিলেন। মুকুন্দের মতামত জানিবার জন্য হরিবাবু ২ দিন সময় দিলেন। পিতার একান্ত বাধ্য পুত্র মুকুন্দ বলিলেন "বিবাহ সম্বন্ধে বাবা যেরূপ ইচ্ছা করেন,

তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।" তৃতীয় দিনে মণিবাবু ও নিশিবাবুর সমক্ষে সনৎবাবুর সহিত বিবাহের পাকা কথা হইল। পড়ার খরচ এক বৎসরের ৫০০৲ পাঁচশত টাকা, ঋণ শোধজন্য ৩০০৲, বিবাহের অন্যবিধ সর্ব্বপ্রকার খরচ বাবদ ৬০০৲ মোট ১৪০০৲ সনৎবাবু চাহিলেন। হরিবাবুও ১৪০০৲ টাকায় অগত্যা স্বীকৃত হইয়া পড়ার খরচ বাবত ২ বৎসরের ৬০০৲ এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার ব্যয় বাবত ৬০০৲ টাকার পরিবর্ত্তে ৫০০৲ দিতে চাহিলেন। অলঙ্কার ও দানসামগ্রী সম্বন্ধে হরিবাবুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা হইল, এতদতিরিক্ত একটী ঘড়ী দিবার কথা রহিল। পরদিন মুকুন্দের ইচ্ছানুসারে ঘড়ী চেইনের কথা পুনরুত্থাপিত হইল। পঁচিশ টাকা মূল্যের ঘড়ী ও হরিবাবুর নিজ ব্যবহারে চেইন দেওয়া স্থির হইল। বিবাহ কলিকাতা মোকামে হওয়া সম্বন্ধে বরপক্ষ আগ্রহ প্রকাশ করিলে, হরিবাবু বলিলেন, "কলিকাতায় সুবিধাজনক না হইলে আমার বাড়ীতেই বিবাহের অনুষ্ঠান করিব, এবং পুনরপি বলিতেছি নমস্কারী, অধিবাস, ফুলশয্যার তত্ত্ব, যাতায়াত ব্যয় ও প্রসেশন্ ইত্যাদি যাবতীয় ব্যয় বাবত সর্ব্বসাকুল্যে ৫০০৲ নগদ দিব, তদতিরিক্ত আর কপর্দ্দকের দাবি রহিল না।" নিশিবাবুর জানিতমতে এইভাবে বিবাহের শেষ কথা পূরণ হইয়া গেল এবং কিছু টাকাও নিশিবাবুর হস্তে অগ্রিম দেওয়া হইল। ইহার ২।৩ সপ্তাহ পরে সনৎবাবু এক পত্র লিখিলেন 'নানা কারণে আপনার কন্যার সহিত মুকুন্দের বিবাহ হইবে না। মুকুন্দ এ বিবাহে সম্মত নহে, পাত্রী সুন্দরী নহে, বয়সও কম ইত্যাদি।' ইহাতে হরিবাবু অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া সনৎবাবুকে লিখিলেন, "মুকুন্দ ও তাহার বন্ধুগণ কন্যা পছন্দ করিয়া সম্মতি প্রকাশ করিলে বিবাহ স্থির হইয়াছে এবং আমিও আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট বিবাহের বিষয় ব্যক্ত করিয়াছি। এখন এ কার্য্য না হইলে বড়ই লজ্জা ও অপমানের বিষয়। আপনার শিক্ষাভিমানী পুত্রের পক্ষে এরূপ অব্যবস্থিতচিত্ততা তুচ্ছ বিষয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু আমার নিকট ইহা মৃত্যুবৎ। আপনার পুত্রের সহিত বিবাহ সংঘটিত হওয়া একান্তই অসম্ভব হইলে, তুল্য বিদ্বান্ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ স্থির করিয়া আমাকে রক্ষা করুন।" প্রত্যুত্তরে সনৎবাবু লিখিলেন "অনেক বলিয়া কহিয়া মুকুন্দকে স্বীকার করিয়াছি। এখন বিবাহের অনুষ্ঠান করুন।" ইহার প্রায় ২ মাস পরে সনৎবাবু আদেশ করিলেন "বিবাহ কলিকাতায় হইবে, বাড়ী খরচ বাবত ৬০০৲ চাই, ৫০০৲ টাকায় সঙ্কুলন হইবে না এবং ঘড়ী, চেইন, আংটী জুতা মুকুন্দের পছন্দমত ক্রয় করিবার জন্য নগদ ১৫০৲ অতিরিক্ত দিতে হইবে। মুকুন্দের মা চপলা বলিয়া পাঠাইলেন "পুরাতন অলঙ্কার চলিবে না। নূতন করিয়া এমনভাবে অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে যেন কন্যা বড় হইলেও অলঙ্কার আর ভাঙ্গিতে না হয়।" ঊর্দ্ধসংখ্যা ১৫০০৲ টাকায় কার্য্য সম্পাদন হইবে, ইহা হরিবাবু প্রথমে সরলভাবে বিশ্বাস করিয়া ছিলেন; কিন্তু নূতন নূতন আবদার, আদেশ ও ফরমাইসে দ্বিগুণ টাকা খরচের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। প্রকৃত পক্ষেও তাহাই ঘটিল। প্রাপ্য টাকা প্রজা ও অধমর্ণ হইতে আদায়

করিতে না পারিয়া বসত গ্রামের অংশ বিক্রয় করতঃ আরব্ধ কার্য্য সম্পাদন করিতে হরিবাবু বাধ্য হইলেন। ইহাতেও মুকুন্দ বা তাহার মা সন্তুষ্ট হইলেন না এবং বালিকাবধূকে পিত্রালয়ে ছাড়িয়া না দিয়া হরিবাবুকে শিক্ষা দিবেন উভয়ে স্থির করিলেন। যাহা হউক, মণি ও নিশি-বাবুর চেষ্টায় নববধূকে অল্পদিনের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ইহার পর জয়া পিত্রালয়ে মুকুন্দের নিম্নলিখিত পত্রখানি পাইলেন—"আজ বিধাতার নির্ব্বন্ধে তুমি আমাদের পরিবারভুক্ত হইয়া পড়িয়াছ, অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, তোমাকে আমাব উপর জোর করিয়া চাপিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ বিবাহে আমার জীবনে এক ভীষণ অশান্তি ও বিতৃষ্ণা উপস্থিত করিয়াছে। এ বিবাহে হঠাৎ সম্মত হইয়া ভ্রম করিয়াছি, ইহাতে আমার জীবনে একটা শেল বিদ্ধ হইয়াছে। লোকচক্ষে ও সমাজের হিসাবে তোমার পিতামাতা আমার গুরুজন হইলেও, হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে আমি তাঁহাদিগকে ঘৃণা করি। এ বিবাহে তোমার পিতা যেরূপ শঠতা করিয়াছেন এবং যেরূপ নীচ ও হীন ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে বিবাহ অগ্রাহ্য করা উচিত। বাবার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য এ অবাঞ্ছনীয় বিবাহে সম্মত হইয়াছিলাম। তোমার আত্মীয় স্বজনের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, সম্বন্ধ রাখিতেও আমি ঘৃণা .বাধ করি। অভদ্রের সহিত অভদ্রোচিত ব্যবহার করাই উচিত ছিল। যাহা হউক, ইচ্ছা হইলে তোমার পিতামাতাকে এই পত্রখানি দেখাইতে পার।"

এই পত্রখানি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও বালিকা জয়া সহজে ভাবগ্রহণ করিতে পারিল না। পত্রের মর্ম্ম ধারণা করিতে পারিলেও প্রথমে বিশ্বাস করিতে সরলপ্রকৃতি জয়ার প্রবৃত্তি হইল না। এই পত্রপাঠের পর হইতে অদ্যাপি জয়ার মুখে আর বালিকাসুলভ হাসি নাই। ঘোর অপরাধিনী বা কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় গালে হাত দিয়া ম্রিয়মাণা জয়া অনেক সময় নীরবে নির্জ্জন স্থানে বসিয়া থাকিত। এই পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া জয়ার পিতা মাতার অবস্থা কিরূপ হইল, তাহা সহৃদয় পাঠক সহজেই ধারণা করিতে পারেন। এখানে বলা বাহুল্য যে সনৎবাবু ও চপলার অন্যায় ও অসাময়িক অর্থের দাবিসম্বন্ধে নিশিবাবুর নিকট সুবিচার না পাইয়া বিপন্ন হরিবাবু যথাসাধ্য তাহাদের মনস্তুষ্টি করিতে ত্রুটি করেন নাই, তবুও চপলা ও মুকুন্দ নিরপরাধী হরিবাবুকে শঠ, প্রপঞ্চক ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করিতে ছাড়েন নাই।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে জয়াকে স্বামিগৃহে পাঠাইবার জন্য সনৎবাবু পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতে লাগিলেন। বন্ধু বান্ধবগণ মধ্যে অনেকে হরিবাবুকে অনেকপ্রকার পরামর্শ দিতে লাগিলেনঃ—"বাঘের হাতে মেষশাবককে সমর্পণ করিও না, জীবিতাবস্থায় জয়াকে যমালয়ে পাঠাইবার দরকার নাই, অনেক কুলীন কন্যা অবিবাহিতা অবস্থায় যাবজ্জীবন পিতৃগৃহে বাস করিয়া থাকে, জয়াকে সেইরূপ অবিবাহিতা অথবা বিধবা মনে করিও। নিজের ঘরেই রাখ" ইত্যাদি। হরিবাবু বলিলেন "অভিশাপগ্রস্ত না হইলে কন্যার পিতা হয় না; পূর্ব্বকালে গঙ্গাসাগরে কন্যা উৎসর্গ করা হইত; আমি না হয় রাক্ষসকবলে জয়াকে সমর্পণ করিব।" মনকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া হরিবাবু জয়াকে পতিগৃহে পাঠাইলেন, ইহার পর জয়ার নামে

বহু পত্র দিয়াও উত্তর পাওয়া যায় নাই। বহুদিনের পরে জয়ার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কলিকাতা ছাত্রনিবাস হইতে একদা জয়াকে দেখিতে গিয়াছিল, তখন জয়া এক পত্র ডাকে পাঠাইবার জন্য ভ্রাতার হস্তে দিয়াছিল। ইহাতে জানা যায় যে পিত্রালয়ের একখানি পত্রও জয়ার হস্তগত হয় নাই, অথবা জয়ার পত্র ডাকে পাঠাইবার পক্ষে অনেক অন্তরায় আছে। বহুদিন পরে হরিবাবু কন্যা জয় কে দেখিবার জন্য সনৎবাবুর বাসায় গিয়াছিলেন। বহুক্ষণ পরে জীর্ণা শীর্ণা মলিনবসনা কঙ্কালমাত্র সার—জয়া পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইল। বালিকার অবস্থা দেখিয়া পিতা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন। তখন কুশল-মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিবার শক্তি হরিবাবুর ছিল না। অপর প্রকোষ্ঠে শাশুড়ী চপলা পিতাপুত্রীর আলাপ শ্রবণের জন্য কাণ পাতিয়াছিল। সুতরাং, জয়া ছোট ভ্রাতা ভগিনীর কুশল বার্ত্তামাত্র জিজ্ঞাসা করিয়া পিতার নিকট হইতে বিদায় হইল। পতিগৃহে জয়ার সহিত পিতার এই প্রথম ও শেষ দর্শন। এই ঘটনার ছয়মাস পরে সনৎবাবু মর্ম্মান্তিক দুঃখের সহিত হরিবাবুকে জয়ার মৃত্যু সংবাদদানে বাধিত করিলেন। বলা বাহুল্য যে জয়ার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সুশিক্ষিত ও সহৃদয় মুকুন্দ বিপুল অর্থ সহ এক বয়স্কা, সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। জয়ার দীর্ঘনিশ্বাস ও অভিশাপপূর্ণ গৃহে মুকুন্দ দ্বিতীয়বার পরিণয় দ্বারাও সুখী হইতে পারে নাই।

এরূপ কষাই, ব্যবসায় হিন্দুপরিবার মধ্যে অব্যাহতভাবে আর কতকাল চলিবে, ভগবানই জানেন।

জাতীয় উত্থান।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের প্রতি অপর বর্ণের আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। চক্ষুফোটা রোগে হিংসা-দ্বেষ সেই ভক্তিশ্রদ্ধার স্থান অধিকার করিয়া বিষম অনর্থ সংঘটন করিয়াছে। বর্ত্তমান জাতীয় উত্থানের স্থানেও চক্ষুফোটা রোগ দেখিতে পাওয়া যায়। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু-সমাজে যাঁহারা যে বর্ণান্তর্গত ছিলেন, এখন তাঁহারা আর সে বর্ণ নহেন; পাশ্চাত্য প্রভুরা বলিয়াছিলেন "শূদ্র অনার্য্য অর্থাৎ ঘৃণিত জাতি, তাহারা বিজিত, অসভ্য আর্য্যগণ ভারতের আদিমনিবাসী নহেন। এশিয়া খণ্ডের যে সকল প্রদেশে কখনও জ্ঞান বা সভ্যতা বিকাশ পায় নাই, আর্য্যগণ তথা হইতে জ্ঞানী ও সভ্য হইয়া অসভ্য ভারতে আগমন পূর্ব্বক তথাকার অসভ্য জাতিবর্গকে অপসারিত করিয়াছেন এবং যে সকল অসভ্য তাঁহাদিগের

বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহারা শূদ্ররূপে পরিণত হইয়াছে।" অনেক শিক্ষিত মহাত্মগণের মধ্যে মহা হুলুস্থুল উপস্থিত হইল। তাঁহাদিগের পিতৃপুরুষগণ ঈদৃশ ঘৃণিত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে শতসহস্র ধিক্কার দিতে আরম্ভ করিলেন। এদেশে আসিয়া তাঁহারা শূদ্র বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন, কি লজ্জার কথা ?

কে যূয়ং নাম কিম্বা কথয়ত কৃতিনঃ স্বাগতাঃ কাপি দেশাৎ।
কোলঞ্চাৎ পঞ্চশূদ্রা বয়মপি নৃপতেঃ কিঙ্করা ভূসুরাণাং ॥

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কে ? কোথা হইতে আসিয়াছ ? অমনি নির্লজ্জ মূর্খ পিতৃপুরুষগণ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া ফেলিলেন আমরা শূদ্র ব্রাহ্মণগণের ভৃত্য স্বরূপে কোলঞ্চ দেশ হইতে আসিয়াছি। ইঁহারা বরং কিঞ্চিৎ গোময় রাখিয়াছিলেন, ঈর্ষাপরায়ণ স্বার্থপর কুলশাস্ত্রকারেরা আবার কথাটা আরও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া বলিলেন —

…বসু র্ঘোষো গুহো মিত্রো দত্তো নাগশ্চ নাথকঃ।
সপ্তবিংশতিঃ শূদ্রাণাং বল্লালেন প্রশংসিতাঃ ॥

তখন তাঁহারা 'ক গচ্ছামঃ' 'কা গতিঃ' ভাবিতে ভাবিতে চিন্তাসাগরের উত্তাল তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু যেস্থানে অপায়, সেই স্থানেই উপায়। তাঁহাদিগের তাদৃশ মর্ম্মান্তিক কষ্ট দেখিয়া ভগবানের দয়া হইল। অর্থাৎ পণ্ডিতগণের দ্বারা শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগের আভিজাত্যের পরিচয় সমুদ্ধরণপূর্ব্বক বিশুদ্ধক্ষত্রিয় হইয়া সুদীর্ঘ শ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তিলাভ করিলেন। অন্যেই বা ছাড়িবে কেন ? তাঁহারাও অনেকে পণ্ডিতপুঙ্গবগণের সাহায্যে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ বৈশ্য, কেহ ক্ষত্রিয় হইয়া শূদ্রপ্রধান বাঙ্গালাদেশ একরূপ নিঃশূদ্র করিয়া ফেলিতেন। ব্রাহ্মণত্বের প্রায় বিলুপ্তির পর বাঙ্গালাদেশে পৈতার যে যৎসামান্য সম্মান অবশিষ্ট ছিল, তাহাও এই জাত্যুৎকর্ষের মহাপ্রলয়ে অব্যক্তে বিলীন হইয়া গেল।

হিন্দুসমাজে জাত্যুৎকর্ষ নাই। মুসলমান খৃষ্টানদিগের মধ্যে অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাত্যুৎকর্ষ লাভ হয়, কিন্তু হিন্দুসমাজে সেরূপ বর্ণোৎকর্ষের ব্যবস্থা নাই। ঈশ্বর বর্ণবিভাগের কর্ত্তা। ইহজন্মের সুকৃতিফলে পরজন্মে উৎকৃষ্ট বর্ণে জন্ম হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্যদত্ত উপাধির ন্যায় উৎকৃষ্ট বর্ণত্ব লাভ হিন্দুসমাজে হইতে পারে না। হিন্দুসমাজের জাত্যুৎকর্ষ জন্মান্তর সাপেক্ষ। যদি শাস্ত্র না মান, বর্ণবিভাগ মনুষ্যকৃত বলিয়া মনে কর, জন্মান্তরের প্রতি আস্থা না থাকে, তবে সমাজের উপর জুলুম না করিয়া হিন্দুসমাজের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে থাকাই প্রশস্ত। যে সকল হিন্দুসন্তান সমাজের ধার ধারেন না, তাঁহাদিগের অহিন্দু আচরণ আমাদিগের আলোচ্য নহে—আলোচনাও সর্ব্বথা নিষ্ফল ও অনধিকারের চর্চ্চা; কিন্তু যাঁহারা সমাজের আনুগত্য মুখে স্বীকার করিয়া কার্য্যতঃ তদন্যথাচরণে প্রবৃত্ত, তাঁহারা আমাদিগের অন্তরঙ্গ, কাজেই তাঁহারা অসন্তুষ্ট, বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হইলেও আমরা তাঁহাদিগের অকার্য্যের সমালোচনা না করিয়া থাকিতে পারি না।

অধিকাংশ কায়স্থ ও রাজবংশী এখন শূদ্রত্ব পরিহারপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়; বৈশ্যগণ মধ্যেও অনেকে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, কিন্তু কি হইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তবে তাঁহারা যে এখন আর সাবেক বৈশ্য নহেন, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ বর্ণোৎকর্ষে শূদ্রদিগের যে কি উন্নতি হইয়াছে তাহাও বোধগম্য হয় না। সমাজমধ্যে ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা যে স্থানে ছিলেন, আমরা তাঁহাদিগকে এখনও সেই স্থানেই দেখিতেছি। উন্নতি তো কিছুই দেখি না, বরং যেন কিঞ্চিৎ অবনত হইয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। বৈষয়িক অবস্থাও তাঁহাদিগের পূর্ব্বে যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে। এতদিন তাঁহারা যেরূপ কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, এখনও তাহাই করিতেছেন। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে বৈদ্যের ও কায়স্থের সম্মান কোন দিনই কম ছিল না। পূর্ব্বেও তাঁহারা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেন, এখনও তাঁহারা ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ বলেন। তাঁহারা যে জাতীয় উৎকর্ষ অঙ্গীকৃত করিয়াছেন হিন্দুমতে তদনুসরণ করিলেও তাঁহারা ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। ব্রাহ্মণ হীনাচারী হইয়াছেন বলিয়া অনেক বৈদ্য কায়স্থ ব্রাহ্মণকে হেয় মনে করেন। ইহা জাত্যুৎকর্ষ নহে, পাশ্চাত্য শিক্ষাজনিত উচ্ছৃঙ্খলতার পূর্ণ বিকাশ। যে জাত্যুৎকর্ষের উত্তালতরঙ্গে আজি হিন্দুসমাজ টলটলায়মান, তাহা যদি সমাজের, বর্ণবিশেষের বা অন্ততঃ ব্যক্তিবিশেষেরও ঐহিক বা পারত্রিক কিছুমাত্র উপকার সাধক হইত, তাহা হইলে ইহা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক বলা যাইতে পারিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা এই বিপুল আয়োজনের সারবত্তা বা উপকারিতা কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছি না। সকলই যে অসারতা, দাম্ভিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও আসুরিক ভাবের উৎকট অভিনয় বলিয়া বোধ হয়।

স্মরণাতীতকাল হইতে যাঁহাদিগের পিতৃপুরুষগণ মৃতাশৌচ একমাস পালনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ হইয়া পিতৃপিণ্ড দান করিতেন, তাঁহাদিগের ত্রয়োদশ বা পঞ্চদশ দিবসে প্রদত্ত পিণ্ডদ্বারা তাঁহাদিগের পিতৃলোকের যে কি উপকার হয়, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। যাঁহারা পরকাল বিশ্বাস করেন না, শাস্ত্রে যাঁহাদিগের আস্থা নাই, শ্রাদ্ধাদি যাঁহারা লৌকিক ক্রিয়ামাত্র মনে করেন, বর্ণান্তরাবলম্বন তাঁহারা গৌরবাত্মক মনে করিতে পারেন, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে যাঁহা দিগের বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস আছে, তাঁহাদিগের চক্ষে এইরূপ জাত্যুৎকর্ষ কুৎসিত দৃশ্য।

ব্রাত্যতা-দোষ ব্যক্তিগত, পুরুষানুক্রমিক হইতে পারে না। সংস্কারহীনতাদোষে যাঁহার ব্রাত্যতা-দোষ ঘটে, তিনি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সংশোধিত হইতে পারেন। প্রায়শ্চিত্তে পরম্পরাগত বর্ণত্বই তাহার স্বাভাবিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম।

সে যাহা হউক, শাস্ত্র এখন উপেক্ষিত, পরোক্ষবাদ কল্পিত, সুতরাং অনাস্থেয়। ঐহিক স্বার্থই এখন পরমার্থ। যদি ইহাতে ঐহিক উপকারও হইত, তাহা হইলেও শ্লাঘনীয় মনে করা যাইত। এ আন্দোলনে ঐহিক কল্যাণও কিছুই দেখা যায় না। আমরা বাঙ্গালী, সংসারের সমস্ত জাতি অপেক্ষা বুদ্ধিমান। পাশ্চাত্য শিক্ষায় আবার সেই অলোকসামান্য বুদ্ধি সমধিক পরিমার্জ্জিত। কাজেই আমরা বর্ণগত সমস্ত ব্যবসায় ছাড়িয়া মোক্ষপ্রাপ্তির মুখোপায়

স্থানে আপামরসাধারণ বদ্ধপরিকর হইয়া চাকরীকেই জীবিকার অদ্বিতীয় সম্বল বোধে অবলম্বন করিয়াছি। নির্ব্বোধ বিদেশীয় জাতিবর্গ বহুকষ্টে নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া আপদাকীর্ণ মহাসাগর লঙ্ঘনপূর্ব্বক আমাদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত দিয়া যাইতেছে। আমরা বিনা পরিশ্রমে গৃহে বসিয়া তাহা নির্ব্বিঘ্নে উপভোগ করিতেছি। আমাদিগের যাহা কিছু শিক্ষা-দীক্ষা সকলেরই অন্তিম লক্ষ্য চাকরী। জ্ঞান, ধ্যান, বিজ্ঞতা, পৌরুষ সমস্তই চাকরীগত। জাত্যুৎকর্ষ দ্বারা চাকরীর পক্ষেও কোন সুবিধা হয় নাই। পূর্ব্বেও যেমন চাকরী পাইতেন, এখনও চাকরী সম্বন্ধে বিচার তদনুরূপ। জাত্যুৎকর্ষ হেতু গভর্ণমেন্ট কাহাকেও উৎকৃষ্টতর চাকরী প্রদান করেন না। বরং যাঁহারা বিলাত গমনহেতু এখনও সমাজে স্থান পায় নাই, উচ্চাঙ্গের সরকারী চাকরী প্রাপ্তিবিষয়ে তাঁহারাই অগ্রগণ্য।

বর্ত্তমান আন্দোলনে যাঁহারা ব্রাহ্মণত্বে, ক্ষত্রিয়ত্বে বা বৈশ্যত্বে উন্নীত, পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাদিগের সামাজিক সম্মানও অধিকতর নহে। পূর্ব্বে তাঁহারা যে স্থানে ছিলেন, এখনও তাঁহারা সেই স্থানেই আছেন। অতঃপর ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন রাজবংশী ও কায়স্থের মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদান আরম্ভ হইলে, ইঁহারা যে সমাজের কোন্ অঙ্গ অধিকার করিবেন, তাহা এখনও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

কোন কোন সুবিজ্ঞ কায়স্থ বলেন :—শূদ্রাবস্থায় আমাদিগের মন্ত্র বিশুদ্ধ ছিল না, সুতরাং সর্ব্ববিধ দৈবানুষ্ঠানেই আমাদিগকে ব্রাহ্মণের মুখাপেক্ষী থাকিতে হইত, ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিলে আমাদিগকে সে অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। এখন দৈবানুষ্ঠানগুলি প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। যাজনিক ব্যবসায়ে জীবিকার সংস্থান দুঃসাধ্যজন্য যাজনিক ব্যবসায়ী লোক অতি বিরল। ব্রতনিয়ম ধর্ম্ম বলিয়া এখনও যাঁহাদিগের বিশ্বাস, তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইলেও পূজার্থে ব্রাহ্মণকেই আহ্বান করিবেন, নিজেরা তাদৃশ কোন ব্রতপূজা করিবেন না, করাও সঙ্গত বা বিশুদ্ধ মনে করিবেন না। যাঁহাদের ব্রতনিয়মাদি ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস নাই, কেবলমাত্র লৌকিক বোধে পূজাদি করেন, তাঁহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষণা না করিয়াও ছাপার বহি দেখিয়া পূজাদি করিতে পারেন। সুতরাং, ক্ষত্রিয়ত্ব ঘোষণায় সে অসুবিধা দূর হইবে না।

কেহ কেহ বলেন,—পৈতা গ্রহণ করার পর হইতে অনেক কায়স্থের ভগবৎচিন্তায় গাঢ়তা জন্মিয়াছে। কিন্তু আমরা এই যুক্তি প্রশস্ত মনে করি না। ভগবদারাধনায় অধিকার সকলেরই আছে এবং সর্ব্বাবস্থায়ই আছে। পৈতাগ্রহণে ভগবদ্ভক্তির যে আধিক্য তাহা সাময়িক হুজুক বা প্রতিক্রিয়া। পৈতাগ্রহণ না করিলেও ভগবদারাধনা করা যাইত। ইতিপূর্ব্বে কায়স্থের মধ্যেও প্রগাঢ় ভগবদ্ভক্ত অনেক দেখা গিয়াছে, তৎতুলনায় এখনই বরং ভগবদ্বিশ্বাসী নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অনেকে বলেন আমরা শূদ্র বলিয়া ব্রাহ্মণেরা আমাদিগকে শাস্ত্র শিক্ষা দেন নাই, বেদেও প্রণবমন্ত্রে আমাদিগকে অনধিকারী বলিতেন, এখন ক্ষত্রিয় হইয়াছি, এখন আর সে কথা বলিবার

অধিকার থাকিবে না, আমরা বেদই হউক আর যে কোন শাস্ত্রই হউক ইচ্ছা করিলেই শিক্ষা করিতে পারিব। ঈদৃশ উক্তিরও কোন প্রকার সারবত্তা নাই। এক দিন হিন্দুশাস্ত্রগুলি গণ্য ছিল বটে, কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। বেদ ও অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র এখন বাজারেই বিক্রীত হয়। শিক্ষক এখন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতেন এখন তাঁহারাও স্বীয় উদর চিন্তায় ব্যাকুল। তথারীতি শাস্ত্রাধ্যয়নের সুবিধা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। দুই একজন যাঁহারা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন, তাঁহারাও অনেকেই যথারীতি অধ্যয়ন করেন না। সুতরাং জ্ঞানও যথোচিত লাভ করিতে পারেন না। শাস্ত্রাধ্যয়নার্থে এখন আর ক্ষত্রিয়ত্বে উন্নীত হওয়ার আবশ্যক নাই। যিনি ইচ্ছা করেন তিনি খাঁটী কায়স্থ থাকিয়াও যে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারেন।

বাঙ্গালা দেশে এক বর্ণের সহিত অন্য বর্ণের পরস্পর আদানপ্রদান নাই, তথাপি পরস্পর বিলক্ষণ আনুরক্তি ও সদ্ভাব ছিল, জাত্যুৎকর্ষের কৃপায় তাহাও নষ্ট হইয়াছে। এ উৎকর্ষ যে কি আকারের উৎকর্ষ, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অধিগম্য নহে। ইহার মধ্যে যে কি মোহনীয় দিল্লীর লাড্ডু আছে, তাহা জাত্যুৎকর্ষে গৌরবান্বিত মহাত্মগণই বুঝিতে পারেন। আবার ইহাও দেখিতে পাই যে বৈদ্য ও কায়স্থ মধ্যে যাঁহারা বুনিয়াদী বংশ, তাঁহাদিগের অনেকেই ক্ষত্রিয়চিহ্ন ধারণ করেন নাই। তাঁহারা শর্ম্মণ বর্ম্মণ ও হন নাই, পৈতা গ্রহণও করেন নাই, মৃতাশৌচ পালনে পিতৃপিতামহাদির পদ্ধতি অবলম্বন করেন, শ্রাদ্ধাদি অশৌচান্ত না হইলে করেন না। যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় তর্কশাস্ত্রে সর্ব্বজয়ী বীরপুরুষ, ক্ষত্র তেজ তাঁহাদিগেরই ধমনীতে বন্যার প্রখর প্রবাহে প্রবাহিত। শূদ্র নাম তাঁহাদিগেরই অসহনীয়। অনেক মহাপণ্ডিতের ক্ষত্রিয়ত্ব এত উদ্দীপিত যে পৈতা গ্রহণের বিলম্বও সহেনা। পৈতা গ্রহণ করিয়াই ত্রয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধ করিয়া ফেলেন। আবার যে কেহ কায়স্থকে শূদ্র বলুক, তাঁহারা অমনি সম্পর্ক বিচার না করিয়া তাহাকে যথাশক্তি গালিগালাজ করিতে থাকেন। ইহাতে যে কি মনুষ্যত্বের ও বীরত্বের পরিচয় দেওয়া হয়, তাহা তাঁহারাই বুঝিতে পারেন, আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ইহা অনর্থক পাগলামী বলিয়াই মনে হয়। যদি ঐহিক পারত্রিক কোনপ্রকার উৎকর্ষ দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে আমরা ইহা কতক পরিমাণে প্রশংসিত মনে করিতে পারিতাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা এ উদ্যমের উপকারিতা কিছুই অনুভব বা কল্পনা করিতে পারিতেছি না।

কেহ কেহ বলেন কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইলে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় ক্ষত্রিয়গণসহ পরস্পর আদানপ্রদান প্রচলিত হইয়া হিন্দুসমাজের কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের সহিত অন্যান্য হিন্দুসমাজের যেরূপ বিচ্ছিন্নভাব, তাহাতে বিশুদ্ধ হিন্দুমতে সেরূপ আদানপ্রদান সম্ভবনীয় নহে। তবে যদি সমাজ তদপেক্ষাও শিথিল হয়, তাহা হইলে সেরূপ হইতে পারে বটে, কিন্তু যদি সেরূপ হয়, তাহা হইলে যিনি যেভাবে আছেন সেই ভাবে থাকিলেও হইতে পারিবে; ক্ষত্রিয়ত্বে উন্নীত হইবার প্রয়োজন হইবে না। কোচবিহারের

মহারাজ যে গুইকোয়ারের মহারাজের কন্যা বিবাহ করিয়াছেন, তাহাতে ক্ষত্রিয়ত্বে উন্নীত হইবার আবশ্যক হয় নাই।

আত্মদোষ অন্যে আরোপ করিয়া নিষ্পাপ হইবার কৌশল বর্ত্তমান শিক্ষায় যেমন বিকাশ পাইয়াছে, ইতিপূর্ব্বে আর কখনও তেমন দেখা যায় না। তাই বর্ত্তমান জাত্যুৎকর্ষের আড়ম্বর সমাজময় বিদ্বেষবীজ বিকিরণের হেতুভূত হইলেও যাঁহারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ সম্বন্ধে কোনপ্রকার অননুকূল কথা কহেন, নব ক্ষত্রগণ অমনি তাঁহাদিগের বিদ্বেষ, বীজের সমুৎপাদক বলিয়া দোষারোপ করিতে আরম্ভ করেন; তথাকথিত শিক্ষিত হিন্দুসন্তান-গণের এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতাময়ী লীলাখেলা আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার আরম্ভ হইতেই প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। যিনি রাজনারায়ণ বসুর "এ কাল সে কাল" পাঠ করিয়াছেন, তিনিই "ইয়ং বেঙ্গলি"দিগের উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুর্বৃত্ততা জানিতে পারেন।

পাশ্চাত্য জাতির বৈষয়িক উন্নতি অত্যধিক। কিন্তু কিগুণে যে তাঁহারা এতদূর সমুন্নত, আমাদিগের শিক্ষিতগণ তাহা বুঝিতে না পারিয়া দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ তাঁহাদিগের দোষরাশিতে গুণারোপ করিয়া তদনুকরণ সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। কয়েক দিন শুনিলাম মদ না খাইলে সুসভ্য, সুবক্তা ও সুপ্রতিষ্ঠ হওয়া যায় না, তজ্জন্য যাঁহারা উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত তাহাদিগের মধ্যে বিলাতি মদ্যের আলোচনা প্রকটভাবে চলিতে আরম্ভ করিল, আদর্শ সমাজময় পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। ফল অশুভ ভিন্ন শুভ হইবে না। সাহেবেরা কোটপেণ্টালুন হ্যাট ব্যবহার করেন। আমাদের শিক্ষিতগণ বুঝিলেন সাহেবদিগের শ্রেষ্ঠতা কোটপেণ্টালুন হ্যাটগত; সুতরাং কয়েকদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা দেশীয় পরিচ্ছদ নিন্দিতবোধে কোটপেণ্টালুন হ্যাটে সুসজ্জিত হইয়া সাহেব সাজিলেন। শিক্ষিতগণ দেখিলেন সাহেবদিগের খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, তাঁহারা বিশুদ্ধাচারীও নহেন, তাঁহারা জাতিভেদও মানেন না, অর্থাৎ আমরা ব্রাহ্মণ, শূদ্র চণ্ডালাদি বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত বটে, কিন্তু উদারপ্রাণ সাহেবদিগের চক্ষে আমরা সকলেই সমান। তখন তাঁহারা উহাই জাতীয় উৎকর্ষের ভিত্তি এই বিশ্বাসে হিন্দুসমাজ ভাঙ্গিয়া চুরমারকরণার্থে বদ্ধপরিকর হইলেন। এ দুর্ব্বুদ্ধি এখনও দূর হয় নাই। বর্ত্তমান জাতীয় উত্থানও এই দুর্ব্বুদ্ধি-মূলক। ইহার উপকারিতা কিছুই নাই, অপকারিতা যথেষ্ট। হয়তো মনে করিতে পার, তোমাদিগের উন্নতিতে আমরা ঈর্ষাপরায়ণ, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। তোমাদিগের উন্নতিতে আমাদিগের লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। তোমরা উৎকর্ষলাভ কর, সভ্যসমাজে মান্যগণ্য হও, ভগবানের নিকট ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা। কিন্তু তোমরা যাহা করিতেছ, তাহা উৎকর্ষাত্মক মনে করিনা, তজ্জন্যই উহা আমাদিগের নিকট ভালবোধ হইতেছে না। যে আকারের ধর্ম্মসংস্কার, সমাজসংস্কার শিক্ষিতগণ এ পর্য্যন্ত উপাদেয় ও উৎকর্ষপ্রদ বলিয়া গ্রহণ করিয়া-ছেন, তৎসমস্তেরই পরিণাম অশুভ হইয়াছে। জাতীয় উত্থানের পরিণামও ভাল হইবে না বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজভুক্ত যে কোন বর্ণই উন্নতিলাভ করুক না কেন, তাহাতেই আমাদের উন্নতি। সুতরাং, তৎসম্বন্ধে ঈর্ষাপরায়ণ হইবার বস্তুতঃ কোনই কারণ নাই,

শিক্ষিত হিন্দুসন্তানগণ উৎকর্ষবোধে ইতঃপূর্ব্বে যে সকল চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তৎসমস্তই সমাজের গুরুতর অনিষ্ট করিয়াছে, বর্ত্তমান উদ্যমও তদ্রূপ। ইহারও প্রকৃত উপকারিতা কিছুই নাই, কেবল লম্ফ-ঝম্ফই সার বুঝিয়া আমারা ইহার অনুকূলতা অসঙ্গত মনে করি।

বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে বৈদ্যকায়স্থগণের সম্মান অন্যান্য প্রদেশের ক্ষত্রিয় অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে, বরং অধিক। চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যতীত কোন সমাজই উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না, এজন্য সকল সভ্যসমাজেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় যেমন অপ্রকটভাবে আছে, সেইরূপ বঙ্গীয় হিন্দুসমাজোক্ত ক্ষত্রিয় বৈশ্য অপ্রকট; ব্রাহ্মণ শূদ্র দুই বর্ণেই চাতুবর্ণ্যের স্থান পূরণ করিয়া আছে। যদিও আমরা কোন কোন স্থলে উত্তরপশ্চিমবিভাগীয় লোক চাই বটে, কিন্তু তাহাদিগকে না পাইলে যে আমাদিগের অভাব দূর হয় না এমন নহে। আমরা যে সকল পদে উত্তরপশ্চিমদেশীয় লোক নিযুক্ত করি, বাঙ্গালী দ্বারাও সে সকল স্থান পূরণ হইতে পারে এবং এতকাল ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অভাবে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের কোনও ক্ষতি হয় নাই।

অনেকের বিশ্বাস যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশীয় হিন্দুমধ্যে বাঙ্গালীর আদানপ্রদান প্রচলিত হইলে, হিন্দুসমাজ মহোন্নতি লাভ করিতে পারিবে। আমরা কিন্তু সে বিশ্বাস নির্ভুল বলিয়া মনে করি না। যাঁহারা তাদৃশ বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হইয়া ভিন্নস্থানীয় লোকের সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের শোচনীয় পরিণাম দর্শনে আমরা তাদৃশ বিশ্বাস দুর্ব্বুদ্ধিমূলক বলিয়াই বোধ করি। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদিগের সহিত হিন্দুস্থানীয় ব্রাহ্মণগণের যখন আদানপ্রদান দেখা যায় না, তখন যাঁহারা এখন আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, তাহাদিগের সহিত হিন্দুস্থানীয় ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের যে পরস্পর আদানপ্রদান অনিন্দিত হইবে এ বিশ্বাসও আমরা মনে স্থান দিতে পারি না। এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া শিক্ষিত হিন্দু-সন্তানগণ জাতিভেদের বিদ্বেষী, কিন্তু আমরা কোথাও বিভিন্ন দেশবাসীদিগের মধ্যে পরস্পর আদানপ্রদান কল্যাণকর দেখিতে পাইনা। বঙ্গদেশীয় মুসলমানগণ সহও ভিন্নদেশীয় মুসলমান-গণের আদান প্রদান দেখা যায় না। নেটিভ্ সহ বিষম সংস্রবে ইউরেসিয়ান্ যে এক শ্রেণীয় লোকের উৎপত্তি দেখা যাইতেছে, তাঁহাদিগকেও কেহ শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করে না। এরূপ অবস্থায় জাতীয় উত্থান ছলে যাঁহারা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য নাম ধারণ করিতেছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা সমাজের ঘোর অকল্যাণ ভিন্ন যে সুফল ফলিবে, এরূপ বিশ্বাস কোন ক্রমেই করা যায় না। যতদূর বুঝিতে পারি তাহাতে জাতীয় উত্থান সমাজের গুরুতর ক্ষতি ও অবসাদজনক বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

উচ্চ বর্ণের সংস্রবে হীনবর্ণের উৎকর্ষ হয় বটে, কিন্তু কোথাও উচ্চ বর্ণকে হীনসংস্রবে সহসা আসিতে দেখা যায় না। আফ্রিকায় নির্ব্বাসিত কোঠো, নিউমিতিয়ায় রাজকুমার সহ স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। দিল্লীর সম্রাট পুত্র সুজা আরাকানের রাজার সহিত কন্যা বিবাহ দিতে অস্বীকার করায় সবংশে নিহত হইয়াছিলেন। মানসিংহ

বাদসার সহিত ভগিনীর বিবাহ দিয়া সমাজে অপদস্থ হইয়াছিলেন। লর্ডবংশীয়েরা হীনকুলের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থান অপমানজনক মনে করেন। মুসলমানেরা ভারতের রাজ-সিংহাসন অধিকার করিয়াও হিন্দুদিগকে শ্রেষ্ঠ মান করিতেন। এ নিমিত্ত নবাব ও বাদসাগণ এদেশীয় মুসলমান সহ কন্যার বিবাহ দেওয়া অপমানকর বোধে হিন্দুকে মুসলমান করিয়া তাহাদের সহিত কন্যার বিবাহ দিতেন। এখন শিক্ষিত মহাত্মগণের উদারনীতির প্রাবল্যে হিন্দুকেও নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য, তজ্জন্য উচ্চ শ্রেণীর দেশীয় মুসলমান ও হিন্দুর সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপন অপমানজনক বোধ করেন। ইংরেজের চক্ষে হিন্দু নিতান্ত জঘন্য বলিয়া গণ্য। এ অবস্থায় বর্ত্তমান জাত্যুৎকর্ষ দ্বারা সমাজের অহিত ভিন্ন বিন্দু মাত্রও উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। আমাদিগের শিক্ষিত মহাত্মগণ উৎকর্ষ বোধে যে কোন চেষ্টা করিতেছেন, তৎসমস্তই যেমন কেবল মাত্র অবসাদকই হইতেছে, তখন এ মারাত্মক যুক্তির প্রার্থর্য্য দেখাইতে না যাইয়া পিতৃপুরুষগণের আচরিত সামাজিক নীতিপদ্ধতির আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলাই সঙ্গত মনে করি।

এখন যাঁহারা ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি হইতে সচেষ্ট, তাঁহাদিগের মধ্যে চণ্ডাল ও রাজবংশীদিগের সামাজিক সম্মানই কম, তদ্ব্যতীত অন্য যে সকল বর্ণ উৎকর্ষ বোধে ক্ষত্রিয় বৈশ্য সাজিতেছেন, তাঁহাদিগের সামাজিক সম্মান ভিন্নস্থানীয় ক্ষত্রিয় বৈশ্য অপেক্ষা ন্যূন নহে। তাঁহারা নামে মাত্র শূদ্র, কিন্তু কার্য্যতঃ ক্ষত্রিয় অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; সুতরাং বর্ম্মণাদি তাঁহাদিগের পক্ষে উৎকর্ষপ্রদ নহে। যদি পরকাল থাকে, পিতা পুত্রদত্ত পিণ্ড আকাঙ্ক্ষা করেন বলিয়া যদি বিশ্বাস কর, তবে নিষ্প্রয়োজনে এ দুশ্চেষ্টা না করাই সঙ্গত মনে করি। ব্রাহ্মণ এখন ঘোর লোভপরায়ণ, তাঁহাদিগের মধ্যেও পরকালবিশ্বাসী লোকও বিরল, বর্ত্তমানে যাঁহারা পণ্ডিতপুঙ্গব এপ্রথা তাঁহাদিগের মধ্যেই অধিক, তজ্জন্য অর্থ ব্যয় করিলে ইচ্ছানুরূপ যে কোন প্রকার পাঁতি পাওয়া যাইতে পারে। সমাজের ঈদৃশ সর্ব্বাঙ্গীণ হীনাবস্থায় সকলেরই সাবধান হইয়া কার্য্য করা বিধেয়। পিতৃপুরুষগণ আমাদিগের অপেক্ষা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান ছিলেন। তাঁহারা যে সামাজিক নিয়ম প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছিলেন, তৎপালন আমাদিগের পক্ষেও বিধেয়। কালের পরিবর্ত্তনে অনেক বিষয়ের পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয়, কিন্তু যতকাল সেই পরিবর্ত্তনের উপযোগিতা না জন্মে, ততকাল পরম্পরাগত রীতিনীতির অনুবর্ত্তনই বিধেয়।

শ্রীমাধবচন্দ্র সান্যাল।

ব্রাহ্মণ্য-সাধনা।

এই সভাতে সমাগত বয়োজ্যেষ্ঠ ও জ্ঞানশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-চরণে আমার সভক্তি নমস্কার এবং বয়ঃকনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদি সর্ব্বজনের প্রতি আমার সস্নেহ - আশীর্ব্বাদ।

হিন্দুস্থানে ইদানীং যেখানেই যে কোন সভা-সমিতি করা হউক না কেন, প্রায় সকল স্থলেই তৎসমুদয়ের রীতি-নীতি, প্রকৃতি-পদ্ধতি, আমাদের জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, অল্প বিস্তর বিলাতী ছাঁচে গঠিত হইয়া উঠিতে দেখা যায়। কালের অবস্থানুসারে লোকরঞ্জনার্থে স্থলবিশেষে এরূপ না করিয়াও উপায়ান্তর নাই। ব্রাহ্মণ-সভাতে কোন বিষয়ে এই সাধারণ নিয়মের অনুসরণ করিতে না পারিলে, তাহা বিশেষ দোষজনক বলিয়া বিবেচিত হইবে না বলিয়াই মনে হয়। এই সাহসেই সভা-সমিতি সম্বন্ধীয় সাধারণ রীতির হয় ত একটু বিরুদ্ধাচরণ হইতেছে জানিয়াও এই সভার সভাপতির কর্ত্তব্যপালন—অভিভাষণের প্রারম্ভে ধন্যবাদদান লইয়াই সর্ব্বপ্রথমে সভয়ে দুই একটি কথা আমাকে বলিতে হইতেছে। আমাকে অতিসম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত করা হইল বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও ধন্যবাদ দান করা সভাপতির যে এ সময়ে কর্ত্তব্য কার্য্য, তাহা আমি জ্ঞাত আছি; কিন্তু আমার কণ্ঠ হইতে এইরূপ শব্দ আমি চেষ্টা করিয়াও বাহির করিতে পারিতেছি না। আমি চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি, আমাদের হিন্দুসমাজের ভাঙ্গা ঘরের চারিধারে এক সঙ্গে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সমাজ-সংস্কারক নামধারী আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দ উহার উপর আবার বিলাতী আমদানী কেরোসিন্ টিনের ক্যানেস্তারা কাটিয়া ঐ কেরোসিন তেল সেই আগুনে ঢালিয়া দিতেছেন। এ সময়ে কে কাহাকে কিরূপ সম্মান করিল, তাহা ভাবিবার সময় নাই; পরস্পর মধ্যে ধন্যবাদ আদান-প্রদান ব্যাপার লইয়া শিষ্টাচার করিবারও অবকাশ নাই। এ সময়ে যে যেখানে যে অবস্থাতে আসিয়া পড়ুন না কেন, যে কোন উপায়ে হউক, ঘরখানি রক্ষা করাই এখন আমাদের সকলেরই সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্মান পাইবার ও সম্মান দিবার দিন আমাদের অনেক দিনই চলিয়া গিয়াছে।

অভিভাষণ সম্বন্ধে আর একটী কথা এখন নিবেদন করিতে হইতেছে। ৺কাশীতে অবস্থিতি-কালে যে সময়ে প্রথমে এই সভার সভাপতি-পদ গ্রহণের অনুরোধ আমার নিকট উপস্থিত হয় এবং আমি উহা গ্রহণ করিতে সম্মত হই, তখন আমার কোন কোন মিত্র আমাকে বলিয়াছিলেন—ইংরাজীতে সভাপতির অভিভাষণ লিখিয়া তাহা পুস্তকাকারে অগ্রেই ছাপাইতে হইবে; কারণ, তাহা হইলে ইংরাজী সংবাদপত্র-সমূহে উহা আদ্যন্ত প্রকাশিত হইতে পারিবে। বন্ধুদের অনুরোধে বাধ্য হইয়া ইংরাজীতেই আমি হিন্দু-ধর্ম্মসভার অভিভাষণ লিখিতে বসিলাম। কিন্তু আমার দারুণ দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার লেখনীমুখে একটি অক্ষরও সরিল না; পরন্তু, নেত্রযুগল দিয়া অবিরাম অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। একটি দুঃখের গল্প

সে সময়ে আমার মনে উদিত হওয়াতে আমার ঐরূপ দশা হইয়াছিল। সে গল্পটি যে কি, তাহা আপনাদের নিকট নিবেদন করিতেছি ;—

আমার কোন বন্ধু একটি টিঁয়াপাখী পুষিয়াছিলেন। সেকালের রীতিতে "রাধাকৃষ্ণ" বুলি তাহাকে না পড়াইয়া পাখীটিকে তিনি "Good morning Sir" উচ্চারণ করিতে শিখাইয়াছিলেন। সেই পাখীটি, যে কোন লোক সম্মুখে দেখিলেই, তাহাকে "গুডমরণিং সার" বলিয়া অভিবাদন করিত। একদিন কোন কারণে মাটিতে খাঁচা রক্ষিত হইয়াছিল। সুযোগ পাইয়া একটা কালো বিড়াল সেই খাঁচার ভিতরে প্রবেশ করিয়া টিঁয়াপাখীর ঘাড় কামড়াইয়া ধরিল। তখন টিঁয়াপাখী তাহার জীবনব্যাপী অভ্যাসের ফল "গুড্‌মরণিং সার" বলা ত্যাগ করিয়া তাহার মাতৃভাষায়—তাহার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে "ক্যাঁ ক্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ" রবে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কলিকালরূপী কালো বিড়াল আসিয়া তো দেখিতেছি, আমাদের ঘাড় কামড়াইয়া ধরিয়াছে। মৃত্যুসময়ে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীটাও তাহার পড়াবুলি ত্যাগ করিয়া তাহার মাতৃভাষাতে প্রাণ ভরিয়া একবার কাঁদিতে পারিয়াছিল ; আমরা কি এখন তবে সেই পিঞ্জরাবদ্ধ টিঁয়পাখীর অবস্থা হইতেও শোচনীয় অবস্থাতে নামিয়া পড়িয়াছি যে, তাহাও করিতে অসমর্থ ? অভিভাষণ লেখা আর ঘটিল না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাগজ ও কলম দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। আমি জানিতেছি, হিন্দীভাষাতে মনোভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমার ভাল নাই। ভাষার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য অলঙ্কার এবং ভাবযোজনার শক্তিও আমার নাই। কিন্তু ইহাও জানিতেছি, কণ্ঠে আমার যে কালো বিড়াল আসিয়া কাম্‌ড়াইয়া ধরিয়াছে, এ সময়ে শব্দালঙ্কার ও ভাব-যোজনার দিকে মন দিবার আর আমার সময় নাই। যে ভাবেই পারি, মর্ম্মব্যথা কোনরূপে প্রকাশ করিবারই এখন প্রয়োজন। তাহাই বা পারিতেছি কৈ ? কণ্ঠে যে শ্লেষ্মা চাপিয়া ধরিয়াছে! কণ্ঠরুদ্ধ, ক্ষীণশ্বাস, অবশ—অসাড় হস্তপদ, এ অবস্থাতে এক রোগী, সম অবস্থাপন্ন আসন্ন শয্যায় শায়িত আর এক রোগীর কর্ণরন্ধ্রের নিকট মুখ আনিয়া চিকিৎসার পরামর্শ দিতে উপস্থিত ; এই শোকাবহ দৃশ্য দেখিলে যেরূপ মনের অবস্থা হয়, আমাদের নিজ নিজ দুর্দ্দশা দেখিবার ও বুঝিবার সামর্থ থাকিলে, আজি এ সভাতে সমুপস্থিত আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিরই মনের অবস্থা ঠিক সেইরূপ হওয়াই উচিত। বলুন, এইরূপ শোচনীয় অবস্থাতে পৌছিয়া আমি সভাপতিভাবেই বা আপনাদিগকে সম্বোধন করিয়া আজি কি বলিব, আর আপনারাই বা আমার নিকটে আমার মুখে এ অবস্থাতে কি কথা শুনিবার প্রত্যাশা করিতে পারেন ?

তথাপি, এ পরমপবিত্র ক্ষেত্রে আজিকার দিনে, এই শুভসংযোগ সময়ে, আপনাদিগকে সম্বোধন করিয়া দুই চারিটি কথা আমাকে বলিতে হইবে এবং আপনাদিগকেও তাহা শুনিতে হইবে। এরূপ নিজজনে পরিপূর্ণ বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া দুইটা মর্ম্মের কথা বলিবার সৌভাগ্য এ জীবনে আর পাইতে পারিব কিনা জানি না—এজন্য এ সময়ে দুই চারিটা বুকের ভিতরের কথা আপনাদিগের নিকটে হৃদয়ের কপাট খুলিয়া

বলিতেই হইবে। একটা সাধারণ প্রচলিত কথা আছে,—"যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।" হিন্দু সমাজের এখনও শ্বাস চলিতেছে। তবে এখনই আমরা আশা ত্যাগ করিব কেন? হউক না রুদ্ধকণ্ঠ, অস্ফুট আর্ত্তনাদে মনের বেদন নিবেদন করিতে নিরস্ত থাকিব কেন?

প্রথম কথা এই যে—আমরা এইরূপ যে সকল সভাসমিতি সময়ে সময়ে দেশের নানা স্থানে নানা ভাবে আহ্বান করিয়া থাকি, তদ্দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে কিছু কাজের মতন কাজ আমরা করিতে পারিতেছি কি? আমার তো মনে হয়, আমাদের এইরূপ চেষ্টা সকল অধিকাংশ স্থলেই এককালীন নিষ্ফলতায় পর্য্যবসিত হইতেছে। কেবল আমিই যে এমন কথা বলিতেছি তাহা নহে, অনেকেই এইরূপ বলিয়া থাকেন। এরূপ কেন হয়? ইহাই এখন আমাদের চিন্তা করিয়া দেখিবার সময়।

এই যে গত পঁচিশ ত্রিশ বৎসর যাবৎ কতই অর্থব্যয় করিয়া, বিপুল প্রয়াস করিয়া ভারতের নানা স্থানে কতই কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স আহ্বান করিয়া সামান্য একটু রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য কত কি করা হইল, কই ইহার তো কিছুই ফল ফলিতে দেখিতে পাইতেছি না? এ সকল চেষ্টায় কোনরূপ ফল হইতেছে না কেন?

এই যে ভারতের নানা স্থানে কত ইনডাষ্ট্রীয়াল কন্‌ফারেন্স বসাইয়া শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি-চেষ্টা করা হইতেছে, কতই বক্তৃতা দান করা হইতেছে, পুস্তক পত্রিকা প্রকাশ করা হইতেছে, কত স্থানে কত জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী স্থাপন করিয়া কত ব্যাঙ্ক এবং কল-কারখানার জন্ম দেওয়া হইতেছে, কিন্তু কৈ, এ সকল চেষ্টাসমষ্টির ফলে হিন্দুস্থানের আর্থিক সম্পদ্ যে গত পঁচিশ বৎসর মধ্যে এক সর্ষপ-পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহাও তো উপলব্ধি করিতে পারা যাইতেছে না? এসকল উদ্যোগের কোনরূপ স্থায়ী সুফল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না কেন?

এই যে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক সাহিত্যসভা-সমিতিসকল সংস্থাপন করিয়া সাহিত্যের উন্নতি সাধনের জন্য কতপ্রকারে যত্ন চেষ্টা করা হইতেছে, কৈ ইহারও তো কোন ফল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। কেন এমন হয়?

এই যে দেশে সনাতনধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ভক্তিমার্গের প্রভাববৃদ্ধি করিবার জন্য নানা স্থানে হরিসভা, ধর্ম্মসভা প্রভৃতি সংস্থাপন করা হইতেছে, কংগ্রেসের অনুকরণে ভারতের নানা স্থানে বার্ষিক মহা-সভা মহাসম্মেলনাদি আহ্বান করা হইতেছে, তাহাতে কতই বক্তৃতা দান ও প্রবন্ধ পাঠ করা হইতেছে, কিন্তু তাহার ফলে হিন্দুত্বরক্ষার কিছুমাত্রও উপায় আবিষ্কার হইতে পারিতেছে কি? এই সকল চেষ্টাতে কিছু ফল ফলিতেছে না কেন?

কেন যে কোন ফল ফলিতেছে না, তাহাই এখন আমাদের অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক হইতেছে।

চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, এই সমস্ত "কেন"র উত্তর দুইটা শব্দমধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে। এই দুইটা শব্দ এই—সাধনার অভাব। হিন্দুজাতি সাধনা ভুলিয়া গিয়াছে,

তাই তাহার কোন দিকের কোন কার্য্যেই সিদ্ধি নাই। হিন্দু যেদিন তাহার "হিন্দুত্ব" বা তাহার নিজস্ব সাধনপদ্ধতি হারাইয়াছে, সেই দিন হইতে কর্ম্মে সিদ্ধিলাভে সে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে।

আমরা হিন্দুজাতির পুনরভ্যুদয় দেখিতে চাহি। ব্রাহ্মণ হিন্দুসমাজের মস্তকস্থানীয়; সেই জন্যই ব্রাহ্মণসভা করিয়া ব্রাহ্মণরূপ মস্তককে সর্ব্বাগ্রে সজাগ করিতে আমরা এত উদ্যোগী হইতেছি। মস্তকে চৈতন্যসঞ্চার হইলে, নয়ন খুলিলে, মুখে কথা ফুটিলে; মাথা তুলিতে পারিলে মাথার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে সমস্ত শরীর উঠিয়া বসিতে পারিবে, ইহাই বুঝিয়া ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আজি আমরা এত যত্নশীল হইয়াছি। কিন্তু আমাদের এদিকের যত্ন চেষ্টা সকল আমাদের আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ সুফল প্রসব করিতেছে না কেন? কোন্ উপচারের অভাবে, কোন্ অনুষ্ঠানের ত্রুটিতে, কোন্ মহামন্ত্রের বিস্মৃতিতে আমাদের এ বিশাল হিন্দুজাতির বিপুল সাধনাতে আমরা কিছুমাত্র সিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেছি না? এ সকল সমস্যার সমাধান করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদের এ দেশের হিন্দুত্বটা যে প্রকৃত প্রস্তাবে কি বস্তু, তাহাই একটু বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। পীড়ার মূলস্থান ধরিতে না পারিলে তাহার চিকিৎসার সুব্যবস্থা তো কথনই সম্ভবপর হয় না।

মোটামুটিভাবে বুঝিতে হইলে, আমাদের দেশের আধুনিক প্রচলিত ভাষাতে "হিন্দুত্ব" বা "হিন্দুয়ানী" বলিতে আমরা এখন যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহাকে একটা "ধর্ম্মমত" না বলিয়া একটা সমাজসংরক্ষণ-সাধনাক্রম বলিতে বাধা নাই। এই সাধনাক্রম বা আমাদের এখনকার এই হিন্দুত্বের দুইটি ধারা আছে। স্থূল দৃষ্টিতে ইহার একটিকে লোকব্যবহার বা সমাজসংস্থা-মূলক ধারা বলা যাইতে পারে, অন্যটিকে অধ্যাত্মজ্ঞান-মূলক ধারা নামে আখ্যা করা যাইতে পারে। আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিতকে তাঁহার বোধ্য ভাষাতে বুঝাইবার জন্য উহার একটীকে Socio-Religions Side অপরটিকে Spiritual Side বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। ইহার একটী ধারা সমাজবিজ্ঞানের উপর দিয়া, অপরটি দার্শনিক জ্ঞান-ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত। বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড নামক যে দুইটি বিভাগ কথিত হয়, তাহার মধ্যেও এই কথারই সূক্ষ্মতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। যদিও দুইটী পৃথক্ নাম দিয়া এই দুই বস্তুকে পৃথক্ বুঝাইতে চেষ্টা করা যাইতেছে, কিন্তু একই তাঁতে একই তুলাজাত সূত্রের "টানা পোড়েন" ভাবে বয়ন করা আমাদের এই গাত্রবস্ত্রখানির ন্যায় হিন্দুত্বের এই দুইটী ধারা সর্ব্বদা ওতঃপ্রোতভাবে বিমিশ্র থাকিয়া অথবা এক অন্যের আশ্রয়-স্থানীয় হইয়া যুগ যুগান্তকাল যাবৎ বিরাট হিন্দুজাতির দেহরক্ষা-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছে।

হিন্দুত্বের এই মর্ম্মতত্ত্বটুকু পূর্ণমাত্রাতে বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই সেকালের ঋষিগণমধ্যে কেহ বা ঈশ্বরকে দার্শনিক যুক্তিবলে নিষ্ক্রিয় বিন্দুতে প্রমাণিত করিতে বসিয়াও অহিন্দু আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন নাই, কেহ বা তাহা পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দিতে উপস্থিত হইয়াও সমাজচ্যুত হয়েন নাই। প্রত্যুত, বেদান্তদর্শনকার এবং সাংখ্যসূত্রকার আজিও হিন্দুসমাজের সর্ব্বত্র

পরম পূজ্য হইয়া রহিয়াছেন। পক্ষান্তরে হিন্দুত্বের এই মর্ম্মতত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ ছিলেন বলিয়াই রামমোহন রায় এবং কেশবচন্দ্র সেন আপনাদিগকে পরম আস্তিক বলিয়া পরিচিত করিয়াও তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত হিন্দুসমাজে সমাদৃত করিতে পারিলেন না। দয়ানন্দ, বেদের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া এবং বেদ-বিহিত ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও হিন্দুসমাজের লোকব্যবহার বা সমাজসংস্থা-মূলক দিক্‌টার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করাতে কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারিলেন না। বিশ্বামিত্র হিন্দুত্বের এই অন্তর্নিহিত মূলতত্ত্ব বুঝিতেন বলিয়াই ব্রাহ্মণপদে উন্নীত হইবার জন্য কেবল সুদীর্ঘকালব্যাপী কঠোর তপস্যা দ্বারা জ্ঞানার্জ্জন করাকেই যথেষ্ট জ্ঞান করেন নাই, পরন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের মুখ হইতে নির্গত ব্রাহ্মণবচনের দ্বারা আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া ব্রাহ্মণ-বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। আধুনিক শিক্ষিত যুবকগণমধ্যে অনেকেই হিন্দুত্বের এই সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝেন না বলিয়াই বিলাতী অনুকরণে মিটিং করিয়া ও রেজলিউসন্ পাশ করিয়া এক দিনেই সম্পূর্ণ একটী সাহা-সম্প্রদায়কে বৈশ্যত্বে অথবা কায়স্থজাতিকে ক্ষত্রিয়ত্বে উন্নীত করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের বিপথে পরিচালিত উদ্যম সুফল দেয় না দেখিয়া, কাজেই তাঁহাদিগকে দুঃখ করিয়া বলিতে হয়—"হয় না কেন ?" সমাজের সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত বলিয়া যে ব্রাহ্মণ আজি আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিয়া থাকেন, সেই ব্রাহ্মণ-সমাজের কার্য্যপদ্ধতিও আজি বিকৃতশিক্ষাপ্রভাবে ঐ একই দোষে দুষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণও নানাস্থানে সভাসমিতি করিয়া রেজলিউসন্ পাশ করিয়া আপনাদের অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কালমাহাত্ম্যে মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে অতীত দেখিতে ভুলিয়া যাইয়া তাঁহারাও আজি এ কথা বুঝিতে পারিতেছেন না যে, তপস্যা ভিন্ন শক্তিসঞ্চয় হয় না আর শক্তিশূন্য ক্লীব-ইচ্ছা কোন কালেই কোন কার্য্যফলের জন্মদাতা হইতে পারে না।

কিছু পূর্ব্বে হিন্দুত্বের যে দুইটী ধারার কথা বলা হইয়াছে, তাহারই একটির অধিষ্ঠাত্রীদেবী "ইচ্ছা," অন্যটীর অধিদেবতা "কর্ম্মশক্তি।" এতদুভয়ের শুভসম্মিলন দ্বারা শুভ কর্ম্মফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। হিন্দুত্বের এই মৌলিক তত্ত্ব ভুলিয়া যাইয়া বিলাতী সভাসমিতির অনুকরণে বৎসরান্তে তিন দিনের জন্য কেবল কাগজ-কলমে পুষ্ট ব্রাহ্মণমহাসম্মিলন বা সনাতন-ধর্ম্ম-সম্মিলন করিলে তদ্দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধির বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই।

সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে সাধনার প্রয়োজন। তপস্যা দ্বারা কর্ম্মশক্তি সঞ্চয় করা আবশ্যক। কয়েকটি শব্দ সংযোজন করিয়া অতি সহজ কথাতে বলা হইল—তপস্যা দ্বারা কর্ম্মশক্তি সঞ্চয় করা প্রয়োজন, সাধনক্ষেত্রে নামিয়া উহা সঞ্চয় করা তেমন সহজসাধ্য কার্য্য নহে। প্রথমতঃ তপস্যা কি বুঝিতে হইবে। অনাহারে একপদে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেই অথবা অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া তাহার মধ্যে বসিয়া থাকিলেই তপস্যা করা হয় না। তপস্যা ত্রিবিধ—(১) বাক্‌তপস্যা (২) কায়তপস্যা এবং (৩) মনস্তপস্যা। বাক্য, মন, দেহকে সুসংযত অবস্থাতে অভীষ্ট দিকে যতই অধিক সময় নিয়োজিত করিয়া রাখিতে পারা যাইবে,

ততই তপস্যার বহ্নি হৃদয়যজ্ঞকুণ্ডে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতে থাকিবে। উহার তাপে একদিকে যেমন অন্যান্য বাজে বাসনা দগ্ধ হইয়া যাইতে থাকিবে, অন্যদিকে তেমন অভীষ্টসিদ্ধিইচ্ছা পরিপক্ক ও ঘনীভূত হইতে থাকিয়া এক অপূর্ব্ব উপাদেয় সামগ্রীতে তাহা পরিণত হইয়া উঠিবে। প্রথমতঃ একটু ধূমের আবির্ভাব দেখিতে পাইলে যেমন যজ্ঞকুণ্ডের কাষ্ঠে ঈষৎ আগুন ধরিয়াছে বুঝিতে হয়, তেমনি এই সাধনার প্রথম অবস্থাতে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ-সাধন-ইচ্ছা অর্থাৎ অর্থাগম কিম্বা নিজের কৃতিত্ব দেখাইবার বাসনা, অথবা লোক-প্রতিষ্ঠা-লাভ-আকাঙ্ক্ষা, অথবা অন্যের মুখে নিজের যশোগান শুনিবার পিপাসা প্রভৃতি বাজে বাসনাগুলি ক্রমে হ্রাস হইতেছে বুঝিলে তখন স্থির করিতে হইবে, ভিতরে তপোনল ঈষৎ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তপোনল পূর্ণপ্রদীপ্ত হইবার পরে আর কোন দিকেই চিত্তবৃত্তি প্রধাবিত হইতে পারে না; তখন প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞকুণ্ডের একাগ্র অগ্নিশিখার ন্যায় কেবল অভীষ্টসিদ্ধির দিকেই সমস্ত চিত্তবৃত্তি একমুখী হইয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে। এইরূপ অবস্থাতে চিত্তবৃত্তি যে পর্য্যন্ত না উপস্থিত হইবে, ততকাল দৃঢ় তপস্যা করিতেই হইবে। যতদিন নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনচিন্তা, ব্যক্তিগত সুখেচ্ছা এবং ব্যক্তিগত সাফল্য ও সৌভাগ্য-কামনা যজ্ঞভূমির বধ্য ছাগের ন্যায় স্বচ্ছন্দ হৃদয়ে উৎসর্গ করিয়া দিতে না পারা যাইবে, ততদিন তপস্যা-উদ্‌যাপনের সময় হয় নাই বুঝিতে হইবে। যেদিন অম্লানবদনে প্রফুল্লচিত্তে এই সকল কার্য্য করা যাইতে পারিবে, সেইদিন এ তপস্যার যজ্ঞকুণ্ডে পূর্ণাহুতি দিয়া নির্ম্মাল্যপুষ্প শিরে লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে হইবে। এইভাবে যে ভাগ্যবান্ পুরুষ কর্ম্মক্ষেত্রে নামিবার অধিকার আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই "সুনিশ্চিত সাফল্য"কে করামলকবৎ মুষ্টিমধ্যে লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিবেন; নতুবা জীবনব্যাপী সভাসমিতির এবং 'রেজিলউসন পাশের' বৃথা কার্য্যে বিব্রত থাকিয়া অন্তিমে কেবল হাহুতাশপূর্ণ "হয় না কেন?" "হচ্ছেনা কেন?" উক্তিতে আমাদের নিজ কপালে করাঘাত করিতে হইবে।

এইস্থলে আর একটী কথার অবতারণা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বিশ্বামিত্র দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও কেবল তাঁহার নিজের দেহকে ব্রাহ্মণ্যসাধনার অধিকারী করিতে কত দীর্ঘকালব্যাপী, কত কঠোর তপস্যা ও কত সাধ্যসাধনার ভিতর দিয়া আপনাকে শোধন করিয়া লইতে তাঁহাকে বাধ্য হইতে হইয়াছিল; রজোগুণপ্রধান একটী ক্ষত্রিয়ের দেহকে সদ্‌গুণপ্রধান ব্রাহ্মণের দেহে পরিণত করিতে তাঁহাকে কতই না বিপুল তপোনুষ্ঠান করিতে হইয়াছিল; ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া যাঁহারা মুহূর্ত্তমধ্যে একটী সমগ্র জাতিকে ধরিয়া অন্য জাতিতে উন্নীত করিতে আজই প্রয়াসী, তাঁহাদের অবস্থা যে কতদূর শোচনীয়, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু বলিতে বাধা নাই, ইহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক শোচনীয় অবস্থা ইদানীন্তন কালের আত্মবিস্মৃত হতভাগ্য ব্রাহ্মণদের—যাঁহারা তপঃ জপ, যাগ যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা এবং সাধনা দ্বারা কর্ম্মশক্তিসঞ্চয়ের কিছুমাত্র প্রয়োজনীয়তা

উপলব্ধি না করিয়া কেবল বৎসরান্তে একবার সভাসমিতি আহ্বান করিয়া শুধুই "রেজলিউসন্" পাশ দ্বারা ব্রাহ্মণ্যসমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে আজি বদ্ধপরিকর হইতেছেন। ব্রাহ্মণের এই নিদারুণ শোচনীয় অবস্থা আমার ন্যায় শত শত ব্রাহ্মণ বুঝিতেছেন, এজন্য তাঁহারাও দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়া রহিয়াছেন; অথচ পরিতাপের বিষয় এই যে, ইহার প্রতিকার করে একপদও তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। কোন্ লৌহশৃঙ্খলে ব্রাহ্মণের হস্ত পদ বাঁধা পড়িয়া আজি তাঁহাকে কর্ম্মশক্তিবিহীন একটী জড়পিণ্ডে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই এখন চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়।

এই চিন্তা করিবে কে? আমরা যেরূপ বহুবর্ষকাল নিষ্কর্ম্মা হইয়া শুইয়া থাকিয়া কর্ম্মশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি, সেইরূপ ইদানীং পরের চিন্তা চর্ব্বণ করিতে করিতে চিন্তাশক্তিও হারাইতে বসিয়াছি। টীনের কৌটাতে পূর্ণ বিলাতী আমদানী দুধে যেমন আজি কালি এদেশের ধনবান্ ঘরের বালকবালিকাগণের দেহের পরিপোষণ হইতেছে, তেমনি বিলাতী আমদানী পুস্তক-পুস্তিকা ও মাসিকপত্রাদির পৃষ্ঠা-বিন্যস্ত পরের চিন্তা গুলিয়া খাইয়া আমাদের দেশের ভদ্রসমাজের প্রায় সকল পরিবারেই যুবকযুবতীগণের অন্তঃকরণের পুষ্টিসাধন হইতেছে। আশৈশব পরের ছাঁচে ঢালা চিন্তাতে প্রতিপালিত হইতে অভ্যস্ত থাকিয়া আমাদের ব্যক্তিগত স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি ক্রমে লুপ্ত হইবার দশাতে উপনীত হইয়াছে। এমন অবস্থায় এ সময়ে এ সকল কথা চিন্তা করিবার প্রবৃত্তি কাহার হইবে?

কিন্তু হিন্দুজাতিটাকে রক্ষা করিতে হইলে এখন আমাদিগকে এই সকল কথার চিন্তাতে একটু মনোনিবেশ করিতেই হইবে। আমাদের সাধনা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে। হিন্দুত্বের দুইটি ধারার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। হিন্দুত্বের এই দুইটী ধারার উপরে সমান দৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগকে সাধনা-কার্য্যে নামিতে হইবে। এইভাবে সাধনা করিতে পারিলে সিদ্ধি সুনিশ্চিত। এখন আমাদের, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের, সাধনা ও সিদ্ধি যে কি, তাহাই বুঝিতে হইবে।

সর্ব্বপ্রথমে ইহাই জানিতে হইবে যে,—ব্রাহ্মণ্য-সাধনার "ক খ" হইতেছে সন্ধ্যা, গায়ত্রী, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, নিত্যকর্ম্মাদির যথাকালে যথাবিধি সম্পাদন অভ্যাস। 'সদাচার' এ সাধনার দ্বিতীয় ক্রম। সত্যে অবস্থান ইহার তৃতীয় ক্রম। লোক-মঙ্গলে আত্মবিনিয়োগ এ সাধনার চতুর্থ ক্রম। একটিকে আয়ত্ত করিয়া অন্যটিকে ধরিতে বহু তপস্যার প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ্য-সাধনাতে সিদ্ধিলাভ এজন্য সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। কিন্তু সুপথে চালিত সাধনা দ্বারা ইহা লাভ করা যাইতে পারে।

সিদ্ধি মাত্রেই সাধনা-সাপেক্ষ। সাধনা আবার তেমনি ইচ্ছামুখাপেক্ষী। যেখানে ইচ্ছা নাই, সেখানে সাধনা নাই, যে কর্ম্মে প্রবৃত্তি নাই, সে কর্ম্মক্ষেত্রে সুফল প্রাপ্তিরও কোন প্রত্যাশা নাই। এইজন্যই বলিতে হয়—ইচ্ছাই সিদ্ধির জন্মদাতা। কেবল ইচ্ছা করিলেই যে কোন ব্যক্তি যে কোন কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে

পারেন না। মানব-হৃদয়ের ইচ্ছা-উৎস হইতে নিক্রান্ত সুপথে প্রবাহিত সবল কর্ম্মধারাই কেবল সিদ্ধি-সাগরে যাইয়া পৌছিতে পারে। এইজন্য সিদ্ধির অনুকূল কার্য্যপ্রবাহকেই সাধনা বলা যায়। পাশ্চাত্য ভাষাতে অধুনা Culture শব্দ কতকটা আমাদের এই সাধনা-ভাব-জ্ঞাপক হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তাহাদের সাধনা এক প্রকৃতি-পদ্ধতির, আমাদের সাধনা অন্য প্রকৃতি-পদ্ধতির। তাহাদের সাধনা এবং আমাদের সাধনা সম্পূর্ণ দুইটি ভিন্ন বর্ণে এবং ভিন্ন ধাতুতে গঠিত বলিতেও বাধা নাই। পাশ্চাত্য সাধনা বৈশ্যভাবাত্মক, কাজেই রজোগুণ-প্রধান, এজন্য রজতের আভাতে তাহাকে সদা আলোকিত দেখিতে পাই। আমাদের এদেশের ব্রাহ্মণের সাধনা সদ্‌গুণের প্রভাবে প্রভাম্বিত, কাজেই যেখানে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার ভেজালে উহাকে বিকৃত করিতে পারে নাই, সেখানে আজিও উহা তপ্তকাঞ্চনবৎ সমুজ্জ্বল, নির্ম্মল এবং সুপবিত্র। ব্রাহ্মণ্য-সাধনার এই সুপবিত্র নির্ম্মল ভাব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে চাহিলে, আগে অন্য জাতির সাধনা-ক্রমের দিকে আমাদিগের দৃষ্টি একটু ফিরাইতে হইবে।

ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার স্তরে সংস্থিত ভিন্ন ভিন্ন মানবের সাধ্য বস্তু এবং সাধনাক্রম বিভিন্ন। ইউরোপের সুসভ্য জাতিসমূহের সাধ্যবস্তু প্রধানতঃ দৈহিক সুখ বা বাহ্য সুখ। উহারই সংস্থান জন্য কাজেই তাঁহারা উহারই অনুকূল বাহ্যসম্পদসকল বৃদ্ধির চেষ্টাতেই সর্ব্বদা রত হইয়া থাকেন। বাহ্য বিলাস-সুখ-সম্বর্দ্ধক কলকারখানার আবিষ্করণের দিকে একারণে তাঁহাদিগের প্রতিভা সর্ব্বদা সতেজে প্রবহমান। তাঁহাদের সাধ্য বস্তু লাভের প্রধান উপকরণ অর্থ। এ কারণ তাঁহাদিগকে অর্থকরী বিদ্যা ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বদা সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এ দেশের ক্ষত্রিয়জাতির সাধ্যবস্তু এক সময়ে ছিল—বীরত্বে প্রতিষ্ঠালাভ। এ সময়ে এদেশের বৈশ্য কৃষকের সাধ্যবস্তু হইয়াছে শস্যসংগ্রহ। কেবল শস্যের গোলা পূর্ণ করিবার চেষ্টাতেই সে এখন তাহার জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়া রাখে। এখন এ দেশের অনেক ব্রাহ্মণ ধনী এবং বিদ্বান্—যাঁহারা পুরুষত্ব হারাইয়া স্ত্রীত্ব দশাতে আসিয়া নামিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের এ সময়ে একমাত্র জীবনের লক্ষ্যসামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে—স্বর্ণরৌপ্যের পদক কণ্ঠে ধারণ আর একটা কিছু উচ্চ পদবীলাভ। প্রকৃত ব্রাহ্মণের জীবনের লক্ষ্য বা সাধনার বস্তু এ সকল অপেক্ষা বহু বহু দূরে, ঊর্দ্ধে সংস্থিত। জীবের জড়ভাব বা বদ্ধভাব বিদূরিত করিয়া চৈতন্যলাভ বা মুক্তিলাভই হইতেছে ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক সাধ্যবস্তু। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষ হইতে ব্যষ্টিভাবে ঐ সিদ্ধির সাধনার দিকে কেহ অগ্রসর হইতে থাকিলে, তখন হিন্দুরা তাঁহাকে সাধু তপস্বী বলিয়া সসম্ভ্রমে আখ্যা দিয়া থাকেন। আর যখন সমষ্টিভাবে সমগ্রলোকের ঐরূপ প্রাপ্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কোন ব্রাহ্মণ কার্য্য করেন, তখনই কেবল তিনি তাঁহার ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন বুঝিতে হয়। এই জন্যই বলিতে হয়—ব্রাহ্মণ্যসাধনার ন্যায় উচ্চ সামগ্রী বিশ্বসংসারে আর কিছুই নাই।

ব্রাহ্মণ্যসাধনা একদিকে যেমন বড়ই উচ্চ সামগ্রী এবং ইহার সাধক হইতে যেমন অসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও বিপুল তপশ্চরণের প্রয়োজন, তেমনি আবার অপর দিকে এই সাধনা-কার্য্য আমাদের উপরে স্থিত পিতৃলোকবাসী আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের এবং দেবলোকবাসী আমাদের উপাস্য দেবদেবীগণের সহায়তা আমরা সহজেই লাভ করিতে পারি এবং তাঁহাদের সহায়তাবলে একটুও বলীয়ান্ হইতে পারিলে, আপনারা স্মরণ রাখিবেন, আমাদের সম্মুখস্থিত পর্ব্বতপ্রমাণ অসাধ্য ব্যাপারকেও আমরা সহজে অতি সহজসাধ্যে পরিণত করিয়া তুলিতে পারি। লোহার রেল লাইনের উপর সংস্থিত একখানা মাল বোঝাই বৃহৎ ওয়াগন গাড়ীকে যেমন একজন ক্ষুদ্র মানুষে একটু চেষ্টা করিলেই সহজে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে পারে, সেইরূপ ব্রাহ্মণ্য-সাধনার সমতল স্বর্ণবর্ত্মে সংস্থিত যে কোন লোকহিতকর কার্য্যকেই ব্রাহ্মণে অতি অনায়াসে গতিশীল করিয়া লইতে পারেন। যেমন পবনদেবের সহায়তালাভ করিতে পারিলে, প্রবল প্রতিকূল স্রোত অগ্রাহ্য করিয়া পাল উঠাইয়া নৌকার মাঝিরা পরমোৎসাহে তাহাদের নৌকাখানিকে উজানে চালাইতে পারে, তেমনি পিতৃপুণ্যফলে এবং দৈববলে বলীয়ান্ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্য-সাধনাতে সহজেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। আবশ্যক কেবল সাধনা-মার্গটা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যভাবাপন্ন হওয়া।

আমাদের সাধনা-মার্গটাকে ব্রাহ্মণ্যভাবাপন্ন করিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে আর একটা কার্য্য করিতে হইবে। আমরা যে কি গুরুতর কার্য্যে আজ ব্রতী হইতেছি, তাহাও একটু চিন্তা করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

কার্য্যের গুরুত্ব পূর্ণ উপলব্ধি করিতে না পারিলে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সাফল্য লাভ দূরে থাকুক, কার্য্যে আত্মনিয়োগের প্রকৃত অধিকার পর্য্যন্ত লাভ করা যায় না। দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্মণ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা কিম্বা ভাঙ্গা হিন্দুসমাজকে পুনর্গঠন করা যে কি গুরুতর ব্যাপার, তাহা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া কেবল অতি সহজসাধ্য উপায়ে সভামঞ্চে বক্তৃতা পাঠ করিয়া অথবা সংবাদপত্রস্তম্ভে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া তাহা সুসম্পন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকি। কাজেই আমাদের রোপিত কার্য্যরূপ বৃক্ষের ফলগুলি মুকুলেই অথবা তাহারও পূর্ব্বে অঙ্কুর-উদ্গম অবস্থাতেই শুষ্ক হইয়া যে ঝরিয়া পড়িতে থাকে, ইহাতে আর বিস্মিত হইবার বিষয় কি আছে? এরূপ অবস্থায় কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া "হয় না কেন?" বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার অধিকার আমাদের আছে কি?

কার্য্যের সফলতালাভ করিতে হইলে—কেবল উহার গুরুত্ব উপলব্ধিই যথেষ্ট নহে এবং কেবল তপস্যাই উহার একমাত্র সাধনসহায় নহে। কেবল তপস্যা দ্বারা রাজা বিশ্বামিত্র যদি ব্রাহ্মণপদ লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ-বশিষ্ঠের নিকট যাইয়া ব্রাহ্মণের মুখের বচন অর্জ্জন দ্বারা তাঁহাকে সে পদ লাভের প্রয়াসী হইতে হইত না। তপোবলের দ্বারা আত্মাকে বলীয়ান্ করিয়া সাধনা দ্বারা স্বয়ং শক্তিসম্পন্ন হইয়া সাধক পুরুষকে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নামিয়া সুপথ-চালিত কর্ম্মকৌশলের পুরুষার্থ সহযোগে অভীষ্টকার্য্যে সংসিদ্ধি লাভ

করিতে হয়। পূর্ব্বকালের কর্ম্মবীরেরা এইরূপেই কর্ম্মসাফল্য লাভ করিতেন। আমাদিগকেও এসময়ে আমাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যে সুফলপ্রাপ্তির প্রত্যাশী হইতে হইলে, এইভাবেই কার্য্য করিতে হইবে।

আপনাকে কর্ম্মক্ষেত্রের যোগ্য পাত্র করিয়া গড়িয়া তুলিয়া পরে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে হইবে। কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া সহযোগী, বা সহকর্ম্মীদের সহিত একত্রিত হইয়া সমউদ্দেশ্যের একগাছি পুষ্পহার দ্বারা সকলের কণ্ঠদেশ সপ্রেমে একত্রে জড়াইতে হইবে, যাহাতে সমান পদ বিক্ষেপে অভীষ্ট পথে চলিতে পারা যায়, তাহার অভ্যাস করিতে হইবে, তাহা না করিতে পারিলে নিজের অধিক উন্নতি বা ব্যক্তিগত বিশেষ কোন স্বার্থের দিকে এক চক্ষু রাখিয়া একপাশ কাটিয়া দৌড়াইতে চেষ্টা করিলেই মুহূর্ত্ত মধ্যে সহযোগিতার সুসম্বদ্ধ হার ছিঁড়িয়া মাটিতে পড়িয়া যাইবে, নিজেকেও স্বার্থচিন্তায় জড়িত হইয়া হোঁচোঠ খাইয়া মাটিতে পড়িতে হইবে। আমাদের জীবনব্যাপী চেষ্টা, যত্ন, উদ্যম, নিষ্ফলে পর্য্যবসিত হইবে।

যেমন একটি বৃক্ষের শত দিকগামী শত শত শিকড় মাটির ভিতরে অতি সংগোপনে আত্ম-অস্তিত্ব ঢাকিয়া রাখিয়া দিবারাতি সমান পরিশ্রমে বৃক্ষটীর পোষণকার্য্যে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে রস যোগাইয়া থাকে, সেইরূপ প্রকৃত কর্ম্মিগণ আপন প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি প্রতিপত্তি, নাম, যশঃ, বাহিরে বিস্তার করিবার দিকে আদৌ কিছুমাত্র যত্ন না করিয়া মূল অভীষ্ট সংসাধনের দিকে স্ব স্ব কর্ম্মশক্তি সর্ব্বক্ষণ নিয়োজিত করিয়া রাখিতে পারিলে, তবেই কর্ম্মবৃক্ষ যথাকালে সুফল প্রসব করিতে পারে। সত্য সত্য কার্য্য করিতে হইলে আমাদিগকে কর্ম্মবৃক্ষের বাহির শোভার ফুল না সাজিয়া মূলস্থানীয় হইয়া থাকিতে হইবে। ইহার অন্যথাচরণ করিলেই আমরা কর্ম্মের সুফল উৎপাদক হইতে পারিব না—পক্ষান্তরে আমরা কর্ম্মের অভিলষিত ফলের হন্তারক হইব মাত্র। কিন্তু এ ভাবে আপনাকে কর্ম্মের তলে ডুবাইয়া রাখিয়া নিঃশব্দে কর্ম্ম করিয়া যাওয়া সকলের পক্ষে এ সময়ে সম্ভবপর নহে।

এ সময়ে ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব মাত্রেই যে ব্রাহ্মণ্যসাধনার অধিকারী হইতে পারিবেন, এরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। এ কারণ, ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন ব্রাহ্মণকে নিম্ন স্তরের সাধনাতে এবং বৈশ্যভাবাপন্ন ব্রাহ্মণকে তাহারও নিম্ন স্তরের সাধনাতে নিযুক্ত থাকিয়া অভিলষিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির দিকে যথাশক্তি চেষ্টা করিতে হইবে। যে ব্রাহ্মণ দুর্দ্দশার চরম সীমাতে নামিয়া সম্পূর্ণ শূদ্রভাবাপন্ন হইয়াছেন, পরপদ সেবাতেই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে তাঁহার হীন জীবন ক্ষেপণ করিতেই হইবে, কিন্তু সে অবস্থাতে থাকিয়াও ভাল ব্রাহ্মণের উচ্চ কর্ম্মাদর্শ চক্ষুর সম্মুখে সর্ব্বদা দেখিবার সুবিধা পাইলে তিনিও স্বজাতির অভ্যুদয়সাধক কিছু না কিছু কার্য্য করিবার সামর্থ্য লাভ করিতে পারিবেন।

এ সময়ে আর একটী কথা আমাদের সকলেরই স্মরণ করা উচিত। ভগীরথের পূর্ব্ব-পুরুষগণকে উদ্ধারের জন্য গঙ্গানয়নব্যাপার এক জীবনব্যাপী তপস্যার ফলে সংসিদ্ধ হয় নাই; ঐ কার্য্য সম্পাদন করিতে পর পর তিন পুরুষের কঠোর তপস্যার প্রয়োজন হইয়া-

ছিল। একটা বংশের অধোগতিপ্রাপ্ত কতকগুলি লোককে উদ্ধার করিবার জন্য যদ্যপি এত তপস্যার প্রয়োজন হয়, সে স্থলে বিংশতি কোটী নরনারীদেহে সংগঠিত বিশাল হিন্দু-জাতিকে অধোগতির শেষ সীমা হইতে উদ্ধার করিতে যে কত তপশ্চরণের প্রয়োজন, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। রাজপথে একটা ঘোড়াসহ একখানা গাড়ী উল্টাইয়া পড়িলে তাহা তুলিতে হইলে, কত লোককে একত্র হইয়া কতই পরিশ্রম করিতে হয়। এ দৃষ্টিতে ভূতলে নিপতিত এই বিরাট হিন্দুসমাজকে উত্তোলন করিতে কত আয়োজন অনুষ্ঠান ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তাহা সহজেই বিবেচনা করা যাইতে পারে। এই দৃষ্টিতে বিচার করিতে উপস্থিত হইলে আমাদের সাধনার ফল সদ্য সদ্য হাতে পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইবার আশা আমরা এক্ষেত্রে কখনই করিতে পারি না।

কার্য্যের অল্প সাফল্যেই এখন আমাদের মধ্যে অনেককেই সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া থাকিতে হইবে, কারণ এ সময়ে অনেক ব্রাহ্মণই শূদ্রভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন এবং কর্ম্মশক্তি হারাইয়াছেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ্যভাবের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকার্য্যে, "কাল" যে আমাদের তীব্র প্রতিকূলাচরণ করিতেছেন, ইহাও সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। কালের সহিত এ তুমুল সংগ্রামে আমাদের সাফল্য লাভের প্রত্যাশা সুদূরপরাহত। কিন্তু সে চিন্তাতে প্রকৃত ব্রাহ্মণের হৃদয়কে এক মুহূর্ত্তের জন্যও অবসন্ন করিতে পারে না। অন্য জাতি জয়-পরাজয় দ্বারা কর্ম্মের সফলতা বিফলতার পরিমাণ করিতে অভ্যস্ত। প্রকৃত ব্রাহ্মণ তাহা করিতে চাহেন না। কোন সাধারণ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের বীরত্ব দেখাইয়া সেনাপতির পদে উন্নীত হইতে পারিলে, একটা ভিক্‌টোরি ক্রস্ অথবা নিতান্ত পক্ষে একটা বিজয় মেডেল পাইয়া, তাহা কণ্ঠে ঝুলাইতে পারিলে আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করেন; অন্য জাতির কোন বীরপুরুষ যুদ্ধে জয়ী হইয়া একটা নূতন রাজ্য লাভ করিতে পারিলে আপনাকে মহাভাগ্যবান্ মনে করিতে পারেন। প্রকৃত ব্রাহ্মণের উচ্চাভিলাষের গতি পূর্ব্বকালেও এ দিকে কখনও প্রধাবিত হয় নাই, এখনও হয় না। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাকে যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণভাবাপন্ন হইয়া কর্ম্মরূপ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে নামিতে হয়, তাহা হইলে আমার দৃষ্টিতে আমার সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা আসিয়া উপস্থিত হইবে তখন—যখন জীবনব্যাপী পরিশ্রমে আমি ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িব, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে কাঁপিতে থাকিব, শত্রুপক্ষের নির্ম্মম কশাঘাতে দেহ ক্ষতবিক্ষত হইবে, নাক মুখ দিয়া রক্তধারা গড়াইতে থাকিবে, এই কলিকালের অস্থিপেষী মহাচক্রের নীচে পড়িয়া আমার পঞ্জরাস্থি ভাঙ্গিয়া চূরিয়া যাইতে থাকিবে, যখন এ দেহখানি প্রাণবায়ুকে ধরিয়া রাখিবার আর উপযুক্ত থাকিবে না, সেই দেববাঞ্ছিত শুভ মুহূর্ত্তে উর্দ্ধনেত্রে যখন আমার উপাস্য দেবীর মুখপানে আমি চাহিয়া দেখিতে থাকিব, যখন এই চরমসময়ে ভারতের কর্ম্মভূমিতে আবির্ভূতা, চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের ভগ্ন স্তূপের উপরে বিষণ্ণবদনে দণ্ডায়মানা বিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমার পরম উপাস্যা পরমাশক্তির মুখমণ্ডল হইতে নিঃশব্দে উচ্চারিত দৈবী ভাষাতে আমার ক্ষুদ্র জীবন-ব্যাপী কার্য্যের অনুমোদন হইল আমি জানিতে পারিব, সময়ে আমার সেই এবারকার এই

জীবনের এই ব্রাহ্মণ-দেহের ব্রাহ্মণ্যসাধনার পরিসমাপ্তি হইল বুঝিয়া পরমানন্দে চক্ষু দুইটি মুদ্রিত করিব। প্রকৃত ব্রাহ্মণের দৃষ্টিতে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষা আর উচ্চ আশা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্রাহ্মণের পক্ষে কিছুই হইতে পারে না। এ সময় ব্রাহ্মণ্য-সাধনার ইহাই পরা-সিদ্ধি। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইহাপেক্ষা উচ্চ বর ব্রাহ্মণের পক্ষে চাহিবার আর কিছুই নাই। এই মহতী সভাতে সমাগত ব্রাহ্মণগণের চরণে এজন্য সবিনয় প্রার্থনা করি, আশীর্ব্বাদ করুন—চরম সময়ে এইরূপ ব্রাহ্মণ্য-সাধকের আকাঙ্ক্ষিত ব্রাহ্মণোচিত মৃত্যুর পরম সৌভাগ্য যেন লাভ করিতে পারি।

শাণ্ডিলী ও সুমনা।

যজ্ঞীয় অনলশিখার মত জ্যোতির্ম্ময়ী শাণ্ডিলী যখন স্বর্গে সতীকুঞ্জের স্বর্ণদ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন স্বর্গের যাবতীয় সতী তাঁহার অভ্যর্থনা করিবার জন্য সেই স্থানে উপনীত হইলেন। গৌর, শ্বেত, শ্যাম, কৃষ্ণবর্ণা রমণীগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। সচল রক্তনীলশ্বেতপদ্মশ্রেণী যেন লক্ষ্মীকে বেষ্টন করিল। সে কি সুন্দর পবিত্র দৃশ্য। চারিদিকে অসংখ্য তারা, মধ্যে মূর্ত্তিমতী চন্দ্রপ্রভা। কোন সতী পারিজাতমালা গলায় পরাইয়া দিল, কোন সতী কবরীর উপর অজস্র পুষ্প চাপাইতে লাগিল, কোন সতী চন্দন-কুঙ্কুমগন্ধি সলিলকণা সর্ব্বাঙ্গে সেচন করিল, কোন সতী বা অমৃতভাণ্ড মুখের উপর ধরিল। শাণ্ডিলীর স্বর্ণদোলা জ্যোতিতে সতীকুঞ্জ আলোকময় করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সতীকুঞ্জের অভ্যন্তরে হীরামুক্তাখচিত স্বর্ণময় সিংহাসন শাণ্ডিলীর উপবেশনার্থ সজ্জিত ছিল। দেবরাজমহিষী—শচী, কমলদলবিহারিণী - লক্ষ্মী, মদনপ্রেয়সী রতি আসিয়া সতীর অভ্যর্থনা করিলেন, হাত ধরিয়া সেই সজ্জিত সিংহাসনে সাদরে বসাইলেন।

শাণ্ডিলী অসামান্যপতিব্রতা যথার্থ সংসারব্রতে দীক্ষিতা প্রকৃত শিক্ষাপ্রাপ্তা আদর্শ রমণী ছিলেন। রূপে, গুণে, স্বভাবে, ব্যবহারে, বিদ্যায়, বিনয়ে, আচারে, অনুষ্ঠানে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, স্নেহে, দয়ায় মর্ত্তের অনুকরণীয়া ছিলেন।

সুমনা নাম্নী দেবলোকবাসিনী কোন সতী আসিয়া শাণ্ডিলীর পদতলে মাথা রাখিয়া প্রণতা হইল। শাণ্ডিলী সসঙ্কোচে পদ সরাইয়া লইয়া আলিঙ্গনে তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। সুমনা জিজ্ঞাসা করিল—"দেবি, তুমি সতীকুলশিরোমণি, তাই আজ সতীকুঞ্জের রাণী হইলে! আমরা সখীর মত তোমাকে ভাল বাসিব, দাসীর মত সেবা করিব। তোমার মুখের কথায় সকলে বাঁচিবে। তোমার আজ্ঞায় সকল সতী চলিবে, তোমার

সাহচর্য্যে সকলে ধন্য হইবে। বল দেবি! কোন্ পুণ্যে তুমি কর্ম্মফল খণ্ডন করিলে, কিরূপে ধর্ম্ম ও সদাচার পালন করিয়া সমুদায় পাপ নাশ করিলে? বল দেবি! জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির মত বিমানে চড়িয়া আকাশ পথ উজ্জ্বল করিয়া আকাশ পথ উদ্ভাসিত করিয়া কোন্ গুণে সতীকুঞ্জের রাণী হইলে? কি তপস্যা কি দান কি কঠোর অনুষ্ঠান করিয়াছ? বল, আমরা শুনিয়া জীবন ধন্য করি।

শাণ্ডিলী। কৈ আমি ত কোন এমন বিশেষ পুণ্য কর্ম্ম, বড় রকমের ধর্ম্মকর্ম্ম ও কঠোর অনুষ্ঠান করিয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না। দুর্ব্বলা অবলা, তপস্যা কি করিব? দরিদ্র গৃহস্থ রমণী, ধন কোথা হইতে দান করিব? জানিনা কোন্ পুণ্যে, কোন গুণে, সুরলোকে আসিলাম, জানিনা কিসের বলে সতীকুঞ্জের রাণী হইলাম।

সুমনা। দেবি! নিজমুখে পুণ্যের বড়াই করিতে নাই সত্য, ধর্ম্মানুষ্ঠানের জাঁক করিতে নাই যথার্থ। কিন্তু তাই বলিয়া স্বরূপ কহিবে না? তুমি পুণ্য অনুষ্ঠান করিয়াছ, কি পাপ অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহার বিচার করায় তোমার প্রয়োজন নাই। তুমি বল কি করিয়াছ, কিভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছ, কি রকমে সংসারে বাস করিয়াছ? তাহা যদি নাই বলিবে, তবে তোমার দ্বারা জগদ্বাসিনী রমণীগণ কি উপকৃতা হইবে এই পুণ্যময়ী জীবন-কথা, এই আদর্শ চরিতগাথার প্রচারে তোমার লাভালাভ নাই, কিন্তু জগদ্বাসী নরনারীর লাভালাভ আছে। আর তোমারই বা নাই কেন? যশঃই অমৃত, যশঃই অবিনশ্বর। যশের দ্বারাই নরনারী মৃত্যুর পরেও জীবিত থাকে। কীর্ত্তিমণ্ডিত দেহই পবিত্র, অনশ্বর ও স্বর্গীয়। শুভ্র নির্ম্মল অবিনশ্বর যশের যাহারা প্রার্থী নহে, সেই গৌরববুদ্ধিহীন ঐহিক কামনামুগ্ধ নরনারীর জীবন বিড়ম্বনা মাত্র। দেখ দেবি! তোমার চরিতগাথা শুনিবার জন্য সকল সতী আজ সমুৎসুক। ইন্দ্রাণী, নারায়ণী ও কামপ্রিয়া পর্য্যন্ত সমুৎকণ্ঠিতা।

শাণ্ডিলী। প্রিয়বাদিনি! নিশ্চয়ই তুমি প্রিয়বচন দ্বারাই এই সুরলোক জয় করিয়াছ, সতীকুঞ্জের আশ্রয় পাইয়াছ। আমার তুচ্ছ জীবনকথা শুনিতে চাহিয়াছ, শোন! আমি ভারতবর্ষে "সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা" বঙ্গভূমির উদরে জন্ম লইয়াছি। সগরকুলোদ্ধার-কারিণী ভাগীরথীদেবীর ক্রোড়ে শিশুকাল কাটাইয়াছি। মধ্যযৌবনে পতিপদতলে মাথা রাখিয়া ভৌতিক দেহ সেই ভাগীরথীর শ্মশানে রক্ষা করিয়াছি। দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহিণী আমি সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব কোথা হইতে? দীন-দরিদ্রের সেবা করিবার সামর্থ্যই বা কোথায়? সংসার লইয়া ব্যতিব্যস্ত, ধর্ম্মকর্ম্মে তেমন মন দিব কোথা হইতে? তবে আমার সাধ্যমত পতি-সেবাই করিয়াছি, কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে মতি রাখিয়াছি। তাঁহার সংসার মাথায় করিয়া লইয়া তাঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্য জীবনের সাধনা করিয়া লইয়া তাঁহার চরণ দেবতার পীঠ ভাবিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছি।

সুমনা। নারীজীবনের ইহাই ত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম দেবি! সতীনারীর পতিই ত দেবতা, পতি-সেবাই ত তপস্যা, পতির সন্তোষ বিধানই ত জীবনের সাধনা। কায়মনোবাক্যে পতির চরণে,

মতি, পতির সংসার মাথায় করিয়া লওয়া, পতির সুখদুঃখের স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দেওয়াই ত সতীর ধর্ম্ম। বল দেখি, কিভাবে সেবা করিতে? কি রকমে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে।

শাণ্ডিলী। চারুহাসিনি! আমি মাথায় জটা রাখিয়া, গৈরিক বসন পরিয়া, ভস্ম মাখিয়া তপস্বিনী সাজি নাই। পতির গৃহই আমার দেব-মন্দির, পতির চরণই আমার মহাতীর্থ। আমি অন্য দেবমন্দির বড় ভাবি নাই, অন্য তীর্থে বড় গমন করি নাই। পতিই আমার দেবতা, পতিই আমার সর্ব্বস্ব, পতিই আমার সঙ্গ। পতির শয্যা আমার সিংহাসন, পতির পাকশালা আমার যজ্ঞস্থলী, পতির সংসার আমার স্বর্গ। পতির গৃহ আমার ক্রীড়াক্ষেত্র, প্রীতি-উপবন, শান্তি-আশ্রম, একাধারে সবই। শয়নে-স্বপনে আহারে-বিহারে পতির চিন্তাই আমার জপমালা ছিল। পতির সুখসন্তোষের দিকে আমার দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তর প্রাণ সর্ব্বদাই অবহিত ছিল। পতির সংসারকে আমি পতি হইতে পৃথক ভাবি নাই, অভেদই ভাবিয়াছি। আমার দৃষ্টির ভিতর অংশটি সর্ব্বদাই পতির চরণ নীচে সংসক্তা ছিল, কিন্তু বাহিরের অংশটি পতির সংসারের উপরই ছিল, আমি পতি-দেবতার ধ্যানে ও আরাধনায় অন্তর্দৃষ্টিকে সর্ব্বদাই ফুটাইয়া রাখিতাম বলিয়া সংসারের কোন কর্ত্তব্যে অবহেলা ও অমনোযোগ দেখা দিত না। পতির সন্তুষ্টিই আমার জীবনের সাধনা। শ্বশুর ও শাশুড়ী, ননদ ও ভাজ, দেবর ও সন্তান প্রভৃতির সন্তুষ্টিও সেই সন্তুষ্টির পৃথগাকার মাত্র। পতির পিতা মাতাই আমার পিতামাতা, পতির ভাই ভগিনীই আমার ভাইভগিনী, পতির গুরুজন ও স্নেহপাত্র আমারই গুরুজন ও স্নেহপাত্র; সমন্বয়ে মন রাখিয়া সংসার করিয়াছি। পতির আদরে আদরিণী, স্বামিসৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী, পতিভক্তির বলে ভক্তিমতী ছিলাম সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া আদরে ঢলিয়া পড়িতাম না, সৌভাগ্যের বড়াই করিতাম না, শক্তির গর্ব্বে গর্ব্বিতা ছিলাম না। স্বামী ভাল বাসিতেন, শ্বশুর শাশুড়ী আমাকে কন্যার চেয়েও ভাল বাসিতেন। অন্ততঃ আমি ত সেইরূপই দেখিতাম। তাঁহারাও সেই মতই চলিতেন, ননদীগণ আমাকে সখীর ন্যায় স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতেন। দেবরেরা আমার ভায়ের চেয়েও বড় ছিল। তাহারা বউদিদি বলিয়াই অজ্ঞান। মায়ের অপেক্ষাও আমাকে বুঝি ভক্তি অধিক করিত। আবদার জুলুম সবই আমার উপর। পতির ভালবাসা, শ্বশুর শাশুড়ীর আদর, ননদীগণের সদ্ব-বহারে, দেবরদের ভক্তি, দাসদাসীগণের শ্রদ্ধা সবই আপনার উপর নির্ভর করে। দর্পণে মুখ দেখার মত। আমি যেমন দেখাইব, সেই মতই দেখিব, আমি যেমন ব্যবহার করিব, সেই মতই ব্যবহার পাইব, ইহাই সংসারের নিয়ম।

পতি আমার পূজায় সামগ্রী, ক্রীড়ার ক্রীড়ণক, প্রণয়ের সখা, নারীজীবনের সাথী ছিলেন। তাঁহার সুখেই আমার সুখ, তাঁহার দুঃখেই আমার দুঃখ। তাঁহার সন্তোষে আমার জীবনের শান্তি; আমি আমার নিজের সুখশান্তি কখন স্বতন্ত্র ভাবিয়া পৃথক করিয়া দেখি নাই। আমার নিজের আবার কি? নিজের ব্যক্তিত্বকে বিসর্জ্জন না দিতে পারিলে প্রকৃত পতিচরণে

প্রাণ দেওয়া চলে না। স্বার্থ সম্পূর্ণ পরিহার করিতে না পারিলে, পতিপ্রেমের অধিকার জন্মে না।

কুটিলভাবের আশ্রয় লইয়া আমি গৃহধর্ম্ম পালন করি নাই। গৃহধর্ম্ম আমি আসল ধর্ম্মের পৃথক্ আকারমাত্র ভাবিয়া আসিয়াছি। পিতা-মাতার সেবা ও ভক্তি করা সন্তানের মহাধর্ম্ম, পতির হইয়া আমি সেই মহাধর্ম্ম পালন করিয়া গিয়াছি, পতি জীবিকা অর্জ্জনেই ব্যস্ত, বৃদ্ধ পিতামাতা, যুবতীপত্নী, শিশু-সন্তান, অসহায় ননদী, অক্ষম দেবর প্রভৃতির খবরাখবর লওয়া তাঁহাদের সকল দিক দেখা, তাঁহার পক্ষে সকল সময়ে সম্ভবপর নহে, আমি তাঁহার সে খবরাখবর লওয়ার, সে সকল দিক দেখাশুনার কোন দিকই অসম্পূর্ণ রাখিতাম না। শ্বশুর শাশুড়ীর কোনরূপ কষ্ট না হয়, সেজন্য আমি সর্ব্বদাই অবহিত থাকিতাম। কোনরূপ অসুবিধা না হয়, সে দিকে নিরন্তর দৃষ্টি রাখিতাম্।

ননদীগণকে ভগিনীর মত ভালবাসিতাম, সখীর মত প্রাণের কথা কহিতাম, প্রচ্ছন্নভাবে দাসীর মত তাঁহাদের অনুবর্ত্তন করিতাম। অতিথি-ব্রাহ্মণের সাদর অভ্যর্থনা সংকারে কখন আমি ত্রুটি করি নাই। দেবতার পূজায় কখন অভক্তি দেখাই নাই। পতি আমার সজীব প্রত্যক্ষদেবতা, তাঁহা হইতে অভিন্ন বোধেই দেবমূর্ত্তির পূজা করিয়াছি।

প্রাতঃকালে স্বামীর শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিতাম। পতির পদধূলি মাথায় লইয়া শয্যামন্দির ত্যাগ করিতাম। সংসারকে আমি স্বামীরই জড়বহির্রূপ বলিয়া ভাবিতাম। সেই বহির্রূপের সেবা ও স্বামীর সেবা, সংসারের কাজ সেই পতিদেবতারই কাজ বলিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে করিতাম। সংসার যাহাতে উড়িয়া পুড়িয়া না যায়, তজ্জন্য বিশেষ বিবেচনার সহিত দেখিতে শুনিতে হইত। সংসারে স্ত্রীলোক বুঝিয়া সুঝিয়া খরচপত্র না করিলে বা না দেখিলে সংসার শ্রীহীন হয়।

আমার স্বামী কর্ম্মস্থল হইতে গৃহে আসিলে হাসিমুখে আমি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতাম; মধুর আলাপে তালবৃন্ত ব্যজন করিয়া তাঁহার পথশ্রান্তি দূর করিতাম। গুরুজন নিকটে কেহ না থাকিলে চরণ ধোয়াইয়া পরিষ্কার গামছায় মুছাইয়া দিতাম। তাহাতে যে কি সুখ হইত, তাহা আর বলিয়া কি জানাইব! আমি নিজহাতে রন্ধন করিয়া তাঁহাকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতাম। ভোজন সময়ে তথায় উপস্থিত থাকিতে সাধ্যমত যত্ন পাইতাম। তিনি যে যে দ্রব্য খাইতে ভালবাসিতেন, আমি সেই সেই দ্রব্যই রাঁধিতাম। দেবতার ভোগে লাগিবে মনে করিয়া খুব পবিত্রভাবে রন্ধনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতাম।

তিনি শয়ন করিলে পর আমি পাখায় বাতাস করিয়া, পা দুখানি টিপিয়া দিতাম, রাত্রিকালে কোন দিন বা পায়ে তেল দিতেও ভুলিতাম না। রাত্রে শ্বশুরশাশুড়ীর পায়ে তেল মালিশ করা, তাঁহাদের ভোজনসময়ে সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকা আমার নিত্যকর্ম্ম ছিল।

আমার মনে কোন দুঃখ উপস্থিত হইলেই আমি পতিকে তাহা জানাই নাই, আর তজ্জন্য মুখ ভারও করি নাই। তিনি হাসিহাসি মুখ দেখিতে ভালবাসেন, আমি নিজের তুচ্ছ

দুঃখকষ্টে সেই হাসি হাসিবনা? তিনি প্রফুল্লচিত্ত দেখিলে কত আনন্দিত হন, আমি সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিব? তাঁহার সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে আমি ছায়ার মত ছিলাম। তাঁহার সন্নিধিই আমার স্বর্গ—সে স্বর্গে থাকিয়া অন্য যাবতীয় কষ্ট আমার তুচ্ছ বোধ হইত। পতির আজ্ঞা আমার নিকট গুরুআজ্ঞার মত দৈববাণী ও শাস্ত্রাদেশের মতই পালনীয় ছিল। তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার আদেশে যে কোন কার্য্য করিতেই আমার আলস্য ছিল না। তাঁহার পায়ে কাঁটা ফুটিলে আমার বুক পাতিয়া দিতে ইচ্ছা হইত, তাঁহার মুখভার দেখিলে আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইত, সবই অন্ধকার বলিয়া মনে হইত। আমি পতির প্রিয়কার্য্যই করিয়াছি।

সুমনা। কোন্ কার্য্য পতির প্রিয়, কোন্ কার্য্য পতির অপ্রিয়, তাহার উপদেশ কর, আমরা জানিয়া লই।

শাণ্ডিলী। সাধারণতঃ কোন্‌গুলি প্রিয়—তাহা বলিতেছি। কিন্তু আবার দেশকালপাত্র অবস্থাভেদে সকলের পক্ষে একই কার্য্য প্রিয় হয় না। মানব ভিন্নরুচি, নানাবিধ প্রবৃত্তি-সম্পন্ন; প্রকৃতিও সকলের এক নহে। কোন স্বামী অধিক লজ্জাশীলা স্ত্রী ভালবাসেন, পত্নীকে তাই হইতে হইবে। কোন পতি তত লজ্জাশীলা ভালবাসেন না, তাহাকে তদনুরূপ হইতে হইবে। লজ্জা যদিও রমণীর সার ধর্ম্ম—তথাপি তাহার আকার ভিন্ন ভিন্ন। পতি যেমন যেমন চলিতে বলিবেন সেই সেই মতই চলিতে হইবে। তবে তাহা যদি শাস্ত্রের বিরুদ্ধ, আচারের বিরুদ্ধ হয়, গুরুজনের অননুমোদিত সামাজিকের চক্ষুতে হেয় হয়, তবে তাহা না করিবার জন্য মধুরভাবে পতির নিকট প্রার্থনা করা যাইতে পারে। পতির সে দৃঢ় আজ্ঞা যদি মধুর বচনেও অবিচল থাকে, তবে তাহাও করিতে হইবে। পতির ন্যায়ান্যায় কার্য্য অবিচারে অনুবর্ত্তনীয় বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া সৎপরামর্শ দেওয়া, কুকার্য্য হইতে বিরত করার চেষ্টা যে একেবারেই করিবে না, এমন বলি না।

প্রধানতঃ পতির প্রিয়া হইতে গেলে অগ্রে প্রিয়বাদিনী হইতে হইবে। অপ্রিয়বাদিনী হওয়া স্ত্রীলোকের প্রধান দোষ। অপ্রিয়বাদিনী পত্নী ত শাস্ত্রানুসারে পরিত্যাজ্যা। যতই কষ্ট হউক, পতির কার্য্য যতই অনভিপ্রেত হউক, তাহা বলিয়া পতির প্রতি কঠোর বাক্য কখনও বলা উচিত নহে। প্রিয়বাক্যই সকলকারই শ্রুতিসুভগ। প্রিয়বচন দ্বারা পতি-দেবতার পূজা করিবে। প্রিয়বাক্যে জগৎ বশ। আমি পতিকে প্রিয়বাক্যই বলিয়া আসিয়াছি। প্রিয়বাক্য অর্থে অযথা তোষামোদ নহে। ক্রোধ বা অভিমান ত করিতাম না, যদি কখন অভিমানও করিতাম, তজ্জন্য কখনও অপ্রিয় কথা উচ্চারণ করি নাই।

পতির ইচ্ছা বুঝিয়া আমি বেশভূষা করিতাম, রমণী সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিতা থাকিলে গৃহের লক্ষ্মীশ্রী হয়। তাঁহার ভাল লাগিত, তাই আমি প্রত্যহ কবরী বন্ধন করিতে ভুলিতাম না; তাঁহার পায়ে জীবন-যৌবন ঢালিয়া দেওয়াতেই তার সার্থকতা। কত জন্মের পুণ্যে এই নশ্বর জীবনযৌবন সেই দেবতার সেবায় উৎসর্গীকৃত করিতে পারিয়াছি। পতির

আদরে দেওয়া গন্ধমাল্য আমি সাদরে গ্রহণ করিতাম, ব্যবহারও করিতাম, তিনি যে বেশ পরিতে বলিতেন, তাই পরিতাম, তিনি যে সাজে সাজাইতে চাহিতেন, আমি সেই সাজে সাজিতাম। তাঁহার আদরপ্রদত্ত সামান্য বস্ত্রটি পর্য্যন্ত মহামূল্য অলঙ্কার ভাবিয়াছি, ইষ্টদেবতার নির্ম্মাল্যের মত মাথা পাতিয়া লইয়াছি। আপনার বেশভূষা সাজসজ্জার জিনিষ কখনও পতির নিকট প্রার্থনা করি নাই। এটা দাও, ওটা দাও, চাওয়া আমার অভ্যাসই ছিল না। :

তিনি গৃহে না থাকিলে আমি অলঙ্কার পরিতাম না, বেশভূষা বা কবরী বন্ধন করিতাম না, মোট কথা আমি সাজিতাম না। কার জন্য সাজিব? যাহার সুখের জন্য সেবার জন্য আমার স্নেহ, জীবন ও যৌবন, তিনি যখন গৃহে নাই, তবে সাজসজ্জা করিয়া কি ফল? কেশ সংস্কার করা, পরিষ্কার কাপড়চোপড় অলঙ্কার পরা, সে ত পতির তৃপ্তির জন্য। দেবতার পদে উৎসর্গ করিতে ভাল জিনিষ চাই, তাও পরিষ্কার চাই। আর দেবতা কি চান, তাহাও ভাবিতে হইবে। যা চান, যে ভাবে চান, তাহা সেই ভাবেই দিতে হইবে। হাসিমুখে তাহার সুখেই আমার সুখ ভাবিয়া দিতে হইবে। তাঁহার ভোগের জিনিষ, এজন্য দেহের এই জড় পিণ্ডেরও যত্ন আবশ্যক। নিজের গৌরব হইবে, নিজেকে লোকে ভাল বলিবে এজন্য যত্ন নয়।

বহির্দ্বারে কখনও দাঁড়াই নাই, উচ্চ হাসি হাসি নাই, স্বামীর অসাক্ষাতে অসম্পর্কীয় যাহার তাহার সহিত কথা কহি নাই। স্বামীর সঙ্গে স্বামীর ইচ্ছানুসারে যাহা করিয়াছি—তাহার ফলাফল ত আমার নহে, তাহা আমার বিচার্য্য নহে। স্বামীর আদেশে যদি আমি লজ্জা কোথাও কোন সময়ে কম করিয়া থাকি, তাহাতে আমার স্বাতন্ত্র্য নাই। পতি ব্যতীত অপর পুরুষের পানে কখনও অভিলাষ পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাই নাই। অজ্ঞাত পুরুষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা আমার অভ্যাস ছিল না। কৌতূহল বশেও এদিক্ ওদিক্ চাওয়া আমার প্রকৃতিই নয়। আমি মনে মনে সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট, তৃপ্ত ও সুখী ছিলাম। আত্মপ্রসন্নতা অমূল্য অমৃত সেই ধনে আমি ধনবতী ছিলাম। পতিকে আমি রাজরাজেশ্বরের চেয়েও বড় দেখিয়াছি। তাঁহার ভালবাসাই আমার জীবনের সাধনা, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি ছিল। তাঁহার আদরই আমার একমাত্র কাঙ্ক্ষণীয় সামগ্রী ছিল। তাঁহার স্পর্শ আমার চন্দন অপেক্ষা শীতল, তাঁহার আদরের আহ্বান আমার স্বর্গসঙ্গীতের চেয়ে মিষ্ট ছিল। পতিপ্রেমে আমি প্রেমিকা, পতিসৌভাগ্যে আমি গরবিণী, সতীত্বতেজে আমি তেজস্বিনী ছিলাম। সেই প্রেমই আমার বিরহে অবলম্বন, রোগে শান্তি, মর্ত্তে অমৃত ছিল। সে প্রেম শিরীষ অপেক্ষা কোমল, যজ্ঞধূম অপেক্ষা পবিত্র, চন্দ্রকরের মত প্রিয় দর্শন ছিল। প্রেমের কাছে মণি মুক্তা, রত্ন হীরা কত তুচ্ছ, রাণী হওয়াও কত সামান্য। পতির সহিত কখন্ দেখা হইবে, কখন্ তাহার অমৃতময়ী বাণী শুনিব,—তাহাই ভাবিতে ভাবিতে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইত। তাঁহার সংসারের মধ্যেও আমি তাঁহাকে দেখিতাম বটে, কিন্তু তাহা অস্পষ্ট। সে অস্পষ্টও আমার সুখকর ছিল সত্য, তবে অবশ্য তাহা মন-প্রাণ ভাসাইয়া দিত না, জীবনে স্বর্গ সুখ ভোগ করাইত না।

আত্মসংযমে বরাবরই আমার যত্ন ছিল। পতির কোন কার্য্য করিয়া তাঁহার নিকট থাকায় তাঁহাকে ধরিয়া রাখার আমার প্রবৃত্তি জন্মিত না। তিনি যখন পড়িতেন, আমি নিকটে যাইতাম না, যাইলেও একবার দেখা দিয়া অমনই তাঁহার ডাকার অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া আসিতাম। রাত্রে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আমিও মনে মনে পড়িতাম, আর চুপি চুপি, তাঁহাকে জানিতে না দিয়া, তাঁহার পানে চাহিয়া দেখিতাম। সংসারের কার্য্য করিতে প্রথম প্রথম ঘুম আসিত, রাত্রে একা থাকিতে ভয় করিত, কিন্তু আমি সে ঘুম দমন করিয়াছি, সে ভয় গণনার মধ্যে আমি নাই। ক্ষুধা পাইলে তৎক্ষণে আমি খাই নাই। অভ্যাসে অনুশীলনে কি না হয়? সবই সহ্য করা যায়। সহ্যশক্তি না থাকিলে, সংযমাভ্যাস না করিলে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যই কষ্টকর হইয়া উঠে। অভ্যাসে অনুশীলনে ক্ষুধা জয়, নিদ্রা জয়, কাম ক্রোধ জয়, চিত্ত জয়, সবই করা যায়।

পরিবারপ্রতিপালনের জন্য স্বামী যত্ন লইতেন, আমি আর সেজন্য অভাবের সৃষ্টি করিয়া অসম্মতি দেখাইয়া তাঁহাকে ব্যস্ত করি নাই। সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে, অধিক শ্রম করিতে আমি বারণই করিতাম। তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট মুখখানি দেখিলে আমার কান্না আসিত। সে সময়েও হয়ত প্রয়োজন বুঝিলে মুখে হাসি ফুটাইয়া পতির সন্তোষ বিধান করিতাম। তাঁহার অন্তরে কষ্ট দেখিলে আমি সে কষ্টের ভার লইতাম, তাঁহার চিন্তার অংশ লইয়া পরামর্শ দিয়া চিন্তাভার কমাইয়া দিবার চেষ্টা পাইতাম। হাসিয়া, আমোদ করিয়া, ভালবাসার খেলা খেলিয়া, কখন বা বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াও তাঁহাকে সুখী করিয়াছি। দেবতাকে লইয়া কত ছেলেখেলা করিয়াছি; কি করিব, আমার দেবতা যে সব সময় ভক্তিমতী সেবকা চান না, ভক্তা শিষ্যা চান না, বিনীতা ছাত্রী চান না। মোট কথা, আমাকে কখন ভক্তিমতী সেবিকা, কখন ভক্তা শিষ্যা, কখন বিনীতা ছাত্রী, কখন সমদুঃখসুখ বন্ধু, কখন উপদেষ্টা গুরু, কখন মন্ত্রণাদাতা মন্ত্রী, কখন স্নেহপ্রাণ শিশু, কখন বিলাসিনী যুবতী, কখন বা লজ্জাহীনা রমণী সাজিতে হইত।

তাঁহার গুপ্ত বিষয় কখন কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই, তাঁহার আদেশ অমান্য করি নাই, তাহার সুখ্যাতি ব্যতীত এতটুকু নিন্দা পর্য্যন্ত করি নাই, স্বামীর নিন্দা গুরুর নিন্দা চেয়েও বড়। সেই দেবতার নিন্দা, সেই নারীজীবনের একমাত্র গুরুনিন্দা যেখানে হয়, আমি সেখান হইতে চলিয়া যাইতাম।

তাঁহার প্রিয়বন্ধু গৃহে আসিলে আমি বন্ধু মতই ব্যবহার করিয়াছি। পতির সাক্ষাতে যাঁহার সহিত কথা কহিয়াছি, শ্বশুর-শাশুড়ীদের সম্মুখেও তাঁহার সহিত দুই একটির অধিক কথা কহি নাই। আদর-অভ্যর্থনা অবশ্য সাধ্যমত করিয়াছি। পতির গুরু আমার গুরু, পতির বন্ধুই আমার বন্ধু, পতির স্নেহপাত্রই আমার স্নেহপাত্র।

দাস দাসীদের আমি বন্ধু ও সখীর মত আদর যত্ন করিতাম। তিরস্কার করা দূরে থাক, তাহাদের অপ্রিয় বাক্যও বলি নাই; আমি রাত্রি দিন খাটিতাম, আমার আদর্শে কেহই

অলস হইতে পার নাই। আমি আদর যত্ন করিতাম, তাহারাই বা না করিবে কেন? নিজ আত্মীয়ের মধ্যেই দাসদাসীকে মনে করা উচিত।

সুমনা। আচ্ছা দেবি! একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, সাধারণে যাহাকে লেখাপড়া বলে, তাহা কি তুমি জানিতে?

শাণ্ডিলী। জানিতাম। ভাষা শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষার দ্বার, লেখাপড়া না জানিলে শিক্ষার সম্পূর্ণতা জন্মে না। লেখাপড়া না করিয়াও যে সুশিক্ষা লাভ করা যায় না, তাহা নহে। লেখাপড়া আমি জানিতাম।

সুমনা। কে শিখাইয়াছিল দেবি?

শাণ্ডিলী। শিশুকালে বাবা, মা, ভাইরা আমার বর্ণপরিচয় করাইয়া দেন। লেখাপড়ার দিকে আমার মায়ের দৃষ্টি খুবই ছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, লেখাপড়া না জানিলে দয়া ভক্তি স্নেহ কর্ত্তব্যকর্ম্মবোধ ঠিক জন্মে না; বুদ্ধির প্রখরতা জন্মে না। মা আমার লেখাপড়া, সংসারের কাজকর্ম্ম দুই শেখাই স্ত্রীলোকের আবশ্যক বলিয়া জানিতেন। সন্তানের শিক্ষা মাতার দ্বারা যেমন হয়, অপরের দ্বারা তেমন হয় না। শিশু মাতাকেই অগ্রে দেখে, মাতার অনুকরণই শিশু অগ্রে করে। সন্তানকে শিক্ষিত ও মানুষ করিতে হইলে প্রথমে মাতাকে শিক্ষিতা হইতে হইবে।

ভ্রাতাদের নিকটও পড়িতাম। তার পর পিতা আমাকে সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, যোগবাশিষ্ঠ অর্থ করিয়া পড়াইতেন। পিতা নিজের আদর্শে আমার জীবন গঠিত করিবার জন্য যত্ন লইতেন। বিবাহের পরও পিতৃগৃহে মাতা ও অপর কোন আত্মীয়ার নিকটেও পড়িতাম। শ্বশুরালয়ে আমার পরম দেবতা স্বামীই আমাকে শিক্ষা দিতেন। আমি শক্ত শক্ত কথাগুলি রাত্রে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতাম। প্রথম প্রথম লজ্জা করিত বটে, কিন্তু স্বামীর আগ্রহাতিশয্যে ক্রমে ক্রমে সে লজ্জা দূর হইল। পতি আমাকে কেবল যৌবনের ক্রীড়ণক, বিলাসের সামগ্রী না করিয়া প্রকৃত অর্দ্ধাঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী করিবার জন্য সাধনা করিতেন। তাঁহার নিজহাতে গড়া জিনিষ বলিয়াই আমি ভাল হইয়াছিলাম। আমার এই সতীকুঞ্জে আসার জন্য যদি কাহারও হাত থাকে সে আমার স্বামীর, আমরা ত কর্দ্দমপিণ্ড; আমাদিগকে যেমনটি করিতে চাহিবে, আমরা তেমনটি হইব।

স্বামী আমাকে স্ত্রীধর্ম্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রের আদেশ পড়িয়া শুনাইতেন। পরে আমিও সেই আদেশ অনুসারে জীবন গঠিত করিতে লাগিলাম। আমাদের শাস্ত্রে বলেন "স্ত্রী ও শ্রীতে কিছু বিশেষ নাই। ভাল স্ত্রী গৃহের লক্ষ্মী, মন্দ স্ত্রী গৃহের অলক্ষ্মী। অসতী দুশ্চরিত্রা মদ্য-পানাসক্তা স্ত্রী মন্দ, ইহারা ইহলোকে নানাকষ্ট ও অযশঃ প্রাপ্ত হয়, পরলোকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করে, জন্মান্তরে শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয়, কিম্বা বেশ্যাগৃহে জন্ম লয়। উহারাই অবিদ্যা। স্ত্রীলোক বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন, বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন থাকিবে। স্ত্রীলোকের কোন সময়েই স্বাতন্ত্র্য নাই।

সুমনা। পতিই স্ত্রীলোকের দেবতা, পতির সেবাই পরম ধর্ম্ম, তবে কি অন্য দেবতার পুজা, অন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান নিষিদ্ধ?

শাণ্ডিলী। স্ত্রীলোকের বিবাহই উপনয়ন। পতি সেবাই তার ঈশ্বরোপাসনা ও গুরুকুলে বাস, পতির গৃহকার্য্যই সায়ং ও প্রাতঃকালের হোমচর্য্যা। পতির অনুমতি লইয়া স্ত্রী অপর ধর্ম্মকার্য্য করিতে পারেন, পতির বিনানুমতিতে স্ত্রীর ধর্ম্মকার্য্য করিবার অধিকার নাই, কোন কোন মতেও তান্ত্রিকী দীক্ষায় পতির সহিতই স্ত্রী অধিকারিণী। পতির আজ্ঞা লইয়া স্ত্রীলোক ব্রত নিয়মে, দীক্ষাগ্রহণাদিতে অধিকারিণী।

ক্রমশঃ।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ।

প্রতিবাদের প্রতিবাদ।

বিগত ১৩২২ সালের ফাল্গুন মাসে বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ-সভার পঞ্জিকা সমিতি হইতে আমার নিকট পঞ্জিকা-সংস্কারবিষয়ক কয়েকটী প্রশ্ন প্রেরিত হয়। আমি জ্যোতিঃশাস্ত্রের পণ্ডিত না হইলেও অন্ততঃ আত্মকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লওয়ার জন্য জ্যোতিঃশাস্ত্র বিষয়ে আমার যে সামান্য অভিজ্ঞতাটুকু আছে, তদ্দ্বারাই ঐ সকল প্রশ্নের যথাশক্তি উত্তর প্রদান করিয়া আমি বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ-সভাতে পাঠাই। ঐ প্রশ্নোত্তরগুলি ১৩২২ সালের চৈত্র মাসের ব্রাহ্মণ-সমাজ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার দশমাস পর গত ১৩২৩ সালের পৌষ মাসের ব্রাহ্মণ-সমাজে ঐ সকল উত্তরের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদের আবির্ভাব হইয়াছে। এই সর্ব্ববিষয়ে পরিপুষ্ট প্রতিবাদ যে শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত-জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়ের অভ্যস্ত লেখনী-প্রসূত, তাহা প্রতিবাদের নিম্নে তদীয় নাম স্বাক্ষরের দ্বারা জানিতে পারিলাম।

এই সিদ্ধান্ত-জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় গোড়া হইতেই নিরয়ণ-প্রণালীতে পঞ্জিকা-সংস্কারের বিরোধী, এবং সায়ন-প্রণালী অর্থাৎ খাঁটি বিলাতী মতের পক্ষপাতী। ইহার প্রমাণ, তৎপ্রণীত বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত-পঞ্জিকার প্রতিবাদ (বঙ্গে পঞ্জিকা-সংস্কার) এবং সাহিত্য-সংহিতা-পত্রিকায় প্রকাশিত জ্যোতির্গণনা নামক প্রবন্ধে আমরা বহু পূর্ব্বেই পাইয়াছি। (বঙ্গে পঞ্জিকা-সংস্কার ১১৬ পৃঃ এবং জ্যোতির্গণনা ১৩, ১৪, ১৫, পৃষ্ঠা দেখুন) আর বর্ত্তমান প্রতিবাদেও তিনি বলিতেছেন—"দেশে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের উন্নতি করিতে হইলে ফলিতজ্যোতিষ কি ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত উহা সংযোগ করার প্রয়োজনীয়তা কি? বিজ্ঞানের আদর বিজ্ঞানের জন্য থাকিলেই কি ভাল হয়না?" দেশে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের উন্নতি আমাদিগের অবাঞ্ছনীয়

নহে, বরং তাহাই আমরা চাই। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত সায়ন-প্রণালীর প্রচলন ব্যতীত যে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের উন্নতি হইবে না, একথা আমরা কিরূপে বিশ্বাস করিব? প্রতিবাদী মহাশয় আর্ষ সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে সায়ন-প্রণালীর কোন একখানা সিদ্ধান্ত আমাদিগকে দেখাইতে পারিবেন? সনাতন হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুর প্রাণাপেক্ষাও অধিক; যেহেতু, হিন্দু প্রাণকে পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, এরূপ দৃষ্টান্ত হিন্দুসমাজে আজকালও বিরল নহে। নিরয়ণ-জ্যোতিষ হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া আমার প্রশ্নোত্তরের কোন একস্থলে নিরয়ণ-জ্যোতিষকে হিন্দুধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ বলা হইয়াছে। প্রতিবাদলেখক কোথা হইতে একটী প্রক্ষিপ্ত এবং পণ্ডিতসমাজ-কর্ত্তৃক অনাদৃত বচন মহর্ষি বশিষ্ঠের নামে উদ্ধৃত করিয়া মহর্ষিকে সায়ন-সংক্রান্তির প্রবর্ত্তনেচ্ছু বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন এবং এই সূত্রে হিন্দুধর্ম্ম-শাস্ত্রের উপর একটুকু বিদ্রূপের কটাক্ষও করিয়াছেন। কোন বিধর্ম্মী যদি হিন্দুধর্ম্মকে বিদ্রূপ করে, তবে তাহা অসহ্য হয় না। কিন্তু কোন হিন্দুর সন্তান যদি বৈরাগী সাজিয়া অথবা ধর্ম্মত্যাগ করিয়া পিতৃপিতামহের প্রাণস্বরূপ হিন্দুধর্ম্মের উপর বিদ্রূপের কটাক্ষ করে, তবে তাহার সহিত আলাপ করিতেও ঘৃণা বোধ হয়।

এই কারণে, বিশেষতঃ কেবল প্রতিবাদ করাই যাহাদিগের স্বভাব তাহারা কোন কথা বুঝিয়াও বুঝিতে চায় না। প্রতিনিয়ত কেবলই মক্ষিকার ন্যায় ক্ষতের অনুসন্ধান করে। এই চিরপ্রসিদ্ধ নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া প্রতিবাদীর প্রতিবাদের উত্তর দিব না বলিয়াই আমি মনে করিয়াছিলাম। তবে বর্ত্তমানে স্বাধীনত্রিপুরা ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সভায় পঞ্জিকা-সংস্কার-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায়, উক্ত প্রতিবাদের উত্তর দেওয়ার জন্য কেহ কেহ আমাকে অনুরোধ করিতেছেন। এই হেতু আন্তরিক অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রতিবাদী আমার প্রশ্নোত্তরের যে যে স্থল বুঝেন নাই, তাহা বুঝাইয়া দিতে আমি প্রস্তুত হইলাম; কলহ আমার অভিপ্রেত নহে। যেকথা বহুব্যক্তি তাঁহাকে বহুবার বুঝাইয়াছেন,—সেকথাও এই প্রতিবাদে তিনি চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়াছেন। এইরূপ কথার উত্তর দিতে গিয়া আমি প্রবন্ধের কলেবর অযথা বৃদ্ধি করিব না। তবে আমার উদ্ধৃত শাস্ত্রীয় প্রমাণ তিনটী, যাহা তিনি প্রকৃত পক্ষেই বুঝিতে পারেন নাই, তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব। বুঝিতে পারিলে তিনি তাঁহার সমস্ত প্রতিবাদের উত্তর ইহার ভিতরেই পাইবেন।

প্রতিবাদী প্রথম প্যারাতেই বলিয়াছেন—"বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত-পঞ্জিকায় অবলম্বিত সংস্কার সমর্থন করাই প্রবন্ধ লেখকের লক্ষ্য এবং বোম্বাই পঞ্চাঙ্গ-শোধন সমিতির আংশিক নির্দ্ধারণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ।"

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়—গত জ্যৈষ্ঠ মাসে (আমার প্রশ্নোত্তর দেওয়ার বৎসরাধিক কাল পরে) ত্রিপুরা—ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সভায় হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এই পঞ্জিকা আমার দৃষ্টিগোচর হইলেও হইতে পারে, কিন্তু বিচারের বিষয়ীভূত হয় নাই।

এই পঞ্জিকাগ্রহণ সম্বন্ধে এখনও আমাদের কিছু বুঝিবার শুনিবার আছে; সুতরাং প্রতিবাদী যে বলিয়াছেন 'বিশুদ্ধসিদ্ধান্তপঞ্জিকার অবলম্বিত সংস্কার সমর্থন করাই আমার লক্ষ্য', ইহাতে তাঁহার 'ক' দেখিয়া কৃষ্ণভাবের উদয় দেখা যায়। তবে পঞ্জিকাসমিতির প্রশ্নসমূহের উত্তরে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি বিশুদ্ধসিদ্ধান্তপঞ্জিকার পক্ষে অনুকূলই হইয়া থাকে, তাহা হইলেও প্রতিবাদকের বিচারে আমার অপরাধী হওয়ার কোন কারণ নাই। যেহেতু বিশুদ্ধসিদ্ধান্তপঞ্জিকা বাজারের ব্যবসায়ীর যথেচ্ছাচারসম্বলিত, বহিঃশুদ্ধির আবরণে আবৃত ধর্ম্মগ্রাসকারী কপট পঞ্জিকা নহে। হিন্দুধর্ম্মসংরক্ষক শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ নবদ্বীপাধিপতি, শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি ও শ্রীমন্মহারাজ কাশিমবাজারাধিপতি বাহাদুরের অনুজ্ঞায় ও অর্থসাহায্যে প্রকাশিত দৃক্প্রত্যয়ান্বিত প্রকৃতই বিশুদ্ধপঞ্জিকা। বঙ্গীয় জ্যোতির্ব্বিৎসমূহের মধ্যে যাঁহারা অগ্রণী, বোম্বাই নগরীর নিখিল ভারত জ্যোতির্ব্বিৎ সম্মিলনে বঙ্গদেশের পক্ষ হইতে যাঁহারা দুই একটী কথা বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারাই আমাদিগকে এরূপ সাক্ষ্য দিতেছেন। এ অবস্থায় বিশুদ্ধসিদ্ধান্তকে প্রতিবাদী যত ঘৃণার চক্ষেই দেখুননা কেন, আমরা এই পঞ্জিকার অনাদর করিতে পারি না। তবে এই পঞ্জিকার যদি বাস্তবিকই কোন দোষ থাকে, তাহা হইলে পঞ্জিকাপ্রকাশকগণকে বলিয়া এই দোষ সংশোধন করাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

আর বোম্বাই পঞ্চাঙ্গশোধন-সমিতির আংশিক (প্রতিবাদীর মতে) নির্দ্ধারণকে আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছি, ইহাও প্রতিবাদীর মতে আমার দোষের কারণ হইয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রধান জ্যোতির্ব্বিৎ একত্র হইয়া বঙ্গদেশেরও মুখপাত্রস্বরূপ নয় জন সদস্য লইয়া, ৮ দিনকাল বিচার বিতর্কের পর যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—তাহা প্রমাণরূপে গ্রহণ না করিয়া কি প্রতিবাদীর প্রলাপবাক্যকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিব? প্রতিবাদী বলেন,—"বোম্বাই সভায় যে সকল ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও সভাস্থলে বিষয়গুলি রীতিমত ও নিরপেক্ষভাবে সমালোচিত হইবার সুবিধা ঘটিয়াছিল কিনা, তদ্বিষয়ে জনসাধারণ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।" একথার উত্তরে বলিতেছি যে, এ বিষয়ের প্রতিবাদকের মত জনসাধারণ অনভিজ্ঞ হইতে পারেন; কিন্তু আমরা জানি, বঙ্গদেশীয় ৯ জন সদস্যসমেত সভায় উপস্থিত সর্ব্বদেশীয় সদস্য মিলিত হইয়া নির্দ্ধারিত বিশদীকরণ পক্ষে এক পাতি স্বাক্ষর করিয়াছেন। পাতিতে যদি কেহ না বুঝিয়া বা চক্ষুলজ্জায় স্বাক্ষর করিয়া থাকেন, তবে সে মূর্খতা তাহার। নিখিল ভারত-সম্মিলিত বিরাট সভার অঙ্গ হইতে এরূপ দুই একজন সদস্যের নাম কাটা গেলেও সভায় নির্দ্ধারিত বিষয়ের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইতে পারে না।

প্রতিবাদী আরও বলেন, বোম্বাই-সভার ৬ বৎসর পরে কালটী গ্রামে পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রশ্নের বিচারের জন্য আর একটী সভা হইয়াছিল, সুতরাং বোম্বাই সভার অভিমত কতকটা সন্দেহের চক্ষে দেখা দোষাবহ নহে। আমরা বলি, কালটীর সভায় পঞ্জিকা-

সংস্কার সম্বন্ধীয় কি কি প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা কি প্রতিবাদী জানেন, না ঐ সভার শেষ সিদ্ধান্ত তাঁহার নিকট আছে? থাকিলে তিনি তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেন। ঐ সভা যে বোম্বাই সভার পক্ষে না হইয়া বিপক্ষে হইয়াছিল, তাহা আমরা কি উপায়ে বুঝিব?

আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বুঝা যায়, কালটীর-সভা বোম্বাই সভার সিদ্ধান্তসমূহকে কার্য্যে পরিণত কবিবার উদ্দেশ্যে বোম্বাই সভার পক্ষেই হইয়াছিল। তবে কথা এই যে, বোম্বাই সভার সিদ্ধান্তসমূহের বিচারসহ যেরূপ বিস্তৃত প্রতিলিপি আমরা পাইয়াছি, কালটি-সভার সেরূপ কিছু পাই নাই। সুতরাং, ঐ সভার কার্য্য শেষ হইয়াছিল কিনা; তৎপক্ষেই আমাদিগের সন্দেহ আছে।

প্রতিবাদী দ্বিতীয় প্যারাতে বলিয়াছেন—"আমার প্রশ্নোত্তরগুলি আলোচনা করিয়া তাঁহার বিশেষ তৃপ্তিলাভ হয় নাই। ইহা আমার দুর্ভাগ্য, কারণ আমার জ্ঞান-বিশ্বাসমত প্রশ্নের উত্তর না দিয়া প্রতিবাদীর রুচিসঙ্গত উত্তর দিতে পারি নাই। আর আমার উক্তি সমর্থন কালে বোম্বাই মহাসভার বিশদীকরণকে আমি প্রমাণরূপে ব্যবহার করিয়াছি। এই হেতুতে প্রতিবাদীর (অনেকের নহে) ধারণা হইয়াছে যে, আমি স্বীয় অনুশীলনোচিত প্রমাণ-প্রয়োগ ও যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করিতে পারি নাই। পঞ্জিকা-সংস্কারের পক্ষে কি বিপক্ষে এমন কোন প্রমাণ প্রয়োগ বা যুক্তি তর্ক নাই, যাহা বোম্বাই মহাসভায় প্রদর্শিত না হইয়াছিল। ইহার উপর বঙ্গীয়পঞ্জিকা-সমিতির প্রশ্নের উত্তরদানপ্রসঙ্গে রাশি রাশি প্রমাণ প্রয়োগও যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করিয়া প্রশ্নোত্তরচ্ছলে পুস্তকলেখা ও বিদ্যা জাহির করাটা আমি সঙ্গত মনে করি নাই। প্রত্যেক উত্তর পক্ষে যে সংক্ষিপ্ত বিচার দেওয়া হইয়াছে, তাহাই আমি অতিরিক্ত মনে করিয়া সঙ্কুচিত হইয়াছি এবং বোম্বাই সভার বিশদীকরণ দেখার জন্য বরাত দিয়াছি। যতটুকু লিখিলে পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারেন, ততটুকুই আমি লিখিয়াছি; পণ্ডিতেতর ব্যক্তিগণকে বুঝাইতে যাওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে।

তৃতীয় প্যারাতে প্রতিবাদী বলিয়াছেন—আমি যে সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে দৃক্‌তুল্যতার প্রমাণ স্বরূপ "তত্তদ্‌গতিবশান্নিত্যং যথা দৃক্‌তুল্যতাং গ্রহাঃ। প্রয়ান্তি তৎপ্রবক্ষ্যামি স্ফুটীকরণ-মাদরাৎ"। এই প্রথম শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছি, ইহাতে বর্ত্তমান সময়ের দৃগ্‌গণিতৈক্যকে সমর্থন করিয়াছেন বুঝায় না; বরং যাহাকে তাঁহারা (কারা?) দৃকতুল্য বলিবেন, উহারই সংজ্ঞা করিয়াছেন মাত্র। মানিয়া লইলাম, প্রতিবাদীর মতে দৃকতুল্যতা সম্পাদনের অর্থ—স্ফুটীকরণ; কিন্তু স্ফুটীকরণ কি? টীকাকার রঙ্গনাথ দৃক্‌তুল্যতা শব্দের অর্থ বেধিত গ্রহসমত্তা এবং স্ফুটীকরণ শব্দের অর্থ স্পষ্টক্রিয়াগণিত প্রকার লিখিয়াছেন।

সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে ভাস্করাচার্য্যও বলিয়াছেন,—

"প্রোচ্যতে তেন নভশ্চরাণাং স্ফুটক্রিয়া দৃগ্‌গণিতৈক্যকৃদ্ যা।"

স্ফুটশব্দে—পৃথিবী হইতে পরিদৃশ্যমান্ গ্রহের যথার্থ অবস্থান বুঝায় তো? যে গাণিতিক প্রক্রিয়া দ্বারা গ্রহের এই যথার্থ অবস্থান নির্ণয় হয়,—দৃষ্টি ও গণিতের একতা সম্পাদিত হয়,

তাহাই গ্রহের বিশুদ্ধ স্ফুটক্রিয়া। গ্রহ দৃক্‌তুল্য না হইলে স্ফুটক্রিয়া অশুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু বহু চক্ষুর দৃষ্টির সামঞ্জস্য অশুদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং দৃক্‌তুল্যতা, দৃগ্‌গণিতৈক্য এবং স্ফুট এই তিনটীই একার্থবাচক শব্দ।

গ্রহগণ মন্দশীঘ্রাদি নানাপ্রকার গতিবশে ভ্রমণ করিয়াও যেরূপ স্ফুটক্রিয়া দ্বারা নিত্য দৃক্‌-তুল্যতা প্রাপ্ত হয়, সূর্য্যাংশসম্ভূত পুরুষ ময়দানবকে তাহাই বলিতেছেন। কেবল সূর্য্যসিদ্ধান্ত নহে, সর্ব্বসিদ্ধান্ত হইতেই এইরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যায় যে, সিদ্ধান্তকারমাত্রেই স্ব স্ব গ্রন্থের স্ফুটক্রিয়াকে সর্ব্বতঃ প্রযত্নে দৃক্‌তুল্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। স্ফুটক্রিয়া যে শুদ্ধ হইল, তাহার দৃষ্ট ভিন্ন অন্য কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং যে পক্ষের গণিত দৃষ্টির সহিত মিলেনা, তাহা অশুদ্ধ ও অগ্রাহ্য। আর যে পক্ষের গণিত দৃষ্টির সহিত মিলে, তাহাই শুদ্ধ; সুতরাং তন্মতেই তিথ্যাদি-সাধন কর্ত্তব্য। এই কথার প্রমাণস্বরূপ বশিষ্ঠসিদ্ধান্তের দ্বিতীয় প্রমাণটী আমি উদ্ধৃত করিয়াছি। যথা —

> "যস্মিন পক্ষে যত্র কালে যেন দৃগ্‌গণিতৈক্যতাম্।
> দৃশ্যতে তেন পক্ষেণ কুর্য্যাত্তিথ্যাদিনির্ণয়ম্॥"

এই প্রমাণটী প্রতিবাদী ঠেলিয়া ফেলিতে না পারিয়া বশিষ্ঠদেবের উপর সায়নপ্রণালী প্রবর্ত্তনের অপবাদ চাপাইয়াছেন। আর বলিয়াছেন যে, "বশিষ্ঠ আমাদিগের জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়া গেলে মহাজনগণ উহা অনুসরণ করেন নাই কেন?"

মহাজনগণ যে অনুসরণ করেন নাই, একথা তাঁহাকে কে বলিল? যদি মহাজনগণ বশিষ্ঠদেবের এই উপদেশমতে কালানুযায়ী দৃগ্‌গণিতৈক্য মত গ্রহণ না করিতেন, তবে কি আর গত চারি শতাব্দীর মধ্যে সিদ্ধান্তরহস্য ও গ্রহলাঘবের পঞ্জিকা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইত? প্রতিবাদীর যদি গণিতে অধিকার থাকে, তবে অঙ্ক কষিয়া দেখিবেন, প্রাচীন সিদ্ধান্তসমূহের সহিত সিদ্ধান্তরহস্য ও গ্রহলাঘবের তিথ্যাদির কত অন্তর হয়। অন্তর কেবল সহজ নহে। "কল্যব্দপিণ্ডাত্রিসহস্রলব্ধং ভাগাদিবীজং ধনমিন্দুকেন্দ্রে। ত্রিঘ্নং শনৌ বেদহতং বুধোচ্চে দ্বিত্রিঘ্নমিজ্যা স্ফুজিতোর্ব্বিশোধ্যম্?" সিদ্ধান্তরহস্যে এই নিয়মে বীজ ব্যবহৃত হওয়ায়, কলিযুগের আদি হইতে প্রতি তিন হাজার বৎসরে সূর্য্যসিদ্ধান্ত অপেক্ষা চন্দ্রকেন্দ্র এক অংশ, শনি মধ্য তিন অংশ, এবং বুধ শীঘ্র চারি অংশ বাড়িতেছে; আর গুরু মধ্য দুই অংশ এবং শুক্র শীঘ্র তিন অংশ বাড়িতেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, সিদ্ধান্তরহস্যের এই বীজ ব্যবহারের রহস্যটা কি? এই বীজ দ্বারা সিদ্ধান্তরহস্যকার সূর্য্যসিদ্ধান্তের সহিত যে তদীয় গ্রন্থের কালান্তরসংস্কার করিয়াছেন, একথা কি প্রতিবাদী স্বীকার করিবেন না? যদি স্বীকার করেন, তবে আর ডুব দিয়া জল খাইয়া নির্জ্জলা-একাদশী কেন? সংস্কার যদি গ্রহণই করিলাম, প্রাচীন সিদ্ধান্তের মত পরিত্যাগই করিলাম, তবে আর বর্ত্তমান সময়ের অনুপযোগী অশুদ্ধ সংস্কার গ্রহণ করি কেন? সিদ্ধান্তরহস্য মতে গ্রহস্ফুট গণনা করিয়া স্ফুটচন্দ্রিকা (নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ) মতে গ্রহণ গণনা করিতে যাই কেন?

সিদ্ধান্তরহস্যে কি গ্রহণ গণনা নাই ? (সোজাসোজি আধুনিক কালানুযায়ী সংস্কারগুলি গ্রহণ করিয়া পঞ্জিকা গণিলেই তো সকল আপদ চুকিয়া যায়। সত্য গোপন করিয়া লোকের চক্ষে ধূলা দিয়া আর কয়দিন চলিবে ?

প্রতিবাদীর মতে বর্ত্তমান সময়ের দৃগ্গণিতৈক্যের মধ্যে কি নূতনত্ব আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আমরা বুঝি দৃক্তুল্য কথাটার অর্থ আগেও যা ছিল, এখনও তাই আছে। তবে সূর্য্যসিদ্ধান্তীয় যোগের গ্রহকে দৃক্তুল্য করিতে যে যে সংস্কারের প্রয়োজন হইত, দীর্ঘকালে গ্রহগতির পরিবর্ত্তন হেতু বর্ত্তমান সময়ে তদপেক্ষা দুই একটী অভিনব সংস্কার যোগকরার প্রয়োজন হইতে পারে ; আর গত চতুর্থ শতাব্দীতে সিদ্ধান্তরহস্যেও এই জন্যই বীজ ব্যবহৃত হইয়াছে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত দৃক্তুল্যতা অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন এবং গ্রহ দৃক্তুল্য করিতে তৎকালে যে যে সংস্কারের প্রয়োজন হইত, সূর্য্যসিদ্ধান্তে তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তৎকালে যে সংস্কারের প্রয়োজন হইত না, তাহা সূর্য্যসিদ্ধান্তে থাকিবে কেন ? আর সূর্য্যসিদ্ধান্তের শাস্ত্রোপনয়নেই কথিত হইয়াছে যে—

"শাস্ত্রমাদ্যং তদেবেদং যৎপূর্ব্বং প্রাহ ভাস্করঃ।
যুগানাং পরিবর্ত্তেন কাল ভেদোঽত্র কেবলম্॥"

অর্থাৎ ইহাও সেই আদ্য শাস্ত্র, যহা পূর্ব্বে ভাস্কর বলিয়াছেন, তবে ইহাতে যুগপরিবর্ত্তন হেতু কেবল কালান্তর সংস্কার করা হইল মাত্র।

টীকাকার রঙ্গনাথ এই শ্লোকের অর্থ টীকাতে আরও পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। যথা— "শাস্ত্রেষু ভেদো ন শাস্ত্রোক্ত রীতিভেদ ইত্যর্থঃ।" "এবং যুগমধ্যেঽপ্যবান্তরকালে গ্রহচারেষন্তরদর্শনে তত্তৎকালে তদন্তরং প্রসাধ্য গ্রন্থাং স্তৎকালবর্ত্তমানাভিযুক্তাঃ কুর্ব্বন্তি তদিদমন্তরং পূর্ব্বগ্রন্থে বীজমিত্যামনন্তি।"

অর্থাৎ ভাস্করোক্ত পূর্ব্বশাস্ত্রের সহিত এই শাস্ত্রের কোনও ভেদ নাই। কালান্তর হেতু ইহাতে কেবল পূর্ব্বশাস্ত্রোক্ত রীতির পরিবর্ত্তন হইল মাত্র। যুগভেদে তো সিদ্ধান্তগ্রন্থের পরিবর্ত্তন হয়ই, যদি যুগ মধ্যেও কোন সময়ে গ্রহগতিতে অন্তর দৃষ্ট হয়, তবে তৎকালে বর্ত্তমান পণ্ডিতগণ সেই অন্তর প্রদান করিয়া নূতন গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এই অন্তর পূর্ব্বগ্রন্থের বীজনামে অভিহিত হইয়া থাকে (সিদ্ধান্ত রহস্যে কোন্ বীজ ব্যবহার করা হইয়াছে এবং বীজ কথাটার অর্থ কি, টীকাকার রঙ্গনাথের এই উক্তি দ্বারা পাঠকগণ তাহা বুঝিয়া লইবেন)

উপরোক্ত শ্লোকটীর দ্বারা সূর্য্যসিদ্ধান্তকার যখন কালান্তরজনিত সংস্কার সমর্থন করিয়াছেন, তখন তৎকালে প্রয়োজনাভাবে অনুক্ত, অধুনাপ্রয়োজনীয় সংস্কারসমূহও যে তদ্দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে, ইহা পণ্ডিত ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু প্রতিবাদী পঞ্চম প্যারায় বলিয়াছেন যে, "টীকাকার রঙ্গনাথ যাহাই বলুন, মূলশ্লোকে এইরূপ পরিবর্ত্তনের কথা নাই। মূলশ্লোকটী আমরা বঙ্গানুবাদসহ উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, সহৃদয় পাঠকগণ তদ্দ্বারা অনায়াসেই

প্রতিবাদীর কথায় সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। মিথ্যা বলিয়া সাধারণের চক্ষে ধূলি দেওয়াটা খুব সহজ ইহা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু প্রতিবাদী যে একবারে দিনকে রাত করিতে পারেন, ইহা দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছি। তারপর - "জ্ঞাত্বৈবং চন্দ্রসূর্য্যাভ্যাং তিথিং স্ফুটতরাং ব্রতী। একাদশীং তৃতীয়াঞ্চ ষষ্ঠীঞ্চোপবসেৎ সদা॥" এই তৃতীয় প্রমাণটী আমি সৌরপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। স্ফুটচন্দ্রার্কসাধিত তিথিতেই ধর্ম্মকার্য্যাদি করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে পুরাণকার শ্লোকটী লিখিয়াছেন। একবাক্যে সমস্ত জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত এই শ্লোকটীকে সমর্থন করিতেছে; কারণ স্ফুটচন্দ্রার্ক ছাড়া মধ্যম চন্দ্রার্ক হইতে তিথিগণনার প্রণালী কোন সিদ্ধান্তেই নাই। আর মধ্যম সূর্য্য বা মধ্যম চন্দ্র বাস্তব পদার্থ নহে, জ্যোতির্গণনার সুবিধার জন্য উহাদিগকে কল্পনা করিয়া লওয়া হইয়াছে। প্রতিবাদী বলেন মধ্যম চন্দ্রার্ক হইতে মধ্যম তিথি গণিতে হয়। আমরাও স্বীকার করি, পঞ্জিকাগণনার সুবিধার জন্য হ্রাসবৃদ্ধি বর্জ্জিত মধ্যম তিথি (৫৯ দঃ ৩'৭ পল) ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই অবাস্তব চন্দ্র সূর্য্য হইতে সাধিত হ্রাসবৃদ্ধিবর্জ্জিত অবাস্তব তিথি কোন যোগে কোন ধর্ম্ম-কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছে, কি কোন পঞ্জিকায় লিখিত হইয়াছে এমন প্রমাণ প্রতিবাদী দিতে পারিবেন কি?

প্রতিবাদী বলেন, মধ্যম ও স্পষ্ট এই উভয় প্রকার তিথির সঙ্গেই দৃগ্‌গণিতের সম্বন্ধ কিছু দূরবর্ত্তী। অবাস্তব মধ্যম তিথির সঙ্গে দৃগ্‌গণিতের সম্বন্ধ দূরবর্ত্তী কেন, নাই বলিলেই হয়; কিন্তু স্পষ্ট তিথির সহিত দৃগ্‌গণিতের সম্বন্ধ নাই, একথা কি কোন জ্যোতির্ব্বিৎ বলিতে পারেন?

তিথিসংজ্ঞা সূর্য্যসিদ্ধান্ত—

"অর্কাদ্বিনিঃসৃতঃ প্রাচীং যদ্ যাত্যহরহঃ শশী।
তদ্ভাগৈর্দ্বাদশভিস্তৎ স্যাত্তিথিশ্চান্দ্রমসং দিনম্॥"

অর্থাৎ প্রতি অমান্তে রবি হইতে বিনিঃসৃত হইয়া চন্দ্র দিন দিন পূর্ব্বদিকে যে বারো অংশ করিয়া অগ্রসর হয়, তাহারই নাম তিথি বা চান্দ্রদিন। এই সংজ্ঞাটীই স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যমহোদয় তদীয় তিথি ও মলমাসতত্ত্বে উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রতিবাদী বলেন এই সংজ্ঞাটী দৃক্‌সিদ্ধির বিরুদ্ধ (অথবা অশুদ্ধ?) কারণ "সূর্য্যগ্রহণের পর ব্যতীত চন্দ্র সূর্য্য হইতে প্রতি অমান্তে বিনিঃসৃত হয় না। তবে কি প্রতিবাদীর মতে সূর্য্যগ্রহণের পরবর্ত্তী চান্দ্রমাস ব্যতীত অন্য চান্দ্রমাসে তিথির উৎপত্তিই হয় না? প্রতিবাদী সূর্য্যসিদ্ধান্তের টীকাকার রঙ্গনাথকে তো গণনার মধ্যেই আনেন না; এখন দেখিতেছি সূর্য্যকেও পরাস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। রবিবিম্বে চন্দ্রের সংস্থানের পার্থক্য হইতে যে তিথি গণিত হয়, একথাটা দেখিতেছি প্রতিবাদী (বুঝুন বা না বুঝুন) জানেন। যদি এতবড় কথাটা জানেন, তবে প্রতি অমান্তে সূর্য্যের সহিত চন্দ্রের সমাংশাবস্থানের পর হইতে প্রতি বারো অংশ দূরত্বে এক একটী করিয়া তিথি হয়, এবং রবিবিম্বের উপর এই দূরত্ব দৃশ্য পদার্থ (যন্ত্রাদির সাহায্যে এই দূরত্ব অতি- সূক্ষ্মরূপে পরিমিত

হইতে পারে) এই সহজ কথাটা জানেন না? সূর্য্যগ্রহণের পর সূর্য্যের পেট চিরিয়া চন্দ্র বিনিঃসৃত না হইলে যে তিথির উৎপত্তি হইবে না, এই অপূর্ব্ব অর্থবাচক কথাটা তিনি সিদ্ধান্ত-ভূষণ হইয়া কোন সিদ্ধান্তমতে বলিলেন?

আর তিনি যে শাস্ত্রোক্ত বিধানে তিথি স্ফুটতর করার কথাটা বলিয়াছেন, তাহা একমাত্র জ্যোতিঃশাস্ত্র ছাড়া আর কোন্ শাস্ত্রানুসারে করিতে হইবে, তাহাও আমরা বুঝিতেছি না। তাঁহার এই শাস্ত্রোক্ত বিধানটী জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। আমার পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে আমি এইখানেই প্রবন্ধ শেষ করিলাম। কারণ, প্রতিবাদীর মত কুশাগ্রবুদ্ধির প্রতিবাদের উত্তর কথায় কথায় করিতে হইলে আমাকে স্বতন্ত্র একখানা পুস্তক লিখিতে হয়। সেরূপ ইচ্ছা ও অবসর আমার নাই; সুতরাং সুবুদ্ধি পাঠকগণ অগত্যা এই-পর্য্যন্তই যথেষ্ট বলিয়া বুঝিয়া লইবেন।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণ।
দ্বারপণ্ডিত আগরতলা।

সংবাদ।

সেহলাপট্টী—পাঙ্গাশীয়া-সভা।

স্থান সেহলাপট্টি জমীদারবাটী।

সেহলাপটী, পাঙ্গাশীয়া, গদাধরদি, কাসিমপুর, বদরদি, জনার্দ্দনদি, কানাইপুর, মিনাজদি প্রভৃতি স্থান সমূহের ব্রাহ্মণমণ্ডলীর একান্ত চেষ্টায় ও আগ্রহে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতি—শ্রীশ্রী৺ব্রহ্মণ্যদেব।

সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রায় চৌধুরী।

সহকারী সম্পাদক - শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মজুমদার।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

সহকারী কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত হীরালাল মজুমদার, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস।

হিসাব পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রায় চৌধুরী।

সহকারী হিসাব পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরকান্ত বন্দ্যো-পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরবিলাস গঙ্গোপাধ্যায়।

ধর্ম্মব্যবস্থাপক—শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত কালীচরণ তর্কালঙ্কার।

চাঁদড়া হরিহরনগর শাখা (যশোহর)।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি,এ,।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত গিরিজাকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুধাকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় বি-এ, বি-এল,।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত দৈবচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহকারী কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত দেবনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সীতানাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অনুকূল চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সীতানাথ চক্রবর্ত্তী।

হিসাব পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।

সহকারী হিসাবপরীক্ষক—শ্রীযুক্ত কেশবনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ধর্ম্মব্যবস্থাপক—শ্রীযুক্ত আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ।

এখানে রামচন্দ্র চতুষ্পাঠী নামে একটী টোল প্রতিষ্ঠিত হইল।

টোলের পরিচালক—শ্রীযুক্ত সুধাকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় বি-এ, বি-এল।

সাতৈর—মহিশালয় শাখাসভা—জেলা ফরিদপুর।

সভাপতি—৺ব্রহ্মণ্যদেব।

সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত রামগোপাল সমাজদার, শ্রীযুক্ত দেবীচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার সান্যাল, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত জয়গোপাল চক্রবর্ত্তী।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য।

হিসাব পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী।

ধর্ম্ম ব্যবস্থাপক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ কাব্যরত্ন, শ্রীযুক্ত রণজয় ভট্টাচার্য্য।

সাতৈর, মহিশালয়, বেড়াদি, ঘোষপুর, বেলেপাড়া প্রভৃতি গ্রামসমূহের বহু ব্রাহ্মণের সম্মিলনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ভাঙ্গা-শাখা ব্রাহ্মণসভা।

গত ১লা আষাঢ় শুক্রবার অপরাহ্ণে স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাসভবনে একটী ব্রাহ্মণ-সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় স্থানীয় বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ সমবেত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত রেবতীকান্ত তর্কপঞ্চানন মহাশয় হিন্দুসমাজের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া একটী বক্তৃতাদ্বারা সমাগত জনগণের চিত্তাকর্ষণ করেন। এবং সন্ধ্যাবন্দনাদির অবশ্যকর্ত্তব্যতা, উপযোগিতা ও উপকারিতা

প্রভৃতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। তদনন্তর ভাঙ্গাতে বঙ্গীয়ব্রাহ্মণসভার একটী শাখাসমিতি সংস্থাপনের প্রস্তাব করিলে তাহা উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করেন।

কথিত প্রস্তাব অনুসারে গত ২৬শে আষাঢ় মঙ্গলবার অপরাহ্নে উপরোক্ত বাসভবনে একটী সভার অধিবেশন হইয়া বঙ্গীয়ব্রাহ্মণ-সভার একটী শাখাসমিতি গঠিত হইয়াছে। এই অধিবেশনে প্রচারক শ্রীযুক্ত রেবতীকান্ত তর্কপঞ্চানন মহাশয় ব্রাহ্মণজাতির বর্ত্তমান অবনতিও তাহার প্রতীকার সম্বন্ধে একটী গভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তদনন্তর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠন করিয়া ৺ব্রহ্মণ্যদেবকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির পরিচয়।

সভাপতি—৺ব্রহ্মণ্যদেব। সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য, সেরেস্তাদার ও শ্রীযুক্ত মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, উকীল। সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত শ্রীপতি ভট্টাচার্য্য, স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী-বিদ্যালয়ের শিক্ষক। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, উকীল। ধর্ম্মব্যবস্থাপক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র তর্করত্ন। কার্য্যকরীসমিতির অতিরিক্ত সদস্য—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য, উকীল। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায়, উকীল। শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ চৌধুরী, উকীল। শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী, উকীল ইত্যাদি।

সামাজিক-শাসন।

ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত ধীতপুর শিমুলজানি গ্রামে ব্রাহ্মণমণ্ডলীর চেষ্টায় একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। সময় সময় ঐ সভায় সমাজ ও ধর্ম্মরক্ষা কল্পে নানা বিষয়ের আলোচনা হয়। ব্যবস্থাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত দুর্গাসুন্দর ব্যাকরণ স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

উক্ত ধীতপুর শিমুলজানি গ্রামের নিকটবর্ত্তী নয়ানগর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র-দের পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দে নৃত্যগীত ব্যবসায়ী (এ প্রদেশে ঘাটু বলিয়া প্রসিদ্ধ) ঐ ব্যবসা উপলক্ষে মুসলমান পল্লীতে অবস্থান করিয়াও নৃত্যগীতাদি করিত সময় সময় দীর্ঘকালও মুসলমান পল্লীতে থাকিত, যবনান্ন ভক্ষণ করিয়াছে বলিয়া বিশেষভাবে রাষ্ট্র হওয়ায় সামাজিকগণ ইহাকেও ইহার সংসর্গী বলিয়া শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র দে ও তাহার পরিবারস্থ সকলকে সমাজচ্যুত করেন। উক্ত শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র দে শুদ্ধ হওয়ার জন্য ধীতপুর শিমুলজানির ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতমণ্ডলীর শরণাপন্ন হইয়াছিল। এখানকার ব্রাহ্মণমণ্ডলী এ বিষয় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার ধর্ম্ম শাস্ত্রাধ্যাপক, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দুর্গাসুন্দর স্মৃতিরত্ন মহোদয়কে পত্রদ্বারা জ্ঞাপন করেন। তাঁহার ব্যবস্থানুসারে বিগত জ্যৈষ্ঠমাসে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র দে তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দেকে পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে নৈহাটী গিয়া ব্যবস্থানুযায়ী গঙ্গাস্নানাত্মক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইয়া সমাজে ব্যবহার্য্য হইয়াছে।

সংস্কৃত পরীক্ষা।

আগামী ৯ই আশ্বিন হইতে ১২ই আশ্বিন পর্য্যন্ত চার দিন নবদ্বীপসমাজসম্মিলিত বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণসভাকর্তৃক বিভিন্ন সংস্কৃতশাস্ত্রের "উপাধি পরীক্ষা" এবং ৯ই ও ১০ই আশ্বিন দুই দিন

"পূর্ব্বপরীক্ষা" গৃহীত হইবে। আগামী ১লা ভাদ্র হইতে ২২শে ভাদ্র পর্য্যন্ত পরীক্ষার্থিগণের আবেদনপত্র গৃহীত হইবে। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পাঠ্যতালিকার এবৎসর কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। বঙ্গদেশের যে সকল জেলায় সংস্কৃতশিক্ষার কথঞ্চিৎ অনুশীলনও আছে, প্রায় সে সকল জেলায় ইহার পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত আছে। পরীক্ষার্থিগণ আবেদনপত্রের অনুলিপি (করম), বৃত্তির পরিমাণ ও সংখ্যা পরীক্ষার নিয়মাবলী প্রভৃতির জন্য বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণসভা-সম্পাদকের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন। সম্পাদক —বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণসভা,
৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্—কলিকাতা।

সদনুষ্ঠান।

নেত্রকোণায় একটী ৺কালীবাড়ী আছে। ৺কালীবাড়ীর সুযোগ্য সেক্রেটারী স্বধর্ম্ম নিষ্ঠ উকীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বাগচী মহাশয়ের চেষ্টায় ৺কালীমন্দিরের সংস্কার ও নাটমন্দিরের পাকা পোস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার ব্যয় ধীতপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র রায়, এম, এ বিএল, সাহিত্যশাস্ত্রী মহাশয় দিয়াছেন। নাটমন্দির তাঁহার পিতা ৺জয়নাথ রায় মহাশয় প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন।

নেত্রকোণায় একটী চতুষ্পাঠীর অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। আমরা শুনিলাম গৌরীপুরের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ জমিদার মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী মহোদয় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিশ্বেশ্বরী-স্মৃতিভাণ্ডার হইতে নেত্রকোণায় একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিবেন। আশাকরি অচিরেই এ অভাব দূর হইবে।

হিন্দুরাজ্যে অহিন্দু আইন। —পাছে প্রজার মর্ম্মে আঘাত লাগে এই আশঙ্কায় ইংরাজরাজ ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সমাজসংক্রান্ত ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপে বিরত। আর আমাদের দেশীয় হিন্দুরাজ হোলকার ও গোয়েকবার নিজ নিজ রাজ্যে ধর্ম্ম ও সমাজ-বিরোধী আইন গঠনে কৃতসঙ্কল্প। সম্প্রতি ইন্দোররাজ এক বিচিত্র আইন জারি করিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ঐ আইনের মর্ম্ম এই যে যদি কোন ব্যক্তি চৌদ্দদিন মাত্র ইন্দোরে অবস্থান করিয়া যে কোন জাতীয়া রমণীকে বিবাহ করে, তাহা হইলে কেহ তাহাকে সমাজচ্যুত করিতে পারিবে না, করিলে আইন অনুসারে সে দণ্ডনীয় হইবে। বরদারাজ্যে আইন হইয়াছে যে দ্বীপান্তরপ্রত্যাগত ব্যক্তিকে অবাধে সমাজে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাতে কেহ আপত্তি করিলে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে। অপিচ আইন পাশের সঙ্গে সঙ্গে একটী ব্যবস্থা আরও ভয়ানক হইয়াছে। সেই ব্যবস্থা এই—দ্বারকাতে গোবর্দ্ধনমঠে ৺শঙ্করাচার্য্যের যে গদি আছে, তাহাতে মঠের কর্ত্তৃপক্ষ উপযুক্ত বিবেচনায় এক-জনকে প্রধান পাণ্ডার পদে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। বরোদারাজ নির্ব্বাচিত পাণ্ডাকে গদিচ্যুত করিয়া একজন দ্বীপান্তর প্রত্যাগত বিধবাপাণিপীড়ককে সেই পবিত্র গদিতে স্থাপিত করি-লেন। বিধর্ম্মী খাস বিলাতীর আচরণে, আর বিলাতীহাবভাবপুষ্টের আচরণের পার্থক্য কেমন —ভাক্ত সূর্য্যের উত্তাপ অসহনীয় কেমন—এখন দেখুন! হিন্দুসমাজ আজও এতদূর অধঃপাতে যায় নাই যে এই অত্যাচার নির্ব্বাক্ হইয়া সহ্য করিবে। হিন্দুরাজ্যে বল প্রয়োগে রাজবিধান চালান এই প্রথম। ইহার ফলে সেই রাজ্যের অনেক হিন্দু প্রজা কাশী, মথুরা, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে চলিয়া আসিয়াছেন। কি বাঙ্গালী, কি হিন্দুস্থানী, কি মাড়বারী সকল হিন্দু-সম্প্রদায় হইতেই ইহার ঘোর প্রতিবাদ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ব্রাহ্মণ-সমাজের নিয়মাবলী।

১। বর্ষগণনা—১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্বিন হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত বৎসর পরিগণিত হইয়া থাকে। ১৩২৩ সালের বর্ত্তমান আশ্বিন হইতে ইহার পঞ্চম বর্ষ চলিতেছে।

২। মূল্য—ব্রাহ্মণ-সমাজের বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র দুই টাকা। ভিঃ পিঃ ডাকে লইতে হইলে দুই টাকা দুই আনা লাগিবে। স্বতন্ত্র ডাকমাশুল লাগিবে না। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। ব্রাহ্মণ-সমাজের মূল্য অগ্রিম দেয়। বৎসরের কোন অংশের জন্য গ্রাহক গৃহীত হয় না। বৎসরের যে মাসেই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আশ্বিন হইতেই তাঁহার বার্ষিক চাঁদার হিসাব চলিবে।

৩। পত্রপ্রাপ্তি—ব্রাহ্মণ-সমাজ বাঙ্গলা মাসের শেষ তারিখে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোনও গ্রাহক পর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে ব্রাহ্মণ-সমাজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। না জানাইলে পরে তাঁহাদের ক্ষতি পূরণ করা কঠিন হইবে।

৪। ঠিকানা পরিবর্ত্তন—গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া—তাঁহাদের নাম ধাম পোষ্ট অফিস ইত্যাদি যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কিম্বা অন্য প্রয়োজনে চিঠিপত্র লিখিলে অনুগ্রহ করিয়া সর্ব্বদা নিজের গ্রাহক নম্বরটী লিখিয়া দিবেন।

৫। চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি—"ব্রাহ্মণ-সমাজে" কোনও প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইলে লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। আর সর্ব্বদাই কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। ব্রাহ্মণ-সমাজ-সম্পাদক প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইবার ভার গ্রহণকরিতে অক্ষম। চিঠিপত্র ব বন্ধা প্রসমস্তই সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদকের নামে ৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। টাকাকড়ি—৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ব্রাহ্মণসভার কার্য্যালয়ে ব্রাহ্মণসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

বিদেশীয় গ্রাহকগণকেও টাকার রসিদ দেওয়া হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভারের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ২য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনের হার মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ৩য় পৃষ্ঠা ও পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ পৃষ্ঠা ৪৲ চারি টাকা হিসাবে লওয়া হয়। অন্য পেজ ৩৲ তিন টাকা—বার্ষিক স্বতন্ত্র।

২। তিন মাসের কম সময়ের জন্য বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। তিন মাসের মধ্যে বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তিত হয় না।

৩। বিজ্ঞাপনের মূল্যের অর্দ্ধেক টাকা অগ্রিম জমা না দিলে ছাপা হয় না।

৪। দীর্ঘকালের নিমিত্ত বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইলে কার্য্যালয়ে জানিতে পারা যায়।

ব্রাহ্মণসমাজ সম্পাদক
৬২ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা—৮২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ নবদ্বীপ সমাজ সম্মিলিত—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা হইতে

ব্রাহ্মণসমাজ কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১২ নং সিমলাষ্ট্রীট, জ্যোতিষ-প্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

	বিষয়		নাম	পৃষ্ঠা
১।	কাজের কথা	...	শ্রীযুক্ত—	৬১৩
২।	চণ্ডী-রহস্য	...	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ	৬১৫
৩।	ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ	...	শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য	৬১৯
৪।	গীতাতত্ত্ব	...	শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী	৬২২
৫।	সন্ধ্যার সন্দেহ প্রবন্ধের প্রত্যুত্তর	...	শ্রীযুক্ত প্রমেশচন্দ্র কাব্যতীর্থ	৬৩২
৬।	সামাজিক-গীত	...	শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়	৬৩৭
৭।	বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণসভার কার্য্যবিবরণী	...		৬৩৯
৮।	পঞ্চম বর্ষের বর্ণানুক্রমিক সূচী	..		৬৫১
৯।	পঞ্জিকা-সংস্কার সমালোচনর বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা		শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র এম্ এ	৬৫৫

REGISTERED No. C—675.

পঞ্চম বর্ষ। { ১৮৩৯ শক, ১৩২৪ সাল, ভাদ্র। } দ্বাদশ সংখ্যা।

কাজের কথা।

আপন কিছু রাখিস্ না রে
আপন কিছু রাখিস্ না,
তুই যে একটা কাজের মানুষ
এ কথা আর ভাবিস্ না ?
গোপন করা প্রাণের ব্যথা
কেন রুদ্ধ ক'রে রাখিস্ বৃথা,
ছাড়িয়ে দে'না সকল সেথা,
ব্যর্থ সে তো হ'বে না রে
ব্যর্থ সে তো হ'বে না।
ব্যস্ত যে তুই মস্ত আশে
হয় তো তা সে ফলবে না,
ভিতর বাহির সব জানে সে—
হিসেব ছাড়া দিবে না ;—
তার ওজন করা সব জিনিষটি

সময়মত ফলবে সেটি
মিছে তোর এ ছুটোছুটি,
জোর জুলুমে চলবে না যে
জোর জুলুমে চলবে না ॥
অভিমান তোর মিছে করা
খবর কিছু রাখিস্ না।
হয় না কিছু সময় ছাড়া
নৈলে জগৎ টেঁকে না।
তোর জন্য তার ভাবনা যত
তুই কি তোরে ভাবিস্ তত?
তারে—দেখিস নায়ে পরের মতো
দেওয়া কিছু দেখিস নারে
দেওয়া কিছু দেখিস না।
দুঃখ দৈন্য ভিন্ন যে তোর
মানুষ হওয়া চল্‌বে না,
দম্ভভরা বক্ষ যে তোর
উচ্চ উদার হ'বে না।
বুঝ্‌বি নে তুই ব্যথীর ব্যথা
দগ্ধ প্রাণের করুণ কথা,
এ জীবনটা শুধুই বৃথা
লক্ষ্যশূন্য চল্‌বেনা রে
লক্ষ্যশূন্য চল্‌বে না।
যুক্তি, তর্ক, দ্বন্দ্ব, মান
গণ্ডগোল আর করিস্ না।
আপনাতে আপ্‌নি থাকিস্
কারো কথাই শুনিস্ না।
তোর প্রাণের কথাই গুহ্যসত্ব
প্রাণের মাঝে বিশ্বতত্ত্ব
একথাটা ধ্রুব সত্য
ভুলিস্ নারে ভুলিস্ না।

শ্রীঃ

(৮)

ধূম্রলোচন-বধ।

দেবী-চরিত্রশ্রবণ-পিপাসু সুরথরাজা ও সমাধি বৈশ্য,—মেধস্ মুনির তপোবনে বাস করিতেছেন, মুনিও প্রত্যহ জগদম্বার অলৌকিক চরিত্রকাহিনী বর্ণনাক্রমে তাঁহাদের কৌতূহল প্রবর্দ্ধিত ও কর্ণকুহর পবিত্র করিতেছেন্।

সুগ্রীব দূত দেবীর দর্পগর্ব্ব স্থিরপ্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া (যেন) অমর্ষপূরিত হইয়া, অসুরেশ্বরসমীপে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল।

অসুররাজ দূতমুখে দেবীর অবজ্ঞাসূচক সদম্ভ বচনপরম্পরা শ্রবণপূর্ব্বক ক্রোধে জ্বলিত হইয়া দৈত্যনায়ক ধূম্রলোচনকে আদেশ করিলেন ;—হে ধূম্রলোচন ! তুমি ত্বরাসহকারে নিজ সৈন্যদলে পরিবৃত হইয়া বলপ্রকাশে সেই দুষ্টা রমণীকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক এখানে আনয়ন কর। তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যদি কেহ অগ্রসর হয়,—সেই ব্যক্তি দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব যেই হউক তাহাকেও নিহত করিবে।

ধূম্রলোচন এইরূপে রাজ-আজ্ঞা পাইয়া ষষ্টিসহস্র অসুরসৈন্যসমভিব্যাহারে দ্রুতপদে হিমালয় অভিমুখে গমন করিল। ধূম্রলোচন হিমালয়শৃঙ্গে সেই অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি দর্শনপূর্ব্বক দূর হইতে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, ওহে রমণি! তুমি শীঘ্রই শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকট গমন কর—যদি প্রীতির সহিত আমার স্বামিসমীপে না যাও, তাহা হইলে এইক্ষণেই তোমাকে কেশ আকর্ষণ করিতে করিতে লইয়া যাইব।

দৈত্যপতির সদম্ভ কর্কশ বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া দেবী বলিতে লাগিলেন,—

দৈত্যেশ্বরেণ প্রহিতো বলবান্ বলসংবৃতঃ।
বলান্নয়সি মামেবং ততঃ কিন্তে করোম্যহম্॥

তুমি দৈত্যেশ্বর অমিতবিক্রম শুম্ভকর্ত্তৃক প্রেরিত, সুতরাং তোমার স্বামিবল অপরিমেয় ; আর তুমি নিজেও বলবান্, অর্থাৎ শারীরিক বলও তোমার যথেষ্ট, এবং বলসংবৃত, প্রভূত সৈন্যদলে পরিবেষ্টিত ; ফল কথা সহায় বলেও তুমি হীন নও। অতএব স্বামিবল, শারীরবল ও সহায়বল, এই বলত্রয়ের উন্মাদতায় যদি আমাকে বলপ্রকাশে লইয়া যাও, তাহা হইলে আমি তোমার কি করিতে পারি ?

ইহার অপর অর্থ এই যে, হে দৈত্য! 'ত্বং ঈশ্বরেণ প্রহিতঃ' কি ? ঈশ্বর তোমাকে পাঠাইয়াছেন কি ? নিশ্চয়ই তোমাকে ভগবান্ এখানে পাঠাইয়াছেন। তুমি বলবান্ ও

সৈন্যবেষ্টিত, যদি এই নিমিত্ত বলপূর্ব্বক (ত্বং আত্মানং মাং নয়সি *) তোমার আত্মাকে যদি আমাতে নিবেশ করিতে চাও, ফলকথা আমাতে আত্মাহুতি প্রদান করিতে চাও, তাহা হইলে আমি (তে ত্বাং) তোমাকে "এবং করোমি" (ভবিষ্যৎ ভস্মীকরণ লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন) এইরূপে ভস্ম করিয়া ফেলিব। যাহার কাল পূর্ণ হয়, পরমেশ্বর হৃদয়দেশে থাকিয়া তাহাকে সংহারিণী শক্তির অভিমুখে প্রেরণ করেন। পতঙ্গ যেমন স্বেচ্ছায় প্রদীপ্ত অগ্নিকুণ্ডে দ্রুতবেগে ঝম্পপ্রদান করে, কালপ্রাপ্ত জীবও সেইরূপ সেই সংহারিণী কালরাত্রির বিকরাল বদনকুহরে আপনাআপনি প্রবেশ করিয়া থাকে।

অথবা মুক্তিলিপ্সু, সুকৃতিবলে ভগবৎ সাযুজ্যলাভনিমিত্ত ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সাধনবলে পরমাত্মায় প্রলীন হইতে হইলেও স্থূলদেহটী বিনষ্ট হওয়া প্রয়োজন; ধূম্রলোচনও স্বকীয় স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া মহাশক্তিতে বিলীন হইবে—এই নিমিত্তই ভগবতী বলিতেছেন,—"তে এবং করোমি" তোমাকে ভস্মীভূত করিব। অথবা তে ত্বাং এবং সত্যং করোমি; অর্থাৎ তুমি জন্মান্তরীয় সাধনবলে বা ইহজন্মীয় ভগবদভিমুখিত্বরূপ একাগ্রতাবলে যদি তোমার জীবাত্মাকে আমাতে (পরমাত্মায়) বিলীন করিতে চাও, তাহা হইলে আমি তোমাকে সত্যস্বরূপতা বা পরমাত্মভাব প্রাপ্ত করাইব। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" তুমি যখন বলযুক্ত, তখন আত্মলাভের যোগ্যপাত্র।

এই যেমন ভগবতী জগদম্বিকার বাক্যে তত্ত্বার্থের আভাস পরিস্ফুট, ধূম্রলোচনের সগর্ব্বোক্তিতেও কি সেইভাব নিহিত নহে? অহো! দৈত্যগণের কি সৌভাগ্য! শুম্ভনিশুম্ভের নিকটে থাকিলেই তাহাদের আসুরভাবের পূর্ণবিকাশ, আর মহামায়ার সান্নিধ্যলাভ করিলেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয়। পূর্ব্বে সুগ্রীব-দূতের যাহা হইয়াছিল, আজ বুঝি ধূম্রলোচনেরও তাহাই ঘটিয়াছে। ধূম্রলোচন যেকালে সেই তুহিনাচল-সংস্থিতা দেদীপ্যমানা রমণীমূর্ত্তি অবলোকন করিয়াছে, অমনি সেই অলোকসামান্যা রমণীর তেজঃপ্রভা অসুরের অজ্ঞানান্ধকারাবৃত অন্তঃকরণ আলোকিত করিয়া দিয়াছে, এখন আর সে ধূম্রলোচন নহে—তিনি প্রদীপ্তলোচন হইয়াছেন, এখন আর তদীয় দৃক্‌শক্তি অজ্ঞানতিমিরে আবৃত নহে। তাহার অন্তঃকরণের ধূমায়িত জ্ঞানাগ্নি মহাশক্তির তেজঃসংস্পর্শে প্রজ্বলিত। তাই আজ ধূম্রলোচন চিনিবার বস্তু চিনিয়াছে, দ্রষ্টব্য দেখিয়াছে; এক্ষণে কেবল পাইবার জন্যই ব্যস্ত।

তন্নিমিত্ত দর্শনমাত্রেই আকুলভাবে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, "শুম্ভ নিশুম্ভয়োঃ মূলং প্রয়াহি"। জননি! আর ছলনা করিও না; অজ্ঞান শুম্ভনিশুম্ভের প্রতি কৃপাপ্রকাশ কর, তাঁহাদের সাক্ষাতে মূলতা প্রাপ্ত হও,—অর্থাৎ বিশ্বের মূলপ্রকৃতিতা প্রকাশ কর, ফলকথা প্রপঞ্চের মূলশক্তিরূপে দেখা দাও। তাহারা তোমার স্বরূপদর্শনে কৃতকৃত্য হইয়া যাউক। অথবা শুম্ভ-

* নয়ত্যাদি ধাতু দ্বিকর্ম্মক, যথাঃ—অজাং নয়তি গ্রামং, এইস্থলেও "আত্মানং" একটী কর্ম্ম অব্যাহৃতী।

নিস্তম্ভের মূলতা, কারণতা প্রাপ্ত হও, তাহারা তোমাতে বিলীন হইয়া কৃতার্থ হউক । সংসার-জ্বালা মিটাইয়া ফেলুক । আর আমি যখন তোমায় প্রকৃতরূপে দেখিয়াছি, তখন আর ছাড়িব না ।

নচেৎ প্রীত্যাদ্য ভবতী মদ্ভর্তারমুপৈষ্যতি ।
ততো বলান্নয়াম্যেষ কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্ ॥

আর যদি আপনি প্রীত্যা (আনন্দস্বরূপেণ) ন উপৈষ্যতি আমার দৃক্ বিষয়ে উপস্থিত না হও, অর্থাৎ আনন্দময়ীরূপে বা ব্রহ্মরূপে আমায় দেখা না দাও, তাহা হইলে আমি তোমাকে বলপূর্ব্বক ব্রহ্মরূপ করিয়া লইব—সমাধিবলে তোমার জগদ্ভাব ছাড়াইয়া দিব । তজ্জন্যই বলিতেছেন,—"ততো বলাৎ" তস্মাৎ প্রসিদ্ধাৎ সমাধিবলাৎ (অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিবলে প্রকৃতির জগদবস্থার খণ্ডন করা যাইতে পারে) কেশাকর্ষণবিহ্বলাং ত্বাং মদ্ভর্তারং পরমাত্মানং (নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধমুক্তং) নয়ামি প্রাপয়ামি ।

ক শব্দে রজোগুণের অধিদেবতা (ব্রহ্ম) অ শব্দে সত্বগুণের অধিদেবতা (বিষ্ণু) আর ঈশ শব্দে তমোগুণের অধিদেবতা (মহেশ্বর) সুতরাং কেশ অর্থে সত্বরজস্তমোগুণ, সেই কেশের বা গুণত্রয়ের আকর্ষণ, অর্থাৎ ত্রিগুণময় বুদ্ধিতত্বে চৈতন্যের প্রতিবিম্বন, * তাহাদ্বারা তুমি বিহ্বলা আকুলিতা হইতেছ,—ফলকথা নির্গুণা হইলেও বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিতা হইয়া বুদ্ধিগত সুখদুঃখাদিও কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতেছ । জবা-সান্নিধ্যে স্বচ্ছ স্ফটিকেও যেমন লৌহিত্য প্রতিফলিত হওয়ায় স্ফটিককেও লোহিত বলিয়া বোধ হয়, প্রকৃতি-সান্নিধ্যেও পরমাত্মার প্রাকৃত ধর্ম্মের আরোপ হইয়া থাকে, ইহা বাস্তব নহে ।

সমাধিবলে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিতে পারিলেই,—

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং ৩ । (পাতঞ্জল সমাধিপাদ)

আত্মাস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, এই নিমিত্তই বলিতেছেন, তুমি কেশাকর্ষণবিহ্বলা, (গুণধর্ম্মে উপরক্তা) হইলেও বলপূর্ব্বক (অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিবলে) তোমাকে মদ্ভর্তারং নয়ামি প্রাপয়ামি, পরমাত্মভাব প্রাপ্ত করাইয়া দিব ।

কৃতার্থং প্রতিনষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ । যোগসূত্র ।

তুমি অন্যের পক্ষে গুণধর্ম্মে উপরক্তা হইয়া তাহার জন্য সংসার প্রসব করিলেও, আমার কাছে তাহা পারিবে না । আমি বলপূর্ব্বক তোমায় ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত করাইব ।

অস্তি ভাতি প্রিয়ং নাম রূপমিত্যংশপঞ্চকম্ ।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততোদ্বয়ম্ ॥

(ক্রমশঃ)

---

* গুণা অয়স্কান্তমণিকল্পাঃ সন্নিধিমাত্রোপকারিণঃ দৃশ্যত্বেন স্বং ভবন্তি পুরুষস্য স্বামিনঃ ।
(পাতঞ্জল ব্যাসভাষ্য)

অস্তি—সৎ,—ভাতি—চিৎ, প্রিয়ং—আনন্দ, নাম ও রূপ পরমাত্মার এই পাঁচটী অংশ। সৎ—চিৎ—আনন্দ এই তিনটী ব্রহ্মরূপ, নাম ও রূপ ইহা জগদবস্থা। এই নিমিত্ত অসুর বলিতেছেন,—"প্রীত্যা" আনন্দরূপেণ অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে দেখা দিতে হইবে, নতুবা বলপূর্ব্বক তোমার গুণ সম্বন্ধ ছাড়াইয়া দিয়া ব্রহ্মরূপ করিয়া লইব।

দেবীর সেই দ্ব্যর্থবোধক আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া অসুর দেবীর অভিমুখে প্রধাবিত হইল, দেবীও তাহাকে হুঙ্কারদ্বারা ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। আমরা না হয় বুঝিলাম অসুর দেবীর অভিমুখে প্রধাবিত তাহার কেশাকর্ষণ করিবার জন্য, কিন্তু দেবীর কি হুঙ্কার ব্যতীত অন্য কোনও অস্ত্রাদি ছিল না ? নিশ্চয়ই এ কথার কোনও গূঢ় অভিসন্ধি থাকিবে। "অসুরো ধূম্রলোচনঃ" এইস্থলে অকার প্রশ্লেষ করিলেই অর্থ হইবে, সেই অসুর সম্প্রতি অধূম্রলোচন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া দেবীকে পাইবার জন্য ধাবিত হইল। মুক্তিলিপ্সু তত্ত্বজ্ঞানী জীব ভগবানের অভিমুখে দ্রুতবেগে ছুটিবে, ইহা ত স্বাভাবিক।

জগৎপ্রসূতি অম্বিকাও তাহাকে হুঙ্কারেণ মায়াবীজেন * সহ ভস্ম চকার। মায়ারূপ যে সংসারবীজ, তাহার সহিত, অথবা মায়া অবিদ্যা এবং সংসারবীজ অনাদি কর্ম্মবাসনা, এতদুভয়ের সহিত অসুরকে অর্থাৎ তদীয় স্থূল সূক্ষ্ম উভয় দেহকে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন, তাহার চিত্তবিমুক্তিরূপ মুক্তি ঘটিয়া গেল। তাই শ্রুতি বলেন,—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

সেই পরাবর পরমাত্মা সাক্ষাৎকৃত হইলে জীবের হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন, সর্ব্বপ্রকার সংশয়রাশি ছিন্ন ও কর্ম্মবাসনা ক্ষীণ হইয়া যায়, সেই জীব কৃতকৃত্যতা লাভ করিতে পারে; কত যুগ যুগান্তের সাধন বলে আজ ধূম্রলোচন অসুর, অধূম্রলোচন হইয়া পরাপর পরমাত্মস্বরূপিণী জগদম্বার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইল। ধন্য ধূম্রলোচন! তোমার অসুরজীবনও ধন্য। আমরা ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া নিয়ত সংসার-অরণ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়াও জগদম্বার কৃপা লাভে বঞ্চিত। জানিনা কতদিনে তাঁহার পাদপদ্ম সন্দর্শন ঘটিবে, অন্তরের চিরপোষিত আশা মিটিবে, আমরা কতদিনে কৃতকৃত্য হইতে পারিব!

শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ।

---

* হুঙ্কার শব্দের অর্থ মায়াবীজ, যামলতন্ত্রে ও বিশ্বসারে প্রচণ্ডচণ্ডিকা-প্রকরণে লিখিত আছে;—ঈশান মুদ্ধৃত্য পুরারিবীজং, সবিন্দুকং নাদবিভূষিতঞ্চ। সবামকর্ণং পরিতঃ প্রকল্প্য মায়াং বদন্তীহ মনীষিণ স্তাং॥ বংশজ গ্রন্থে হ্রস্বান্ত থাকিলেও শ্রুতি বৈষম্য না হওয়ায় দীর্ঘান্ত পাঠ ও তদনুযায়িনী ব্যাখ্যা অসঙ্গত নহে।

ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ।

ব্রাহ্মণ ত্রিবিধ ; মুখ্য ব্রাহ্মণ—যিনি জাতি এবং সত্যাদিসদ্‌গুণসম্পন্ন তিনি মুখ্যব্রাহ্মণ, আর দুই প্রকার গৌণব্রাহ্মণ, কেবল জাতিব্রাহ্মণ এবং গুণব্রাহ্মণ ; যাঁহার গুণ নাই, কেবল ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, তিনি জাতিব্রাহ্মণ এবং যাঁহার জন্ম ব্রাহ্মণকুলে না হইলেও সত্যাদিসদ্‌গুণ যাঁহার আছে, তিনি গুণব্রাহ্মণ। মুখ্যব্রাহ্মণ এবং শেষোক্ত গৌণব্রাহ্মণ সকলেরই আদরণীয়। গুণহীন জাতিব্রাহ্মণকে শাস্ত্রও নিন্দা করিয়াছেন।

বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী সম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণ নামেই যেমন বিদ্বেষের একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, বুদ্ধদেবের সময়ে সেরূপ হয় নাই। বুদ্ধদেব কেবল জাতিব্রাহ্মণকে না মানিলেও অপর দ্বিবিধ ব্রাহ্মণই তাঁহার আদৃত। তিনি বুদ্ধ ও ব্রাহ্মণ একই বলিয়াছেন। 'ব্রহ্ম জানাতি' ব্রাহ্মণ এবং বুদ্ধ তত্ত্ববোধশালী—এই দুই অর্থেরও সাম্য অল্প নহে। তবে কথা এই— যখন কোন দেশে কোন ধর্ম্ম বা দার্শনিক মত বহুদিন ধরিয়া বহুলোককর্ত্তৃক অবলম্বিত ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, তখন উহা স্বভাবতঃই প্রবর্ত্তক বা প্রবর্ত্তকগণের নির্দ্দিষ্ট মূলসূত্র হইতে অনেকটা বিভিন্ন আকার ধারণ করে। যেমন কোন স্রোতস্বিনী আপন উৎপত্তিস্থান হইতে নির্গত হইয়া ক্রমে দেশ বিদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, এবং ক্রমে আবিলতা লাভ করিয়া পরিশেষে আপন সলিলের নিজস্ব ভাবটুকু বিপুল লবণসমুদ্রে মিশাইয়া দেয়, তখন তাহার প্রাথমিক বিশিষ্টতা বাছিয়া লওয়া যায় না, সেইরূপ ধর্ম্ম বা দার্শনিক মত গুরুমুখনিঃসৃত হইয়া ক্রমে শিষ্যপরম্পরার সম্পর্কে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের আবিলতার মধ্য দিয়া প্রচারিত হইয়া কিম্ভূত কিমাকার ধারণ করে, তখন তাহার মূল সূত্রটী হারাইয়া ফেলিতে হয়। খেই হারাইয়া ফেলিলে একটা গোলযোগ বাধে ; অনুসন্ধিৎসার ব্যর্থতায় ব্যথা পাইয়া সাধারণের মনে একটী অশান্তির সৃষ্টি হয়। তখন তাহারা এই অশান্তির প্রেরণায় সেই নষ্ট মূলসূত্রটীর পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় তাহাদিগের সমস্ত মানসিক শক্তি প্রণোদিত করে। তাহার ফলে হয়ত আবার একটী নূতন ধর্ম্ম বা দার্শনিক মতের সৃষ্টি হয়। তখন অবশ্য তাহাতে আবর্জ্জনা স্পর্শ করিতে পারেনা। হয়ত এই নূতনটীর মূলসূত্র বাস্তবিক পক্ষে পূর্ব্বোক্তটীর মূলসূত্রের সহিত বিরুদ্ধভাবাপন্ন না হইলেও উহার আবর্জ্জনার ব্যবধানই ক্রমে বিরোধে পরিণত হয় এবং ক্রমে দ্বিতীয় মতেরও অবশ্যম্ভাবী আবর্জ্জনা সেই বিরোধকে আরও ঘোরতর করিয়া তুলে। তখন বিচক্ষণ ব্যক্তি আপনার তত্ত্বদর্শিতার গুণে বুঝিতে পারেন যেন দুইটী বীরপুরুষ একই দেশে, একই জাতিতে, একই মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া দৈবক্রমে দুই বিভিন্ন দেশে পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া রণক্ষেত্রে উভয়ে উভয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে। কিন্তু প্রাদেশিক ও আগন্তুক ভাবগুলি বাদ দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, সকল ধর্ম্মের, সকল নীতির যাহা সার, যেগুলি নিত্য সত্য তত্ত্ব, তাহাদের মধ্য দিয়া সামাঞ্জস্যের একটী অচ্ছেদ্য সূত্র বহিয়া তাহাদিগকে গ্রথিত করিয়া রাখি-

যাছে। মনীষিগণের মনোরাজ্যের এই এক অপূর্ব্ব নিয়ম যে তাঁহাদিগের চিন্তাশ্রেণীর তলদেশ দিয়া ভাবসাম্যের এক অন্তঃসলিলা বহিয়া যাইতেছে। কি খৃষ্ট ধর্ম্ম, কি মহম্মদীয় ধর্ম্ম, কি বৌদ্ধ ধর্ম্ম, কি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, কোনটীতেই এই অপূর্ব্ব নিয়মের ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না।

কিন্তু সাধারণতঃ আমরা এই তথ্যটী ভুলিয়া যাই। আমরা মনে করি বুঝি একটী ধর্ম্ম আর একটীকে সমূলে উচ্ছিন্ন করিবার জন্য অভ্যুত্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং, একটীর যাহা ধ্যান, ধারণা, শিক্ষা, দীক্ষা, তাহা অপরটীর সহিত কোন ক্রমেই সামঞ্জস্যের আশা করিতে পারে না। এই ভ্রমাত্মক ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা অনেক সময়ে ভাবিয়া থাকি বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন, একটী অপরটীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্যই অভ্যুত্থিত হইয়াছিল। কিন্তু একটু দূরদর্শিতার সহিত দেখিলে দেখা যাইবে যে সৌগত ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে বিরোধ আছে বটে, কিন্তু সে বিরোধ অতি উপরের স্তরেই সীমাবদ্ধ, তলস্পর্শী নহে ; উহা প্রাদেশিক আগন্তুক বা বহিরঙ্গীভূত ভাবগুলি লইয়া, মূলসূত্র লইয়া নহে। আগন্তুকভাবগুলি উপেক্ষা করিয়া মূলসূত্রের অনুসন্ধান কর, দেখিবে বুদ্ধবাক্য এবং জনক, যাজ্ঞবল্ক্য ও মনুবাক্য একই সুরে বাঁধা।

অবশ্য ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য বা ঐক্য প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমরা এইমাত্র দেখাইতে চেষ্টা করিব যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রধানতঃ নীতিমূলক (pre-eminently ethical) এবং এই নীতির দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ব্রাহ্মণ ও "শ্রমণ" এই দুইটী পর্য্যায়ের ভাবার্থ একই। সদ্ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কিরূপে কুশলমার্গে বিচরণ করতঃ মানবমণ্ডলী শ্রামণ্য বা অর্হত্ত্ব লাভ করিতে পারে, তাহাই বুদ্ধনীতি। এ দিকে উপনিষৎ বলেন, নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক প্রভৃতি সাধনচতুষ্টয়ের সাধন করিয়া স্রক্‌চন্দনবনিতামধুমাংসাদি বর্জ্জন করতঃ নিরুপাধি হইয়া ব্রাহ্মণ্যপদ লাভ করিবে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে উক্ত দুই মতানুসারে মুমুক্ষু অথবা নির্ব্বাণেচ্ছুর নৈতিক ও ধর্ম্ম জীবনের মূলসূত্র একই। বলা বাহুল্য যে ভারতীয় দর্শনের চরম লক্ষ্য নৈতিক উৎকর্ষ সাধন ; দর্শনের তত্ত্বগুলি উপায়, জীবনকে ধর্ম্ম ও নীতির আদর্শে গড়িয়া তুলা তাহার উদ্দেশ্য। একথার যাথার্থ্য বৌদ্ধশাস্ত্রেরও প্রতি অক্ষরে পরিস্ফুট। মনুস্মৃতিতে ব্রহ্মচারীর দৈনিক কর্ত্তব্যের মধ্যে যে ভিক্ষাচর্য্যা অন্যতম কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, বৌদ্ধশাস্ত্রে সেই ভিক্ষাবৃত্তিকে আরও সমাদর ও উচ্চতর স্থান দেওয়া হইয়াছে ; এমন কি ভিক্ষু বা 'সমণ' নামে একটি বৌদ্ধ সন্ন্যাসিশ্রেণী গঠিত হইয়াছে।

ফলকথা, বৌদ্ধশাস্ত্রের মর্ম্ম এই যে ব্রাহ্মণ হইলেই বৌদ্ধ ধর্ম্মদ্বেষী হইল এমন নহে, অথবা শ্রমণ হইলেই ব্রাহ্মণত্বে বর্জিত এমনও নহে। বরং বুদ্ধদেবও ব্রাহ্মণগণকে যথেষ্ট আদর ও বহুমান করিতেন। কারণ বাস্তবিক ব্রাহ্মণের জীবনে যে সমুদায় আচার, অনুষ্ঠানের বিধি আছে, শ্রমণের জীবনেও মূলতঃ তাহাই। ব্রাহ্মণ শান্ত, দান্ত, নিয়ত ব্রহ্মচারী, শ্রমণও তাহাই।

ব্রাহ্মণ সর্ব্ব বাসনাজাল ছিন্ন করিবেন। বুদ্ধও বলিতেছেন, "তণহাকৃখয়ো সর্ব্বদুক্খং জিনাতি।" যিনিই শুদ্ধসত্ব, তিনিই জাতি বা সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে ব্রাহ্মণ বা শ্রমণ পদের অধিকারী। তাই তিনি বলেন, "কি করে বরণ কুল রে"। তাই তিনি বলেন,—

অলংকতো চেপি সমং চরেয্য
সন্তো দন্তো নিয়তো ব্রহ্মচারী
সর্ব্বেসু ভূতেসু নিধায় দন্তং
সো ব্রাহ্মণো সো সমণো সো ভিক্‌খু।

—ধম্মপদ। দন্তবগ্‌গ, ১৪।

যিনি অলংকৃত অর্থাৎ বহুবিধ বহিরুপাধিমান্ হইলেও শান্ত, দান্ত, সংযত ও ব্রহ্মচারী, এবং সর্ব্বভূতে অহিংসা ও শম আচরণ করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ, তিনিই শ্রমণ, তিনিই ভিক্ষু।

ধম্মপদের উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাচ্ছলে বুদ্ধঘোষ নিম্নলিখিত উপাখ্যানটী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেনঃ— একদা বুদ্ধদেব একটী ধর্ম্মবিষয়ক শ্লোক পাঠ করিতেছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা প্রসেন্‌জিতের ধম্মপ্রাণ মন্ত্রী সন্ততি তৎক্ষণাৎ অর্হৎ বা বৌদ্ধসন্ন্যাসী হয়েন ও নির্ব্বাণলাভ করেন। তখন অন্যান্য শ্রমণগণ বিস্মিত হইয়া পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "এব্যক্তি ত দেখিতেছি বেশ সচিবের বেশ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, অথচ উনি নির্ব্বাণ-লাভ করিলেন, ইহা কিরূপে হইল? ক্রমে ঐ প্রশ্ন যখন বুদ্ধদেবের কর্ণে উঠিল, তখন তিনি এইভাবে প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিলেন, "ভিক্‌খবে মমপুতং সমণোতি বত্তুম্ বত্তি, ব্রাহ্মণো তি পি বত্তুম্ বত্তি" অর্থাৎ যিনি আমার ধর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন তাঁহাকে শ্রমণও বলিতে পার, ব্রাহ্মণও বলিতে পার, একই কথা। ধম্মপদ গ্রন্থের ব্রাহ্মণবগ্গে, এই তথ্য আরও পরিস্ফুট হইয়াছে।

বাহিতপাপো তি ব্রাহ্মণো
সমচরিয়া সমণো তি বুচ্চতি
পব্‌বাজ যমত্ত নো মলং
তস্মাপচ্চজিতোতি বুচ্চতি। ব্রাহ্মণ বগ্‌গ, ৬
ন জটাহি ন গোত্তেহি ন জচ্চাহোতি ব্রাহ্মণো
যম্হি সচ্চঞ্চ ধর্ম্মো চ সো সুচী সো চ ব্রাহ্মণো॥ ১১
আসা যস্‌স ন বিজ্জন্তি অস্মিং লোকে পরম্হি চ।
নিরাসয়ং বিসংযুত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং। ২৮
হিত্বা রতিঞ্চ অরতিঞ্চ সীতিভূতং নিরুপধিং
সব্ব্‌লোকভিভুং বীরং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥ ৩৬
চুতিং যো বেদি সত্তানং উপপত্তিঞ্চ সর্ব্বসো
অসত্তং সুগতং বুদ্ধং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥৩৭

শ্লোক কয়টীর মর্ম্মার্থ এই যিনি অপহতপাপ্মা তিনিই ব্রাহ্মণ, যিনি কুশলমার্গে বিচরণ করেন তিনিই শ্রমণ, যিনি রাগদ্বেষাদি মল প্রব্রজিত অর্থাৎ দূর করিয়াছেন, তিনিই প্রব্রজিত অর্থাৎ ভিক্ষু। জটাধারণ কর, অথবা অভিজাতবংশে জন্মগ্রহণ কর, তাহাতে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। যিনি নিরাকাঙ্ক্ষ, অনাসক্ত, যাঁহার রাগদ্বেষ উপশান্ত হইয়াছে, যিনি সর্ব্ববিধ উপাধিবিহীন, যিনি নির্ব্বাণমার্গে সতত উদ্যমশীল, যিনি প্রাণিগণের জন্মমৃত্যু-তত্ত্ব অবগত আছেন এবং যিনি সুগত বা বুদ্ধ হইয়াছেন তিনিই ব্রাহ্মণ।

বুদ্ধদেব কথিত এই ব্রাহ্মণের লক্ষণের সহিত হিন্দুশাস্ত্রোদিত ব্রহ্মচারীর অন্ততঃ নৈতিক বা ধর্ম্মজীবনের কর্ত্তব্যের বিশেষ পার্থক্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইতিপূর্ব্বেও আমরা দেখিয়াছি যে উপরি উক্ত আচারানুষ্ঠানপালনকারীকে বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ, শ্রমণ ও ভিক্ষু এই তিন পর্য্যায়ে তুল্যার্থে অভিহিত করিয়াছেন। এইরূপে দেখা গেল যে হিন্দুর নৈতিক জীবনের যাহা সার, যাহা মহৎ, বৌদ্ধেরও নৈতিক জীবনে ঠিক তাহাই। প্রকৃত ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মচারী শ্রমণ বা ভিক্ষু হইতে বিভিন্ন নহেন। কারণ উভয়েরই নৈতিক জীবনের আচারানুষ্ঠান, বিধিব্যবস্থা মনীষিগণের চিন্তার ফল, এবং মনোরাজ্যের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মাধীনে তাঁহাদের চিন্তার লক্ষ্য একই। এইজন্যই আমরা দেখিতে পাই বুদ্ধশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ তুল্যাদর প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীছবিমোহন ভট্টাচার্য্য।

গীতাতত্ত্ব।

কলিকাতা গীতাসভায় পঠিত।

শ্রুতি লীলাময় সচ্চিদানন্দব্রহ্মের নিঃশ্বাসস্বরূপ। গীতা শ্রীভগবানের স্বমুখোচ্চারিতা বাণী। সকল শ্রুতির সারনির্য্যাসরূপা গীতায় তাবৎ বেদার্থই সন্নিবেশিত। গীতাই সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়-গ্রন্থ। উপনিষৎ যখন নানাবিধ মতজালে সমাচ্ছন্ন, বৌদ্ধ চার্ব্বাকাদি কর্ত্তৃক অযথারূপে সমাক্রান্ত, তখন গীতাই তাঁহার রক্ষা করেন। গীতাই বড় আদরে আপনার বক্ষপেটিকায় উপনিষৎতত্ত্বের সমস্ত মধুটুকু সঞ্চিত রাখেন। উপনিষৎ গীতার জননী, গীতা তাঁহার আদরিণী দুহিতা। সর্ব্বধর্ম্মময়ী সমস্তশাস্ত্রসারভূতা গীতা শ্রীভগবানের হৃদয়। শ্রীভগবানের হৃদয়ের কথা গীতায় যথাযথ উদাহৃত। দয়াময় শ্রীভগবান্ ব্যতীত আর কে এমন করিয়া জীবগণকে বলিবেন "আমার উপর নির্ভর কর, আমি তোমাদিগকে সর্ব্ব আপৎ হইতে রক্ষা করিব, জন্মমৃত্যুসঙ্কুল সংসার হইতে উদ্ধার করিব"। কে এমনভাবে জগদ্বাসীকে আহ্বান

করিয়া কহিবেন "আমার শরণ লও, শাশ্বত শান্তিলাভ হইবে, নিরাময় অক্ষয়পদ প্রাপ্ত হইবে"। সংসার পার হইবার একমাত্র সহজ উপায় গীতার শরণ লওয়া। গীতাই সেই দুরুত্তীর্য্য অতল সাগরে ভেলা, দুঃখার্ত্ত তাপিত মানবের একমাত্র পরম রসায়ন, যশঃ-সৌভাগ্য-আরোগ্য-তৃপ্তি-সুখ-শান্তি-ধর্ম্ম অর্থ-কাম-মোক্ষের একমাত্র প্রযোজিকা।

গীতায় কি নাই? ন্যায়, মীমাংসা, সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত ও ভক্তিশাস্ত্রের কোন্ কথা গীতায় নাই? গীতার আদেশ জ্ঞানবাদী, ভক্তিবাদী, কর্ম্মবাদী কে মাথায় পাতিয়া না লইয়াছে? শ্রীভগবানের মুখোচ্চারিত বাণী কে না শুনিয়া পারে? এমন কে আছে যে, গীতার এমন সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের পবিত্র পীঠে মাথা না বিনত করে? সংসারে নিরন্তর গতায়াতক্লান্ত জীবগণকে শাশ্বত পরমপদে উপনীত করিবার জন্য পরমকারুণিক পরমেশ্বর গোপালরূপে উপনিষৎ কামধেনু হইতে এই অক্ষয় ক্ষীরধারা দোহন করিয়া রাখিয়াছেন। আপামর-সাধারণ যাহাতে এই গীতামৃতধারা পান করিয়া অতুল শ্রীভগবৎতত্ত্ব রসাস্বাদে মনপ্রাণ তৃপ্ত করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ঋক্, যজুঃ, সাম অথর্ব্ব এই চারিবেদ এবং উপনিষৎ দ্বিজগণেরই নিজস্ব বস্তু। গীতা কিন্তু সর্ব্বসাধারণেরই আপনার সামগ্রী। বাসুদেবরূপী নারায়ণ ইহার জন্মদাতা। অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণরচয়িতা বেদের বিভাগকর্ত্তা দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব ইহার লেখক, নরনারায়ণের অন্যতম অবতার পরমভক্ত কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন ইহার শ্রোতা। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যবৃন্দের কোলাহলে পূর্ণ, পৃথিবীর বড় বড় মহাবীরগণের কোদণ্ডটঙ্কারে ভীষণ কুরুক্ষেত্র ইহার সূতিকাগৃহ।

সংসারমলা যাঁহারা কাটাইতে চান, জীবনের সুখশান্তি যাঁহারা লাভ করিতে চান, ইহ-পরলোকের সমৃদ্ধি যাঁহারা আকাঙ্ক্ষা করেন, ভগবৎ-তত্ত্বলাভে যাঁহাদের বাসনা আছে, মোক্ষপদলাভে যাঁহাদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা আছে, তাঁহারা মনপ্রাণের সহিত গীতার শরণ লউন। অপর শাস্ত্র পঠনপাঠনে আবশ্যক নাই, একমাত্র গীতার আশ্রয় লইলেই সিদ্ধি হইবে। গীতার জ্ঞানালোকে সংসারের বন্ধনরূপা মায়া ছায়ার মত পশ্চাতে লুকাইবে। এস, আমরা ভ্রান্তিনাশিনী তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ব্রহ্মবিদ্যারূপা ভগবতী গীতার ধ্যান করি —

> পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং।
> ব্যাসেন গ্রথিতং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতং।
> অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতী মষ্টাদশাধ্যায়িনীং
> অম্বত্বা মনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণী॥

কর্ম্মনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠাকে ভগবদ্ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্ব্বকর্ম্মত্যাগাত্মক সন্ন্যাস ও কর্ম্মফল ত্যাগাত্মক ত্যাগকে ভগবদুপাসনার দ্বারা সার্থক করিয়া, সংযম ধারণা ধ্যান এমন কি মনোনাশ বাসনাক্ষয়কে পর্য্যন্ত ভগবৎকরুণালভ্যরূপে দাঁড় করাইয়া গীতা আজ জগতের শিক্ষয়িত্রী পদে অধিরূঢ়া আছেন।

রণক্ষেত্রে পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর, শ্যালক আত্মীয় ও সুহৃৎ প্রভৃতিকে যুদ্ধার্থ সমুদ্যুক্ত দেখিয়া অর্জ্জুনের প্রাণ করুণায় গলিয়া গেল, অঙ্গ অবসন্ন; বদন শুষ্ক, শরীর কম্পিত, গাণ্ডীব বিস্রস্ত হইল। "হে গোবিন্দ! স্বজন হত্যাদ্বারা বিজয় আমি চাই না, রাজ্যসুখভোগে আমার আকাঙ্ক্ষা নাই, কুলক্ষয়কৃত দোষ, মিত্রদ্রোহ-সম্ভূত পাতকের অর্জ্জনে আমার স্পৃহা নাই।" এই বলিয়া অর্জ্জুন সশরগাণ্ডীবধনু ত্যাগ করিয়া রথের উপর নিরুৎসাহ ও বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

যুদ্ধে নামিয়া অর্জ্জুনের এ অনিচ্ছা, এ দুর্ব্বলতা, এ স্নায়ুবিকার কর্তৃত্ব ও অহঙ্কারজনিত ভ্রান্তিমাত্র বুঝিয়া ভগবান্ তাহা দূর করিবার জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের এভাব সাময়িক ও ক্ষণিক হউক, কিন্তু বড় প্রবল বড় তীব্র। ইহা সজ্জনসুলভ ভ্রান্তি। ভগবানের এই উপদেশের পাত্র অর্জ্জুন। অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া ভগবান্ জগদ্বাসীকে এই অমূল্য ধন বিতরণ করিলেন। অর্জ্জুন উপলক্ষ মাত্র হউন, তথাপি আমাদিগকে অগ্রে বুঝিতে হইবে, অর্জ্জুনের এই ভাব অজ্ঞানের কার্য্য, অহঙ্কারের ফলরূপে ভগবান্ বুঝাইলেন কেন? কাতরতা দুর্ব্বলতা মোহপর্য্যায়ে ইহাকে ফেলিলেন কেন?

যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন, জ্যেষ্ঠের ন্যায্য সিংহাসন প্রাপ্তি, প্রতিজ্ঞাত আততায়ী বধ। যে যুদ্ধের জন্য পৃথিবীব্যাপী এই আয়োজন, সেই যুদ্ধের প্রারম্ভে, এমন সঙ্কটময় অবস্থায় অকস্মাৎ অনিচ্ছার ভাব দুর্ব্বলতা ব্যতীত আর কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া কর্ত্তব্য বোধে বহুদিন হইতে স্থিরীকৃত ব্যাপারে ঔদাসীন্য স্নায়ুদৌর্ব্বল্য বিনা আর কি? যুদ্ধে এমন সময়ে পরাঙ্মুখতা ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্মবিরুদ্ধ, অকীর্ত্তিকর, অনার্য্যজনোচিত, স্বর্গকামীর অসেব্য। ক্ষত্রিয়বীরের পক্ষে জ্যেষ্ঠের দাবীরক্ষক ভ্রাতার পক্ষে অকস্মাৎ যুদ্ধে নিবৃত্ত হওয়া মস্তিষ্কের বিকার আর কি? ভগবান্ যুক্তিযুক্তভাবে প্রিয় ভক্ত অর্জ্জুনকে ইহাই বুঝাইতে লাগিলেন।

"রাজ্যবল, গুরুজনবল, পুত্র মিত্র আত্মীয় বন্ধুবল, সকলই আমার, আমি সকলের ইহা ভ্রান্তি নয় ত কি? এ ভ্রান্তি যদিও সজ্জনসুলভ, সংসারে স্বাভাবিক, অনাদি অনন্তকাল বর্ত্তমান, তথাপি ইহা ভ্রান্তি। যাহা ভ্রান্তি তাহা মিথ্যা, মরুভূমে মরীচিকার মত তাহা আরোপিত; স্বপ্নে দৃষ্ট হস্ত্যশ্বরথপদাতির মত বস্তুতন্ত্রতাশূন্য। এই ভ্রান্তিপ্রত্যয় নিমিত্তই স্নেহ ভয় বিষাদ ও মোহের উদ্ভব! ইহাদের উচ্ছেদ আশঙ্কাও সেই ভ্রান্তিপ্রত্যয় নিমিত্তই। গুরু মিত্র পুত্র পৌত্রের প্রতি এ ভালবাসা ভ্রান্তিরই ফল। এই ভালবাসা— ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত দুদিনের ভালবাসা এই বিচ্ছেদাদির জন্যই অর্জ্জুনের এই দীনতা এই মোহ এই শোকের আবির্ভাব। এই উদ্ভূত শোক-মোহে অর্জ্জুনের বিবেকবিজ্ঞান অভিভূত —তাই অর্জ্জুন ক্ষাত্রধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও নিবৃত্ত, পরধর্ম্ম ভিক্ষা প্রভৃতি কর্ম্মেই প্রবৃত্ত। শোক ও মোহে আবিষ্টচিত্ত হইলেই লোকে স্বধর্ম্ম বিস্মৃত হয়, নিষিদ্ধ পরধর্ম্ম মানিয়া লয়। অর্জ্জুনের এই ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে।

স্বধর্ম্মের পালনই বল, আর নিষিদ্ধের সেবাই বল, যুদ্ধের প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তিই বল—সকলই অহঙ্কারের ফল। ভগবান উপদেশ দিতেছেন

"অর্জ্জুন, যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি তোমার শোকমোহের ফল। অতএব শোক মোহ পরিহার করিয়া যুদ্ধ কর! যুদ্ধে প্রবৃত্তিও তোমার শোকমোহের ফল, যুদ্ধে নিবৃত্তিও তোমার শোক-মোহের ফল। তুমি যে ভাব লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, আর যে ভাব লইয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতেছ ও দুইটি ভাবও অজ্ঞানের কার্য্য। দেহে আত্মবুদ্ধি, পুত্র মিত্র আত্মীয়স্বজনে আপনার বোধ, রাজ্য ধন গৃহ কলত্রাদিতে স্বস্বামিত্বজ্ঞানও তোমার অজ্ঞানের ফল। অশোচ্য আত্মীয়গণের বিনষ্টতা বোধ, আবার সেই বিনাশের আমিই কারণ—এই ভাবনা, তাহার ফলাফলকর্ত্তা আমি -ইত্যাকার ধারণাও তোমার অজ্ঞানের ফল।

মানবের কর্ম্মপ্রবৃত্তি, কর্তৃত্ব ও অহঙ্কারের জন্যই হইয়া থাকে। সেই কর্ম্মের ফলাফলভাগিত্ব, কর্তৃত্ব ও অহঙ্কারের জন্য ঘটে। তুমি এই কর্তৃত্ব অহঙ্কার বশে কার্য্য করিবে কেন? কর্ত্তব্য-বোধে ঈশ্বরে ফলাফল সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করিবে, তাহা হইলে সে কর্ম্মের ফলাফল তোমার জন্মিবে না, কর্তৃত্ব অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্মজ্ঞানে যুদ্ধ কর। কর্তৃত্ব অহঙ্কারশূন্য কর্ম্ম নিষ্কাম জানিও। এই নিষ্কাম কর্ম্ম তোমার চিত্তের শুদ্ধি জন্মাইবে, উহা বন্ধনের কারণ হইবে না। কর্তৃত্ব অহঙ্কারজনিত ফলাফল প্রকৃতির খেলা। আত্মার কোন কার্য্যই নাই। যে কার্য্য আত্মার নহে, তাহা তোমারও নহে। তুমি দেহ মন বুদ্ধিকে আপনার ভাবিতেছ, তাই তাহাদের খেলাকে আত্মার খেলা ভাবিতেছ।

কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলে নহে। অতএব তুমি মাত্র কর্ম্ম করিয়া যাও, এক্ষেত্রে যুদ্ধই তোমার কর্ত্তব্য কর্ম। জীবনমৃত্যুর উপর মানবের কোন হাতই নাই তবে তোমার ভয় কিসের? জন্ম সময়েই মৃত্যু লিখিত হইয়াছে, তুমি যুদ্ধে নিমিত্ত হইবে মাত্র। জড়যন্ত্রও অনেক সময়ে মরণের কারণ হইয়া থাকে, তাহাতে জড়যন্ত্রের কি? মানব ত জড়যন্ত্রমাত্র, পরাধীন, পরচালিত মাত্র—তাহার কার্য্যে স্বাধীনতা কোথায়? আপনার আপনার মনে কর, আমার কৃত আমার অকৃত মনে কর, অজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া ফলাফলভাগী আপনাকেই ভাব—তাই বদ্ধ হও। তুমি আমায় ভজ, তুমি তাহা ভাবিবে কেন?

অর্জ্জুন, শোক ত্যাগ কর, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। বাল্যযৌবনজরার মত মৃত্যুও অবস্থান্তর মাত্র। কাহারও বাল্যকাল গত হইলে তাহার জন্য ত শোক কর না; তবে মৃত্যুর জন্যই বা শোক করিবে কেন? বস্ত্রপরিবর্ত্তনের মত মৃত্যু, সে ত কেবল পরিচ্ছদ বদলান মাত্র। আত্মা অজর অমর অবিক্রিয়—তাহার জন্ম, নাশ বিক্রিয়া নাই। স্থির জানিও অর্জ্জুন, বিদ্যমান পদার্থের অভাব নাই, অবিদ্যমান পদার্থের অস্তিত্ব নাই। সুখ দুঃখ ত শীত-গ্রীষ্মের মত ইন্দ্রিয়ের বিকারমাত্র। ইন্দ্রিয় ও বিষয় সংযোগের ফলে যাহার উদ্ভব, তাহার জন্য ব্যাকুল হওয়া ধীর ব্যক্তির সাজে না। তুমি ধীর, অধৈর্য্য, ব্যাকুলতা তোমার সাজে না। ইন্দ্রিয় বিষয় সংযোগে যাহা উদ্ভূত তাহা অনিত্য। অনিত্যের জন্য ব্যস্ত হওয়া বিবেকহীন

কর্ত্তব্য নহে, ঘট পট যাবতীয় বস্তুই ত্রাসরেণুর সমবায়ে উৎপন্ন সংঘাত দ্রব্য। সংঘাত দ্রব্যের তবে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোথায়? ত্রাসরেণুরও পরমাণুষট্‌কের মিলনে সংজাত, তবে ত্রাসরেণুর ও স্বতন্ত্র সত্তা কোথায়? পরমাণুও সংঘাত ও বিকার পদার্থ, পরমার্থিক ভাবে ব্রহ্ম ব্যতীত যখন অপর কোন নিত্যবস্তু অঙ্গীকৃত হয় নাই, তখন পরমাণুকেও সংহত পদার্থ বলিয়াই ধরিতে হইবে। ব্রহ্ম ব্যতীত সকলই অনিত্য, কাহারও স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ব্যবহারের সুবিধার্থ ঘটপটাদি সংজ্ঞার ব্যবহার। একই চন্দ্রকে জলে অনেক চন্দ্র বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু চন্দ্র একই। আমাকেই সেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমাতেই অবস্থিত। আমি ছাড়া তুমি নাই, সেই আমি যখন তোমাকে আদেশ করিতেছি, তখন তোমার ভাবনা কি? আমি অদৃশ্য থাকিয়া সকলকেই নিয়োজিত করি। সখা বলিয়া, পরম ভক্ত বলিয়া আমি প্রত্যক্ষ থাকিয়া তোমাকে চালাইতেছি। এ সৌভাগ্য তুমি পাইয়াছ, অবহেলা করিও না! অতএব অর্জ্জুন, স্বধর্ম্ম পালন কর। দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা, সুখে বিগতস্পৃহ হইয়া কর্ম্ম কর! তোমার যোগক্ষেম আমিই বহন করিব। আমাতে যে নির্ভর করে, আমি তাহাকে রক্ষা করি।· তুমি ভাবিও না। আমার উপদেশ শোন, তদনুযায়ী কর্ম্ম কর।

অর্জ্জুন! কিসের মায়া? দেহের জন্য ত মায়া নয়, দেহের জন্য হইলে মৃত্যুর পর ত লোকে সে দেহ দগ্ধ করে। আর আত্মা ত অবিনাশী। অক্ষয়, অমর, সনাতন, তারও বিনাশ নাই। তবে কিসের জন্য দুঃখ? যাহারা পূর্ব্বে ছিল না, পরে থাকিবে না, তাহাদের থাকা না থাকায় আবার দুঃখ শোক হইবে কেন? যাহার অতীত ভবিষ্যৎ নাই, তাহার আবার বর্ত্তমান কি?

আর অর্জ্জুন, যুদ্ধ না করিলে ক্ষত্রিয়ের বড় অযশঃ, বড় গ্লানি। রণক্ষেত্রে মৃত্যুশয্যায় শায়িত বীরের স্বর্গলাভ অবশ্যম্ভাবী—ইহা শাস্ত্রের কথা। জয় হইলে পৃথিবীর সাম্রাজ্যলাভ,—তবে লৌকিক দৃষ্টিতেই বা যুদ্ধে নামিবে না কেন? সিদ্ধি অসিদ্ধি সমান ভাবিয়া সমত্ববুদ্ধি করিয়া কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হও। আপনার শুভাশুভ গণনা না করিয়া বীতরাগ ভয় ক্রোধ হইয়া প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণকে বশে রাখিয়া কর্ম্ম করিয়া যাও, দুঃখের নাশ হইবে, শান্তিলাভ হইবে, প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠা দেখা দিবে।”

অর্জ্জুন উপদেশপাত্র, তথাপি অনেক সময়ে এমন সমস্ত তত্ত্বকথার অবতারণা গীতায় দেখা যায়, তাহাতে বেশ প্রতীতি জন্মে যে, কেবল যুদ্ধে প্রবৃত্তি করাইবার উদ্দেশ্যেই মাত্র গীতার উদ্ভব নহে। মধ্যে মধ্যে কর্ত্তব্যকর্ম্ম পালন হিসাবে যুদ্ধের আদেশ ও উপদেশ করা হইয়াছে মাত্র। অর্জ্জুনকে যে ভাবে গড়িয়া লইয়া ভগবান্ তাঁহার দ্বারা যুদ্ধ করাইলেন, সে ভাবে ঠিক আমাদের মত লোকে যুদ্ধ করিতে পারে না, পারা সম্ভবও নহে। এই কারণে যুদ্ধ সাধারণতঃ পাপকর্ম্ম বলিয়াই আমরা ধরিয়া লইয়াছি। যুদ্ধে অর্জ্জুনের অপ্রবৃত্তিকে আমরা গৌরবের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি। আমরা যে স্থানে দাঁড়াইয়া, সে স্থান হইতে দেখিলে অর্জ্জুনের যুদ্ধে অপ্রবৃত্তিটাকেই বড় মনে হয়। অর্জ্জুন গোড়ায় যে ভাব লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,

তাহা যে ঠিকই হইয়াছিল, ইহা যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা ভগবানের আজ্ঞার উপর অবিচারই করেন, অর্জ্জুনের গোড়ায় যে ভাব…সেই ভাবে যুদ্ধে নামাও দোষের, যুদ্ধে নামিয়া ফেরাও দোষের। ভগবান্ অর্জ্জুনের সেই গোড়াকার ভাবটিই নষ্ট করিয়া একটি নূতন ভাব আনিয়া দিলেন। সেই নূতন ভাবটির জন্ম ইহা ধর্ম্মযুদ্ধ কর্ত্তব্যপালন মাত্র হইল। আত্মীয়-বন্ধু বিনাশ ও নিষ্পাপ আচরণ হইল।

ভগবদ্গীতায় প্রধানভাবে দুইপ্রকার নিষ্ঠাই অভিহিত হইয়াছে। প্রথম জ্ঞাননিষ্ঠা, দ্বিতীয় কর্ম্মনিষ্ঠা, ইহজন্মেই হউক বা পরজন্মেই হউক শাস্ত্রীয় পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধ-সত্ত্ব ব্যক্তিদের জন্যই জ্ঞাননিষ্ঠা। ঐহিক পারত্রিক কর্ম্মফলে যাঁহারা বিগততৃষ্ণ, শমদমাদিদ্বারা চিত্ত যাঁহাদের সম্যক্ মার্জ্জিত, মুক্তির ইচ্ছা যাঁহাদের অতীব প্রবলা, তাঁহারাই জ্ঞাননিষ্ঠার প্রকৃত অধিকারী; আর কর্ম্মনিষ্ঠা সাধারণের জন্যই ব্যবস্থিত। সকলেই কর্ম্মনিষ্ঠার অধিকারী, কর্ম্ম না করিয়া যখন কেহই থাকিতে পারিবেনা, প্রকৃতিস্থ সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের দ্বারা যখন সকলকেই পরিচালিত হইতে হইতেছে, তখন কর্ম্ম না করিয়া উপায় নাই। কামনা জয় পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়দিগকে সম্যক আয়ত্তে আনিয়া অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিয়া যাওয়াই শ্রেষ্ঠপুরুষের লক্ষণ। জ্ঞানীর পক্ষে আয়াসসাধ্য কর্ম্ম করিয়া সময় ক্ষেপ করার প্রয়োজন নাই। করিলে তাহা দোষেরও নহে, বরং সাধারণ ব্যক্তিকে কর্ম্মানুষ্ঠানে লিপ্ত করাই যখন জ্ঞানীদের কর্ত্তব্য, তখন লোকসংগ্রহার্থ করাও ভাল। লোকে যাহাতে কুশিক্ষা পায়, এমন কার্য্য ভগবান্ স্বয়ংই করেন না, সংসারে লোকালয়ে থাকিতে হইলে লোকশিক্ষার পরিপন্থী কিছুই করিলে চলিবে না। এই কারণ কর্ম্মযোগ জ্ঞানিগণেরও অননুষ্ঠেয় নহে।

বেদান্তে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগই মুখ্যভাবে উপদিষ্ট, গীতায় কর্ম্মফল ত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানই প্রধানভাবে নির্দ্দিষ্ট। জৈমিনীর কর্ম্মমীমাংসায় যাগযজ্ঞ বিশেষভাবে ব্যবস্থাপিত। গীতায় তাহাও সমাদৃত। যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টির ফলে অন্ন; আর অন্নদ্বারাই জীবের রক্ষা—ইহাই যজ্ঞের ঐহিক ফল। যাবতীয় পাপধ্বংস যজমানের স্বর্গলাভ—ইহাই যজ্ঞের পারত্রিক ফল। যজ্ঞই দেবাদির অপ্যায়ন ও পুষ্টি করে, যজমানের শুভাদৃষ্ট উৎপন্ন করে। পরম শ্রেয় লাভে পর্য্যন্ত যজ্ঞের শক্তি আছে। যজ্ঞ সাধারণতঃ সকাম, ফল স্বর্গ, যজ্ঞও আবার নিষ্কাম হইতে পারে। তখন ফল চিত্তশুদ্ধি—পশ্চাৎ সিদ্ধি লাভ। একই অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, একই দুর্গোৎসব কখন সকাম কখন নিষ্কাম। কর্ত্তার মনে কামনা থাকিলে নিষ্কাম বলিয়া অভিহিত কর্ম্মও স্বর্গাদি ফলপ্রদ—কাজেই সকাম, আবার সকামরূপে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াও স্বর্গাদি ফলে বীতস্পৃহ ব্যক্তির ফল চিত্তশুদ্ধি—পশ্চাৎ সিদ্ধি লাভ। নিষ্কামের তুলনায় সকাম নিকৃষ্ট, কিন্তু প্রথমাবস্থায় কামনামুগ্ধ জীবের নিকট সকাম কর্ম্মই উপকারক, কাজেই প্রশস্ত। অনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম বা বিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠান অপেক্ষা সকামকর্ম্ম শতগুণে শ্রেষ্ঠ। সাধারণতঃ মানবমাত্রেই ঐ তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী অনিশ্চিত ঐহিক ফলেই লোলুপ, তাহাদের পক্ষে প্রশস্ত দীর্ঘকাল-স্থায়ী নিশ্চিত পারলৌকিক ফলে বীতরাগ হওয়া অসম্ভব। পারলৌকিক কর্ম্মের ফলের

উপর শ্রদ্ধা বিশ্বাসের অভাববশতঃ অনেক ব্যক্তি আপনাকে নিষ্কামকর্ম্মপ্রয়াসী বলিয়া লোকসমাজে খ্যাপন করে; কিন্তু বাস্তবিক সেই শ্রদ্ধা বিশ্বাসহীন ব্যক্তিরা নিষ্কামকর্ম্মের অধিকারী নহে। যজ্ঞ বলিতে শাস্ত্রীয় পুণ্যকর্ম্ম মাত্রই বুঝায় আমাদের শ্রাদ্ধ, হোম, তর্পণ, উপনয়নাদি সংস্কার প্রভৃতি যজ্ঞেরই অন্তর্গত। অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ বর্ত্তমানে কঠিন ও দুঃসাধ্য, কাজেই সেগুলির এখন বড় প্রচলন নাই। বড় বড় জ্ঞানী ঋষিগণ যজমান কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া পুরাকালে যজ্ঞে ব্রতী হইতেন। (রাঢ়ীয় বারেন্দ্র শ্রেণির ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করিবার জন্যই আদিশূর কর্ত্তৃক বঙ্গে আনীত হন এ তথ্য সকলেই অবগত আছেন।)

অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিয়া জনকাদি সিদ্ধিলাভ করেন, অতএব কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিতে পরমভক্ত অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের উপদেশ। ভগবানের নিজের লাভালাভ নাই, প্রয়োজন নাই। তথাপি লোকশিক্ষার জন্য তাঁহাকেও কর্ম্ম করিতে হইয়াছে। লোক সংগ্রহার্থ জ্ঞানবান্ ব্যক্তিকে পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। কেননা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা করিবেন, সর্ব্বসাধারণে যে তাহারই অনুকরণ করিয়া যাইবে। সকলে মহাত্মাদিগের পথই অনুসরণ করে, মহাপুরুষদের বাক্যই মানিয়া লয়। লোকসংগ্রহার্থ অজ্ঞলোককে কর্ম্মে প্রবৃত্ত রাখিবার জন্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে অন্ততঃ কর্ম্মীর ভাণও করিতে হইবে। অজ্ঞব্যক্তি যদি শ্রেষ্ঠলোকের বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, তবে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় পথভ্রষ্ট হইয়া সেই অজ্ঞলোকগণ আপনাদিগেরই অবনতির পথ পরিষ্কার করিবে। সংসার কামনামুগ্ধ, কর্ত্তৃত্ব ও অহঙ্কারের দাস ব্যক্তিমাত্রেই অজ্ঞশ্রেণির অন্তর্গত। কতকগুলি শাস্ত্রবাক্য পড়িলে, অগাধ অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগুলির অধিকারী হইলেই আধ্যাত্মিক অজ্ঞতা কাটে না। অজ্ঞ—আধ্যাত্মিক অজ্ঞ।

মানবগণ অবিদ্যাপ্রভাবে দেহাদি জড় পদার্থ ইন্দ্রিয়, চিত্ত, অহঙ্কার ও বুদ্ধির সহিত আত্মার প্রকৃত পার্থক্য ধরিতে না পারিয়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির বিকার-স্বরূপ দেহেন্দ্রিয়াদির কার্য্যকে আপনার কার্য্য মনে করে, আমি করি, আমি ফলভোক্তা হই এইরূপ ধারণা রাখে, ফলে দুঃখপ্রাপ্ত হয়, জন্মমৃত্যুর দুর্ভেদ্য জাল রচনা করে, কাজেই সংসারে গতায়াত হইতে অব্যাহতি লাভ তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না।

সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতিপুরুষতত্ত্ব গীতায় বিশেষভাবে উল্লিখিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি, স্থূলভূতাদি যাবতীয় বিকার পদার্থ, এবং প্রকৃত বিকৃত পদার্থের উপাদান কারণীভূতা মূলপ্রকৃতি, আর পুরুষই প্রকৃতিস্থ হইয়া সুখদুঃখের ভোক্তা—এই সকল সাংখ্যদর্শনেরই কথা। গীতার আলোচনা করিলে, প্রকৃতিপুরুষতত্ত্বের অনেক কথাই সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হইয়া থাকে। প্রকৃতি ও পুরুষ মানিয়া সাংখ্যকার ঠিক ঈশ্বর মানেন নাই, গীতাকার অবশ্য সাংখ্যদর্শনের উপেক্ষিত ঈশ্বরবাদকে সর্ব্বতোভাবেই অবলম্বন করিয়াছেন। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে গীতার এক পদ চলিবার উপায় নাই। গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত গীতায় ঈশ্বরবাদ। সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি সত্ত্ব, রজ, তমোময়ী।

গীতায় সেই সত্ত্বরজঃ ও তমোগুণের বিবরণ বিশেষ-
ভাবেই প্রদত্ত হইয়াছে ।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি ।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥
কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে ।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।
কারণং গুণসংঙ্গোঽস্য সদসদ্ যোনিজন্মসু ॥

এগুলি সাংখ্য দর্শনের কথা। অবশ্য বেদান্তবিদ্ আচার্য্যগণ এ সকল বেদান্ত পক্ষেই বুঝিয়া লইয়াছেন, বুঝাইয়াও গিয়াছেন।

পাতঞ্জল দর্শনের যোগতত্ত্ব গীতার মধ্যে পরিস্ফুট। শুদ্ধস্থানে স্থির আসনে বসিয়া দেহ, শরীর ও গ্রীবাকে সরল ও অবিচল রাখিয়া নিজের নাসাগ্রোপরি দৃষ্টি না নিমীলিত না উন্মীলিত করিয়া একাকী সংযতাত্মা হইয়া যোগকরার ব্যবস্থা ষষ্ঠাধ্যায়ে বর্ণিত আছে। অতিরিক্ত ভোজন, সম্পূর্ণ অনাহার ও বাহ্য বিষয়ে আসক্তি পরিহৃত হইয়াছে। নির্ব্বাত প্রদেশে দীপ-শিখার মত চিত্তবৃত্তিকে স্থির রাখিতে হইলে যম নিয়ম-আসন প্রাণায়ামাদি যথাশাস্ত্রোক্ত ক্রমে করিয়া যাওয়া আবশ্যক—গীতায় ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রমাথী চঞ্চলচিত্তকে স্থির করা বায়ুর নিগ্রহের মত কঠিন ব্যাপার। এজন্য সাধনা আবশ্যক। চেষ্টা অনুশীলন ও অভ্যাস ব্যতীত কোন বড় কার্য্য সাধিত হয় না। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা দুর্নিগ্রাহ্য চিত্তের নিগ্রহের ব্যবস্থা শ্রীভগবানই বলিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরপ্রণিধান পাতঞ্জল-দর্শনে মনোজয়ের অন্যতম উপায় মাত্র; গীতায় উহাই প্রধান উপায়। চিত্তজয়ে বাক্যবিচার ও পাতঞ্জলোক্ত যোগ দুইই কারণ। পাতঞ্জলোক্ত উপায় কঠিন ও বিপৎসঙ্কুল। বাক্যবিচার সরল ও বিপৎশূন্য। হঠাৎ চিত্তের সাময়িকবেগে যাহারা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, তাহাদের পক্ষে বাক্যবিচার অপেক্ষা পাতঞ্জলোক্ত যোগই অধিক উপযোগী। কারণ ইন্দ্রিয়াদির হঠাৎ উত্তেজনা লেলিহান অগ্নিশিখার মত এমনভাবে জ্বলিয়া উঠে, তখন বাক্যবিচারের সময়ই থাকে না। সেই ভীষণ মুহূর্ত্তে ইন্দ্রিয়াদির সরলভাবে আকর্ষণ, নিষ্ঠুরভাবে দমন আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়। বাক্যবিচার বেদান্তদর্শনে প্রধানভাবে, প্রাণায়ামাদিযোগ ও ঈশ্বর-প্রণিধান অপ্রধানভাবে উল্লিখিত। পাতঞ্জলদর্শনে যোগ প্রধানভাবে, বাক্যবিচার ও ঈশ্বর-প্রণিধান অপ্রধানভাবে নির্দ্দিষ্ট। গীতায় বাক্যবিচার, যোগ ও ঈশ্বরপ্রণিধান তিনই মুখ্যভাবে উপদিষ্ট হইলেও বাক্যবিচারের স্থান অপেক্ষাকৃত গৌণ। গীতাকারমতে যোগ কোথাও সমত্ববুদ্ধি, কোথাও নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান, কোথাও কর্ম্মত্যাগ সন্ন্যাস। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়, কূটস্থ, সমলোষ্ট্র, সমকাঞ্চন ব্যক্তিই যোগী। কোথাও কর্ত্তৃত্ব অহঙ্কার বিসর্জ্জন

পূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্মীজনই যোগী। আবার কোথাও ঈশ্বরে তদ্গত প্রাণই যোগী। পাতঞ্জলোক্ত যোগও যে গীতার উপদিষ্ট যোগ—ইহা গীতায় সুস্পষ্টভাবে অভিহিত আছে।

যথা—

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরং॥
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে।
সমংকায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরং॥
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্।
প্রশান্তাত্মা বিগতভী র্ব্রহ্মচারী ব্রতে স্থিতঃ॥

ইত্যাদি।

বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনের পরমাণুকারণবাদ সমর্থিত না হইলেও তাঁহাদের দ্বৈতবাদ যে গীতায় সমর্থিত হইয়াছে তাহা বলা যাইতে পারে। যে ঈশ্বরকারণবাদের অরুণাভায় গীতা আগাগোড়া অনুরঞ্জিত, সেই ঈশ্বরকারণবাদ। তথা দ্বৈতবাদ ন্যায়দর্শনের প্রতিবাদ। অদ্বৈতবাদও অবশ্য ঈশ্বর কারণবাদ, ন্যায়দর্শনের ঈশ্বর কারণবাদের সহিত গীতার ঈশ্বরকারণ-বাদের কচিৎ কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও মূলতঃ জিনিষটি একই। জীবাত্মসাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণ, এমত গীতায় সমর্থিত হয় নাই বা হইতে পারেনা। জীবাত্মসাক্ষাৎকার পরমেশ্বর কৃপাজন্ত শুভাদৃষ্টের ফল, আর উহাই মুক্তির কারণ, এরূপ না বলিয়া পরমেশ্বরকৃপাই শুভাদৃষ্ট জন্মাইয়া মুক্তির হেতু হইয়া থাকে, ইহা বলিলে গীতার অননুমোদিত হইত না।

তারপর বেদান্তদর্শনের কথা। উপনিষৎপ্রমাণে যে বেদান্তদর্শনের উদ্ভব, স্থিতি ও অভ্যুদয়—তাহার সহিত গীতার বিরুদ্ধতা থাকিতেই পারে না। গীতা উপনিষদের কন্যা, বেদান্তদর্শন উপনিষদ্ দর্শনরূপেই আখ্যাত। ভগবদ্গীতার সঙ্কলনকর্ত্তা বেদান্তসূত্রের রচয়িতা একই বেদব্যাস। এই উভয়গ্রন্থে ঐক্যই থাকিবার কথা। ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী বলিয়া ভগবদ্গীতার ধ্যান বিহিত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদই যে গীতার সর্ব্বস্ব, তাহা আচার্য্য শঙ্কর, মধুসূদন সরস্বতী, শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি গীতার ভাষ্য ও টীকাকারগণ সুন্দররূপে বুঝাইয়া গিয়াছেন।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—যাহার বড় আচার্য্য বলিয়া রামানুজস্বামী জগৎবিখ্যাত, তাহার মূল ও উপনিষৎ, বেদান্তসূত্র ভগবদ্গীতাও তাহার পরিপোষক, ইহা রামানুজদর্শন আলোচনা করিলেই জানা যায়। শ্রীভাষ্য ও গীতার টীকায় আচার্য্যরামানুজ যুক্তিযুক্তভাবে বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ দাঁড় করাইয়াছেন। বৈষ্ণব দর্শনকারগণের মধ্যে কেহই গীতাকে অমান্য করেন নাই। মোট কথা সকল বাদই গীতাকে আপনাপন মতের অনুকূলভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন।

ভগবদ্ভক্তি নিষ্ঠা গীতার সর্ব্বস্ব। জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ সকলটাতেই ভগবদ্ভক্তি ওতপ্রোতঃ বিরাজমান। শ্রীভগবানের নিজমুখের উক্তি গীতা—সেই গীতা ভগবানকে ছাড়িয়া একপদও

চলিতে পারে না। অনেকে এমন কথাও বলেন, গীতা ব্যতীত অন্য দর্শনে ঈশ্বরের স্থান মুখ্য নহে, গৌণ। গীতার ঈশ্বরের স্থান আবার এমনই মুখ্য যে অন্য কোন গ্রন্থেই সেরূপ দৃষ্ট হয় না। বেদান্তদর্শনেও এমন কি ঠিক ঈশ্বরের স্থান মুখ্য এমন কথাও বলা যায় না। ঈশ্বরের স্থান সকল শাস্ত্রেই প্রত্যক্ষভাবেই হউক বা পরোক্ষভাবেই হউক আছেই। তথাপি গীতার মধ্যে যেমনটি, তেমনটি আর কোথাও নাই—এ কথা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে।

গীতা অবতারবাদের প্রচারক। গীতার পূর্ব্বে, অবতারবাদের একেবারে না হউক, বড়প্রচার দেখা যায় নাই। অধর্ম্মের বিনাশ, ধর্ম্মের সংস্থাপন উদ্দেশ্যে জীবগণকে সহজে উদ্ধারের পথ দেখাইবার জন্য অবতারবাদের সার্থকতা সর্ব্বদেশেই স্বীকৃত হইয়াছে। মানবগণের রক্ষা সাধিত না হইলে সৃষ্টি রক্ষা সম্যক্ সাধিত হয় না; কাজেই অবতার হইয়া ঈশ্বরকে সেই মানবরক্ষা ফলে সৃষ্টি রক্ষাই করিতে হয়। অবতারবাদ ছাড়িয়া দিয়া জগতের কোন ধর্ম্মই দাঁড়াইতে পারে না, কিন্তু সত্যের অনুরোধে এইটুকু আমরা বলিতে পারি, অবতারবাদ হিন্দুধর্ম্মের যতই উৎকৃষ্ট জিনিষ হউক, অবতারবাদ ছাড়িয়াও হিন্দুধর্ম্ম দাঁড়াইতে পারে। অবতাররূপী শ্রীকৃষ্ণও দুইটি পথই আমাদের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অবতার না মানিয়া যেখানে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেখানে ঈশ্বর কথাই ব্যবহার করিয়াছেন। অস্মৎ শব্দদ্বারা আপনাকে সর্ব্বত্র ঈশ্বর বলিয়া দাঁড় করান নাই।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং।

এখানে অবতারবাদ ছাড়িয়াই উপদেশ। আবার—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥

এস্থানে অবতারবাদেরই কথা।

পর্ব্বতশিখর হইতে নদ নদী জন্মিয়া পরিশেষে সাগরে যাইয়া মিশে। সকল দর্শনগুলি নদনদীর মত উপনিষৎ হইতে বাহির হইয়া এই গীতারূপ সাগরে আসিয়া মিলিয়াছে। গীতাই ষড়্দর্শনের (এবং ষড়্দর্শন ভিন্ন অপর দর্শনগুলিরও) সমন্বয় গ্রন্থ। সকল দর্শনের নানাবিধ মত গীতার মধ্যে আসিয়া যেন একত্বে পরিণত হইয়াছে। গীতাই ষড়্দর্শনের—অপরাপর সকল দর্শনের বহুকালসঞ্জাত বিরোধের ভঞ্জন করিয়া একটি সংযোগ সূত্র রচনা করিয়া দিয়াছে।

গীতা ভক্তিরসের প্রবাহিনী। শ্রীভগবানের বাঁশরীর তানে সুর মিলাইয়া প্রবাহিনী যমুনার মত রাত্রিদিবস কুলুকুলুধ্বনি করিয়া প্রবহমানা। এই যমুনার অশ্রান্ত মধুর ধ্বনি যেই কাণ পাতিয়া শুনে, সেই শ্রীভগবানের বাঁশীর তান সুস্পষ্টই শুনিতে পায়। এ সুর গোলকের, এ সুরে কতকাল ধরিয়া কোটী কোটী ভক্তের শ্রবণ মন ভরিয়া দিয়া কালের অশ্রান্ত গতির সহিত চলিয়াছে। এ সুর সংসারতাপদগ্ধ জগৎ নরনারীর প্রাণে এক নূতন অমৃতের স্রোত বহাইয়া দিয়াছে। এই গীতামৃতরসধারা আকণ্ঠ পান করিয়াও তবু তৃপ্তির শেষ হয় না। লাখ লাখ যুগ ধরিয়া এ রস যতই আস্বাদন কর, তৃষ্ণা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে। রসের মূল উৎস সেই রসময়ে মিশিতে পারিলে তবে এই তৃষ্ণা মিটিবে। অনেক ভক্ত এই তৃষ্ণা একেবারে মিটাইতে চান না।

কোটী কোটী যুগের জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, ভাব, প্রেম, শান্তি, সুখ, তৃপ্তি, সঞ্চিত হইয়া এই অমৃত অক্ষয়ভাণ্ডাররূপে ধরায় নামিয়া আসিয়াছে। ভক্তগণের সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষা শ্রীভগবানের মঙ্গলময়ী করুণায় মিলিয়া মিশিয়া আজি গীতারূপে পরিণত হইয়াছে।

গীতার সার উপদেশ, শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ ও সর্ব্বকর্ম্মফলার্পণ। শ্রীভগবান্ এই কথাই অনেক ভাবে আমাদিগকে বলিয়াছেন, অনেকবার শুনাইয়া শুনাইয়া প্রতিজ্ঞার স্বরেও বলিয়াছেন, তথাপি বধির আমরা তাহা শুনিনা—শুনিলেও তদনুযায়ী চলিনা। ঐ শুন ভগবানের আহ্বান:—

মযোব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবমিষ্যসি মযোব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ং॥

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

সন্ধ্যায় সন্দেহ প্রবন্ধের প্রত্যুত্তর।

বিগত কার্ত্তিক মাসের ব্রাহ্মণ-সমাজপত্রিকায় কালীচন্দ্র শর্ম্মা নামক জনৈক ব্যক্তি, সন্ধ্যায়-সন্দেহ শীর্ষকপ্রবন্ধে, প্রাত্যহিক সন্ধ্যোপাসনা বিষয়ক কয়টি প্রশ্ন উপস্থিত করতঃ ব্রাহ্মণ সভা হইতে তাহার মীমাংসা আকাঙ্ক্ষা করেন। আজকাল এই সমস্ত বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু মূল শাস্ত্রগ্রন্থের অভাবে, কেহই ইচ্ছানুসারে সন্দিগ্ধ বিষয়ে প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতেছেন না। অথচ আপাতদৃষ্টিমাত্রে পূর্ব্বপুরুষাচরিত আচার ব্যবহার বর্জ্জনও করিতে পারিতেছেন না। উক্ত প্রবন্ধদৃষ্টে আমরাও আশা করিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত পণ্ডিতমণ্ডলী হইতে কিছু মূলতত্ত্ব অবগত হইতে পারিব। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহই এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই, দেখিয়া আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি অনুসারে

যথাসম্ভব ইহার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যথার্থদর্শিপণ্ডিতমণ্ডলী ইহার সত্যাসত্য বিচার করিবেন। প্রথমতঃ, আমি আচমনক্রিয়ার বিষয় লিখিতেছি। শাস্ত্রে যতদূর প্রমাণ পাইয়াছি তদনুসারে সদসৎ বিচার করাই প্রধানতঃ এই প্রবন্ধের লক্ষ্য হইবে।

আচমনবিষয়ে আমরা যে সমস্ত প্রমাণ পাই, তাহা দ্বারা তিনবার জলপান করতঃ ওষ্ঠদ্বয় মার্জ্জন ও মুখ চক্ষু কর্ণপ্রভৃতি স্থান স্পর্শ করাই আচমন-শব্দবাচ্য বলিয়া বুঝিয়া থাকি। অমরকোষেও লিখা হইয়াছে "উপস্পর্শ আচমনং"। প্রমাণ যথা;

দক্ষঃ—

প্রক্ষাল্য পাণীপাদৌ চ ত্রিঃ পিবেদম্বুবীক্ষিতং।
সম্বৃত্যাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিঃপ্রমৃজ্যাত্ততো মুখং। ইত্যাদি।

মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক আচমনের কথা হলায়ুধ ভিন্ন আর কেহই লিখেন নাই। আমার বিশ্বাস, যাঁহারা, ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব মতানুসারে সন্ধ্যা করেন, তাঁহারাই সমন্ত্রক আচমন করিয়া থাকেন। অন্যথা, কালীচন্দ্রশর্ম্মার লিখিতানুসারে অমন্ত্রক আচমনকারীদের প্রাচীনাচারকেও দুরাচার বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ "যেনাস্য পিতরো যাতা" ইত্যাদি প্রমাণও আছে। যাহা হউক, অস্মদ্দেশীয় সন্ধ্যাবিধি হলায়ুধের অনুমোদিত নহে। অন্য সকল গ্রন্থেই আমাদের অনুকূলেই প্রমাণ পাইতেছি। ঋষিকল্প পরমপূজনীয় পণ্ডিতবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রামনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় হইতে আমরা এইরূপই উপদেশ পাইয়াছি এবং তিনিও স্বরচিত "স্মৃতিসন্দর্ভ" গ্রন্থে এইরূপ প্রমাণ দিয়াছেন। সুতরাং, এরূপ সন্দেহস্থলে নিম্নলিখিতরূপে ইহার সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

আচমন ক্রিয়াটি কর্ম্মাঙ্গ, কর্ম্মকর্ত্তার শুচিত্বকারক। ইহা "অনেনৈব বিধানেন আচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ" এইটুকুদ্বারা স্পষ্টই বলা হইয়াছে। এইরূপ অন্যান্য বহু প্রমাণদ্বারা ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, আচমনদ্বারা কর্ম্মকর্ত্তা পবিত্র হইয়া থাকেন। তবে যে অনেকেই আচমনকালে প্রণব উচ্চারণ বা বিষ্ণুস্মরণ, কেহ কেহ বা ওঁতৎসৎ উচ্চারণ করতঃ আচমন করেন, তাহা কেবল ক্রিয়ার বৈগুণ্যনাশের জন্যই। প্রমাণ যথা;—

"যন্ন্যূনং চাতিরিক্তঞ্চ যচ্ছিদ্রং যদযজ্ঞিয়ং।
যদমেধ্য মশুদ্ধঞ্চ যাতযামঞ্চ যদ্ভবেৎ॥
তদোঙ্কারপ্রযুক্তেন সর্ব্বঞ্চাবিকলং ভবেৎ"।
"অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণংস্যাদিতি শ্রুতিঃ।"
"ওঁতৎসদিতিনির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা।
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃ ক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাং।"

অতএব বৌধায়নবচনে পাতক শব্দের উল্লেখ থাকায়, যাঁহারা আচমনদ্বারা পাতকনাশ কামনা করেন, তাঁহাদের পক্ষেই সেইরূপ আচমন বিহিত, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা সাধারণের জন্য নয়। অন্যথা অমন্ত্রক আচমনের ভূরিব্যবহার হইত না এবং সমন্ত্রক আচমনেরও অন্য প্রমাণ পাওয়া যাইত। কিন্তু শূদ্রাদির বিষয়েই যে অমন্ত্রক আচমন বিহিত, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ, হলায়ুধ ব্রাহ্মণ-সর্বস্বের প্রথমখণ্ডে ওঁপূর্ব্বক ব্যাহৃতিদ্বারা আচমনের উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু, তাহারই দ্বিতীয় খণ্ড কর্ম্মোপদেশিনীতে তিনি প্রধানতঃ আচমনের সপ্রমাণ উপদেশ করিয়াও প্রণব বা ব্যাহৃতিদ্বারা আচমনের বিষয় কিছুই উল্লেখ করেন নাই। যথা ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বে দ্বিতীয় খণ্ডে দক্ষঃ—

"প্রক্ষাল্য পাণিপাদৌ চ সুখাসীনস্তথাসনে।

... ...

প্রাগ্‌বা ব্রাহ্মেণতীর্থেন ত্রিঃ পিবেদম্বু বীক্ষিতং।

... ...

অনেনৈব বিধানেন আচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ।"

এবং সর্ব্বত্রাচমনং কর্ত্তব্যং। ইতি

ইহা দ্বারা প্রণবপূর্ব্বকব্যাহৃতির আচমনের কথা শিথিল হইল কি না, ইহা পণ্ডিতমণ্ডলী বিবেচনা করিবেন। মন্ত্রবিশেষদ্বারা আচমনের প্রমাণ না থাকিলেও, এই কারণেই বৌধায়ন-বচনটী, ব্রাহ্মণমাত্রের আচমনের নিমিত্ত বিহিত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।

শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয়ের আহ্নিককৃত্যে আমাদের যথেষ্ট মতানৈক্য আছে। আচমনে তিনবার জলপানের বিষয় শাস্ত্রে ফলশ্রুতিসহ উল্লিখিত আছে। যথা মনুঃ—

ত্রিরাচামেদপঃ পূর্ব্বং দ্বিঃ প্রমৃজ্যাত্ততোমুখং।

যাজ্ঞবল্ক্য ত্রিঃ প্রাশ্যাপো দ্বিরুন্মৃজ্য ইত্যাদি

গোভিল ত্রিরাচমেৎ দ্বিঃ প্রমৃজীতেত্যাদি।

অন্যত্র শঙ্খঃ— ত্রিঃ প্রাশ্নীয়াদ্‌যদম্ভস্তু প্রীতা স্তেনাস্যদেবতাঃ।

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ভবন্তীত্যনুশুশ্রুমঃ।

এতাদৃশ স্থলে "দ্বিরাচম্য ততঃ শুদ্ধ" এই বচন সঙ্গতই হইতে পারে না। যে যে স্থলে দ্বিরাচমন করিতে হয়, তাহার প্রমাণ যথা যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

স্নাত্বা পীত্বা ক্ষুতে সুপ্তে ভুক্ত্বা রথ্যোপসর্পণে।

আচান্তঃ পুনরাচামেদ্বাসোঽপি পরিধায় চ।

বৌধায়নঃ। ভোজনে হবনে দানে উচ্চারে চ প্রতিগ্রহে।

হবির্ভোজনকালে চ তদ্বিরাচমনং স্মৃতং॥

সুতরাং, আহ্নিককৃত্যে আচমন মাত্রেই দ্বিরাচম্য ইত্যাদি বচন কিরূপে লিখিত হইল তাহার কারণ জানা আবশ্যক। ত্রিবেদীর সন্ধ্যাবিধিতেও বহু বৈষম্য আছে। সন্ধ্যাচরণ নিরত

ব্রাহ্মণগণ ঐ গ্রন্থ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। বাস্তবিক বিভিন্নরূপ সন্ধ্যাবিধি সম্ভবতঃ শাখাভেদেই হইয়াছে। বেদজ্ঞ পণ্ডিত ভিন্ন ইহার স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে। অতএব প্রার্থনা বেদশাস্ত্রাভিজ্ঞ কোনও মহাত্মা এই সন্দেহের সুমীমাংসাকরতঃ ব্রাহ্মণমাত্রেরই ধন্যবাদ ভাজন হইবেন।

প্রাণায়াম।

প্রতিদিন সন্ধ্যা-উপাসনাকালে তিনটী প্রাণায়াম কর্ত্তব্য। সকলেই ঐরূপ করিয়া থাকেন। প্রমাণ যথা, আহ্নিকপ্রদীপধৃত কূর্ম্মপুরাণে,—

"প্রাক্‌কূলেষু ততঃ স্থিত্বা দর্ভেষু সুসমাহিতঃ।
প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা যে সন্ধ্যাং সমুপাসতে" ইত্যাদি।

আমরাও পুরুষানুক্রমে এইরূপ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু প্রাণায়ামত্রয় বলিতেই যে পূরক কুম্ভকাদির প্রত্যেকের বারত্রয়ানুষ্ঠান বোধ হইতেছে, তাহা নয়। কারণ পূরক, কুম্ভক ও রেচক ইহাদের প্রত্যেকটিই প্রাণায়াম বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। আহ্নিক-প্রদীপকার পূর্ব্ববচনের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"প্রাণায়ামত্রয়মিতি পূরককুম্ভকরেচকাখ্যত্রয়ং কৃত্বেত্যর্থ"। অর্থাৎ পূরক কুম্ভক ও রেচক নামক প্রাণায়াম তিনটি করিয়া ইহা পূরকাদি প্রত্যেকের প্রাণায়ামত্ব ও প্রত্যেকের একবার অনুষ্ঠানেই বারত্রয়ানুষ্ঠান হইতেছে। ইহা স্বীকার না করিলে, পূরকঃ কুম্ভকো রেচঃ প্রাণায়াম ত্রিলক্ষণঃ ইহার সহিত বিরোধ হইতেছে; অথচ পাতঞ্জল দর্শনের "বাহ্যাভ্যন্তর স্তম্ভবৃত্তির্দেশকাল সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘ সূক্ষ্মঃ" এই সূত্রটীও ব্যর্থ হইতেছে। মহর্ষি পতঞ্জলির এই সূত্রে, বাহ্যবৃত্তি শব্দে রেচক, অভ্যন্তর বৃত্তিশব্দে পূরক ও স্তম্ভবৃত্তি শব্দে কুম্ভক প্রাণায়ামকে বুঝাইতেছে। ইহা বশিষ্ঠ-সংহিতায় ও যোগবার্ত্তিকে স্পষ্ট দেখান হইয়াছে। যথা—

"স তু প্রাণায়ামো বাহ্যবৃত্তিরাভ্যন্তরবৃত্তিঃ—স্তম্ভবৃত্তিরিতি ত্রিবিধঃ, রেচক পূরক কুম্ভকভেদাৎ।" ইতি। "প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যাৎ পূরককুম্ভক রেচকৈ-রিতি বশিষ্ঠ-সংহিতায়াং।

এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা পূরকাদি প্রত্যেকের প্রাণায়ামত্ব নিশ্চিত হইল। এখন প্রাণায়ামের যে লক্ষণ করা হইয়াছে তাহার সহিত সামঞ্জস্য হয় কিনা, দেখা যাউক। ছন্দোগ পরিশিষ্টে—

সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ।
ত্রিঃ পঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে।

অর্থ; ব্যাহৃতি ও প্রণবের সহিত সশিরস্ক গায়ত্রী তিনবার পাঠ করার নাম প্রাণায়াম। তাহা হইলে ব্রাহ্মণমাত্রেই অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যে, পূরকাদির প্রত্যেকটাতেই ঐরূপ সশিরস্ক গায়ত্রী ৩ বার পাঠ করা হয় কি না। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন পূরকাদির প্রাণায়ামত্ব অব্যাহত। সুতরাং, সিদ্ধান্ত ইহাই যে প্রাণায়ামস্বরূপে তিনটী এক, হইলেও

পূরকাদি ভেদেই প্রাণায়ামের ত্রৈবিধ্য হইয়াছে। যে স্থলে প্রাণায়ামত্রয়ের কথা উল্লিখিত থাকিবে, সেখানেই পূরকাদি ত্রয়ের উপস্থিতি হইবে। আহ্নিকপ্রদীপে আর একটী প্রমাণ দ্বারা ইহা আরও পরিষ্কার বুঝান হইয়াছে। যথা —

ভূরাভাস্তিস্র এবৈতা মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।
মহর্জ্জন স্তপঃ সত্যং গায়ত্রী চ শিরস্তথা।
ইত্যুপক্রম্য
এতা এতাং সহানেন তথৈভির্দ্দশভিঃ সহ।
ত্রির্জ্জপেদায়ত প্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে।

ব্যাখ্যা যথা :—

এতাঃ সপ্তব্যাহৃতীঃ, এতাং গায়ত্রীং, অনেন শিরসা সহ এভির্দ্দশভিঃ প্রণবৈশ্চ সহত্রির্জ্জপেৎ। প্রাণায়াম ত্রিবারজপস্যৈব ত্রিত্বং লভ্যতে; সঃ প্রাণায়াম উচ্যতে ইত্যর্থঃ।

তাৎপর্য্য এই যে, প্রাণায়ামের ত্রৈবিধ্য বিধায়ই সশিরস্ক গায়ত্রী ব্যাহৃতি ও প্রণবের সহিত ৩ বার জপের বিধান করা হইয়াছে। ইহার পরেই "সব্যাহৃতিং স প্রণবাং" এই বচন লিখিত হইয়াছে। এই বচন দ্বারা ব্যাহৃতি প্রণবযুক্ত সশিরস্ক গায়ত্রী ৩ বার পাঠের নামই প্রাণায়াম বলিয়া তিনটী প্রাণায়ামে উক্ত প্রকার গায়ত্রী ৯ বার পঠিত হয়। সুতরাং সর্ব্বতোভাবেই পূরকাদি প্রত্যেকের প্রাণায়ামত্ব ও "প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা" ইহারও সার্থকতা হইল।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তে "আদানং রোধমুৎসর্গং বায়ো স্ত্রিস্ত্রিঃ সমভ্যসেৎ" ইহার সহিত কোনও বিরোধ নাই। কারণ, এই বচন অধিক ফলকামী ব্যক্তির পক্ষেই বিহিত হইয়াছে। তদুক্তং, তত্রৈব; "আদানং রোধ মুৎসর্গং, বায়ো স্ত্রিস্ত্রিঃ সমভ্যসে" দিতি বচনন্তু ফলার্থিন এব। ত্রিবিধং কেচিদিচ্ছন্তি তথৈব নবধাপরমিতি বচনান্তরাৎ?

ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় কালীচন্দ্রশর্ম্মা যে প্রাণায়ামের বারত্রয়ানুষ্ঠানের কথা বলিয়াছেন, তাহা বারত্রয়ানুষ্ঠান হয় না। সেইরূপ করিলে তাহা নয়বারই অনুষ্ঠান করা হয়। একবার অনুষ্ঠানের বাস্তবিকই প্রমাণ নাই; তবে, তিনি যাহা একবার বলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাতেই প্রাণায়ামের তিনবার অনুষ্ঠান হইয়া যায়। এই বিষয় অধিক লিখিতে ক্ষান্ত হইলাম। প্রবন্ধের ভ্রম প্রমাদ পরিত্যাগ করতঃ গুণগ্রাহী মনীষিবৃন্দ যদি ইহার আংশিকও উপযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করেন তবে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

মন্ত্রের ঋষিচ্ছন্দঃ প্রভৃতি বিষয় আমাদের যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যাবিধিতে যথাক্রমেই লিখিত হইয়াছে॥ এই সম্বন্ধে বহুগ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়াও কিছুই পাওয়া যায় না।

শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় যে সমাসমধ্যে "বিবেদেবা" পাঠ অশুদ্ধ লিখিয়াছেন, তাহার কোনও কারণ উল্লেখ করেন নাই। এইরূপ পাঠ প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহা অলুক্ সমাসান্ত পদ বলিয়া আমাদের ধারণা। তবে যদি কবিরত্ন মহাশয়ের মতে বিশ্ব ও দেব

দুইটী শব্দ হয়, তবে আমরাও বলি ইহা অশুদ্ধই। ইহার বিশেষ কারণ আমরা জানিতে ইচ্ছুক। কেহ জানাইলে অনুগৃহীত হইব।

পঞ্চম প্রশ্নে "সূর্য্যশ্চমে" ইত্যাদি প্রাতরাচমনমন্ত্রে যে বৈষম্য দেখান হইয়াছে, সেইরূপ পাঠ মন্ত্রার্থদীপিকার অনুমোদিত বটে। ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বগ্রন্থেও আমাদের অভ্যস্ত মন্ত্রের কোনও কোনও স্থানে বৈষম্য দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ শাখাভেদই এরূপ বৈষম্যের কারণ হইবে। বেদের কোনও গ্রন্থ আমার নিকট না থাকায় ইহার কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছি না। আশা করি বেদরহস্যাভিজ্ঞ কোনও মহাত্মা আমাদের এইরূপ সন্দেহের সুমীমাংসাক্রমে চিরবাধিত করিবেন। বিশেষ লেখা বাহুল্য। ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরতপণ্ডিতগণ এই সমস্ত সন্দিগ্ধ বিষয়ে যথাসম্ভব সহানুভূতি প্রদর্শন করতঃ স্বকীয়মহানুভবতার পরিচয় দিতে ত্রুটি করিবেন না; ইহাই আমার বিশ্বাস।

শ্রীপ্রমেশচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

সামাজিক গীত।

(কন্যার বিবাহে পণ সম্বন্ধীয়।)

হায় রে সমাজ হ'ল কি?
কি ছিল এর আগে এখন হয়েছে কি—ছি-ছি-ছি !
একটী দুটী মেয়ে হ'লে, পালাতে হয় কাপড় ফেলে,
মেয়ের বাপের কি যে জ্বালা অপরে তা বুঝবে কি ?
ভিটে বেচে পথে দাঁড়ায় পরিবারের হাত ধরি ॥
ছেলের বাপের কি যে খাঁই, দুনিয়া সুদ্ধ সকল চাই,
খাট পালং আর রূপার বাসন, হাজার পাঁচেক নগদই !
ছেলের বিয়ের পয়সা ক'রে, করেন তিনি নবাবী ॥
নিজের মেয়ের বিয়ের বেলা, বুঝে ছিলেন যখন ঠ্যালা,
বক্তৃতাতে ফাটিয়ে গগন—বলতেন "আমরা হলেম কি ?
(এস) ছেলের বিয়ের টাকা নেওয়ার কুপ্রথাটা উঠিয়ে দিই ॥"
(এখন) নিজের ছেলের দেবেন বিয়ে—মেয়ের বাপকে বলছেন গিয়ে,
"করব কি ভাই শোনেন না যে—ঘরের আমার গিন্নিটী।

হাজার দশেক না দিলে ছেলের কেমন করে বিয়ে দিই ?"
কাগজ কলম কালী নিলে, লম্বা চওড়া ফর্দ দিলে—
হাজার পাঁচেক নগদ,—গয়নায় সোণা চাই শ দুই ভরি।
সোণা রূপায় সকলই চাই—কেবল একটা ল্যাজ বাকি॥
মেয়ের বাপ এই ফর্দ পেয়ে—বাস্তু ভিটে বেচেন গিয়ে,
মেয়ে তো পার করতে হবে—আহা গরীব করেন কি !
সংসারের ভার ঘুচিয়ে তাঁরে—করে দাও শেষ বিবাগী॥
কুসুমকোমল ননীর কায়, দেখলে বদন দুঃখ যায়,
চক্ষুশূল হয় এমন মেয়ে—এর বাড়া আর করবে কি ?
সোনার সংসার তোমার জ্বালায়—হয় যেন ঠিক শ্মশানটী।
তোমাদের এই অত্যাচারে বাপের দুঃখে মর্ম্মে মরে
(কত) ননীর পুতুল জীবন দিলে সেটা সবাই দেখছো কি ?
হ'ল নাকো লজ্জা তবু বুঝলে না তো ছি-ছি-ছি॥
কসাইরা সব কশাই হয়ে, ব্যাইয়ের গলায় ছুরি দিয়ে,
সুরু করেন কুটুম্বিতা তার ফলেতে হচ্ছে কি ?
মেহের পুতুল স্নেহলতা—পুড়ে মর্‌ল দেখছো কি ?
(এই) মেয়ে মরার যত পাপ, দগ্ধে মরার অভিশাপ,
কার মাথাতে পড়বে বল—তোমরা ত সমাজপতি !
পাপ পুণ্যের বিচার কর্ত্তা—তিনি তো ভাই ঘুমোন নি॥
শোন সবাই কথা রাখ, চোখ থাকে তো চেয়ে দেখ,
এতেও যদি লজ্জা না হয় - দাও তবে গলায় দড়ি।
দড়ি কেনার কড়ি তোমার যৌতুক দেবে চাও না কি॥

শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্।

বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণসভার একাদশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী।

করুণাময় শ্রীশ্রীব্রহ্মণ্যদেবের কৃপায় বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণসভা একাদশ বর্ষে উপনীত হইল। আজ এই বার্ষিক উৎসবের দিনে সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বনিয়ন্তা ৺ব্রহ্মণ্যদেবের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, সম্রাটের জয়কামনা করিয়া সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে সভা সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছেন এবং তাঁহাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা ইহার সর্ব্বানুষ্ঠানে প্রার্থনা করিতেছেন।

এখন চারিদিকে বিপ্লব-বিভীষিকা, বর্ণাশ্রমের প্রতিকূল স্রোত খরতর বহিতেছে। এ সময়ে স্থিরলক্ষ্য আত্মনির্ভরতায়, দৃঢ়সংকল্প একপ্রাণতায় এতটুকু অভাবে আমরা বহুদূর বিপরীত পথে নীত হইব। তাই সভার সুবিবেচিত সর্ব্বানুষ্ঠানে আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি।

হিন্দুর শিক্ষা—ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গের সাধনা; পাশ্চাত্য শিক্ষা পূর্ব্বাপরবর্জ্জিত—কেবল অর্থ ও কামের সাধনা। এই আপাতমনোরম পরিণামবিষময় শিক্ষানুশীলনে সেই অর্থ-কামপ্লাবিত সমাজের আবর্জ্জনা আমাদের বর্ণাশ্রম-সমাজে আপতিত হইয়া সব বিপর্য্যস্ত করিতেছে। আত্মরক্ষায় একনিষ্ঠতার অভাবে আমাদের সুগঠিত সমাজ আজ বিধ্বস্তপ্রায়। এখন তাহার ভগ্নস্তূপে দাঁড়াইয়া নির্ম্মাতার কারুকার্য্যে শুধু মোহিত হইলে চলিবে না; অভগ্ন অংশসমূহ আর যাহাতে না ভাঙ্গে, প্রথমতঃ তাহার ব্যবস্থা করা, পরে ভগ্ন অংশসমূহ কি করিলে পুনরায় পূর্ব্বানুযায়ী হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা আপনাদের কার্য্য। "ও ভাঙ্গা যোড়া লাগিবে না, আহা! এ প্রাসাদ কেমন ছিল," ইত্যাকার হতাশ অনুশোচনার পরিণাম অবসাদ, অবসন্ন সমাজের পরিণাম পরায়ত্ততা, তাহা কে স্বীকার করিবে? আমার পিতৃ-পিতামহগঠিত সমাজে আমি কেহ নয়, "নিজবাসভূমে পরবাসী" হইতে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থাকিতে কে স্বীকার করিবে? 'তোমাদের এটা ভাল নয়, তোমাদের ওটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন', পরে বলিলে আমি তাহা স্বীকার করিব কেন? যখন বুঝিতেছি, আমি নিজে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি—ইহা অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী আমার পক্ষে, আমার জীবিতের পক্ষে আর কিছুই নাই। তোমার ও বাহ্য চাকচিক্যময় অর্থ-কাম-বিজড়িত সমাজ আমার মরীচিকা, তৃষ্ণা বাড়াইয়া আমাকে দগ্ধ করিবে। তখন কেন আমি তাহাতে মুগ্ধ হইব? কেন আমি তাহাতে আপনা ভুলিয়া মজিব? ভাল-মন্দ লইয়া আমার সমাজ, সেই ভাল-মন্দ আমারই, তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে আমার ত লজ্জা নাই? হউক তাহা তোমার কাছে কুসংস্কার। তুমি আমায় পৈতৃক কুটীর হইতে বাহির করিয়া প্রাসাদে উঠাইলে, আমার

মৃত্তিকাপ্রদীপ স্থলে তাড়িত চমকাইলে, আমার অশনবসন পানীয় তোমার ছাঁচে ঢালিলে। তোমার অঙ্কে লালিত শিশুটীর মত সোহাগ ভোগ করিলাম, উত্তম। কিন্তু কালনিয়মে আমাকে ত বাড়িতে হ'বে? তখন সেই পৈতৃক কুটীরে প্রবেশের সময় তুমি ত আমার পুরাতন আবেষ্টনে অতৃপ্তি বাড়াইয়া সরিয়া পড়িবে? আমার সেই মেটে প্রদীপে, সেই পর্ণকুটীরে তখন যে সেই পানীয়ে, সেই অশনবসনে তৃপ্ত না হইলে আমার আর উপায় নাই। তুমি ত তখন অর্থ-কামশূন্য আমার সেই পল্লীভূমিপ্রাঙ্গণে পদার্পণও করিবে না? তবে কেন আমাকে আমার সেই পল্লীর মত, আমার পিতৃপিতামহের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে অবকাশ দাওনা?

যেনাস্যৎ পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন দুষ্যতি॥

সেই পিতৃপিতামহ-অনুসৃত পদবীই ত আমাদের নিষ্কণ্টক; সন্দিগ্ধ দুষ্ট পথ পরিত্যাগ করিয়া সেই নিষ্কণ্টক পথে গমন করিতে যাহাতে আমাদের প্রবৃত্তি জাগে, ভিতর হইতে যাহাতে সেই প্রেরণা আইসে, তাহার অনুশীলনই ব্রাহ্মণসভার প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যাভিমুখী ক্রিয়া যাহাতে সমাজমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তাহার জন্য ব্রাহ্মণসভার চেষ্টা। সেই চেষ্টা যাহাতে ঐকমত্যে করা হয়, তাহার জন্য সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সহযোগিতার প্রয়োজন ও প্রার্থনা। ব্রাহ্মণ কখনই লালসার কষাঘাতে জর্জ্জরিত ছিল না। ত্যাগেই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য, ত্যাগই ব্রাহ্মণকে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজে উচ্চাসন দিয়াছে—ভোগ নহে। ত্যাগই ব্রাহ্মণের ভোগ ভোগে পতন। আমাদের প্রতিষ্ঠার সেই পুরাতন পথের আবেষ্টন উপস্থিত অরণ্যসঙ্কুল বোধ হইলেও তাহা একেবারে অগম্য হয় নাই। পরিত্যক্ত ক্ষীণরেখা আরও ক্ষীণতর হইতে না দেওয়াই সেই ক্ষীয়মাণ পন্থা রক্ষার উপায়। এই পূর্ত্তকার্য্যে সমবেত চেষ্টা ব্যতীত সফলতা সুদূরপরাহত। তাই এই আহ্বান। জানিবেন এআহ্বান কাতরতা-পূর্ণ, আবেগময় হৃদয়যন্ত্রের গৈরিক নিঃস্রাব। ইহা আপনারা শুনিবেন না? ত্যাগের আদর্শ ঋষির সন্তান এমন কে আছে এই অরুন্তুদ আহ্বানে বধির থাকিবে? ব্রাহ্মণেতর যাঁহারা আছেন, তাঁহারা আমাদের সহায় হউন, যাহাতে আমাদের এই চেষ্টা সফলতায় মণ্ডিত হয়, সেই লুপ্তপ্রায় পন্থা যাহাতে সুগম হয়। জানিবেন আমাদের সমাজ চাতুর্ব্বর্ণ্য, আমাদের পূর্ব্বাভ্যস্ত অধুনা পরিত্যক্ত ত্যাগ আবার আমরা কুড়াইয়া লইব; ইহাতে তাঁহাদের লাভ বই ক্ষতি নাই, ইহার ফলের তাঁহারাও ভাগী হইবেন। তবে আসুন, আজ সকল বর্ণ একযোগে একলক্ষ্যে ব্রাহ্মণকে সেই পথে আগুয়ান করিয়া দিন। আমাদের এক উপাদান—সেই এক বিরাট দেহ হইতে আমরা সকলেই উদ্ভূত, আমাদের উদ্দেশ্য বিভিন্ন হইবে কেন?

এই সভার নাম ব্রাহ্মণসভা হইলেও উদ্দেশ্য চাতুর্ব্বর্ণ্যের উন্নতি, কোন জাতিবিশেষের নহে। সংসারে যে জাতিই দেখিবেন উন্নত, ত্যাগস্বীকার তাহার মূল। ত্যাগস্বীকার ব্রাহ্মণের

মজ্জাগত, সহজসাধ্য—বর্ণত্রয় অপেক্ষা সহজসাধ্য। তাই ইহার নাম ব্রাহ্মণ-সভা, ইহা সাম্প্রদায়িক সভা নহে।

কি উপায় অবলম্বন করিলে, কোন্ শিক্ষা অভ্যাস করিলে, কি আচারানুষ্ঠান পালন করিলে, লোকের মোহ আগন্তুক ব্যসন হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণকে সেই উপায় অবলম্বন করিতে, সেই শিক্ষা অভ্যাস করিতে, সেই আচার পালন করিতে প্রবৃত্তি উন্মুক্ত করায় ব্রাহ্মণসভার চেষ্টা আছে। সেই চেষ্টা নিম্নলিখিত আকারে বিকশিত:—

(১) সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে ভাববিনিময়—যাহার ফলে ব্রাহ্মণমহাসম্মিলন। [২] আচারানুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা যাহার ফলে সাঙ্গবেদবিদ্যালয় স্থাপন। [৩] শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মকর্ম্মে অনুরাগ সঞ্চার, অবিহিতের বর্জ্জন—যাহার ফলে ধর্ম্মশাস্ত্র চতুষ্পাঠী স্থাপন। [৪] স্ব-ভাব গ্রহণে দেশকে অনুরোধ—যাহার ফলে প্রচার বিভাগের প্রতিষ্ঠা। [৫] সামাজিক বিশুদ্ধি-রক্ষায় উৎসাহদান যাহার ফলে কুলপরিচয় সংগ্রহে যত্ন; প্রভৃতি। উল্লিখিত এক একটী বিভাগের কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করা ব্রাহ্মণসভার বর্ত্তমান অবস্থায় কুলায় না; প্রত্যেকটীর জন্য পৃথক কার্য্যালয়, পৃথক কর্ম্মচারী, পৃথক্ পরিদর্শক, সম্পূর্ণ পৃথক্ বন্দোবস্ত একই ব্রাহ্মণসভার অধীন বৃহদায়তনে করিতে হয়। তাহা করা—সমবেত চেষ্টাসাপেক্ষ; ব্যক্তি বিশেষের বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তিগণের চেষ্টায় তাহা দুঃসাধ্য। সমাজের যেরূপ উৎসাহ, তাহাতে আশা করা যায় এই সমবেত চেষ্টা সুদুর্লভ নহে। ব্রাহ্মণসভা যখন একটী সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছেন, এই প্রবৃত্তি পোষণে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছেন, তখন তাঁহাদের এই উৎসাহের অনাহারে অকাল মৃত্যু না ঘটে, সে দিকে সমগ্র সমাজের লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন। এই ভাব যাঁহাদের হৃদয়গ্রাহী, তাঁহাদের ইহা প্রতিপাল্য। সুতরাং, শক্তিমত আহার ইহাকে তাঁহারা যোগাইবেন, এইরূপ অনুরোধ করায়—প্রার্থনা করায়—ভিক্ষা করায় ব্রাহ্মণসভার সঙ্কোচ নাই।

এই যে আজ দশম বর্ষ অতীত হইল ব্রাহ্মণসভার অঙ্গপুষ্টির লক্ষণ দেখা যাইতেছে, ইহাতে হাত সমাজের কয় জনের? মাত্র মুষ্টিমেয় জনকয়েক দেশবৎসল সমাজবৎসল ব্যক্তি ইহার এই বর্ত্তমান পুষ্টিসাধনে সহায়। তন্মধ্যে মান্যবর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের নাম প্রধান ও প্রথম উল্লেখযোগ্য। এই স্বনামধন্য দানবীর মহাপুরুষ ব্রাহ্মণ-সভার নামে লক্ষ টাকা উৎসর্গ করিয়াছেন, যাহার সত্তর হাজার টাকার উপস্বত্বে এবং অন্যান্য জনকয়েক মহাত্মার মাসিক ও বার্ষিক আনুকূল্যে ইহার ব্যয় কষ্টে নির্ব্বাহিত হইতেছে। বর্ত্তমান আয়ের উপর নির্ভর করিয়া ইহার কার্য্যপরিধি আর বর্দ্ধিত করা সুকঠিন। অপরন্তু, এই যে একটী সমাজবৎসল জনসংহতির আশ্রম আদিশূর পরগৃহবাসী হইয়া আছে, ইহার স্ফূর্ত্তি কি করিয়া হয়, স্ফূর্ত্তির অভাবে কি এই বর্ত্তমান শিশু আজীবন মুহ্যমান থাকিবে? ব্রাহ্মণের চক্ষে, চাতুর্ব্বর্ণ্যের চক্ষে, হিন্দুর চক্ষে কি ইহা দুঃসহ নহে?

ব্রজেন্দ্রবাবুর লক্ষ টাকার মধ্যে সত্তর হাজারের সংবাদ দিয়াছি। বাকি ত্রিশ হাজার টাকার জমী খরিদ যেন হইল, কিন্তু তাহাতে ত আর ব্রাহ্মণসভার পরগৃহবাস ঘুচিল না? বিনা আড়ম্বরে ব্রাহ্মণসভার বর্ত্তমান বিভাগ কয়টীকে অবিস্তৃতভাবে স্থান দানের উপযোগী গৃহের জন্ত উপস্থিত অন্ততঃ চল্লিশ হাজার টাকার প্রয়োজন। পরে কার্য্যবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর আয়তন বৃদ্ধি সময়মত করা যাইতে পারে।

চল্লিশ হাজার টাকা একের পক্ষে বেশী হইলেও সমষ্টির কাছে যৎকিঞ্চিৎ। ব্রজেন্দ্র-কিশোরের ন্যায় সামর্থ্যবান মহাপ্রাণ ব্যক্তির সংখ্যা সমাজে খুব বেশী নাই, সত্য। নাই বা থাকিল, হইতে কতক্ষণ? ত্যাগশীলতা ত আর ব্রজেন্দ্রকিশোরের একচেটিয়া নহে? যাহা ব্রাহ্মণে সুলভ, হিন্দুর গৌরবের বস্তু, তাহা ব্রাহ্মণের কাছে—হিন্দুর কাছে কেন পাইব না? চাই কেবল উদ্বুদ্ধ করা, কর্ত্তব্যের প্রেরণায় সামাজিক দায়িত্বজ্ঞানে তাঁহাদিগকে উদ্দীপ্ত রাখা। তাহা করিতে ব্রাহ্মণসভা সর্ব্বদাই প্রস্তুত। আমাদের বিলাসব্যসনের বৃথা ব্যয় কমাইলে অতি অল্প সময়েই ঐ টাকা সমাজ হইতে উঠিতে পারে। তাই ব্রাহ্মণের নিকট, হিন্দুর নিকট, অনুনয়—প্রার্থনা যাহাতে এই ব্রাহ্মণসভার গৃহনির্ম্মাণসংকল্প কার্য্যে পরিণত হয়, তাহার জন্ত যেন তাঁহারা সাধ্যমত আনুকূল্য করিয়া এই সাধু উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায় হন।

ব্রাহ্মণসভার কার্য্যাদি।

গত বর্ষে মাদারীপুর-ব্রাহ্মণমহাসম্মিলনে নিম্নলিখিত নির্দ্ধারণ কয়টী গৃহীত হয়। (১) গুরুপুরোহিত ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের বৃত্তি বিধান ব্যবস্থা। (২) বিবাহে পণপ্রথা নিবারণের উপায়। (৩) বিদ্যালয়ে হিন্দুধর্ম্মের গ্লানিকর পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন নিবারণ। (৪) আচারপূত ব্রাহ্মণবিদ্যার্থিগণের বিধিমত শাস্ত্রাধ্যয়ন জন্ত ব্রাহ্মণবিদ্যালয় স্থাপন। (৫) জাতিগত পবিত্রতা রক্ষার উপায়। (৬) হিন্দুসমাজে বর্ণাশ্রমধর্ম্মরক্ষার্থ এবং শাস্ত্রীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠানের সুবিধাজন্ত হিন্দুগ্রামের দেবালয় রক্ষা ও সংস্থাপন করা এবং অতিথিসৎকার, জলাশয়, গাভী ও গোচারণ রক্ষার ব্যবস্থা (৭) রাঢ়ীয় কুলীনব্রাহ্মণ মধ্যে মেলবন্ধনের কঠোরতা হ্রাস এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মধ্যে পটিসমীকরণের অবশিষ্ট কর্ম্ম সত্বর সম্পাদন ব্যবস্থা। (৮) প্রচলিত পঞ্জিকাসংস্কার ব্যবস্থা। (৯) মাদারীপুরে ব্রাহ্মণসভা গঠন এবং চতুষ্পাঠীস্থাপন ব্যবস্থা। (১০) ব্রাহ্মণমহাসম্মিলনের স্থায়ী সমিতির আয়তন বৃদ্ধির ব্যবস্থা (১১) ৺গঙ্গার পবিত্রতা রক্ষার জন্ত ময়লা জল ও আবর্জ্জনা যাহাতে গঙ্গায় না পড়ে তাহার চেষ্টা ও ৺কালীঘাটের আদিগঙ্গাকে 'টালিস্ নালা' আখ্যায় অভিহিত না করিয়া 'আদিগঙ্গা' নামই বজায় রাখার চেষ্টা। পরিশেষে, মহামান্ত ভারতসম্রাট্ ও তাঁহার মহিষী দীর্ঘজীবনলাভ, করতঃ জয়শ্রী ও সাম্রাজ্যের মঙ্গল দ্বারা বিভূষিত হউন, এতদর্থে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন।

(১) ধর্ম্মশাস্ত্রের চতুষ্পাঠী।

উল্লিখিত নির্দ্ধারণসমূহ কার্য্যে পরিণত করা বহু ও:সময়সাপেক্ষ। তবে সেই উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণসভার কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। বাদারীপুর ব্রাহ্মণসভা ও চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইয়াছে। ১ বঙ্গের প্রধানস্মার্ত্ত শ্রীযুক্ত দুর্গাসুন্দর কৃতিরত্ন মহাশয়ের পরিচালনে ধর্ম্মশাস্ত্রের চতুষ্পাঠী ব্রাহ্মণসভায় স্থাপন। এই টোলে উপস্থিত ছয় জন কৃতবিদ্য ছাত্রের বৃত্তি ও বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। তাঁহাদের অধ্যাপনার ভার কৃতিরত্নমহাশয় স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন; ব্রাহ্মণসভা তজ্জন্ত তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। এই ছাত্রদিগের মধ্যে অধিকাংশই স্মৃতিতীর্থ, সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ বা অন্ত কোন উল্লেখযোগ্য শাস্ত্রপরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সকলেই অনুষ্ঠায়ী, ধার্ম্মিক এবং আচারপূত।

(২) সাঙ্গবেদবিদ্যালয়।

এখানে ৫৫ জন ছাত্র বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ হিন্দুস্থানী ছাত্র, মাত্র ৮ জন বাঙ্গালী। গত বর্ষ অপেক্ষা দুইজন অধিক বাঙ্গালীছাত্র বেদ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। দেশে বেদের আদরের সঙ্গে সঙ্গে এই বিত্তালয়ে বাঙ্গালী আকৃষ্ট হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই টোলে কাব্য এবং দর্শনশাস্ত্রও অধ্যাপিত হয়। প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকাদত্ত শাস্ত্রী। স্বরবৈদিকপ্রকরণের আরও দুইজন অধ্যাপক আছেন, শ্রীযুক্ত রণবীর দত্ত শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত বালমুকুন্দ শাস্ত্রী; ইহারা প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞবংশের ধারা এবং তজ্জন্ত খ্যাতাপন্ন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষণ শাস্ত্রী মহাশয় এই বিত্তালয়ের আচার্য্য। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই উত্তোগে ইহার প্রতিষ্ঠা। তিনি অনুগ্রহ করিয়া ইহার বিশেষ তত্ত্বাবধান করেন। মাত্র বিদ্যা শিক্ষা ব্যতীত ব্রাহ্মণবিদ্যালয়স্থাপনের অন্ত উদ্দেশ্ত আছে—অস্থিরধী ছাত্রবৃন্দের নমনীয় চিত্তবৃত্তির সুপথে পরিচালনদ্বারা তাহাদিগের চরিত্র গঠন। এই সাঙ্গবেদবিদ্যালয়ে এবং স্মৃতিচতুষ্পাঠীতে ছাত্রদিগের গুরুগৃহবাসের তপশ্চরণ হয়। অধ্যাপকের সঙ্গ ব্যতীত অল্পক্ষণই তাঁহারা যথেচ্ছা ভ্রমণ করিতে পান। তাহার ফলে সদাচারী গুরুর দৃষ্টান্তে তাঁহাদের চরিত্র অলক্ষ্যে সেই ভাবে গঠিত হইতে থাকে। ইহা ভবিষ্যৎ সমাজের পক্ষে অল্প লাভের কথা নহে।

(৩) পরীক্ষা বিভাগ।

এই বিভাগের কার্য্য পূর্ব্বাপর একইভাবে চলিয়া আসিতেছে। ইহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্ত গবাটিকুরীর জমিদার শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যই অধিক, অধিক কেন, প্রায় সম্পূর্ণ ই। বাঙ্গালার যে সকল জেলায় সংস্কৃতানুশীলন কতক পরিমাণেও আছে। প্রায় সেই সকলস্থানেই ইহার পরীক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত আছে। উপস্থিত পূর্ব্ব ও উপাধি এই

বিবিধ পরীক্ষা গৃহীত হয়। এই বিভাগের জন্ম আরও অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা হইতেছে। আশা করা যায় আগামী বর্ষে বিশেষ পরিবর্ত্তন সম্ভব হইবে। এই বৎসরে বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে ৫৫ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৪ জন ছাত্র বৃত্তি পাইয়াছে; ৬১ জন অধ্যাপক ও ২২ জন প্রশ্নকর্ত্তাও বৃত্তি পাইয়াছেন। অর্থের অস্বাচ্ছন্দ্য হেতু বৃত্তির পরিমাণ উপযুক্তরূপ না হইলেও বৃত্তির সম্মানপ্রদর্শন-ব্রাহ্মণসভা উচিত বিবেচনা করেন। ন্যায্য হইলেও তাই এই বৃত্তির ব্যবস্থা।

(৪) প্রচার বিভাগ।

এই বিভাগের কার্য্য এতদিন পর্য্যন্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রেবতীকান্ত তর্কপঞ্চানন ও শ্রীযুক্ত তরঙ্গবিহারি মুখোপাধ্যায় মহাশয় করিতেছেন। বাঙ্গালার ব্রহ্মণাধ্যুসিত বিভিন্ন জেলায় ভ্রমণ করিয়া তথায় সভার উদ্দেশ্য প্রচার এবং সেই ভাবে ব্রাহ্মণদিগকে অনুস্যূত করা এবং শাখাসভা স্থাপন দ্বারা সেই ভাবকে স্থায়ী করা, সদস্যসংগ্রহ করা এবং সর্ব্বোপরি, এই মূল ব্রাহ্মণসভার সহিত মফস্বলের সহানুভূতি উদ্‌বুদ্ধ করা তাঁহাদের প্রধান কার্য্য। সম্প্রতি ত্যাগধর্ম্মী সুবক্তা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, ও শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় স্বজীয়ব্রাহ্মণসভার এই বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা এই সভাভবনে নিয়মিতভাবে ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা—আলোচনা করিতেছেন। প্রয়োজনমত সহরের বিভিন্নস্থানে এবং মফস্বলে প্রচার জন্ম গমন করিতেছেন। মফস্বল হইতে তাঁহাদের আমন্ত্রণ প্রায় আসিতেছে। ইহাদ্বারা অনুমান হয় বাঙ্গালীর স্বাভাবিক ধর্ম্মপিপাসা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বাঙ্গালা আবার কদাচারমুক্ত বিস্মৃতপ্রায় পূর্ব্বসারল্যের মধুর মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। রেবতী কান্ত ও তরঙ্গবিহারী এইরূপে জেলায় জেলায় ভ্রমণ করিয়া ভাব বজায় রাখিতে সহায়তা করিলে রামদয়াল ও কেদারনাথের সাধনাশক্তি তাহাতে প্রবাহ আনিলে, দেশে কণ্টকসমূহের আবিলতা, কদাচারব্যসনের আবর্জ্জনা ক্রমশঃ, বিধৌত হইতে পারে।

(৫) ব্রাহ্মণসমাজ-পত্রিকা।

এই বিভাগের কার্য্যভার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার তর্কনিধি ও কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের উপর আছে। তাঁহারা পত্রিকার সম্পাদন কার্য্য সাধ্যানুসারে করিয়া থাকেন। মাত্র ২ জনের পক্ষে সম্পাদনের সকল দিক দেখা সম্ভবপর নহে। প্রবন্ধসকল অনেক সময়ে ব্রাহ্মণসভার উদ্দেশ্যের উপযোগী হইলেও সাধারণ পাঠকের হৃদয়গ্রাহী যদি না হয়,তাহার জন্ম সংগ্রহকর্ত্তা বা লেখক দায়ী নহেন। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লেখক আছেন, যাঁহারা ইচ্ছামত অনিয়মিতভাবে প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। কিন্তু সম্পাদনকার্য্যে নিয়মের ব্যত্যয় চলে না। কাজেই পত্রিকা কখন নীরস, কখন সরস, কখন লঘু, কখনও গুরু হওয়া অনিবার্য্য। সাধারণ লোকরঞ্জন অপেক্ষা ব্রাহ্মণসভার ভাব ও উদ্দেশ্য প্রচারের দিকে, ব্রাহ্মণ্যের প্রতিষ্ঠার দিকে

এই পত্রিকার লক্ষ্য অধিক; সেই লক্ষ্যের পোষক প্রবন্ধ্যের সংখ্যা অধিক হওয়ায় যদি লোকের হৃদয়গ্রাহী না হয়, তাহার জন্য সম্পাদক দোষী নহেন। তবে প্রয়োজন কৌশলী লেখকের; উভয়দিক বজায় রাখিয়া যাঁহাদের রচনা পটুতা আছে—প্রয়োজন সেই রূপ লেখকের। পত্রিকায় সেইরূপ লেখকের সংখ্যা ও আগ্রহ কম, ইহা দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি। বিশেষতঃ, কাগজ এখন দুর্মূল্য, অন্যরূপে সাজাইয়া পত্রিকার বাহ্য সৌষ্ঠব সম্পাদন করাও এখন বহু ব্যয় সাপেক্ষ। একে ইহার আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক; তাহা আরও বাড়াইতে সাহস হয় না। তবে চেষ্টা আছে যাহাতে মাধুর্য্য অপেক্ষা প্রয়োজনীয়তায়, গল্প অপেক্ষা শিক্ষাপ্রদ বিষয়ে ব্রাহ্মণসমাজকে সম্পন্ন করা যায়।

(৬) পঞ্জিকাসংস্কার সমিতি।

গত ১৩২২ সালের শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার বোধনে মতদ্বৈধ উপস্থিত হওয়ায় পঞ্জিকাসংস্কার সমিতির উদ্ভব। সেই অবধি অদ্য পর্য্যন্ত সংস্কার চেষ্টা চলিতেছে। তাহার ফলে বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের সহিত পরামর্শে সংস্কার করিতে হইলে কোন্ কোন্ প্রশ্ন উঠিতে পারে, সেই সকল প্রশ্ন ছাপাইয়া বাঙ্গালার প্রায় প্রত্যেক জেলার জ্যোতিষিক, স্মার্ত্ত ও মীমাংসক পণ্ডিতগণের নিকট হইতে উত্তর সংগৃহীত হইয়াছে। প্রচলিত সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থের সহিত নেপালের রাজলাইব্রেরী হইতে আনীত সহস্র বৎসরের হস্তলিখিত সূর্য্যসিদ্ধান্তগ্রন্থ চণ্ডেশ্বর ভাষ্য সহ মিলাইয়া নকল করান হইয়াছে। সেই গ্রন্থ অনুসারে পঞ্চদশটী সূর্য্যগ্রহণ গণিত হইয়া দেখা গিয়াছে ঠিক মিল হয় না। উপস্থিত মিল করিতে হইলে কিরূপ সংস্কার প্রয়োজন, কোন্ কোন্ ব্যক্তির সাহায্য সেজন্য আবশ্যক, তাহার আলোচনা চলিতেছে। আশা করা যায় আগামী ব্রাহ্মণমহাসম্মিলনে পঞ্জিকাসংস্কার সমিতি কর্ত্তৃক উপনীত সিদ্ধান্ত সাধারণ্যে ঘোষিত হইবে। এই সংস্কার লইয়া বাঙ্গালার স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, বোম্বাই প্রদেশের জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বহুকাল পরিশ্রম এবং অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সুতরাং, আমরা আশা করিতে পারি বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় হিন্দু-সাধারণ ব্রাহ্মণসভার এ বিষয়ে কালক্ষেপ মার্জ্জনা করিবেন। তাহাদিগকে আমরা জানাইতেছি যে এই অবলম্বিত সংস্কারকার্য্যে অপরিহার্য্য কালক্ষেপে হতাশ হইবার কিছুই নাই; ব্রাহ্মণসভার সংকল্প দৃঢ় আছে।

এই পঞ্জিকা-সমিতির কার্য্য পরিচালনজন্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শন-তীর্থ মহাশয় ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় কোষাধ্যক্ষও নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

পঞ্জিকাসমিতির মনোনীত সদস্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার।
২। „ পঞ্চানন তর্করত্ন।
৩। „ চন্দ্রনারায়ণ বিদ্যারত্ন।
৪। „ উপাধ্যায় ঝা।
৫। „ ক্ষেত্রনাথ জ্যোতীরত্ন।
৬। „ ধীরানন্দ কাব্যনিধি।
৭। „ রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ।
৮। „ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
৯। „ আশুতোষ শিরোরত্ন।
১০। „ কুলচন্দ্র জ্যোতির্ব্বিনোদ।

মাননীয় বিচারপতি স্যর—

১১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী শাস্ত্রবাচস্পতি।
১২। শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন এম, এ।
১৩। „ আশুতোষ মিত্র এম, এ।

রায় বাহাদুর—

১৪। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম, এ।
১৫। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন রক্ষিত।

পারিষদ ও
কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণ—

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দুর্গাসুন্দর স্মৃতিরত্ন।
„ „ শশধর তর্কচূড়ামণি।
„ „ পঞ্চানন তর্করত্ন।
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষণ শাস্ত্রী।
„ „ গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রঘুরাম শিরোমণি।
„ „ অবিনাশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।
„ „ কৃষ্ণনাথ ন্যায়রত্ন।
„ „ শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন।
„ „ হেরম্বচন্দ্র ন্যায়রত্ন।
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীকিশোর স্মৃতিরত্ন।
„ „ যামিনীকান্ত তর্কবাগীশ।
„ „ জগদীশচন্দ্র স্মৃতিকণ্ঠ।
„ „ কৈলাসচন্দ্র স্মৃতিরত্ন।
„ „ শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ।
„ „ শশিভূষণ শিরোমণি।
„ „ সুরেন্দ্রনাথ তর্করত্ন।
„ „ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ।
„ „ চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ।
„ „ বৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণ।
„ „ অন্নদানাথ বেদান্তশাস্ত্রী।

সহকারী সভাপতিগণ—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি;
„ „ পঞ্চানন তর্করত্ন।
রাজা „ প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়।

অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি—

শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়।
বিচারপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
স্বর্গীয় মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর,

সম্পাদক—

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ,
মান্যবর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোরদেবশর্ম্মা রায়চৌধুরী,
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সহকারী সম্পাদক—

মান্যবর কুমার শ্রীযুক্ত শিবশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর। *
কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর।

" শরচ্চন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।
" রথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

কোষাধ্যক্ষ—
শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

হিসাবপরীক্ষক –
শ্রীযুক্ত বীরভদ্র চন্দ্র রায়চৌধুরী।
শ্রীযুক্ত হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।
মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর।
শ্রীযুক্ত হর্ষনাথ মুখোপাধ্যায়।
" প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
" রামদয়াল মজুমদার।
" সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
রাজা শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত রায়।
" মনোমোহন ভট্টাচার্য্য।
" বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়।
" অনাদি নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
" শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী।
শ্রীযুক্ত দুর্গাসুন্দর কৃত্তিরত্ন।
শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ তর্কবাগীশ।
" রামচরণ বিদ্যাবিনোদ।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ।
" চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ।
" বসন্তকুমার তর্কনিধি।
" আনন্দচন্দ্র তর্কবাগীশ।
" কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার।
" শ্রীরাম শাস্ত্রী।
" শশিকুমার শিরোমণি।
" শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
" চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার।
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী।
শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ সরস্বতী।
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস রায়।
শ্রীযুক্ত পান্নালাল মুখোপাধ্যায়।
ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী।
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত চিরসুহৃৎ লাহিড়ী।
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
" দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী।
" উমানাথ ভট্টাচার্য।
" রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

সাহায্যদাতৃগণের নাম।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর, রাজা শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত রায়, শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রায় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বহাদুর, শ্রীযুক্ত চিরসুহৃদ লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়; পশ্চিম-দেশীয় শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্ম্মণ, শ্রীযুক্ত বসন্তলাল বর্ম্মণ, শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস বর্ম্মণ, ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলালজী বর্ম্মণ, শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ দাস, শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস বাজোরিয়া, শ্রীযুক্ত বল্লভ-রায় নাগর, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুন্দনলাল চতুর্ব্বেদী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগীঝাঁ ব্যাকরণতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রঘুবীর বেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন রায়, শ্রীযুক্ত ধুরন্ধর রায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুকদেব মানাকা, শ্রীযুক্ত জগন্নাথ হরিতোয়াল, শ্রীযুক্ত জগন্নাথ শর্ম্মা, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সকলনারায়ণ শর্ম্মা পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত রামলাল রামস্বরূপ, শ্রীযুক্ত ঈশ্বর গোপালজী, শ্রীযুক্ত ভূআল রায়জী প্রভৃতি। রামগোপালপুরের রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় এক কালীন ২০০৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং সিমলাশৈল হইতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৲ শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহোপলক্ষে অতিরিক্ত ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শোকপ্রকাশ।

বঙ্গীয়ব্রাহ্মণসভা দুইজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ঘনিষ্ট বান্ধবের মৃত্যুতে আজ ক্ষতিগ্রস্ত। এক জন পণ্ডিতসমাজের, অপর জন বিষয়িসমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। কাশীধামের মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবকুমার শাস্ত্রী ও সুসঙ্গের মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর আর ইহ জগতে নাই। উভয়েরই ধর্ম্মজীবন নিষ্কলঙ্ক, কর্ম্ম-জীবন মধুময় ছিল। উভয়ের অভাব আধুনিক সমাজে পূরণ হওয়া দুষ্কর। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা তাঁহাদের জন্য শোক প্রকাশ করিতে-ছেন ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের শোকে আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছেন।

উপসংহার।

যাঁহার সমদর্শিতায় বিভিন্ন জাতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী স্ব স্ব উপযোগী সমাজধর্ম্ম অব্যাহত-ভাবে পালনে অধিকারী, যাঁহার সুশাসনে আজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান ধর্ম্ম-আচারণে সকলে সমান, যাঁহার ছত্রচ্ছায়াতলে অননুভূতপূর্ব্ব স্নিগ্ধশান্তি আজ আমরা অনুভব করিতেছি, হিন্দুর চক্ষে যিনি নররূপী মহতী দেবতা, চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্মের প্রতিভূ, সেই মহামান্য সসাগরা-ধরাধিপতি ভারতসম্রাট্ তাঁহার মহিষীর সহিত দীর্ঘজীবন লাভ করুন এবং সত্বর জয়শ্রীযুক্ত ও সর্ব্ববিধ মঙ্গলদ্বারা বিভূষিত হউন, বঙ্গীয়ব্রাহ্মণসভা আজ সর্ব্বান্তঃকরণে এই আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ সভা।

১৩২৩ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব।

জমা

গত বৎসরের তহবিল———————৩৫১৸৴১০

১। সাধারণ বিভাগ———

(ক) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় প্রদত্ত ৭০,০০০৲ সত্তর হাজার টাকার উপর সুদ ৫৲ টাকা হিসাবে ৩৫০০৲ এবং গতবর্ষের বাকি ৮৪১৵৫ মোট ৪৩৪১৵৫ মধ্যে আদায়

———————

৪৩২৪৶৫

(খ) অন্যান্য বার্ষিক ও মাসিক বৃত্তি আদায় ৯৯১৵১৫

(গ) ১৩২৩ সালের বাড়ী ভাড়া আদায় ৪৬৬৷৫

(ঘ) অন্যান্য আদায় ১৮১৷৶০

(ঙ) আমানত ১৫৬৵৫

———————

৬১১৯৷৶১০

২। বেদবিত্থালয় বিভাগ———

শ্রীযুক্ত রায় গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর ৬০৲

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৬০৲

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী সংগৃহীত ৩৯৫৷৵০

———————

৫১৫৷৵০

খরচ

১। সাধারণ বিভাগ———

দেবার্চ্চন ও বার্ষিক সভা———১০৯৷৶৫

মাসিক বৃত্তি———————২২৭৫৷৷৶১৫

(অধ্যাপক, ছাত্র, প্রচারক ও কর্ম্মকর্ত্তা)

পাথেয়	১১৬৲১০
বাজে খরচ	১৫২৷৷৶১৫
সরঞ্জাম	১৫৭৷৷০
বেদবিদ্যালয় সাহায্য	৯৪৷৵০
দাতব্য ও পার্ব্বণী	১৩৷৶০
বাড়ী ভাড়া	১০৩৭৷৶০
হাওয়ালত	১৯৶১৫
আমানত শোধ	৬০৯৷৷৵০
মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম মহাসম্মিলন খরচ	৮৪৶১০
মাদারীপুর মহাসম্মিলন (মায় হাওলাত) খরচ	৩৮৬৸৴১৫
	৫০৫৬৷৵৶৫

২। বেদবিদ্যালয়———

(ক)	অধ্যাপক ও ছাত্রবৃত্তি	১৪১৷৷০
(খ)	বাড়ী ভাড়া	৪২০৲
(গ)	সরঞ্জামী	১৩৲
(ঘ)	বাজে খরচ	৮৭৷৷৶৫
(ঙ)	হাওলাত	৫১৲
		১৯৮২৶৫
		৭০৩৯৵১০

জমা		খরচ	
জের	৫১৫৮৶০	৩। পরীক্ষা-বিভাগ	৬৬।০
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী	১৩৫৪৲	দফে	১৭০৲
শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৫৲		২৩৬।০
বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা	৯৪।৶০	৪। ব্রাহ্মণ-সমাজ পত্রিকা	
আমানত	১৬।০	ডাক খরচ	২৫৮।৶৫
	১৯৯৫॥০	অন্যান্য	১৬২৪৸৶০
	৮৪৬৭৶০		১৮৮৩।/৫
৩। পরীক্ষা বিভাগ		তহবিল	৬৩৪৴৫
শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২১৮৲	দফে	
৪। ব্রাহ্মণসভা পত্রিকাবিভাগ	৯৬২ ০	গত বৎসরের প্রেশের বাকী জমা করতঃ খরচ লেখা যায়	১১৬॥৶০
৫। প্রেশের বাকি (পূর্ব্ব বৎসর ও বর্ত্তমান বৎসরে রমণীবাবুর প্রেশে বাকি)	২৫৮॥৶০		
৬। বাজে	৩॥০		
	৯৯০৯।৶০		৯৯০৯।৶০

শ্রীবীরভদ্রচন্দ্র চৌধুরী, হিসাবপরীক্ষক।
শ্রীগুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ,
শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
সম্পাদক।

গত বার্ষিক সভায় পরিগৃহীত নির্দ্ধারণ, নির্ব্বাচিত পারিষদ ও অন্যান্য সভ্যগণের নাম বারান্তরে প্রকাশ্য।

(ব্রাঃ সং)

পঞ্জিকা-সংস্কার সমালোচনার বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা। *

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ষষ্ঠ উদাহরণ। "আশুবাবু জুলিয়স সিজারের সময় হইতে পুঞ্জীকৃত ভ্রমের মধ্যে সংশোধনা-বশিষ্ট তিন দিনের জন্য প্রশ্ন করিয়াছেন। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, নিশিয়ার কাউন্সিলে ৩২৫ খৃঃইষ্টার পালনের বিধান স্থিরীকৃত হওয়ায় ঐ সময়ের সায়ন মেষ সংক্রমণের তারিখ (২১শে মার্চ্চ) ঐক্য রাখার জন্যই এইরূপ হইয়াছিল। ইহাতে অশুদ্ধ সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিকতা নাই।"—শ্রীযুক্ত সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় ব্রাহ্মণ সমাজ পত্রিকার ১৩২৩ সালের চৈত্র সংখ্যায় ৩৮৮ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত ইতিহাস আলোচনার উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু আলোচ্য বিষয়টি পাঠকের বোধগম্য করিবার চেষ্টা আদৌ করেন নাই। আশুবাবু তো ইতিহাস আলোচনা করিবেন সাধারণ পাঠক কি করিবেন? আসুন আমরা সকলে মিলিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়, সাতকড়ি বাবুর যুক্তি ও ইতিহাস প্রকাশ্য ভাবে আলোচনা করি।

বম্বে সভা সূর্য্যসিদ্ধান্তের (ক) বর্ষমাণ গ্রহণ করিতে আদেশ দেওয়াতে সভার পোষকতায় আমরা লিখিয়াছিলাম, "সামান্য অশুদ্ধ বর্ষমান বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে" (খ)। "ভ্রান্ত বর্ষমান লইলেও জ্যোতিষ বিজ্ঞানসম্মত থাকিতে পারে" (গ)। এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য ইউরোপের বর্ষমান-ভ্রান্তির উদাহরণ দেওয়া হইয়াছিল (ঘ)। জুলিয়স্ সিজারের সময় হইতে পুঞ্জীকৃত ভ্রম যখন গ্রেগরি সংশোধন করিলেন তখন দুই তিন দিন ভ্রমাবশেষ রহিয়া গেল। সেই ভ্রম এখনো ইউরোপীয় জ্যোতিষে আছে; কিন্তু তাহাতে জ্যোতিষ অবৈজ্ঞানিক হইয়া পড়ে নাই। ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা এই ভ্রম অপনয়ন করিতে সচেষ্ট নহেন; কারণ ইহাতে জ্যোতিষ কলুষিত হয় না।

আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় "ভ্রান্ত বর্ষমাণ লইলেও জ্যোতিষ বিজ্ঞানসম্মত থাকিতে পারে।" আমাদের প্রমাণ এই যে, ইউরোপের পুঞ্জীকৃত বর্ষমানভ্রান্তির অংশ অদ্যাবধি বিদ্যমান থাকায়ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ সমগ্র পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মতে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত।

---

* আষাঢ় সংখ্যায় নাম পরিবর্ত্তন হইলেও একই বিষয়।

(ক) এই বর্ষমাণ ঈষৎ ভ্রান্ত।

(খ) ব্রাহ্মণ সমাজ ১৩২৩ আষাঢ় পৃষ্ঠা ৫৮৬।

(গ) ব্রাহ্মণ সমাজ ১৩২৩ আষাঢ়, পৃষ্ঠা ৫৮৭।

(ঘ) ব্রাহ্মণ সমাজ ১৩২৪ আষাঢ় সংখ্যা পৃষ্ঠা ৫৮৬ এবং ৫৮৭ পাঠ করুন।

ইহার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় নিশিয়ার কাউন্সিলের কথা অপরিস্ফুট ভাবে বলিলেন। যুক্তি তর্ক বিচারাদি স্থলে অস্ফুটতা বিলক্ষণ দোষাবহ। যাহাই হউক, তিনি যাহা বলিতে চাহিতেছেন তাহা এই,—

"The Julian calendar continued unaltered for about sixteen ceturies; and if the true length of the tropical year had been 365·25 days, it would have been in use still. But this period is about 11·25 minutes longer than the solar year, a quantity which repeated every year, amounts to an entire day in 128 years. Consequently in the sixteenth century the equinoxes occurred 11 or 12 days sooner than they should have occurred according to the calendar or on the 10 th instead of the 21st of March. To restore them to their original position in the year, or, more exactly, to their position at the time of the Council of Nice * was the object of the Gregorian reformation of the calendar, so called after Pope Gregory XIII. by whom it was directed." অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে জুলিয়ান্ পঞ্জীতে এগারো, বারো দিনের ভ্রম দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে Nice বা Nicæa নগরীর ধর্ম্মসম্মিলনের সময়ের পরবর্ত্তী অংশ ধর্ম্মযাজক-শ্রেষ্ঠ Gregory'র আজ্ঞানুসারে পরিত্যক্ত হইল †। এই ইতিহাস সিদ্ধান্তজ্যোতির্ভূষণ মহাশয় আলোচনা করিতে বলিতেছেন। তাঁহার লেখার উদ্দেশ্য এই যে, নিশিয়ার কাউন্সিল সমাবেশের বৎসর (৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে) যখন ইষ্টার হয় বৎসরের সেই ভাগে যাহাতে ভবিষ্যৎ ইষ্টার হইতে থাকে সেই জন্য ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বসঞ্চিত ভ্রম রাখা হইল।

দুরূহ ভাষায় জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় ভ্রান্তি সংরক্ষণের কারণ নির্দ্দেশ করিলেন। আমাদের বক্তব্য এই যে সহস্র কারণ নির্দ্দিষ্ট হইলেও ভ্রমের অপনয়ন হইল না; ভ্রম রহিয়াই গেল।

এই ভ্রম সত্ত্বেও আজিকার পাশ্চাত্য জ্যোতিষ বিজ্ঞানসম্মত। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, "ভ্রান্ত বর্ষমান লইলেও জ্যোতিষ বিজ্ঞানসম্মত থাকিতে পারে।"

সিদ্ধান্তজ্যোতির্ভূষণ মহাশয়ের শেষ কথা,—"ইহাতে অশুদ্ধ সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিকতা নাই।" আমরা বলি, বৈজ্ঞানিকতা না থাকিলেও সংরক্ষণটা আছে। জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়ের মনে হইয়াছে যে অশুদ্ধিই বুঝি বিজ্ঞান। বস্তুত অশুদ্ধি বিজ্ঞান নহে। বর্ষমানের অশুদ্ধি জ্যোতিষের অন্যান্য অংশকে কলুষিত করিতে পারে না, এই কথাই আমরা বলিয়া আসিতেছি। আমাদের প্রতিপাদিত বিষয় অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে, সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের নিশিয়ান্ ইষ্টাররূপ শরসন্ধান ব্যর্থ (ক);

শ্রীআশুতোষ মিত্র এম্ এ,। ক্রমশঃ।

---

* In 325 A. D.

† পূর্ব্ববর্ত্তী অংশ রহিয়া গেল।

(ক) "Thou goes my shaft like the world goose unclaimed of any" "They are invulnerable as the casing air and our vain blows are malicious mockery"

কলিকাতা—৮২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ নবদ্বীপ সমাজ সমিতির—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা হইতে ব্রাহ্মণসমাজ কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১২ নং শিমলাষ্ট্রীট, জ্যোতিষ-প্রকাশ যন্ত্রে শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা মুদ্রিত।